যৌবনে বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব বসু: স্রষ্টা ও সৃষ্টি

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান শৌভিক (টুম্পা)-কে

রাঙাকাকা

সূচিপত্র

আধুনিক কবিতা: পটভূমি উন্মেষ ও বুদ্ধদেব বসু

আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম বিশ শতকের তিনের দশকে আর পরবর্তী চারের দশক হল তার প্রতিষ্ঠাকাল। এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন সরে আসতে চাইছিলেন তাঁর বৃত্ত থেকে বৃত্তের বাইরে, তেমনি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে খুঁজে পেতে চাইছিলেন আধুনিকতার ভিত্তিভূমি এবং তাঁদের ভাবনা, বিন্যাস ও প্রকরণ চর্চার ফলে বাংলা কবিতা নতুন ও অভিনব ভুবন রচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯২৩ থেকে ৩০ পর্যন্ত আধুনিক কবিতার আত্মানুসন্ধানের কাল আর ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ তার আত্ম-আবিষ্কার, প্রতিষ্ঠা আর সম্প্রসারণের কাল। উনিশ শতকের স্মরণীয় ঘটনা প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮), সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব (১৯১৭), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন (১৯২৭-২৮), কমিউনিস্ট বিরোধী মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। এই পর্বে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও মার্কসীয় চেতনার অভিঘাত জাতীয় তরুণ চিত্তে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক চেতনা, অসহযোগ আন্দোলন, গণচেতনার প্রসার, বিপ্লবী সংগ্রাম ইত্যাদি সমসময়কে চিহ্নিত করে দেয় এবং সাধারণ মানুষ ক্রমশ নানা আন্দোলন, বিক্ষোভ, সংগ্রাম ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। শৃঙ্খল মুক্তির পিপাসা, অর্থনৈতিক দুর্দশা, ক্রমবর্ধমান বেকারি, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (১৯২৯) ইত্যাদি সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতেও আঘাত হানল। 'কল্লোল' বাঙালি পাঠকের কাছে বিশ্বসাহিত্যের সংবাদ আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, বাস্তবধর্মী দেহনির্ভর যৌনচেতনার প্রকাশও অবারিত করল। এই যে দৈশিক ও বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা, সেখানেই তিরিশের কবিদের জীবনের বেশ অনেকখানি পর্ব অতিবাহিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু পূর্বোক্ত কবিদের কালপর্ব সম্পর্কে মন্তব্যকালে বলেছেন যে, তাঁরা সকলেই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমকালীন আবহাওয়ায় সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের জীবনের মূল পর্ব অতিবাহিত হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপে যে পরিবর্তন এসেছিল তার তুলনায় আমাদের দেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম হলেও সেই পরিবর্তন অনস্বীকার্য। উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকের পরিবর্তন অনেকখানি বিস্তৃত ও ব্যাপক। কঠোর জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতায়, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে জীবনের সুস্থতা প্রায় নির্বাসিত হচ্ছিল। জীবনের আনন্দ, প্রাণ, সুস্থতা, শোভনতা ইত্যাদি সম্পর্কে মোহ প্রায় ভাঙতে শুরু করেছিল। ফলে রবীন্দ্রভাববৃত্তের জগৎ থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম এবং পরবর্তীকালে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্তরা। এরা বাংলা কবিতার ভুবনে আনলেন ভাবৈশ্বর্যের বিচিত্র ও নবতম সমারোহ।

বলা যেতে পারে, 'কল্লোল' পর্বই প্রথম আধুনিকতার সূচনা করে। এই পর্বের লেখকরা

রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও যুগচৈতন্যের আদর্শে আত্ম-অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন। জীবনানন্দ এ পর্বের কবিতা প্রসঙ্গে 'বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতা' প্রবন্ধে বলেছেন—"এই সংঘর্ষে যে আধুনিক কবিতার নিজস্বতা ম্লান হয়নি তাকে বাঙলাদেশের বর্তমান কালের অল্পাধিক বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতা বলা যেতে পারে। বিপ্লব সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোটা পরিপ্রেক্ষিতের মুখে দাঁড়িয়ে এ বিপ্লব পূর্ণতর সমীকরণের চেষ্টায় অর্থাৎ সৃষ্টির রহস্যের নতুনতর অর্থসন্ধানে ব্যস্ত। কাজেই এ সব কবিতার জীবনদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের জীবনদেবতাবোধের চেয়ে অন্য জিনিস। রবীন্দ্রকাব্যের অর্থ গৌরবের থেকে এসব আধুনিক কবিতার নিহিত অর্থ পৃথক হওয়ার দরুন প্রকাশের ভঙ্গিও স্বভাবতই অন্য রকম হয়েছে।" যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল তিনজনেই রবীন্দ্রভাববৃত্তের বাইরে এসে মানুষের নীতিবোধ, প্রেমচেতনা ও অন্যান্য অনুভূতির বিরুদ্ধে অনাস্থা ঘোষণা করলেন। বিশ্বজোড়া মরুময়তা ও তমসালিপ্ত রূপকের আবরণে যতীন্দ্রনাথ নাস্তি আর অমঙ্গলচেতনার রেখালেখ্য কবিতায় উপস্থিত করলেন। রবীন্দ্রনাথের যৌবনবন্দনার বিপ্রতীপ জগতে মোহিতলাল স্থাপন করলেন মানবিক বাসনা-কামনার আরক্ত সংরাগে স্পন্দিত দেহাস্বাদনমূলক কবিতা। আর নজরুল তাঁর কবিতার জগতে আনলেন বিদ্রোহের তপ্ত পরিমণ্ডল, যেখানে তিনি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অমানবিক ব্যবস্থাসমূহের সমূহ বিনাশ কামনা করে মানুষের সর্বাত্মক মহিমার জয়গান গাইলেন। রোমান্টিক কল্পনাবিলাস, ভগবদ্ভক্তি, আস্তিক্যবাদী ঔপনিষদিক চেতনা বিসর্জিত হল। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবোধ, নজরুলের মমত্ববোধ, প্রেমেন্দ্রর সহানুভূতির লক্ষ্য ছিল সাধারণ শ্রমজীবী অবজ্ঞাত মানুষ। বুদ্ধদেব বসুও ঈশ্বরবন্দনা সত্ত্বেও আস্তিক্যবাদী চেতনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন। এ কালে প্রেমচেতনায় পরিবর্তন এল—অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্থানে দেহচেতনা প্রাধান্য লাভ করল। বিষ্ণু দে জীবনকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কাব্যসাহিত্য মন্থনজাত মননে বন্দনা জানালেন। সুধীন্দ্রনাথ আত্মরতিতে মগ্ন মানুষের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার প্রেক্ষাপটে তিন ও চারের দশক বিশ শতকের সর্বাপেক্ষা অগ্নিগর্ভ উন্মুখর মুহূর্ত—এই কালপর্বে বিশ্ব সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য চেতনা বাংলা সাহিত্যের ভাবরূপ, কলাবিধির ক্রমশই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে, তীব্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, মানবিক মূল্যবোধও বিচলিত, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর জীবনচেতনাও আন্দোলিত ও আলোড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (১৯২৯—৩০), বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী বছরগুলি থেকে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি অনিবার্য নিয়তি সাধারণ জীবনকে তছ্নছ্ করে দেয়। ১৯৪৩—৪৪-এর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। অবশ্য ইতিহাসের এই নেতিবাচকতা কিন্তু আলোচ্য কালপর্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নয়। এই সময় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে, ভারতীয় রাজনীতি ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ লাভ করে। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৫—৪৭ আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বিচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক

গণ-আন্দোলন ইত্যাদি বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাসকে চিনিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধের মূলে সক্রিয় ছিল অশুভ ফ্যাসিবাদী শক্তি ; তাকে প্রতিহত করার জন্য ইউরোপের মানবতাবাদী, গণতন্ত্রবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবৃন্দ পপুলার ফ্রন্ট গড়ে ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হন। ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের ফলে মানবিক মূল্যবোধের বিনাশের আশঙ্কায় সাম্যবাদে বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লেখককুল এক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ফ্যাসিবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও প্রতিরোধের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেন। বাংলা সাহিত্যেও তার অভিঘাত উপনীত হতে দেরি হল না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ, এলিয়ট কাব্যের সঙ্গে পরিচিতি, প্রগতিবাদী স্পেন্ডার, অডেন, ডে-লুইস প্রমুখের প্রতি অনুরাগ বাংলা কবিতায় নতুন সম্ভাবনা সূচিত করল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' এবং 'ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট' প্রবন্ধে ; বিষ্ণু দে তাঁর 'জনৈক লেখকের কৈফিয়ত' এবং বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার কাব্যতত্ত্ব উচ্চারণ করলেন। এইভাবে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক 'সমন্বয়ী প্রযত্ন' গড়ে উঠল।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যে কয়জন কবিকে আধুনিকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) অন্যতম। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যধারার সুদীর্ঘ কালের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আধুনিক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুকে সর্বাপেক্ষা কবিতাপ্লুত ও শিল্পমনস্ক কবি বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। যদিও মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বাস্তব অভিক্ষেপ তার কবিতায় প্রত্যক্ষত প্রতিফলিত হয়নি, তবুও আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যকলা এবং কাব্যভাবনা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় বুদ্ধদেব বসুর নানা মাত্রিক অবদান স্মরণীয়। সংগঠক রূপে বুদ্ধদেবের ভূমিকা তিনভাবে স্মরণীয়—সম্পাদক ; সমালোচক এবং প্রকাশক। ঢাকাতে তিনি সম্পাদনা করেন দুটি পত্রিকা: বিখ্যাত জগন্নাথ হল বার্ষিকী 'বাসন্তিকা' (১৯২২), মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি' (১৯২৭) এবং কলকাতায় ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা 'কবিতা' (১৯৩৫)। 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ করেন বন্ধু কবি অজিত দত্তের সঙ্গে। 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেবের সঙ্গে নানা সময়ে সহযোগী ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, নরেশ গুহ প্রমুখ। হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশ করেন 'চতুরঙ্গ' (১৯৩৮)। তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা (১৯৩৫-৬০) পঁচিশ বছর ধরে আধুনিক বাংলা কবিতাকে প্রায় নির্মাণ করেছে। সমালোচক রূপে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রমুখ কবিদের সমালোচনা করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ পূর্ণ সমালোচনা করেছেন। ১৯৪০ সালে 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র (আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) তিনিই ছিলেন প্রকাশক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'কবিতা ভবন' থেকে শুধুমাত্র তাঁরই নয়, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদেরও অনেক কবিতা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে 'এক পয়সার একটি সিরিজে'। কাব্য সমালোচক রূপে ও 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক রূপে নজরুল-পরবর্তী তিরিশ-চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কবিদের

সংগঠনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা কারও অবিদিত নয়। এমনকি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের ও বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদক রূপেও বুদ্ধদেব বসু স্মরণীয়। তা ছাড়া তিনি হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে, চিনে কবিতা, পাস্তেরনাকের জিভাগোর কবিতাও অনুবাদ করেছেন।

মূলত রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধতা করে এবং ক্ষমাহীন ক্ষোভ নিয়ে বাংলা কবিতার রাজ্যে বুদ্ধদেব বসুর আবির্ভাব। তিনি তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়েই হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যে প্লাবনে বিদ্রোহী। দুরন্ত আবেগের এক রোমান্টিক অস্মিতাবোধ এবং বিক্ষোভ এই তরুণ কবিপুরুষকে প্রথম থেকেই অভিভূত করেছিল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা যেখানে রোমান্টিকতার আবেগ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে সেখানে বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিকতাকে নবতম আবেগে মণ্ডিত করতে চাইলেন। তিনি রাবীন্দ্রিক প্রচ্ছায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। যদিও তিনি বুঝেছিলেন, 'উত্তররৈবিক কবিযশ প্রার্থীর পক্ষে সূর্যাবর্তের আবহ স্বাস্থ্যকর নয়', তবুও তিনি স্বীকার করেছিলেন, প্রত্যেক আধুনিক বাঙালি লেখকের কাছে কিন্তু বিশেষ করে আমার কাছে আপনি দেবতার মতো। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি।" (রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেব বসুর চিঠি। বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড।)

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী' (১৯২৪)। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল সম্ভবত ছিয়ানব্বই এবং কবিতার সংখ্যা তিরিশ। কবিতাগুলি মূলত অপরিণত কিশোর মনের অভিব্যক্তি, প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্য অবলোকনে কবিচিত্তের উন্মোচন ঘটেছে। কবিতার বিষয়ও গতানুগতিক। যেমন, নদী-সন্ধ্যা-প্রভাত-সূর্যাস্ত ইত্যাদি। একাব্যে রাবীন্দ্রিক ছন্দ, উচ্চারণভঙ্গি এবং রবীন্দ্র প্রভাবই বেশি। হয়তো কিশোরকালের কবিতা বলেই উক্ত কাব্যগ্রন্থে শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ লিখিত একটি ভূমিকা ছিল যেখানে তিনি লিখেছিলেন, "এই সংগ্রহের বহু কবিতায় যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শিল্পচাতুর্যে, বিচিত্র শব্দবিন্যাসে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত কঠিন অসমছন্দে গভীর ভাব প্রকাশে কবি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে তাহার বয়সের তারুণ্য বিবেচনা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।" তবু এ কাব্যে রাবীন্দ্রিক ছন্দ ও উচ্চারণভঙ্গি বুদ্ধদেব বসুর স্বরভঙ্গিকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে উঠেছে।

'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০) মূলত প্রেমের কাব্য। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে চিরন্তন মানবিক চিত্তবৃত্তি প্রেমকে তিনি যেভাবে অবলোকন করেছেন তাকে বুদ্ধদেবের প্রেমভাবনার প্রথম পর্যায় বলা চলে। আলোচ্য কাব্যে এমন কতকগুলি শব্দবন্ধ আছে যা কবির দেহবাদী সম্ভোগ-সংরোগের যেমন পরিচয় প্রদান করে তেমনি দেহোত্তীর্ণ প্রেমের পরিচয়ও প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'বন্দীর বন্দনা' সম্পূর্ণ পড়েননি; পণ্ডিচেরির দিলীপকুমার যে কয়টি কবিতা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন সেগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, "কবিতাগুলিতে সহজস্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী। .... যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হল এ যে একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল, ফুল, ধ্বনি ও বর্ণ। ... দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু বিস্তৃত। হয়তো দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ. হয়তো প্রকাশ পাবে

উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে 'তমালতালীবনরাজিনীলা' তটলেখা।" (গ্রন্থপরিচয়, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক: নরেশ গুহ)। 'বন্দীর বন্দনা' আলোচনাকালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৯): "এক অতুলনীয় কবি প্রতিভার প্রভাবে বাংলার কাব্যসাহিত্য যখন...আধ্যাত্মিকতার আকাশে অস্পষ্টতার জাল বুনিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন যে কয়েকজন কবি উহাকে মর্ত্য মানবের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদেরই অন্যতম।" 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাটির রচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "ধীরে ধীরে লাইনের পর লাইনে, মিলছুট, চলন একটু ভারী, বেরিয়ে এল এক যুবকের জবানবন্দী, এক শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর আত্মঘোষণা। 'অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত'—এই শেষ উক্তিটি কাগজে লিখেই আমার অনুভূতি হল—এটা ঠিক, এটা হয়েছে, এটা সত্যি। মানে এটা বানানো নয়, আওয়াজের কুচকাওয়াজ নয়, নয় রবীন্দ্রনাথে বা সত্যেন দত্তে বদহজমজনিত উদগার, এখানে আমার কিছু বলার ছিল, এই প্রথম আমি নিজের গলায় কথা বলতে পারলাম।" (আমার ছেলেবেলা) এ কাব্যে আছে জীবনের বাস্তব উপস্থিতির স্বীকৃতি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'য় প্রেমের বাসনার লজ্জাহীন ও কুণ্ঠাহীন প্রকাশ। মানুষের আদিম জৈবকামনার অলজ্জ প্রকাশ 'বন্দীর বন্দনা'য় যেমন রূপায়িত, তেমনি কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণের মন্ত্রধ্বনিও তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নয়। কবি চিত্তের ক্ষুধিত যৌবনের ঝড় আর আদিম শৃঙ্গার কামনাজনিত সংকট জিজ্ঞাসা যা উঠে আসে কবির অবচেতনার গভীরতার থেকে আমূল আলোড়িত হয়ে, কবি তা থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিপ্রয়াসী। অবচেতন অন্ধকার কক্ষে যদি থাকে কামনার তপ্ত নাগপাশ তাহলে বহির্প্রকৃতিতে আছে স্নিগ্ধতা ও শান্তি। যৌবনের অগ্নিদাহ বাসনা-ব্যাকুলতা, সৌন্দর্যের সোপান কলঙ্কিত করে; সুন্দরের আনন্দ বঞ্চিত করে। বুদ্ধদেব বসু এ পর্বের কবিমানসের বিপুল দিগন্তকে পরিব্যাপ্ত করেছে আবেগে,উচ্ছ্বাসে, যন্ত্রণায়, বিদ্রোহে, শান্তিতে, স্বস্তিতে। প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দিদশার কান্নায় মুখর বুদ্ধদেব উচ্চারণ করেন—'বাসনার বক্ষো মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন'। কামনার শৃঙ্খলে চিরবন্দি থেকেই প্রেমের অমৃত পিপাসাকে কবি পূর্ণ করেছেন। 'অমিতার প্রেম' কবিতায় শাপভ্রষ্ট জীবনের মুক্তির পথ কবি খুঁজে পান। আলোচ্য কাব্যের 'প্রেম ও প্রাণ' পর্যায়ের ছয়টি সনেটে আরক্ত শরীরী সংরাগ থেকে প্রেমে উত্তরণের পর্যায়টি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'প্রেমিক' কবিতায় নারীর নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যকে ধ্বংসের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু মানুষের রিরংসা পরায়ণতাতেই কবির কাব্যসাধনার সমাপ্তি ঘটে না ; তিনি প্রেমের প্রেরণাতেই আবিষ্কার করেন শিল্পিত মহিমা। মানুষের এই যে আত্মাবিষ্কার তাঁর মূলীভূত প্রেরণা প্রেম, আর 'বন্দীর বন্দনা' তারই ছন্দস্পন্দিত চিত্রমণ্ডিত কাব্য রূপায়ণ।

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে বুদ্ধদেব যেখানে দেহ সম্পর্কে আত্মমীমাংসায় উন্নীত, সেখানে 'একটি কথা' (১৯৩২) কাব্যে দেহকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণের জন্য আত্মদ্বন্দ্বের অবসান। ব্যক্তিবোধের নিঃসঙ্গতা অতিক্রমকারী বুদ্ধদেব বহির্বিশ্বে প্রেমকে অনুভব করতে চেয়েছেন। 'একটি কথা'র সব কবিতাই প্রেমকেন্দ্রিক কবিতা। এ কাব্যে প্রকৃতির সহজ-স্বাভাবিক আবেগ

শান্ত মধুর দৃশ্যে রূপায়িত হওয়ায় প্রেমের কবিতাগুলিও বেশ সৌন্দর্যমণ্ডিত। কাব্যের নায়িকার নাম বাস্তবসংলগ্নতার কাছাকাছি, অথচ সে চিরন্তনী—

আমি বসাবো তোমাকে মোর ইজি চেয়ারে
আমি বসবো পাশে
ঘরে জ্বলবে মোর আলো এক কিনারে
আর জ্বলবে সন্ধ্যাতারা আকাশ পারে
আর জ্বলবে স্বপ্ন তব আঁখির ঠারে

বুদ্ধদেব বসুর এ পর্যায়ের কবিতাবলিতে বাসনার উপস্থিতি স্বাভাবিক। শারীরিক স্পর্শতা, রোমান্টিকদের ব্যাকুল বাসনা তাঁর এ পর্যায়ের কবিতাবলিতে সুপরিস্ফুট। তিনি রূপায়িত করেন সেই মেয়েকে যার নয়নে কামনা, অধরে অমৃত, পরশে মিনতি আর আঁখির কোণে বাসনার গুঞ্জরণ।

বুদ্ধদেব বসুর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'পৃথিবীর পথে' (১৯৩৩)-র নামপত্রে লেখা আছে 'বুদ্ধদেব বসু প্রণীত প্রেমের কবিতা'। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে মাত্র ছটি কবিতা আছে; কবিতা সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে 'পৃথিবীর পথে' থেকে বর্জিত ১২টি কবিতা আছে। এ কাব্যেও 'বন্দীর বন্দনা'র সুর প্রবাহিত। এখানেও আত্মময় বিচরণ থেকে গেছে। দেহকে স্বীকার করেই কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বাস্তব প্রযুক্ত হতে পারে না; তাই তিনি প্রেমকে গোপনে রাখতে প্রয়াসী—

সৃষ্টির আনন্দ মোহে রচিয়াছ অন্ধকারে নব তিলোত্তমা—
সূর্যের দুর্জয় দাহে এনো না টানিয়া তারে নির্লজ্জ বাহিরে।

কবি মনে করেন, নারীদেহের প্রতি আদিম লালসা মানুষের মহিমাকে খর্ব করে বলে প্রেমের রহস্য জাল প্রয়োজন। তাই 'অসূর্যস্পশ্যা' কবিতায় কবির উচ্চারণ—

প্রেমের পবিত্র ব্যথা আচ্ছাদন করি রাখে কুমারীর কামচঞ্চলতা—
তেমনি ঢাকিয়া রাখো তোমার রূপের স্বপ্নে আমার সমস্ত প্রাণমন।

কিন্তু তবুও কবির বোধে জড়িয়ে থাকে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যা ধ্বনিত হয় 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের 'আর কিছু নাহি সাধ' কবিতায়।

'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) কাব্য থেকে বুদ্ধদেবের কবিতায়, প্রেমের কবিতায় প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটেছে। আসলে তাঁর প্রেমের দুটি মহল—'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী'। বুদ্ধদেব বসু 'কঙ্কাবতী'র তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—"বন্দীর বন্দনা ও কঙ্কাবতীকে যদি দুটো মহল বলা যায়, তাদের মধ্যে যোগসাধনাকারী সরু বারান্দাটির নাম দিয়েছিলাম পৃথিবীর পথে"। বাংলার প্রাচীন লোকনায়িকা 'কঙ্কাবতী'র প্রতি কবি যে অমেয় আকর্ষণ অনুভব করেন তাই 'কঙ্কাবতী'তে রূপায়িত। বহু যুগের অন্ধকার অতিক্রম করে লোকনায়িকা কঙ্কাবতী বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিক প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কঙ্কাবতী নাম শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয় 'বন্দীর বন্দনা'র 'প্রেমিক' কবিতায়। 'কঙ্কাবতী' কাব্যের আরশি, সেরেনাদ, কঙ্কাবতী,

রূপকথা, শেষের রাত্রি কবিতায় কঙ্কাবতীর নাম ব্যবহৃত হয়েছে। কঙ্কাবতী বাংলার লোকনায়িকা হলেও তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, নায়িকার রূপসৌন্দর্য বিদেশাগত। যেমন, আপেল, লাল, লালচুল, হালকা হলুদ চুল ইত্যাদি শব্দ দেশজ লোকনায়িকা সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে কিনা তা সন্দেহের। মনে হয়, বুদ্ধদেব বসু লোকপুরাণের কঙ্কাবতীর আজানুলম্বিত, মেঘবরণ, তৈলসিক্ত চুলের সঙ্গে আধুনিক প্রতীচ্য নায়িকার রূপসৌন্দর্য মিশ্রিত করতে চেয়েছেন। 'কঙ্কাবতী'র রূপরাশি যে বিদেশি রোমান্টিক কাব্য থেকে সমাহৃত তার ইঙ্গিত আছে। দীপ্তি ত্রিপাঠীও মনে করেছেন—"আবেগ সঞ্চারের জন্য যেতে হবে পৃথিবী পরিক্রমায়—বর্তমান থেকে সুদূর অতীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কবিকর্ম থেকে তিলে তিলে সৌন্দর্য প্রেরণা আহরণ করে গড়তে হবে আধুনিক কাব্যের তিলোত্তমা। কঙ্কাবতী হল এই তিলোত্তমা"। (আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।) কঙ্কাবতীর প্রেম কবিকে পৌঁছে দিয়েছে অমরাবতীতে অমৃতরূপা হয়ে।

কবি সব বিষয়ে-বস্তুতে 'কঙ্কাবতী'র নাম অনুভব করেন। কঙ্কাবতীর নাম অপরূপ প্রেমাবেগে উজ্জ্বল—কাব্যকলার সাংগীতিক প্রকাশরীতিতে 'কঙ্কাবতী' মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। চিত্রকল্পের ও চিত্রের পারস্পরিক অবলুপ্তি এবং শব্দ ও বাক্যবন্ধের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ কবিতাটিকে করে তোলে রোমান্টিকতায় আপ্লুত:

> তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো
> মর্মের মাঝে মর্মরি বাজে, কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !

'কঙ্কাবতী'র উৎস লোকপুরাণ হলেও এটি আসলে বুদ্ধদেব বসুর স্বনির্মিত সৌন্দর্য প্রতিমা। জীবনানন্দ তাই এসব কবিতাকে 'কুহকময় প্রেমের জয়জয়ন্তী' রূপে অভিহিত করেন। আলোচ্য কাব্যের স্মরণীয় কবিতা 'শেষের রাত্রি', এ কবিতায় প্রত্যক্ষের অতীত এক অন্ধকারে, যোজন যোজন ব্যাপ্ত বিশাল আঁধারে ঢাকা রহস্যময় জগতে কবি আহ্বান করেন তাঁর মানসীপ্রিয়া কঙ্কাবতীকে। মনে হয়, কবি বাস্তব ধূসর পৃথিবী, ধূসর জীবন ও ক্রূরকলাকে অতিক্রম করতে চান:

> তোমার চুলের মনোহীনতম আকাশে আকাশে চলেছে উড়ে
> আদিম রাতের আঁধার বেণীতে জড়ানো মরণপুঞ্জ ফুঁড়ে—
> সময় ছাড়ায়ে মরণ মাড়ায়ে বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
> (এসো, চলে এসো যেখানে সময় সীমাহীন,
> সময় ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।
> সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন—
> কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

'কঙ্কাবতী' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'শেষের রাত্রি'। আলোচ্য কাব্যের শেষ কয়েকটি কবিতায় কবির বাসনা ব্যাকুল প্রেমচেতনা ফিরে এলেও তিনি দেহোত্তীর্ণ প্রেমে স্থিত হতে চেয়েছেন। আলোচ্য কাব্যের ভাববৈচিত্র্য, আবেষ্টনী, চেতনা, চিত্রকল্প, শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ, প্রেমিকার

দেহীরূপ ও গতিচঞ্চল বাস্তবতা কাব্যটিতে যেমন ইন্দ্রিয়ঘনত্ব এনেছে, তেমনি কবিও দূর অতীতের চুলের ঘনতমসার অন্তরালে আবৃত করে দিতে চান প্রত্যক্ষ রূঢ় বাস্তবতার ক্রূর সময়কে।

'নতুন পাতা' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন কবিপত্নী প্রতিভা বসুকে। এখানে কাব্যের প্রেমচেতনা কবি ও কবিপত্নীর পারস্পরিক স্পর্শে রোমান্টিক সংবেদনশীলতার কাব্য হয়ে উঠেছে। এ কাব্যের কবিতাগুলিকে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং বলেছেন, 'গদ্যকবিতা—ক্ষুদ্রাকার ও সরল ও মন্ময়'। তাঁর ভাষাতেই, 'প্রায় একটি দৈনিক ডায়েরির মতো।' এ কাব্যে ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শ না থাকলেও প্রেমচেতনা কিন্তু অপরিবর্তনীয়। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে কবি যদি কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বে বিচলিত হন, তবে আলোচ্য কাব্যে তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা লিখেছেন। অমিয় চক্রবর্তী আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন—"প্রেমের ইট-পাথর-কাঠের ফাটলে ফাটলে সবুজ রঙিন হয়ে যেখানে-সেখানে ঠেলে বেরিয়েছে। প্রথম অংশটা হৃদয়বৃত্তির ডায়েরি। বাঙালি জীবনের সমস্যাজনিত আক্ষেপ এবং প্রত্যুত্তর, উপাদান গাঁথা হয়েছে প্রেমের মূল সুতোয়। সেইখানে আন্তরিক সংগতি। 'আমি ভালোবাসি' বলবার সাহস 'নতুন পাতা'য়।" (অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ)। আলোচ্য কাব্যে আছে সম্ভোগ রসের কবিতা, বর্ষার হাওয়ায় হাহাকারের সঙ্গে নিঃসঙ্গ কবি হৃদয়ের বেদনা, কামনা ও প্রেম দুয়েরই প্রকাশ এবং মিলনের মধ্যে নতুন জন্মের সম্ভাবনা, সর্বোপরি বিরহ রসের কবিতা।

সম্ভোগ রসের কবিতায় কবি চেয়েছেন মিলনের অন্ধকার—

> টেনে নিয়ো সেই অতল অনির্বচনীয়
> অন্ধকারে
> যেখানে ঝরছে তোমার সঙ্গোপন সূর্য
> পল্লবের পর পল্লবে।

বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে রবীন্দ্রনাথ যেখানে ঘনঘোর কবিতায় কিছু বলতে চান, সেখানে বুদ্ধদেব বসু বিরহ বোধের পরিবর্তে প্রেমিকার শরীরী প্রতিমা আকর্যণের জন্য স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। 'স্পর্শের প্রজ্জ্বলন' কবিতাটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কয়েকটি কবিতায় আবার অবরুদ্ধ রতি বাসনা প্রবল আবেগের ভাষায় আন্দোলিত। যেমন: এর নাম নেই, বিচ্ছেদের দিন, পদধ্বনি ইত্যাদি। আলোচ্য কাব্যের অনেক কবিতায় কামনা ও প্রেম—দুয়েরই স্পর্শ থেকে জেগে উঠছে নতুন জন্মের সম্ভাবনা—আমাকে বাধা দিতে ভয় কোরো না তুমি / এ ব্যথা সৃষ্টির / আমি হয়ে উঠছি, নবজাত, সদ্যোজাত / এ ব্যথা সেই জন্মের।

'জন্ম' কবিতার মধ্যেও প্রেম ও মিলনের মধ্যে নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত / অন্ধকার, রাত্রি, অন্ধকার মন্থিত মুহূর্তে ইত্যাদি জাতীয় শব্দসম্ভারে যৌন প্রতীক ও মিলনের প্রতীক যেন উপস্থিত।

> হে দৃষ্টি—অন্ধ করা যুগ্ম চূড়া এ কোন যজ্ঞ?
> বলো তুমিই কি ধাত্রী?

দিগন্তে ঘুমন্ত সূর্যের? হে অন্ধকার, তুমি কি
মৃত্যুর, তুমি কি জন্মের সিংহদ্বার?
একী অসহ্য মৃত্যু! এখন উজ্জ্বল, অলজ্জ, নবজন্মা!

'সমুদ্রস্নান' কবিতায় দুজনের মিলনের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে নবজন্মের প্রত্যাশা—

হোক তো পদ্ম।
শুধু একটি পদ্ম।
আমাদের দুজনের শরীর তার যুগল মৃণাল।
কে জানে হয়তো তা এক নতুন পৃথিবী।

সম্ভোগ রসের কবিতার মতো বিরহের কবিতাও এখানে আবেগে ঝলসে উঠেছে। যেমন: আশঙ্কা, আশ্বাস, বিচ্ছেদের দিন, বিরহ ইত্যাদি কবিতা।

তবে 'নতুন পাতার' শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্ভবত 'চিল্কায় সকাল'। এখানে ধরা পড়েছে দুটি জীবনের ভাসমান চলমান ছবি; এখানে এমন এক শান্ত সুর আছে যা বুদ্ধদেবের প্রেমের কবিতায় অন্যত্র দুর্লভ। 'চিল্কায় সকাল' তাৎক্ষণিক রচনা; কিন্তু চারদিকের শান্ত শ্রীমণ্ডিত আকাশ, আঁকাবাঁকা সবুজ পাহাড়, দিগন্তপ্লাবী জলরেখা আর ঝলমল করা চিল্কা হ্রদ প্রেমিক হৃদয়ে এক শান্ত স্তব্ধতা বহন করে আনে এবং প্রেমিকার দিকে প্রেমিক তাকায় নম্র ভালোবাসার স্নিগ্ধ কোমলতায়। 'এক পয়সার একটি' এবং '২২শে শ্রাবণ' দুটি কাব্যগ্রন্থই ১৯৪২ সালে প্রকাশিত। 'এক পয়সার একটি' সিরিজ কাব্যমালায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ব্যতীত অমিয় চক্রবর্তী, অশোকবিজয় রাহা, অন্নদাশংকর রায়, জীবনানন্দ দাশ ও সমর সেনের কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হল জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। বুদ্ধদেব বসুর 'এক পয়সার একটি' কাব্যগ্রন্থে অধুনা সাতটি কবিতা পাওয়া যায়; বাকি বর্জিত কবিতাগুলি 'কবিতা সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে সংগৃহীত হয়েছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের সূচনা হয়েছে 'ভাদ্রের দিনে ভাবনা' শীর্ষক হালকা ধরনের কবিতা দিয়ে। এ প্রসঙ্গে নরেশ গুহ সম্পাদিত সংস্করণ থেকে জানা যায়: "হালকা কবিতা দিয়ে শুরু করলেন এই গ্রন্থমালা. কারণ সাধারণের কাছে কবিতাকে পৌঁছে দিতে হলে, শুরুতে হালকা কবিতার সার্থকতাই বেশি।"

'২২শে শ্রাবণ' কাব্যগ্রন্থটি 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালার পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। এখানে মোট কবিতার সংখ্যা ছয়। কাব্যসংগ্রহের বর্জিত অংশে চারিটি কবিতা আছে এবং 'কবিতা সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডে দুটি কবিতা আছে। আলোচ্য কাব্যের সমস্ত কবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি:

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান শয্যায়
সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়।

আলোচ্য কবিতাটির রচনাকাল ১৩৪৯-এর ২৫ বৈশাখ। '২২ শ্রাবণ' কবিতার সমাজভাবনা কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতাতেও প্রকাশিত। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাজ সচেতন মনোভাবের পরিচয় আলোচ্য কাব্যের বহু কবিতায় স্পন্দিত। এ সম্পর্কে দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত নরেশ

গুহ সম্পাদিত 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সম্পাদক লিখেছেন—"...যামিনী রায়কে' এবং 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা দুটি একটু আলাদা জাতের রচনা। ...এদের মধ্যে সমাজ চেতনার মতো এক ধরনের সাময়িক প্রবণতার ছাপ আছে যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসুকেও ক্ষণিকের জন্য নাড়া দিয়েছিলো।"

'দময়ন্তী' (১৯৪৩) কাব্যে বক্তব্যধর্মী বর্ণনা অপেক্ষা মননশীলতাই প্রাধান্য পেয়েছে। আলোচ্য কাব্যে সমসাময়িক চেতনার সঙ্গে পুরাণকাহিনির সমন্বয় ঘটেছে। পুরাণ প্রসঙ্গ আলোচ্য কাব্যে নানা কবিতায় সমন্বিত হয়ে এমন এক বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করেছে যা কালাতিক্রমী। আলোচ্য কাব্যে বুদ্ধদেব বসু প্রেম ও যৌবন সম্পর্কে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত। এখানে যেমন আছে শাশ্বত প্রেমকবিতা (যেমন, সাগরদোলা ও দময়ন্তী) তেমনি সমকালীনতার কবিতাও অনুপস্থিত নয় (যেমন, ম্যাল ও এখন বিকেল।) নলদময়ন্তীর পুরাকাহিনিতে পার্থিব-মানবিক প্রেমের, জীবন-জরা, যৌবন ও প্রেম সম্পর্কে কবি অপরূপ জীবনভাষ্যের ভাষ্যকার। কবির প্রণয়ধারায় যৌবন-কামনা ও প্রেম পরস্পর অন্তর্নির্বিষ্ট—এই জীবনভাষ্যকে কবি 'দময়ন্তী' কাব্যে অনেক সংহত পরিণত রূপ প্রদান করলেন; যদিও আলোচ্য কাব্যে বিশুদ্ধ, জান্তব প্রণয় মিলনের ভাবনাও অনুপস্থিত নয়। যেমন—

(১) দাম্ভিক যৌবন

মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রদীপ,
তারার সেনাই তারই রতি হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।

(২) সে প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর,
আয়ুর সর্পিল সোপানে সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।

এ কাব্যের 'দময়ন্তী' নামকরণের পটভূমিকায় রয়েছে সেই পুরাণকাহিনি যেখানে মহেন্দ্র, অগ্নি, যমকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষ নলকে বরণ করেছিল দময়ন্তী। কবি মনে করেছেন, পুরাণকাহিনির দময়ন্তীর মতো কবি-কন্যাও বরণ করবে অতিমর্ত্য মানবের প্রেম অপেক্ষা মর্ত্য মানবের প্রেমকে।

'এখন বিকেল' কবিতায় সমকালীন নাগরিক জীবনের প্রতিফলন। ট্র্যাফিকের চাকার ঘর্ষণ, প্রতিবেশীর গ্রামোফোন, উনুনের ধোঁয়া, রাজনৈতিক মতাদর্শের পোস্টার ইত্যাদি সব মিলিয়ে পরিবেশ এমনই যে প্রেমিক যুগল কলকাতার আবেষ্টনী এড়িয়ে অন্যত্র যেতে উন্মুখ। যেমন:

চলো বাইরে যাই।
চলো যাই রাস্তা পার হয়ে

ট্র্যাম লাইন পার হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
দেয়ালে দেয়ালে
শকুনের দুরন্ত ডানার মতো প্ল্যাকার্ডের দল
ছিঁড়ে কেড়ে নিতে চায়, কেড়ে নিয়ে খেতে
চায় চোখ—
আমরা এড়িয়ে যাবো। যাবো সেইখানে
শুপারির সরু সরু ছায়া চলে
চঞ্চল জলের মতো এঁকে বেঁকে
দক্ষিণের হাওয়ার তাড়ায়।

'ম্যাল' কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের করুণ বেদনা প্রকাশিত। 'দময়ন্তীর' এখন বিকেল, ম্যাল, জলপাহাড়ে কুয়াশা প্রভৃতি কবিতা যুগল প্রেমিকের ভ্রাম্যমাণ জীবনের জলছবি। আলোচ্য কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা 'সাগর দোলা'। এ কবিতায় বার বার অতীত স্মৃতির উল্লেখ—'মনে কি পড়ে, সুরঙ্গমা?' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার পাঠকের মনে বিরহ-ব্যাকুলতা জাগিয়ে তোলে:

ছোট ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা?
মনে কি পড়ে? মনে কি পড়ে?
জলাশয় নীল আকাশ ঝরে,
সারাদিন রাত হাওয়ার ঝড়ে
সাগর দোলা।

'দময়ন্তী' কাব্যে কবির যৌবন অস্তগোধূলির সমীপবর্তী। এই সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁর প্রেমকে দুর্দমনীয় আসক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী। সেই সঙ্গে যৌবনকে নতুন অঙ্গরাগে বিভূষিত করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে প্রেম বিশুদ্ধ এবং অনন্ত, প্রেম মৃত্যুহীন, সেখানে শুধু রূপান্তর। প্রেম তাঁর কাছে নবজীবনের জীবধর্মের চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্য। 'দময়ন্তী' কবিতায় তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা:

আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র পাহাড়,
তারার জ্বলন্ত নৃত্য, পৃথিবীতে সবুজের খেলা,
আকাশের সোনালি রঙের মেলা;
মুক্ত করো জন্ম মৃত্যু; আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে।

'রূপান্তর' (১৯৪৪) পরিবর্জিত অংশসহ মোট বারোটি কবিতার সমষ্টি; পরিবর্জিত অংশে

আছে তিনটি কবিতা। "রূপান্তর থেকেই বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সুস্পষ্ট ধারাবদল ঘটেছিল। কবিতা হয়ে উঠেছিল হ্রস্ব, মিতবাক এবং চিন্তামগ্ন"। (নরেশ গুহ সম্পাদিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশ)।

এ কাব্যে যেন স্বকীয়া প্রেমের বিপ্রলব্ধ বেদনার সংগীত রচিত হয়েছে। এখানে নায়িকা কোনো বিশেষ নামরূপে চিহ্নিতা নয়; 'সে অতলান্তা'। তিনি সেই অতলান্তাকেই খুঁজে বেড়িয়েছেন, প্রেমের নিত্যসঙ্গিনীকেই কবি অন্বেষণ করেছেন সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্রসীমার অন্তরালে, জীবনের সীমাবদ্ধতার অন্তরালে অতলান্তাকে নিয়ে প্রেমের দুর্মর আসক্তিকে কাটাতে পেরেছেন:

একবার যাকে পেয়েছি, সে মোর চিরন্তনী,
তাই তো আমার হৃদয়ে ঝলকে স্বপ্নমণি,
তাই অনিদ্রা আজও শোনে কোন পদধ্বনি
দুঃখসুখের ক্ষুদ্র সীমার অন্তরালে।
অতলান্তাকে হারাতে পারি না, পারি না।

ক্রমশ কবির রোমান্টিক আবেগ সংযত ও সংহত হয়ে আসতে দেখা যায় ১৯৪৮-এ প্রকাশিত 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থে। যে ক্ষণিকা প্রেম 'অতলান্তা' কবিতায় চিরমর্যাদা লাভ করে তা দেহাতিরিক্ত চিরন্তন প্রেমমানসেরই উত্তরাধিকার। প্রেমের ক্ষেত্রে দুটি জৈব জীবনের ভূমিকা থাকলেও সেখানেও থাকে প্রেমের অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা। এ তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যের 'প্রেমের কবিতা'-য়:

শুধু নয়, দুজনের হৃদয়ের রঞ্জন,
নয়নের মন্ত্রণা, স্মরণের অঞ্জন।
রঙ্গিনী কবরীর গর্বিত সম্ভার
সুরভিত লুণ্ঠনে ইঙ্গিত আনে যার,
সে কি শুধু দেহতটে তরঙ্গ তর্পণ?
কিছু তার দৃশ্য, কিছু বা রহস্য।
এসো শুভ লগ্নের উন্মীল সমীরণ,
করো সেই অবিকল মন্ত্রের বিকিরণ,
যার অনুকম্পায় বেদনার অভিসার,
হয়ে ওঠে মিলনের কণ্ঠের মণিহার;
সেথা বৈজ্ঞানিকের বৃথা অণুবীক্ষণ।
—কিছু তার জৈব, কিছু তার দৈব।

তাঁর কবিতায় কামনা ও প্রেম যে অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত, যে রহস্যময়তায় মানব-মানবী আকৃষ্ট হয় তা বিজ্ঞানের ব্যাঘাত না হলেও চিরন্তন রহস্যময়তায় বর্তমান আর তার ফলে ক্ষণিক হলেও চিরন্তনীর জন্য হৃদয় আলোড়িত হয়:

মর্ত্যলীলা যখনই শেষ, মনের তলে
অতনু যুথী অন্তহীন
মাটির বুক আবার সেই সুখে কাঁপায়;
যে সুখে কাঁপে আমার প্রেম রাত্রি দিন
কখনো কোনো কথার ছলে
চিরন্তনের ক্ষণপরশ যদি বা পায়।

'দোলপূর্ণিমা' কবিতায় প্রেমের দেবতাকে পঞ্চবাণ নিক্ষেপের জন্য আহ্বান করা হয়েছে, প্রেমের দেবতা অতনুর প্রভাবে যাতে প্রাজ্ঞ ও মননশীল দুজনেই আবেগে উদ্‌বেলিত হয়। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা অবশ্যই প্রেমের—'স্বয়ংবরা'। শ্রাবণের ধারাজলে যে সুখমিলনের রাত নেমে এসেছিল সে রাতে প্রেমিকা হয়েছিল স্বয়ংবরা। নির্বাচিত শব্দাবলিতে সংহত প্রকাশে সংযত ক্ষুদ্র নির্বাচিত বাক্যবন্ধে সেই বিরহ্-বেদনা আকাশজোড়া বিরহবেদনায় স্মৃতিমেদুর—'সেদিন তুমি ছিলে স্বয়ংবরা / অন্ধকার রাত্রি ভরে / বৃষ্টি তার মন্ত্র পড়ে / স্পর্শ যেন বিদ্যুতের / অত্যাচারে গড়া।' আলোচ্য কাব্যের নাম কবিতা 'দ্রৌপদীর শাড়ি'-তে প্রকৃতির ভয়ংকর রূপময়তায় দ্রৌপদীর শাড়ি পুরাকাহিনির নব্যরূপায়ণ ঘটিয়েছেন—

সন্ধ্যাকাশে উচ্চহাস্যে
সূর্য পেলো ছাড়া।
দুঃশাসন করিলো পণ
দ্রৌপদীর শাড়ি।
ভাঙলো ঘুম লাল আগুন
ধৈর্যহীন শিরায়
উল্লসিত হুল্লোড়ের
আনলো কড়া নাড়া।

'কালো চুল' কবিতায় 'কঙ্কাবতীর' কালো চুলের চিত্রকল্প, রোমান্টিক পরিপ্রেক্ষিত, হলুদ আগুন, উষ্ণ বাদামি, উত্তাল লাল অগ্নিতে ছড়ানো মগ্নতা ইত্যাদি পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে। এখানে লোক-পুরাণের কঙ্কাবতী যেন শাশ্বত শান্তি ও প্রেমের প্রতিরূপক। অশান্ত পটভূমি উত্তীর্ণ কালো চুলে কবি চিরন্তনীর কাছে প্রস্থান প্রয়াসী—

আঁধার আকাশের হাজার বিশ্বের বহ্নি হলো লীন
তোমার কালো চুলে,
তারার অগ্নিতে ছড়ালো মগ্নতা তোমার কালো চুলে;
তোমার কালো চুল যুগযুগান্তের দূর সীমান্তে
ছড়ালো শান্তি, অতল অন্তিম শান্তি, কঙ্কা,
কঙ্কা শান্তি।

'কালো চুল' কবিতার যিনি কাঙ্ক্ষিতা কঙ্কা তিনি প্রকৃতার্থে শাশ্বত শান্তির প্রতীক। সমকালীনতাকে উত্তীর্ণ পৃথিবী এখানে সূর্যাস্তের বর্ণিলতায় উদ্ভাসিত—

তোমার কালো চুল ছড়ায়ে দিলে দূর নীল দিগন্তের প্রান্তে,
মত্ত বিপ্লবী অপলাপ পার হয়ে দাঁড়ালে শাশ্বতী শান্তি;
আর্দ্র উজ্জ্বল তীব্র থরোথরো ভাদ্রের সৌম্য সীমান্তে
আশ্বিন এনে দিলে, কঙ্কা!

আলোচ্য কবিতায় কঙ্কা যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। লাল সূর্যাস্তের জানালা, ভাদ্রের হলদে বারান্দা, লাল সূর্যাস্তের সন্ধ্যা, পশ্চিমে অন্তিম সূর্যের জানালা, ভাদ্রের সৌম্য সীমান্ত, সন্ধ্যাতারকার স্তব্ধ উদ্‌বেল ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ যেন তার ইঙ্গিতবাহী।

'নূপুর' কবিতায় প্রকৃতি ও নারী যেন একসূত্রে গ্রথিত; 'পৌষ পূর্ণিমা' কবিতায় প্রকৃতি তার যৌবন সুষমা দিয়ে নগরীকেও সাজায়। 'বৃষ্টি'কে কবির প্রার্থনা করেন জড়তা, শূন্যতাবোধ ও বন্ধ্যাত্ব অপসারণের জন্য। এইভাবে 'দ্রৌপদীর শাড়ি' হয়ে ওঠে অন্তহীন আধার—প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতায়।

'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) কবিমানসের মুক্তির দ্বন্দ্ব জর্জর অনুভূতির প্রকাশ। কবি যৌবনের ঝাড়বাতিকে নবীনতম বসন্তের আলোকে উদ্ভাসিত করতে প্রয়াসী। আলোচ্য কাব্যে কবি জড়ের বিরুদ্ধে প্রাণের, জরার বিরুদ্ধে যৌবনের, ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রেমের, পরিতৃপ্তির বিরুদ্ধে তৃষ্ণার আহ্বান করেছেন। প্রেম ও যৌবনের জন্য কবির ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, আর সেই বেদনার্ত অনুভূতি কাব্যের মুখ্য বিষয়। এ কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় ব্যঙ্গের আবেগও আছে। 'কবিমশাই' কবিতায় কবি বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত প্রেমের অধিবাস শুধু শরীরে নয়; মূলত হৃদয়ে। তিনি মনে করেন, শরীরটাতেই সব মিটে যায় না; মনও আছে। আলোচ্য কাব্যরচনাকালে কবি প্রায় প্রৌঢ়। তাই তাঁর কবিতায় প্রায় ঘুরে ফিরে আসে 'কনকনে কড়া শীত', 'মানবে যে শীত নয়', 'হাতে ঠেকে টেবিলের.. ঠাণ্ডা কাঠ', 'দিনের টেবিলে আর রাতের লেপের তলে' ইত্যাদি। 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' কবিতায় কবির অভিব্যক্তি হল: 'যা কিছু লিখেছি সবই ভালোবাসার কবিতা'

এবং—

আরো ভালোবেসেছি আমার ছন্দের ইন্দ্রজালে,
শব্দের সম্মোহনে আর
কবিতারে আরো বেশি ভালোবেসে
আরো ভালোবেসিছি নারীরে।

'বর্ষার দিনে' কবিতায় দৈনন্দিনতার বেদনার গ্লানি, ব্যর্থতাবোধ, হতাশা, ক্লান্তি ইত্যাদি উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যেন সুধীন্দ্রীয় ভাষায় উচ্চারণ করেন—

আমার অঙ্গীকার
ভুলবো না আমি, কোনোদিন ভুলবো না।

কবির চর্তুদিকে এখন শীত, শীতের শত্রুতা, 'আর শেষরাতে মুখ-ঢাকা বুক-চাপা, অন্ধকারে ঘুম ভেঙে মনে হয়, নেই—কিছু নেই।' যখন যৌবন ছিল, তখন কবি যৌবনের বন্দনা করেছেন:

যৌবন যখন ছিলো, যৌবনেরে
করেছি বন্দনা; যৌবন যখন যায়, যায় যায় তখনও আমার
যৌবনেরে করেছি বন্দনা; কেন না জীবন
যৌবনেরে ভালোবাসে—প্রকৃতির রীতি এই।

প্রকৃতিতে শীত-বসন্তের আবর্তন, মানবজীবনেও তেমনি বার্ধক্য ও যৌবনের আবর্তন। কবির কাছে যৌবন বিদ্রোহের, জীবনের আনন্দের; কবির কাছে অবসিত বসন্তে, প্রৌঢ়ত্বে একান্ত প্রার্থনা 'উন্মত্ত তীব্র আত্মহারা ভালোবাসা'। যৌবনের কলতান ক্ষান্ত হওয়ার সঙ্গে যে খেলা সাঙ্গ হয়ে আসে, মোহিনীর বিশ্বজয়ী মালা যে একদিন শুষ্ক হয়ে যায় তা প্রকাশিত হয় 'এও তার' কবিতায়। কিন্তু তবুও কবির স্মরণ পথে উদিত হয় 'তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে'র কথা, 'হীরকের মায়াবী চোখের ডাক'। কবির কাছে যৌবনের প্রেমে পড়া ছিল 'একটি মেয়ের হাতের নড়া।' আলোচ্য কাব্যে 'হেমন্ত' শীতের তল্পিবাহক হয়ে আসে। 'প্রণয়গাথায়' উচ্চারিত হয়:

কোকিল হানা আতপ্ত বৈশাখে
আষাঢ় এলো মেঘের ঘনঘটায়,
আকাশে খোলা জানালা কোন আমন্ত্রণ রটায়
এমন সময় তোমার চিঠি এলো।

শীত রাত্রিতে অর্থাৎ কবির প্রৌঢ়ত্বে এ সমস্ত মনে পড়ে। কিন্তু শীত ঋতু শুধু ধ্বংসের বার্তা বহন করে আনে না; সে শুধু পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায় না। যদিও কবির মনে হয়:

তোমার চোখের সামনে পৃথিবী মরে গেলো আজ—
ফুল নেই,
সব সবুজ নিবে গেছে, চারিদিকে শুধু কঠিন
শাদা স্তব্ধতার চিহ্ন।

তবুও শীতের কাছে কবির প্রার্থনা:

যে মৃত্যুকে ভেদ করে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
রাশি রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়
যে মৃত্যুকে দীর্ণ করে বরফের কবর ফেটে ফুল
জ্বলে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর—নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।

শীতের প্রার্থনার মধ্যেই কবি খুঁজে পান বসন্তের উত্তর। "মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাতালে নামার

অভিজ্ঞতা এবং সেই পাতাল থেকে নবজন্মের জন্য বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষার কথাও এই প্রথম বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় শুনতে পাই আমরা।" (নরেশ গুহ সম্পাদিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশ)।

১৯৫৮-তে প্রকাশিত 'যে আঁধার আলোর অধিক' পর্বে বুদ্ধদেব বসুর কবিমানসের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এর রেশ পরবর্তী কাব্য 'মরচে পড়া পেরেকের গান' পর্যন্ত (১৯৬৬) প্রবাহিত। 'যে আঁধার আলোর অধিক' পর্বে কবি জৈবিক অস্তিত্বের উপলব্ধিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং বলেছেন—"বইটি আমার জীবনের এক সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্য দিয়ে একটা সংকট আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম, এবং তার দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতা আমার পরবর্তী সব কাব্যরচনায় কাজে লেগেছে—সেগুলি আকারে প্রকারে যতই ভিন্ন হোক।" (গ্রন্থপরিচয় অংশ, নরেশ গুহ সম্পাদিত বুদ্ধদেব বসু কবিতা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড) আলোচ্য কাব্যটি সম্পর্কে 'কবিতা' পত্রিকার ২৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরি লিখেছিলেন—"বইটিতে প্রেমের কবিতা আছে কয়েকটি, কিন্তু বেশিরভাগ কবিতা শিল্পের সমস্যা, লক্ষ্য ও বিশেষ করে নিগূঢ় প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে। আমাদের অবচেতন ও নিজ্ঞান মনে যে অক্ষয় স্মৃতির ঐশ্বর্য সঞ্চিত—সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে বুদ্ধদেব শিল্পের প্রক্রিয়া ও উৎসকে বুঝতে চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে। অধিকাংশ কবিতায় বুদ্ধদেব এক কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধীন। বস্তুত ভাষা ও আবেগের উপর ক্রমিক আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনই তাঁর কাব্যজীবনের ইতিহাস। এই বইয়ের মধ্যে প্রধান সুর নির্বেদের; শান্তমনে সবকিছু মেনে নিয়ে শিল্পকর্মে ডুবে যাবার, বেদনাকে গানে রূপান্তরিত করবার সাধনাই কবির পক্ষে একমাত্র উদ্ধার।" (তদেব) প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত আলোচ্য কাব্যের কবিতাগুলিতে লক্ষ করেছিলেন আবেগগ্রাহ্য উজ্জ্বল প্রবণতার পরিবর্তে বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা নির্ভরতা। (দ্র. কলকাতা পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৬৮-এর যুগ্ম সংকলন।)

'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যে বুদ্ধদেব বসুর প্রেমসংবেদনার দৃষ্টির প্রকাশ একজন প্রৌঢ়ের নিরাসক্ত দৃষ্টির প্রকাশের মতো। প্রথম পর্বের উদ্দাম উজ্জ্বল আবেগবাহুল্য এখানে স্ফটিক শিলায় সংহত। যৌবনের অশান্ত বাসনা দিনের অবসান ঘটলেও যৌবনের আবেগ আজও প্রমত্ত, একথা ব্যক্ত হয় 'আটচল্লিশের শীতের জন্য ৩' কবিতায়। 'স্মৃতির প্রতি: ১' কবিতায় 'আঁধার তোমার স্বত্ব', কিন্তু সেই আঁধারই আলোর অধিক। একান্ত নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত জিনিসকেই কবি পবিত্র মনে করেন। সামাজিক ধর্মীয় বা অন্য কোনো দায়ে তাঁর কোনো দায়িত্ব নেই। 'প্রেমিকের গান: ১' এবং '২' সংখ্যক কবিতায় আবার শরীরী সংরাগের আলোড়ন; কিন্তু শুধু সেখানেই কবিতাটি শেষ হয়ে যায় না, আরও কিছু থাকে—

ঠোঁটে তোমার দীপ্ত কমণ্ডলু
উপচে পড়ে বিদ্যুতে চুম্বনে।
কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি
তোমার পিছে জানালা আছে খোলা

আকাশ, তারা, দিগন্তরে নিয়ে—
এবং শুনি অনন্তের দোলা।

স্মৃতি সংবদ্ধ প্রেমের বেদনাকরুণ ইতিহাস রূপায়িত হয় 'সমর্পণ' কবিতায়। সহজপ্রাপ্তি ও সহজলব্ধ প্রেম কবিকে আকর্ষণ করে না। পেছনে ফেলে আসা অনিঃশেষ প্রেম কবির হৃদয়ে স্মৃতির আলোড়ন তোলে। বার্ধক্যে প্রেম তৃষ্ণার সঙ্গে দেহযুক্ত মিলনকামনা থাকলেও অতীন্দ্রিয় ভালোবাসার প্রতি পক্ষপাত ও অনুপস্থিত নয়:

কাকে বলে পাওয়া, তা জেনেছি
আঁধারে, ঘুমের ঘোরে, রক্তের ফেনিল চেঁচামেচি
শান্ত হলে—সে যখন ডেকেছে নাম অবাল-নিস্বনে
আর সেই ফুৎকারে দেহের তন্তু, হৃৎপিণ্ডের অতল গহ্বর
হয়েছে প্রবলময়—যেন কোনো পথিকের প্রতীক্ষার সার্থক প্রহর।

'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নবতর রোমান্টিক ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়' ও 'গ্যেটের নবম প্রণয়' কবিতায় গ্যেটের প্রণয় বৈচিত্র্যের উদ্ভাসন। মহাভারতের বীর অর্জুনকে কেন্দ্র করে পুরাণাশ্রয়ী কবিতা 'অর্জুনের প্রতি—কোনো নামহীনা।' 'বহুমুখী প্রতিভাতে'ও মিথের অর্জুন ফিরে এসেছেন। কবির দৃষ্টিতে অর্জুন যেন এ যুগের ব্যক্তি মানুষের ছিন্নভিন্ন সত্তা—

উলুপী দেয় না সাড়া, সুভদ্রা উৎসুক নয় আর,
কোথাও মেলে না খোঁজ, এমনকি, চিত্রাঙ্গদার
লেলিহান যৌবনের।

'অর্জুনের প্রতি নামহীনা' কবিতায় অর্জুনের জন্য অনেক নারীর কামনা ছিল, কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি। তা নামহীনা নারীর পক্ষে যেমন সত্য অর্জুনের পক্ষেও তেমন সত্য।

'দেবযানীর স্মরণে কচ' এটিও পুরাণাশ্রয়ী কবিতা। এখানে তিনটি পর্যায়ক্রমিক ভাবনা উপস্থিত। তিনটি কবিতাই স্বগতোক্তি। আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডি এখানে সমীকৃত হয়েছে। বিচ্ছেদ পরবর্তী বিরহগাথা এবং সঞ্জীবনী জ্ঞানসহ স্বর্গবাসকালে স্বপ্নে-স্মরণে-স্মৃতিতে তাঁর প্রেমস্মৃতির উজ্জ্বলতা।

'মরচে পড়া পেরেকের গান' (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থেরও মূল বিষয়ও প্রেম: তবে এখানে প্রেমের বিভিন্ন মাত্রা আছে। আলোচ্য কাব্যে একজন আধুনিক বিচ্ছিন্ন মানুষের নিঃসঙ্গতার কথাও আছে। কবি পুরা-কাহিনির সঙ্গে আধুনিক চৈতন্যের যোগ সাধন করেছেন। রোদনরূপসী, মরচে পড়া পেরেকের গান, তপস্বী তরঙ্গিনী থেকে তিনটি কবিতা প্রাচ্য পুরা-কাহিনির আধুনিক তত্ত্বভাষ্য; আর 'ইকারুস'-প্রতীচ্য পুরা-কাহিনির কাব্যিক রূপায়ণ। 'রোদনরূপসী' কবিতায় বুদ্ধদেব স্বয়ং পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। মহাভারতীয় পুরাণকাহিনির অনুক্ত অংশটি কবি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং অর্জুন যেন এখানে কবির প্রতিরূপকে প্রত্যাগমন করেছেন। দ্রৌপদীর কান্নাজাত যে পদ্মের কথা ব্যাসদেব বলেননি বুদ্ধদেব তাকেই কবিতার প্রতীকরূপে আনয়ন

করেছেন। আলোচ্য কাব্যের নাম কবিতা 'মরচে পড়া পেরেকের গান'; আলোচ্য অংশে বুদ্ধদেব প্রেমস্মৃতিবদ্ধ হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রেম, ব্যর্থতাবোধ ও প্রেমতৃষ্ণার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তির অবস্থান ও অবদান আলোচ্য কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতিরূপকে স্থাপিত। 'আরোগ্যের তারিখ' অবিমিশ্র প্রেমের কবিতা না হলেও এখানে স্মৃতিবদ্ধ প্রেমের পুনর্মিলন ও পুনর্বিচ্ছেদ লক্ষগোচর। বার্ধক্যের হিম অনুভূতি জাহাজে কবির আটলান্টিক পাড়ির স্মৃতি ও অন্যান্য চিত্র আলোচ্য কবিতায় স্থান পেয়েছে। "অবশেষে 'আরোগ্যের তারিখ' বলে যে কবিতাটার স্থান পেলো, তার পিছনে ছিলো আমার সেবারকার কুইন ম্যারি জাহাজে আটলান্টিক পাড়ির স্মৃতি। অন্তর্বর্তী আরো দু-একটা অভিজ্ঞতা, এবং আমার আসন্ন বার্ধক্যের হিম অনুভূতিও ছিলো।" (কবিতার শত্রুমিত্র / বুদ্ধদেব বসু)। এ কবিতায় মিলনশেষে অনিবার্য বিচ্ছেদের সুর বাজতে থাকে—দুজনকেই ফিরতে হয়। কেন-না, মৃত্যু ব্যতীত বাসনা থেকে মুক্তি নেই, এমনকি প্রেম থেকেও নয়। 'মৌলিনাথের স্বপ্ন' কবিতায় স্মৃতিতে কাম ছায়া ফেলেছে। 'প্রেমে পড়া পুরুষের গান' অবশ্য প্রেমের কবিতা নয়। তবে কবিতার নায়ক এক কবি—বস্তু-বিশ্বের সমস্ত কিছু যার মধ্যে ঢুকে পড়ে কবিতার উপাদানে পরিণত হয়।

এখন আমার মধ্যে ঢুকে সমস্ত পৃথিবী,
উঁচু বাড়ি লোকজন, মহিলার গন্ধে ভরা বস্ত্রালয়,
খাটুনি, ঝগড়াঝাঁটি, রকের খিস্তিতে ক্ষিপ্র বখা ছেলে,
এবং পার্কের বেঞ্চি, বসে থাকে যেখানে বৃদ্ধরা।

'মন ও প্রাণ: এক অন্তহীন বিতর্কের অংশ' কবিতায় কবি পরাবাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করে প্রেমিকার সঙ্গে মিলন-রাত্রির স্বর্গ-মর্ত্য স্মরণ করিয়ে দেন—

মনে পড়ে এক রাত্রি—অমল দাঁতের দাগে
আপেল উজ্জ্বলতর, নিঃশ্বাসে মদের পাত্র হয়ে আছে লাল,
নিঃসঙ্গ মোমের তলে অন্ধকারে গাত্ররূপ গলে যায় ধীরে
বিন্দু বিন্দু আদরে আরক্ত আরও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির ভাবনা মুক্তি পায়—

কিন্তু আজও যার কথা ভাবি
সে মরত্বে রূপসী—পাষাণ নয়—আমি মজে আছি তার প্রেমে।

'মোহমুদগর' (শঙ্করাচার্য ও শার্ল বোদলেয়ারকে ভক্তি নিবেদন) কবিতায় মানবিক নারীপ্রেমকেই আশ্রয় করেছেন এবং প্রেমকে নিম্নোক্তভাবে সম্বোধন করেছেন—দেবাদিদেব, আদিনাথ, অবিনাশ, শাশ্বত, মহাবল, বিদ্বান, জাদুকর, মহীয়ান, ঈশ্বর, মুক্তিদাতা, বান্ধব, অপরূপ, অপরাজেয়, উদ্দাম, ক্ষুরধার, শতরূপ, লীলাময়, চিরায়ত, পুরোহিত, মহান ঋষি ইত্যাদি রূপে। আলোচ্য কবিতায় যে বৈরাগ্য ধ্বনিত তা আসলে কামের প্রতি বৈরাগ্য; কাম থেকে মুক্তিলাভ করে যেন তিনি প্রেমে উত্তরিত হয়ে শিল্পীর সাধনায় স্থিত হতে পারেন:

নিদ্রাহীন নিশা, দৃপ্ত কল্পনা, মায়াবী শিল্প ও ভগবান—

যেহেতু জানি, তুমি তৃপ্তিহীনে দাও নিগূঢ় এইসব অবদান
যাচনা, অতএব, আমাকে রাখো দেব বঞ্চনায় সন্তপ্ত,
তোমার উৎসের পাতাল ছুঁয়ে যাতে আলোয় হতে পারি ব্যক্ত।

'একদিন: চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা'-র প্রকাশকাল ১৯৭১ হলেও কবিতাগুলি লিখিত হয়েছিল ১৯৫২-১৯৭০-এর মধ্যে। এর অধিকাংশ কবিতাই গড়ে উঠেছে মৃত্যু, স্মৃতি, কবিতা বা শিল্পের রহস্যকে কেন্দ্র করে। 'নতুন পাতা'র গদ্য কবিতার সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। বুদ্ধদেব বসু 'একদিন চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা' প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন—"সময়টা বোধহয় চৈত্রমাস ছিলো, বেলা তিনটে নাগাদ হবে। মনে আছে রোদ ছিলো উজ্জ্বল, বাতাস শুকনো, রাস্তায় বৈকালিক ভিড় তখনো শুরু হয়নি। ট্রাম যখন পার্ক সার্কাসের গোলাকার চৌরাস্তার বাঁক নিচ্ছে... তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হলো এই মুহূর্তটা অন্য কোনো দিনের। পরবর্তী মিনিট খানেকের মধ্যে আমার মনে কয়েকটি বাক্য রচিত হয়ে গেলো, বাড়ি ফিরে একটা খাতার কোণে তা লিখে রাখলাম। সেই পুরোনো খাতা খুলে দেখছি, একটা শাদা পাতার মাথায় লেখা আছে; 'মাঝে মাঝে এক-একটা দিনকে মনে হয় অন্য কোনো দিনের মতো। যেন একটা ঠেলা দিলেই দরজা খুলে যাবে। একটু আর একটু।' আর এর উপরে লেখা; 'একদিন: চিরদিন।' যেটুকু আপনা থেকেই ধরা দিলো তা যদি কখনো একটি গদ্য কবিতায় পরিণত করতে পারি তবে তার শিরোনাম দেবো 'একদিন: চিরদিন।' (নরেশ গুহ সম্পাদিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশ।)। এ কাব্য অবিমিশ্র প্রেমের কবিতা নয়; প্রেম-প্রকৃতি-নারী-কবিতা এখানে কখনও সমকালীন জীবনের প্রেক্ষিতে, আবার কখনও পরাবাস্তববাদের আঙ্গিকে রূপায়িত। 'একদিন: চিরদিন' কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি পরস্পরের সান্নিধ্যে যেমন একাকার তেমনি 'এক অদ্ভুত' কবিতায় প্রেম ও মৃত্যু পরস্পরের সান্নিধ্যে একাকার। আলোচ্য কাব্যের 'একদিন: চিরদিন' কবিতাটি বহুমাত্রিক কবিতা—এখানে নারী-প্রেম-প্রকৃতি পরাবাস্তববাদিতায় পরস্পর অন্তর্নিবিষ্ট। নারীর প্রেম ও প্রকৃতি কবির কাছে যেমন ক্ষণকালীন তেমনি চিরকালীনও বটে। জীবন ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেও কবির মনে হয়, কোনো এক দুপুরবেলা তার পুরাতন চেনা দিন, সেখানে স্মৃতির কাছে ফিরে যেতে তিনি লুব্ধ—

এখনো তবু মাঝে মাঝে ফিরে যাই।
সেই দুয়ার, সেই অপেক্ষা,
যে এই মুহূর্তে অন্য কোনো দিন।
যেন কাঁপছে।
কাঁপছে আজ আকাশ-জোড়া আজ।

নিছক অভিজ্ঞতা-নির্ভর যে কবিতা হতে পারে 'আমার জীবন' কবিতায় তার প্রমাণ আছে:

আমি দেখেছি অনেক মিলনের ক্ষণ, বিদায়ের দৃশ্য
অনেক কান্না, অনেক চুম্বন, অনেক বাহু
অরণ্যের মতো উতরোল।

অনেক কবিতায় আছে অন্তর্দেশীয় মেজাজে মন্থরতার পদধ্বনি, বুদ্ধদেব তাঁর মৌল স্বকীয়তায় স্থিত হওয়ার জন্য শব্দকে সংকেতমুখী করে তোলেন। এমন ভাবনা আছে নস্টালজিয়া, আমার মিনার, যুবক-যুবতীরা ইত্যাদি কবিতায়। এসবের সঙ্গে আছে স্মৃতিমন্থনের বিধুরতা।

বুদ্ধদেব বসুর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা'। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬৭-৭০ খ্রিস্টাব্দে। কবিতার সংখ্যা কুড়ি। প্রথম প্রকাশ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। বুদ্ধদেব মূলত প্রেমের কবি; অবশ্য আলোচ্য কাব্যে নতুন কোনো প্রেমভাবনা প্রকাশিত হয়নি। প্রেমমূলক স্মৃতিকণাই এখানে মুখ্য। বার্ধক্যে কবির প্রেমের শরীরী আবেদন নিঃশেষিত বলে কবির কাছে জীবন আর পূর্বের মতো উপভোগ্য নয়। কবি এখন আর প্রেমের বিস্মৃত নির্জনে প্রবেশ করতে পারেন না বলে মাঝে মাঝে প্রাক্তন প্রেমের স্মৃতি কবির চিত্তদেশে উঁকি মারে। বার্ধক্যে উপনীত কবি অন্যান্য মানুষের শরীরী প্রেম থেকে বঞ্চিত বলে প্রেমের স্মৃতি উৎসবে মত্ত। আসলে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি কবির আত্মজীবন পর্যবেক্ষণ। 'সন্ধিলগ্ন' কবিতাটি আত্মস্মৃতিমূলক। কবির চিত্তদেশে মাতৃসম্পর্কিত স্মৃতিকাতরতার উদ্‌বোধন—

মা, আমি প্রণাম করি তোমাকে,
মা, আমি চুম্বন করি তোমাকে, অপিরিচিতা
অদৃষ্টা আমার,

আলোচ্য কাব্যে আছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সম্বন্ধ ও সেতুবন্ধনের কথা। 'সেতুবন্ধ' কবিতাতেও কবির জীবন-মৃত্যুর সেতুবন্ধনের কথা; জীবন ও মৃত্যু যেন পরস্পরের পরিপূরক, এরা পরস্পর সংযুক্ত। কবিতাটির প্রথম পর্যায়ে আছে ব্যবধানের কথা, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সেতুবন্ধনের ভাবনা:

মনে পড়ে মৃত্যু ও জীবন
পরস্পর সম্পৃক্ত অনবরত, অথচ অনন্ত দূর।

মৃত্যুর ও জীবনের সীমানা অতিক্রম করতে কালাভিজ্ঞতা থাকতেও পারে; নাও থাকতে পারে। 'সেতুবন্ধ' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় কবি মনে করেছেন, মৃত্যুতে 'ক্ষান্তসব আলাপ গুঞ্জন'। তারপর দীর্ঘ কান্নায় ফিরে আসে সেইসব পরিচিত বা স্বল্প পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু দল। মৃতদের সঙ্গে জীবিত কবিচৈতন্যের ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। কবি মৃত্যুচেতনা দার্শনিকতাপূর্ণ সেই স্থির অন্তরাল, সেই স্তব্ধ ঘূর্ণন, যেখানে:

তুমি, আমি, অন্য সকলেই,
আপাতত পৃথক যদিও,
কেউ যুবা, কেউ বৃদ্ধ, মৃত কিংবা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস
আছি সম্মিলিত ভাবে, লুপ্তভেদ, অতিক্রান্ত, অবস্থারহিত—

আলোচ্য কাব্যের কয়েকটি নামও মৃত্যু-বিষয়ক। যেমন—কবির মৃত্যু, বেশ্যার মৃত্যু, এক অপরিচিতা মৃতার স্মরণে, হনুমানের জীবন ও মৃত্যু। যে কবির ভাবনা ছিল রূপের বৈভব,

রমণীয় মুখ, সেই কবি মৃত্যু মুহূর্তের ভাবনায় আক্রান্ত হলেন:

হঠাৎ দেখে অনন্তের প্লাবিত উদ্ভাস
ফেলেছিলো অচিন্ত্য জলকে পূর্ণ অন্তিম নিশ্বাস
মৃদু হেসে, অবশেষে, চেয়েছিল ক্ষমা?

আবার 'একটি কুমারীর মৃত্যু' কবিতায় কবি নিঃসীম বেদনার শরিক হয়ে পড়েন। 'সে ও অন্যেরা' কবিতায় কবির দীর্ঘ পরিক্রমা কবিতার ঐতিহ্য আর শিল্প জিজ্ঞাসা রূপায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির নানা টুকরোও ভেসে আসে। কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'স্বাগত বিদায়' কবিতাটি বেশ দীর্ঘ কবিতা—এখানে রয়েছে ব্রুকলিনের স্মৃতি। ব্রুকলিনে থাকার সময় কবির মনে পড়ে যায় রমনার বিস্তৃত আকাশে বাংলাদেশের বৃষ্টি। কাব্যের নাম 'স্বাগত বিদায়' কেন-না, 'সে নিত্য বিদায় বলে স্বাগত জানায়'। 'সাবিত্রীর জন্য' কবিতাটি মিথকেন্দ্রিক দীর্ঘ মৃত্যুচেতনা বিষয়ক কবিতা। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হল প্রাকৃতিক নিয়ম—জন্ম-মৃত্যু এবং পুনরুজ্জীবন। মৃত্যু আসলে আত্মসমর্পণ—কবি যার জন্য অপেক্ষারত; আর এই আত্মসমর্পণ আসলে হল পুনরুজ্জীবনের নামান্তর।

বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কবিতা ও কবিমানস আলোচনা করলে সেখানে প্রকৃতি চেতনা, প্রেম-ভাবনা, সমাজচেতনা ও অন্যান্য নানা বিষয়ক উপাদান পাওয়া যাবে। কিন্তু বুদ্ধদেব মূলত যৌবন ও জীবনের কবিতা। প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দি থাকলেও শাপভ্রষ্ট দেবশিশু বুদ্ধদেব কামনার, কামের অতীত জগতের অমৃত পিয়াসী:

বিধাতা জানো না তুমি কী অগাধ অপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে।

আবার 'অমৃতের তরে' পিপাসা থাকলেও প্রায় সব কাব্যগ্রন্থেই প্রেমানুভূতিই মুখ্য। আসলে বুদ্ধদেব দ্বন্দ্বসংকট দ্বিধান্বিত কবিসত্তা। কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য আছে জেনেও তিনি কখনও কামের কখনও প্রেমের দিগন্তে দাঁড়িয়ে জীবনকে দেখেন। জীবন সম্বন্ধে এই যে মনোমুগ্ধতা তাই তো একজন রোমান্টিক কবির মৌল বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশ থেকেই তা সর্ববিধ চপলতাহীন, যৌবন-প্রেম-আর সৌন্দর্যের বোধে উদ্দীপ্ত। তাঁর জীবনদর্শন হল:

আমি মনে করি,
যৌবনের, বিদ্রোহের, জীবনের, অন্ধ আনন্দেরে—
কিংবা তার অস্থির স্মৃতির-যদিও করেছি স্তব
তৃপ্তিহীন স্তাবকতা কখনো করি নি।

তাঁর কবিতায় আছে যৌবনের স্তব, অন্ধজৈব আনন্দের বন্দনা, শব্দ-ছন্দকে ভালোবাসা, কবিতার জন্য অতলান্ত প্রীতি, স্মৃতিসঞ্চিত পৃথিবীর পরিবর্তনের তাৎপর্য, আবার একই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ, সভ্যতার সংকটে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ—সর্বোপরি শিল্পীর জন্য এক আদর্শলোক সৃষ্টির স্বপ্নময় প্রকাশ।

শুধু বিষয়ে নয়, কবিতার প্রকরণে বুদ্ধদেব বসু অদ্বিতীয় কবি। 'অদ্বিতীয় কবি' হবার

কাব্যকলা কীভাবে আয়ত্ত করতে হয় তার কারণ নিহিত আছে তাঁরই একটি গদ্যরচনায়: "পূর্বসূরীদের মতো লেখবার চেষ্টা করতে-করতেই বাক্যরচনার নীহারিকায় হঠাৎ একদিন তারকার জন্ম হয়, অনুকরণের কলরোল ছাপিয়ে বেজে ওঠে নতুন সুর, নিজস্ব সুর। এর উদাহরণ শেক্‌সপিয়র, এর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। আর এই প্রক্রিয়া যে ছেলে বয়সেই শেষ হয়ে যায় তাও নয়; পরিণত জীবনেও নিজের নিঃসংশয় বিশিষ্টতা অর্জন করবার পরেও কোনো সমসাময়িক, প্রাচীন বা বিদেশি কবির কোনো রচনা পড়ে কোন্ কবির না মনে-মনে ইচ্ছা হয়েছে: আহা, এ যদি আমার লেখা হতো। এ-ইচ্ছার মানে তো এই যে কাব্যকলার শিক্ষা আরো একটু সম্পূর্ণ হলো, আরো একটু বিস্তৃত হলো ক্ষেত্র, আরো একটু বিকশিত হলো প্রতিভা। এই শিক্ষিত হবার ক্ষমতাকে যিনি জীবনে যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত সজীব রাখতে পারবেন, এক হিসেবে তিনি তত বড়ো কবি। একে যদি বলি অনুকরণের—বা অপহরণের—আশ্চর্য ক্ষমতা তাহলেও দোষ হয় না। পৃথিবীর মহৎ কবিদের সমস্ত জীবনের কাব্যসাধনার কথা যখন ভাবি তখন এ কথা মনে না করে উপায় থাকে না যে আত্মোপলব্ধির অন্যতম উপায়ই অনুকরণ, প্রকৃত মৌলিকতার সেটাই উপলবন্ধুর বঙ্কিমপথ। সেই সঙ্গে অনুশীলন চাই। অনুকরণ করেন অনেকেই, অনুশীলন করেন না ফলে ব্যর্থ হন।" তাঁর কবিতায় খণ্ডচিত্রের সমাহারে পূর্ণ চিত্র রচনার সামগ্রিকতা, আন্তরিক আবেগে ছন্দের সহজতাকে করায়ত্ত করা শব্দের ঝংকারে কবিতার জৈবনিক প্রতিফলন ইত্যাদিও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কবির আত্মসচেতনতাও তাঁর কবিতায় সংলক্ষ্য। তিনি একই সঙ্গে স্বাদেশিক, আবার আন্তর্জাতিক; একই সঙ্গে সমকালের এবং উত্তরকালের। সম্পাদক, সংগঠন, সাংস্কৃতিক কর্মী, অনুবাদক ইত্যাদি প্রায় সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত শেষ প্রতিভা যাঁর 'হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে' 'অকারণ আনন্দ' মুক্ত হবার বেদনায় অধীর চঞ্চল।

বন্দীর বন্দনা: বিষয় ও শিল্পরীতি

[বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী' (১৯২৪) হলেও তাঁর কবিসত্তার যথার্থ প্রকাশ 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে—যার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩০-এ। 'মর্মবাণী' কাব্যটিকে 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে (নরেশ গুহ সম্পাদিত) পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থ পরিচয় অংশে সম্পাদক এর কৈফিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন: 'ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষারও আগেকার কিশোর বয়সে লেখা কবিতাসমেত এই বই একবারই মাত্র ছাপা হয়েছিল। এর কোনো কবিতাই পরবর্তী কোনো গ্রন্থে উঠে আসার মর্যাদা পায়নি। বুদ্ধদেব বসুর কৈশোরক কাব্য রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন অন্যান্য কবির অনুসরণ ও অনুকরণ। একাব্যে রাবীন্দ্রিক ছন্দ ও উচ্চারণভঙ্গি বুদ্ধদেব বসুর স্বরভঙ্গিকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে উঠেছে।

'বন্দীর বন্দনা'—কাব্যের প্রথম সংস্করণে (১৯৩০) কবিতার সংখ্যা ছিল দশ। দ্বিতীয় (১৯৪০) এবং তৃতীয় সংস্করণ (১৯৪৭) কবিতার সংখ্যা ছিল আঠাশ। এই সংস্করণে 'ক্ষণিকা' ও 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' নামে দুটি কবিতা এবং ষোলোটি সনেট যোগ করা হয়। 'বিবাহ' ব্যতীত সমস্ত কবিতাই ১৯২৬—২৯-এর মধ্যে লেখা অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলির সমসাময়িক। 'বিবাহ' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩৩ এবং কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটলো কমল' উপন্যাসে প্রথম মুদ্রিত হয়। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের 'শাপভ্রষ্ট' এবং 'বন্দীর বন্দনা', 'কল্লোল', পত্রিকায়; 'ক্ষণিকা', 'কোনো বন্ধুর প্রতি', 'মানুষ', 'অপর্ণার শত্রু' এবং 'বিজয়িনী ও পরাজিতা' 'প্রগতি' পত্রিকায়; এবং 'মোরা তার গান রচি' নামহীনভাবে 'মহাকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সবকটি পত্রিকা অধুনালুপ্ত।

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে। 'বন্দীর বন্দনা'র চতুর্থ সংস্করণে বুদ্ধদেব বসু একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। ভূমিকাটি নিম্নরূপ: "পনেরো বছর পরে 'বন্দীর বন্দনা'র নতুন সংস্করণ প্রস্তুত হচ্ছে, এই সুযোগে পুনশ্চ কিছু পরিবর্তন না করা অসম্ভব হলো।

দ্বিতীয় সংস্করণে যা যোগ করেছিলাম, তার মধ্যে 'প্রেম ও প্রাণ'-এর দশটি সনেট পরিণত হলো ছয়টিতে, এবং বর্জিত হলো 'বিবাহ'—কেন-না ১৯২৯-এর পরবর্তীকালে রচিত কোনো কবিতার পক্ষে এই গ্রন্থ যথাস্থান নয়। পরিবর্তে যোগ করা হলো 'নীলপূর্ণিমা' যা ইতিপূর্বে ছাপার অক্ষরে দেখা দেয়নি, এবং 'আর কিছু নাহি সাধি' নামক সনেট। এটি ছাপা হয় 'কল্লোলে', অধুনালুপ্ত 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ছিলো; বর্তমানে আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্তর্ভূত আছে। 'বন্দীর বন্দনা'য় স্থান দেবার পূর্বে কবিতাটিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছি। অনুরূপ অল্পস্বল্প পরিশোধন অন্য কয়েকটি কবিতাকেও সহ্য করতে হয়েছে; 'অর্পণার শত্রু'র আয়তন কিছু ছেঁটে দিলাম। 'প্রেম ও প্রাণ' ও 'কোনো অভিনেত্রীর প্রতি'—এই সনেটগুলোর সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হলো। কিন্তু এমন কোনো শব্দ বা ভঙ্গি বা অভিজ্ঞতা ব্যবহার করিনি যা ছিলো পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমার সাধ্য অথবা সম্বলের বাইরে। 'বন্দীর

বন্দনা' যাঁদের পূর্বপরিচিত আমার মনে হয় না তাঁরা পরিবর্তনগুলো অনুভব করবেন। কবিতাগুলোর পরস্পর সংস্থাপনের কিছু বদল করা হলো।"]

[১] বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' মূলত প্রেমের কাব্য। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে চিরন্তন মানবিক চিত্তবৃত্তি প্রেমকে তিনি যেভাবে অবলোকন করেছেন তাকে বুদ্ধদেবের প্রেমভাবনার প্রথম পর্যায় বলা চলে; আর এই অবলোকন চলেছে 'নতুন পাতা' (১৯৪০) পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায় ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত 'দময়ন্তী' থেকে 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) পর্যন্ত। এই পর্বে বুদ্ধদেবের প্রেমচেতনার বৈশিষ্ট্য হল নারীর দেহ কণিকা, প্রেমের মূলপ্রেরণা রূপে যৌনলিপ্সাকে স্বীকৃতি প্রদান। কিন্তু পরিণামী ফলশ্রুতিতে কবি দেহাতীত সুকুমার প্রেমকেই স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অবলম্বন করে কবির এই যে দেহোত্তীর্ণতা একে রোমান্টিক ইন্দ্রিয়বাদ বলা যেতে পারে। বাংলা কবিতায় নারীর শরীর এবং কামনা-বাসনা যে অনুপস্থিত নয় তার প্রমাণ আছে গোবিন্দচন্দ্র দাস, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম প্রমুখের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর সমকালীন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রায় সকলের কবিতাতেই নারীর শরীর মুখ্য।

কিন্তু "বুদ্ধদেব সমস্ত বিষয়টিকে একটি নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন: একদিকে বয়ঃসন্ধিকালের উদ্দাম কামকালিমা, অপরদিকে তা থেকে উত্তরণের অভীপ্সা; একদিকে 'সহস্র পঙ্গুতা', 'ভঙ্গুর হৃদয়', অপরদিকে দেবতার মতো অপরূপ, ভাস্করের মতো জ্যোর্তিময় কান্তি; একদিকে পঙ্কতিলক, আর একদিকে পঙ্কজের কোল; এক কথায়: একদিকে প্রকৃতি, আরেকদিকে সংস্কৃতি। মানুষের এই নিরন্তর সংঘর্ষ চিরকালের, তবু প্রথম যৌবনোন্মেষ কালে এ যেমন তীব্র আকার ধারণ করে, সে রকম আর কখনো নয়; এই প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি...প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট; কিন্তু একে হঠিয়ে যে মানবিকতা তা তো ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছা-চেষ্টা শ্রমের কাম্য। বুদ্ধদেব সেই ব্যক্তি মানুষটিকে জানিয়েছেন সালাম, এখানে সেই শ্রদ্ধাপাত্রটি কবি স্বয়ং।" [প্রকৃতি ও সংস্কৃতি: আবদুল মান্নান সৈয়দ। উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা ১৯৭৪]

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে এমন কতকগুলি শব্দবন্ধ আছে যা কবির দেহবাদী সম্ভোগ সংরক্ষণের পরিচয় যেমন প্রদান করে তেমনি দেহোত্তীর্ণ প্রেমের পরিচয়ও প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শব্দবন্ধের উল্লেখ করা চলে। যেমন: সলজ্জ বিকাশ, আরক্তিম কামনা, তরুণ রক্তিমা, অসহ্য লজ্জা, শীতল প্রণয়, নিরুদ্ধ বেদনা, সংগোপনে প্রণয়গুঞ্জন, অবরুদ্ধ ক্রন্দন, প্রণয়ের চন্দন কুমকুম, প্রণয়ের সুরাপান, প্রেয়সীর লাজুক কিঙ্কিনী, রৌদ্ররাগদীপ্ত পরিপূর্ণ দেহ, অন্তহীন প্রেমপত্র, বহ্নির চুম্বন রাগ, বিদ্যুৎময় বিরহগৌরব, মূর্তিমতী বেদনা, কুমারীর সুন্দর লজ্জা, রমণীর লীলাচ্ছলে, শৃঙ্গারকামনা, মদিরামত্তা রাত্রির প্রেয়সী, কটাক্ষ ঈক্ষণ, ওষ্ঠাধর, বাহলতিকা স্তনাগ্রচূড়ার স্পর্শ, ওষ্ঠাধারে প্রবল উত্তাপ, রক্তিম স্তনাভা, মধুরাত্রে রতিক্রীড়া ইত্যাদি।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় প্রথম প্রেমের বাসনার এমন লজ্জাহীন কুণ্ঠাহীন প্রকাশ। বুদ্ধদেব বসুর কাছে প্রেম এক মানবিক চিত্তবৃত্তি এবং কবি তাকে দীর্ঘজীবনব্যাপী

দৃষ্টিতে নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে অবলোকন করেছেন। তাঁর কাছে মানবিক চিত্তবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রেম; আর সে প্রেমভাবনায় নারীর দেহরূপ প্রশংসনীয় গৌরবে স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর প্রেম ভাবনায় দেহবাদী সম্ভোগ সংরাগ প্রাধান্য পেলেও, তাঁর পরিণামী বক্তব্য কিন্তু দেহোত্তীর্ণ সুকুমার প্রেম; ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষীভূত বাস্তবতার কুসুম থেকেই তাঁর দেহাতীত প্রেমের সুরভি বিহার। মানুষের আদিম জৈবকামনার অলজ্জ প্রকাশ 'বন্দীর বন্দনা'য় যেমন রূপায়িত, তেমনি কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণের মন্ত্রধ্বনি তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নয়। আসলে মানুষ তো বিধাতার সৃষ্ট প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দি; এ যেন নিয়তি-নির্ধারিত যে প্রবৃত্তির ও কামনার কারাগার থেকে মানুষের মুক্তি নেই:

'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়
—নির্মম নির্মাতা মম। এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।

* * * * * * * * *

বাসনার বক্ষো মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপযোগী শৃঙ্গার কামনা
রমণী রমণ রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি,—
তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় ক্লেদালিপ্ত লোভ
হিরণময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা সর্প গুপ্ত আছে।

(বন্দীর বন্দনা)

কবিচিত্তের ক্ষুধিত যৌবনের ঝড় আর আদিম শৃঙ্গার কামনাজনিত সংকট জিজ্ঞাসা যা উঠে আসে কবির অবচেতনার গভীরতার থেকে আমূল আলোড়িত হয়ে, কবি শেষপর্যন্ত তা থেকে মুক্তি প্রয়াসী। কবি বিশ্বাস করেন, আদিম বাসনার জন্যই কবি স্বয়ং এবং সমগ্র মানবজাতি আকণ্ঠ প্রবৃত্তির পঙ্কে নিমজ্জিত; আর এর জন্য দায়ী স্রষ্টা—যিনি মানুষকে বাসনা-কামনার নাগপাশে চিরন্তন বন্দি করে রেখেছেন। আদিম বাসনা-কামনাই ভেঙে দেয় কবির সুন্দরের স্বপ্ন আরাধনা। 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় কবি একই অঙ্গে, প্রত্যক্ষ করলেন, প্রভাত সূর্যালোকে 'কামনার বহ্নি' যা হল 'স্বপনের সলজ্জ-বিকাশ'; আর 'গোলাপের বর্ণে বর্ণে স্বপ্নসুরমাখা আরক্তিম কামনার আলিঙ্গন'। কবি মনে করেছেন, তাঁর অবস্থান 'গোপন গভীর গর্তে' এবং তিনি সুন্দরের সঙ্গ বঞ্চিত এক 'শাপভ্রষ্ট' সত্তা; কিন্তু শাপভ্রষ্ট হলেও সুন্দর তাঁর প্রার্থিত:

শাপভ্রষ্ট দেব আমি।
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়ি যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।

(শাপভ্রষ্ট)

'সুন্দর' কুসুমগন্ধে বা 'এ বাঁশি বেজে' উঠলেও কবির একান্ত আক্ষেপ:

আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকার মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।

* * * * * * * * *

দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।
যৌবন আমার অভিশাপ।

(তদেব)

অবচেতন অন্ধকার কক্ষে যদি থাকে কামনার তপ্ত নাগপাশ তাহলে বহিঃপ্রকৃতিতে আছে স্নিগ্ধতা ও শান্তি। তাই বোধ হয় বিহঙ্গের উদাসী কলকণ্ঠ তাঁকে জানায় 'শাপভ্রষ্টদেব তুমি'। মানুষের আদিম জৈবধর্ম এবং যৌবন-বাসনাকে স্বীকার করেই কবি তাদের অভিশাপ রূপে চিহ্নিত করেন। কেন-না, যৌবনের অগ্নিদাহ, বাসনা-ব্যাকুলতা সৌন্দর্যের সোপান কলঙ্কিত করে; সুন্দরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে:

অক্ষম দুর্বল আমি নিঃসঙ্গের নীলিমার তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘপথে যাত্রা করেছিনু কোন স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে
আজ তার নাহিক আভাস।

(তদেব)

'মানুষ' কবিতার চারটির পর্যায়ের (১, ২, ৩, ৪) প্রথম পর্যায়ে মানুষ কামনা প্রলুব্ধ রতি সম্মোহিত; আর কবি স্বয়ং

প্রলুব্ধ অস্থির
অসাঙ্গা বাসনা পঙ্গু আমি সেই নিলর্জ্জ কামুক;
সারঙ্গা সঙ্গীত স্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটাবিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্য স্ত্রীর।

(মানুষ ১)

ওই কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বপ্নসঞ্জাত সুন্দরের ব্যাকুল প্রার্থনা কবির বিধাতা শোনেননি। ফলত, তৃতীয় পর্যায়ে 'অন্ধকার শূন্যগৃহে' জমে-থাকা বিষণ্ণতারাশি দূরীকরণের জন্য কবিকে নিজ হাতে দীপ জ্বালাতে হয়, যার আলোকে গৃহতল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর চতুর্থ পর্যায়ে কবির উপলব্ধ সত্য 'মানুষ শুধু জীবসৃষ্টি যন্ত্রমাত্র নহে'। কবির মনে হয় 'এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারীমাংস চেয়ে সুখকর'। কবি প্রবৃত্তির কারাগারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দি হয়েও শিল্প সফলতার মহিমাময় সৌন্দর্যের দিক অবলোকন করে বিস্ময়-বিমূঢ় হন:

হেরিতেছি একসঙ্গো শত শিল্প, সংগীত কবিতা,

কারুকার্য, চারুকলা, মাধুর্যের নাহি পরিসীমা।
বিধির বিধান লঙ্ঘি মানুষের জ্বলন্ত মহিমা
ব্রহ্মাণ্ড অম্বর মধ্যে অনির্বাণ গৌরবসবিতা।
আমি যে রচিব কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টা
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার (মানুষ/বন্দীর বন্দনা)

'মোহমুক্ত' কবিতাতেও প্রেমের মর্মমূলে কামনার অমোঘ এবং অনিবার্য লীলার বৈচিত্র্য; অমর কামনা ব্যতীত প্রেমের ক্ষেত্রে আর কিছুই থাকে না। কবি জানেন, মান-অভিমান সবই মিথ, সবই ছলনা; 'স্মৃতির সঞ্চয়সাধ শূন্য প্রবঞ্চনা'। স্বপ্ন ভেঙে যায়, অশ্রুজল শুকিয়ে যায়, বেদনার মৃত্যু হয়—'শুধু থাকে অমর কামনা'। কবির বরণীয় অভিজ্ঞতা 'আশ্লেষ আবেশ তৃষ্ণ' 'উষ্ণতনু আস্বাদন', 'স্তনাগ্রচূড়ায় স্পর্শ' ইত্যাদি আনন্দ প্রদায়ী। সেই কারণে:

একমাত্র কামনা অমর
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা,
স্বপ্ন সে ভাঙিয়া যায়, ভুল হয়ে যায় ভালোবাসা।

(মোহমুক্ত/তদেব)

বুদ্ধদেব বসুর কাছে নারী প্রেমকল্পনার রোমান্টিক বৃত্তে আবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছেন বিধাতার 'চিরন্তন অশ্লীলতা' এবং 'জন্ম-অসতী':

এতদিনে আমি বুঝিলাম—
ওগো নগ্নদেহা নারী—তোমার কী দাম!
কবির কল্পনা নহো, চিরন্তন অশ্লীলতা তুমি বিধাতার,
অনঙ্গবিহারভূমি, তুমি মূর্তি মর্ত্য কামনার।
আর কিছু চাহি নাকো;—জানি, জানি চক্ষে তব নাহি স্বর্গজ্যোতি—
তপ্ততনু নিঙাড়িয়া—পরিতৃপ্তি ঢেলে দাও, হে জন্ম অসতী!

(মোহমুক্ত / তদেব)

অথচ সেই 'জন্ম-অসতী'কে পাওয়ার জন্য কবির অনিঃশেষ কামনা:

এসো কাছে পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহ মদ্য পান করি।
আনিয়ো না আর কিছু, শুধু আনো প্রস্ফুট যৌবন,
মলিন গোলাপসম গাত্রবর্ণ উদ্ভাসিয়া উঠেছে বসন।
মসৃণ চিক্কণ ত্বক্ ওষ্ঠাধরে প্রবল উত্তাপ,
পদতটে পদ্মগন্ধ, বাহুডোরে মদির প্রলাপ।
আর কিছু চাহি না, সুন্দরী,

সুন্দর তোমার দেহ গণ্ডুষে লইবো পান করি।

•(মোহমুক্ত / তদেব)

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু দ্বন্দ্বে আলোড়িত কবি। মানুষ তাঁর কাছে আদিম বাসনাবদ্ধ জীব আবার মুক্তির জন্য ব্যাকুলও বটে। মূলত 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় এই আত্মদ্বন্দ্বে আলোড়িত হওয়ার মানসিকতা অনুভব করা যায়। শাপভ্রষ্ট দেবশিশু দেবতার মতো অপরূপ, জ্যোতির্ময়, প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয়গুঞ্জনেরত; অথচ যৌবনলগ্নে তীব্র কামনার স্পর্শে আলোড়িত—যৌবন আর কামনার অমোঘ অনিবার্যতা। আবার সেও মুক্তি চায় পাশবতার জৈবতার অন্ধতা থেকে; যৌবন কবির অভিশাপ হলেও:

গগনের স্নিগ্ধ শান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হয়ে যেন লাগে
ফুটে ওঠে সোনার কমল
খানিক সৌরভে তার নিখিলেরে করে বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয় পল্লবসম্পূটে।

এ কাব্যে কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ সম্ভবত মার্জিত পরিশীলিত ভারতীয় মানস এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য লালিত যৌনবোধ। তাই কবি নিজেকে মনে করেন, 'পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে শেফালি সৌরভ', 'ভোরের ভৈরবী'। কবি যে একদিকে কামনার অন্ধকারে পূর্ণ আবার অন্যদিকে শুভ্র জ্যোতির্ময় আত্মা তার অভিব্যক্তি ঘটে 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায়:

যেথা যত আনন্দের মহান মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব নব হয়েছে প্রকাশ।
বুকলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।

'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' কবি আত্মার দ্বন্দ্ব আর তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা 'বন্দীর বন্দনা' কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব। জৈব কামনা বাসনার নাগপাশে বন্দি কবির অন্তরে আছে সুন্দরের অনুধ্যান আর মনে জাগে অমৃত পিপাসা:

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হয়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে; তবু জেনো শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
ব্যগ্র আলিঙ্গনে।

(বন্দীর বন্দনা)

রবীন্দ্র জীবনদর্শনের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনের পার্থক্য এইখানে যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে মঙ্গল শুচি, সৌন্দর্যময়তার ধ্যানে তন্ময়; বুদ্ধদেব বসু সেখানে পাপ—অমঙ্গলবোধ, আদিম বাসনা কামনাকে অঙ্গীকার করেই তা থেকে মুক্তি প্রয়াসী। লোলুপ ভোগলালসা সত্ত্বেও কবি অমৃতপিয়াসী। মানুষ যে অসম্পূর্ণ ও প্রবৃত্তি সর্বস্ব তার জন্য দায়ী বিধাতা; আর বিধাতার সেই ত্রুটিকে কবি নিজস্ব মহিমায় সংশোধন করতে চান; অর্থাৎ এক অর্থে কবি নিজস্ব শিল্পলোক গড়তে প্রয়াসী। প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় বুদ্ধদেব বসুর স্মরণীয় উক্তি: "যে ভগবান ও মানুষ পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী, কেন-না যে আদিমানব বিধাতার সৃষ্টি সে অসহায়ভাবে পাশব বৃত্তির অধীন, কিন্তু সেই মানুষই তার আপন সাধনার দ্বারা নিজেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করেছে, হয়ে উঠেছে কবি ও শিল্পী, ঈশ্বরের মতোই স্রষ্টা। নবযৌবনের স্পর্ধা বলতে যা কিছু বোঝায়, এই কবিতাটি তার দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতে পারে, এবং এর প্রথম প্রকাশের কাল আমাদের সাহিত্য পঞ্জিকায় বিদ্রোহের ঋতু বলে চিহ্নিত।" (সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ।) যদিও বিধাতা কবিকে 'অন্ধকার অমারাত্রি সম' কামনা প্রদান করেছেন তবুও কবি আপন সাধনায় তা শোধন করে স্বপ্নসুধাসম প্রেম রচনা করেছেন। প্রবৃত্তির কারাগার থেকে এইভাবেই মানুষ মুক্তিলাভ করে প্রেমের অমৃতলোক সৃজন করে। আদিম জৈবতায় স্পন্দমান মানুষ বাসনাতুর সত্তাকে পরাভূত করে, যদিও বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করেন জৈবতার প্রতিমূর্তি রূপে। 'মানুষ' কবিতাতেও বিশ্বস্রষ্টার প্রতি অভিযোগ ধ্বনিত:

স্রষ্টা শুধু এই চাহে, এ বীভৎস ইন্দ্রিয় মিলন
নির্বিচারে প্রাণীসৃষ্টি করে থাকে যেমন পশুরা।
মোর তিক্ত চিত্ত ঠেলি উঠিছে যে ব্যাকুল প্রার্থনা
স্বপ্নসঞ্জাত সেই সুন্দরের সুদূরের তরে—
বিধাতা শোনেনি তাহা। (মানুষ/বন্দীর বন্দনা)

'বন্দীর বন্দনা', 'শাপভ্রষ্ট', 'কালস্রোত', 'অমিতার প্রেম'—এই কবিতা চতুষ্টয়ে ব্যবহৃত শব্দ ও চিত্রকল্প প্রমাণ করে যে প্রবৃত্তি পরাবশ্যতার অধীন, দেহসচেতন, কামনাবদ্ধ, আবার একই দেহোত্তীর্ণ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল।

আলোচ্য কাব্যের 'প্রেম ও প্রাণ' পর্যায়ের ছয়টি সনেটে আরক্ত শরীরী সংরাগ থেকে প্রেমে উত্তরণের পর্যায়টি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। কৈশোর ও কৈশোর যৌবনের সন্ধিলগ্নে প্রেম রহস্যময়; যৌবনে প্রেম কামকলঙ্কিত, বাস্তব পৃথিবীর জ্বালাভরা। কবি বিশ্বাস করেন, তা অপবিত্র হলেও সত্য। তবুও প্রেমের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম-কামনা-বেদনা অতিক্রম করে যথার্থ প্রেমের উপলব্ধিতে উপনীত হতে হবে।

১. তখন জীবনে মোর অঙ্গ শুভ্র নির্মল কৈশোর—
যে কুসুম ফোটে নাই, তারই মতো ক্রীড়ায় ব্যাকুল;
কুমারী বাসনা মোর জন্মলব্ধ লজ্জায় দুকূল
উন্মোচন করে নাই।

(প্রেম ও প্রাণ ২)

২. কৈশোরের সাধনা সেতু চূর্ণ হয়ে গেছে যে অবধি,
হানিয়াছে মোর মুখে কশাঘাত কর্কশ কামনা;
কর্দমে হৃদয়পদ্ম সহিয়াছে চরম লাঞ্ছনা।

(তদেব ৩)

৩. ওগো প্রেম, মানুষের হৃদয়ের শেষ সার্থকতা!
মনীষায় লভ্য জ্ঞান—তুমি তার চরম সীমানা;
তপস্যা অভীষ্ট তুমি, ধ্যানলব্ধ অমৃত বারতা;
তুমিই এই জীবনের

(তদেব ৫)

প্রেমেই জীবনের সার্থকতা জেনেও কবি জৈব জীবনের কথা বলেন; আবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সুরও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়:

মানুষ মাংসের পিণ্ড, পঙ্ককাণ্ড, প্রবৃত্তির স্তূপ,
তুমি এসে যতক্ষণ সচকিয়া নাহি যাও তারে;—
তোমার সুরার স্পর্শে ফোটে তার ফটিকের রূপ।
সে সুরা উচ্ছ্বসি ওঠে প্রাণপাত্র ছাপি চারিধারে;
ফেনময় উন্মাদনা—অপচয় করে অপরূপ;
অবশেষে <u>স্বর্গরেণু</u> জ্বলে ওঠে <u>রক্তের আঁধার</u>।

শেষ পঙ্‌ক্তির 'স্বর্গরেণু' এবং 'রক্তের আঁধার' শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যব্যঞ্জক। 'রক্তের আঁধার' শব্দদ্বয় যদি কামনার দ্যোতক হয়, তাহলে 'স্বর্গরেণু' শব্দটি প্রেমের প্রতীক। কেন-না, কামনা অন্ধকারই তো প্রেমের উৎস। এই সিদ্ধান্তই শেষপর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুকে নির্দ্বন্দ্ব করে তোলে।

মনে হয়, 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে বুদ্ধদেবীয় প্রেম-মনস্তত্ত্বে যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় তার অন্যতম কারণ বোধ হয় সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে কবির অধিক সচেতনতা। বিধাতার মতো সৃষ্টিশীল ক্ষমতা যে মানুষেরও আছে তাও কবির বিশ্বাস আর কামাতুরতার বৃত্তবদ্ধ হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। 'কোনো বন্ধুর প্রতি' কবিতার কবি বিশ্বস্তভাবে উচ্চারণ করেন—স্থূলতম দৈনিকতা, জঘন্য মার্জারবৃত্তি, কুটিল ক্ষুদ্রতা, সুন্দরী কামিনীবৃন্দের প্রতি নিপীড়ন, ইক্ষুযম শরীর লাবণ্য শোষণ, কৃশ কটিতট, প্রশস্ত জঘন, রঙিন স্তনাভা, সন্তানের বহুবচনতা ইত্যাদি তাঁর কাম্য নয়; আকাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁর দ্ব্যর্থহীন উক্তি:

কৃপণের কামার্ত গৃধ্নুতা
মোরা ঘৃণা করি। ঘৃণা করি সুমসৃণ আরামের
তৈলাক্ত বিক্লব তৃপ্তি। ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক প্রসাদ
সুখান্বেষী পশুধর্ম নহে আমাদের।

(কোনো বন্ধুর প্রতি/বন্দীর বন্দনা)

কবির প্রশ্ন নারীর কাছে:

ভালোবাসার যোগ্য নারী পৃথিবীতে দুর্লভ—
কাহারে করিব ধন্য মোরা
প্রেম দিয়ে; নির্বোধ নারীর পাল, স্থূলমাংসস্তূপ,
শরীরসর্বস্ব মূঢ়। চর্ম সাথে চর্মের ঘর্ষণ
একমাত্র সুখ যাহাদের, সন্তানেরে স্তন্যদান
উচ্চতম স্বর্গলাভ—তাহারা কী বুঝিবে প্রেমের?

কেন-না, নারীরা তো সকলে রবীন্দ্রনাথের লাবণ্য বা সুচরিতা নয়; মর্ত্য পৃথিবীর যে নারীরা শরীরী সংরাগে দীপ্ত তারা কেউই কবির বন্ধু নয়:

বিম্বাধর, কৃশ কটি করভোরা, প্রশস্ত জঘন,
আশ্চর্য যুগলাস্তন, কৃষ্ণক্লেশ আমষ্যলুণ্ঠিত,
কুসুম কোমল ত্বক আরক্ত মাংসের আচ্ছাদন,
মধুরাত্রে রতিক্রীড়া জ্যোৎস্নাধৌত পুষ্পশয্যাপরে
সে নহে মোদের বন্ধু।

(পূর্বোক্ত)

তাই শেষপর্যন্ত কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কুমারীর প্রথম প্রেমিক'রূপে শতবর্ষ পরেও বিরাজিত থাকেন। আর কবিও উচ্চারণ করেন পরম ফলবান বাণী:

বিধাতার নির্বাচিত মোরা,
কবিতা মোদের প্রিয়া,—আমরা চাহি না সিংহাসন,
চাহিনা সহস্র নারী;—মোরা চাই উদার জীবন,
উদার জীবন ভরি ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতা।
আমাদের তপস্যায় পৃথিবীর নবজন্ম হবে—
সে পৃথিবী আমাদের।

(কোনো বন্ধুর প্রতি/তদেব)

রোমান্টিক কবি কবিতাকেই তাঁর প্রিয়ারূপে গ্রহণ করেন; আর সে কবিতা তাঁকে মুক্তি দেয় হেমন্তের মাঠ ভরা ধানে, শক্তির অশেষ উৎসে, সর্ব আনন্দের সার্থকতায়। কবি হয়ে যান শঙ্কাহীন, শতমৃত্যুজেতা, মুক্তপক্ষ, স্বচ্ছন্দাবিহারী:

তাহার নির্মম প্রেমে কবিতা যে আমাদের প্রিয়া, জ্বলিয়া উঠিবে প্রাণমন
সংগীতের অগ্ন্যুৎপাতে দেহ আর দেহ নয় যেন,
বিকার, বিক্লম, ব্যাধি-কিছু নাই, কিছু নাই আর—
অমৃত পরশ পশে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বাতায়নে।
সেই প্রেম নব নব দুঃখ দেবে তীব্র নিদারুণ;

মহান দুঃখের বর লভিলাম, মোরা ভাগ্যবান।

(কোনো বন্ধুর প্রতি/তদেব)

'প্রেমিক' কবিতায় বুদ্ধদেব নারীর সমস্ত নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যকে ধ্বংসের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। নারীর দেবীরূপ, সৌন্দর্যময়তা সবই বিকৃত হয়ে গেল। বুদ্ধদেব বসুর কাছে নারী পীতবর্ণ, খড়ির মতো সাদা, নিঃশব্দ বীভৎস, রুক্ষ অট্টহাসি, 'নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা'। 'প্রেমিক' কবিতায় প্রথম লোকসংস্কৃতির নায়িকা কঙ্কাবতীর আবির্ভাব। তার প্রতি কবি যখন তাকান তখন 'পৃথিবী টলিয়া ওঠে'। কিন্তু কঙ্কাবতী একালের দৃষ্টিতে কবির দ্বারা ব্যাঘাত: 'তুমি নারী, কঙ্কাবতী, প্রেম কোথা পাবে'? আসলে আজকাল তো প্রেমের পরিবর্তে সকলে প্রেমের ভান করে। তাই 'কঙ্কাবতী'র কাছে কবির 'বরং প্রেমের ভান করিয়ো না'। 'কঙ্কাবতী' শাশ্বত প্রেমিকার প্রতীক হলেও প্রেমের সমস্ত রহস্যজাল আজ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কবির কাছে; কেন-না, সে এখন আর চিরন্তনী প্রেমিকা নয়, আধুনিকা। তা ছাড়া বিজ্ঞান তার দেহ-লাবণ্যের অন্তরালে দেখেছে কুৎসিত কঙ্কাল।

নারীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
তেমনি তোমার প্রেম কোন প্রেতে করিছে গোপন।

(প্রেমিক/তদেব)

কবি সমস্ত জেনেও তাকে ভালোবাসেন—'তোমার যে সৌন্দর্যেরে ভালোবাসি' (তোমারে তো নয়)।

'কঙ্কাবতী' ক্ষণতরে উজ্জ্বল আলোতে ফুলের মতো ফুটে ওঠে বলে কবি তাকে ভালোবাসেন কবির 'প্রেমের আলোতে'। কবি ভালোবাসেন সৌন্দর্য, সুষমা; অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতিরেকে দেহকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করেও দেহোত্তীর্ণতার সন্ধান।

[২] 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে কবির এই যে দেহবাদ ও দেহোত্তীর্ণতাবাদ তা পারস্পরিক বিপরীত শব্দবন্ধে, বাক্যবন্ধে; আবার একই শব্দ ও বাক্যবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

(ক) রক্তিম আকাশ / কামনার বহ্নি / সলজ্জ আকাশ / আরক্তিম কামনা / উচ্ছলিত যৌবন / তরুণ রক্তিমা / গোপন গভীর গর্ভ / অসহ্য লজ্জা / শীতল প্রণয়ে / নিরুদ্ধ বেদনা / অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয় / প্রণয়ের চন্দনকুঙ্কুম্ / পরিপূর্ণ দেহ / বাক্যহারা কটাক্ষ / বহ্নির চুম্বনরাগ / নয়নের আলো / বিদ্যুৎময় বিরহগৌরব / ওষ্ঠতটে হাসি / নগ্ন শুভ্র হস্ত দুটি / উদ্বেল বাসনা / কুমারীর সুন্দর লজ্জা / রমণীর লীলাচ্ছল / অন্তরঙ্গ আলাপন / উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার / রক্তের আরক্ত লাজ / উপবাসী শৃঙ্গার কামনা / কণ্ঠে তব মন্দাকিনী বারিস্নাত মন্দারের মালা / ভীরু দুটি ভুরুলতা / ঠোঁট হতে ধীরে ধীরে ঝরে পড়া মধুভরা কথা / বাহুলতা প্রসারিত / ললাট, চিবুক, রাঙা আঙুলের কোণ / কুমারী প্রেম / আশ্লেষ আবেশ তৃষ্ণা / উন্নতনু আস্বাদন / স্তনাগ্রচূড়ার স্পর্শ / মসৃণ চিক্কণ ত্বক / ওষ্ঠাধরে প্রবল উত্তাপ / বাহুডোরে মদির প্রলাপ / রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস / রক্তিম স্তনাভা / বিম্বাধর / প্রশস্ত জঘন / আশ্চর্য যুগলাস্তন / মধুরাত্রে রতিক্রীড়া / নতুন ননীর মত তনু /

লাস্য হয়ে ওঠে তুমি / স্তনরেখা বঙ্কিম মসৃণ / বাদামি চোখ / চুল লালচে বাদামি / পেলবাঙ্গী তনুময্যা / কৌমার্যের আঁধার / নিষিদ্ধ যে রক্তফল ইত্যাদি।

খ. 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে কথ্য ক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। যেমন—'শতদার নারীমাংসলোভী / কামুক রাজন্যকুল ছুঁয়ে ছেনে বেড়াতেন ফিরি / বিশ্বের সুতনুরাশি।

গ. আলোচ্য কাব্যের বিশেষণগুলি তীব্র লক্ষ্যভেদী। যেমন—

আমি শুষ্ক নিশাচর অন্ধকার / আমি হিংস্র দুরন্ত পাশব / স্তনরেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সতত স্পন্দিত / স্পর্শ রস তৃষ্ণাতুর দেহ /

ঘ. গুণবাচক শব্দের বিন্যাস বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সংহতি। যেমন—লক্ষ দৈন্য কলঙ্কিত ক্ষুধাক্ষীণ্ন বিশীর্ণাজীবন।

ঙ. বিপ্রতীপ বিশেষণ অভিঘাত নির্মাণ:

১. বকুল শাখার ফাঁকে উঁকি দেয় সদ্যোজাত তারা /

২. উষ্ণ তুষার লাল কপাল /

চ. অলংকার প্রয়োগ:

১. অনুপ্রাস—

(১) অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।

(২) লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রশনালেহন।

(৩) নতুন ননীর মতো তনু তব।

(৪) আমার সোনার সন্ধ্যা, প্রভাতে শ্যামল তৃণে শিহরিত শিশিরের কণা।

(৫) ঘন অরণ্যের মর্মে অলক্ষিতে মরে যায় ভীরু বনপাতার মর্মর।

২. উপমা:

(১) আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো।

(২) প্রেম গুঞ্জনের মতো কী অমৃত ঢালে মর্ম মাঝে।

(৩) সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো।

(৪) কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ।

(৫) বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মতো।

(৬) সুনীল দর্পণসম বিতরিছে স্বপ্নমায়া-জাল।

(৭) সহসা দেখেছি তোমা মূর্তিমতী বেদনার মতো।

(৮) কৃমিসম, কীটসম হীন প্রাণ হইবে বহিতে।

(৯) অদৃশ্য ছায়ার মতো রবো আমি তব সাথে সাথে।

(১০) অতৃপ্ত আত্মার মতো অগণিত অন্ধকার হতে।

(১১) মৃত্যুর চুম্বনসম।

(১২) অদেহী ছায়ার মতো।
(১৩) সবিতার দীপ্তিসম।
(১৪) কুমারীর প্রেমের মতন।
(১৫) শরীর লাবণ্য তাঁরা ইক্ষুসম করিয়া শোষণ।

৩. রূপক:

(১) রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হয়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ তলে।

(২) সঞ্চিত আশার জ্যোতি ডুবে গেছে বিস্মৃতি তিমিরে।

(৩) আমাদেরও জীবনের নদী
মৃত্যুর সমুদ্রে মিশিয়াছে।

(৪) হিরণ্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা সর্প গুপ্ত আছে।

(৫) তার তরে নহে প্রেম, যে বালক তুষার-বসনে
অজ্ঞান বালিশে শুয়ে কৌমার্যের আধারে ঘুমায়।

[৩] বুদ্ধদেব বসুর আলোচ্য কাব্যের মূল বিষয় প্রেম এবং সেখানে মানবিক বাসনা ব্যাকুলতার কথা সগৌরবে স্বীকৃত। একালের মানুষ প্রেমের চিরন্তনত্বে বিশ্বাস হারিয়েছে। চিরন্তনী প্রেমিকের প্রতীক গ্রিক পুরাণের আর্ফিয়ুস—কবি তার সমান্তরালভাবে আধুনিক প্রেমিকাকে প্রতিস্থাপন করে একালের প্রেমিকার অন্তঃসারশূন্যতা, হৃদয়হীনতা, তুচ্ছতাবোধ ইত্যাদির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

মোর প্রাণে নেই সেই প্রেম—যার বলে
সুপ্ত মৃত্যুপুরী হতে এনেছিলো
ফিরায়ে প্রিয়ারে
বিরহী প্রেমিক।
দুর্বল ভঙ্গুর আমি পঙ্গু, অসহায়,
কর্কশ কঠিন।

পুরাণের সীতা-সাবিত্রী, শকুন্তলার প্রেমকাহিনি যত মধুরই হোক তার অন্তরালে ছিল সামন্ততান্ত্রিক পুরুষের লালসা-বাসনা-কামনার প্রকাশ। কবি সেই মিথ ব্যবহারে ব্যঙ্গ প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন:

কুমারীত্ব করিতে মোচন
পটুতার নাহি ছিলো সীমা। নারীমেধ যজ্ঞ মাঝে
ইন্ধন রয়েছে শত শকুন্তলা। ***

শয্যাকক্ষে একনিষ্ঠতায়

সীতার সতীত্ব শিক্ষা, সন্তানের বহুবচনতা,

সাবিত্রীর সুপবিত্র প্রেমের লক্ষণ!

আবার 'মোরা তার গান রচি' কবিতায় কবির মিথকল্পে অনন্যপূর্ব কাব্য সাফল্য পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না: আমাদের চিরসঙ্গী নৃত্যক্ষিপ্ত, রিক্ত মহাকাল।

গজাসুর বধের পর তার রক্তাক্ত চামড়া মাথার উপর তুলে শিবের ক্ষিপ্ত নৃত্যের মাধ্যমে মহাকালের রূপকল্পে বর্তমানের কুরূপ, ক্ষিপ্ততার চিত্র প্রতিভাত।

[৪] 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে কবি প্রবহমান মুক্তক মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি দ্বিধাহীনভাবে ব্যবহার করেছেন মোর, কঙ্ক, সাথে, যবে, হেথা, সনে, গেনু, তিয়াষ ইত্যাদি প্রচলিত কাব্যিক শব্দ। তাঁর ছন্দে কখনও মিল, কখনও অমিল; তবে তাঁর ভাবনার উজ্জ্বল প্রকাশ সমিল মিশ্রবৃত্ত ছন্দ। অবশ্য অমিল ছন্দেরও প্রয়োগ লক্ষ্যগোচর। অমিল প্রবহমান দীর্ঘ পয়ারছন্দের কবিতা 'বন্দীর বন্দনায়' দুর্লভ নয়। এর উদাহরণ হল 'কোনো বন্ধুর প্রতি' কবিতাটি। আলোচ্য কাব্যের মুক্তক মিশ্রবৃত্ত ছন্দের কবিতা শাপভ্রষ্ট, অমিতার প্রেম, কালস্রোত, প্রেমিকা, মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান, অপর্ণার শত্রু ইত্যাদি। এখানে দু-মাত্রা থেকে তিরিশ মাত্রা বিভিন্ন মাপের প্রবহমান পঙ্ক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। 'সনেটগুচ্ছ' কবিতাতে কবি সর্বক্ষেত্রেই ৮ + ১০ মাত্রা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

দরিদ্র বালক যথা / অভিনয় ভবন দুয়ারে

এ চরণ রাজপথে / অন্যপদ মর্মরসোপানে

[৫] ইংরেজি রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা বাংলা কবিতার রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দর মতো বুদ্ধদেব বসু ততটা প্রকৃতি-প্রেমিক কবি নন। তার 'মর্মবাণী' কাব্যে প্রকৃতি সচেতনতার প্রকাশ কোনোভাবে লক্ষিতব্য না হলেও 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে প্রকৃতি অর্ধচৈতন্যের বাহন। 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় প্রকৃতির দুটি রূপ প্রকাশিত:

(ক) শান্তরূপ:

শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,

দক্ষিণপবন তারে মৃদু হাস্যে আন্দোলিয়া যায়।

রাত্রির রাজীব বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা

আধারে অশ্রুকণা তারার মণিকা হয়ে জ্বলে

ত্রিযামার জাগরণ তলে।

(খ) রুদ্ররূপ:

নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা

উদ্গারিছে বিষ,

তরঙ্গমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকত শিখরে।

গাঢ় কৃষ্ণ জলরাশি আস্বাদে অতল
নিত্যনব অমঙ্গল করে জন্মদান
গোপন গভীর গর্ভে।

প্রথম চিত্রে প্রকৃতির শান্তরূপ যেন রাবীন্দ্রিক আবহমণ্ডলের প্রতিচ্ছায়া। দ্বিতীয় চিত্রে প্রকৃতির বিধ্বংসী রূপে যেন মানব স্বভাবের আদিম জৈবধর্মের প্রকাশ।

আবার 'নীলপূর্ণিমা' কবিতায় প্রেমিকার সঙ্গস্পর্শে
'তখন ফুটেছে ফুল অধীর কাননে
ভ্রমরের গুঞ্জরণে বসন্তের চঞ্চলতা হয়েছে মন্থর
পূর্ণতার আস্বাদনে মৌন হয়ে গেছে মোর বীণা।
আর প্রেমিকার অনুপস্থিতিতে:
সঙ্গে তব নিয়ে গেছো পুষ্পিত ফাল্গুন,
রেখে গেছো রিক্ত করে যৌবন আমার,
ব্যর্থতায় কাঁদায়েছো বীণার কম্পন বারে বারে।

[৬] বুদ্ধদেবের প্রথম পর্যায়ের কাব্য 'বন্দীর বন্দনায়' সমাজসচেতনতা দুর্লক্ষ। তবে তাঁর কবিতায় সমকালীন বিশ্বের ছায়াপাত ঘটেছে। 'বন্দীর বন্দনা'য় সমাজ বাস্তবিকতার প্রকাশ না থাকলেও সমাজ ভাবনায় প্রকাশ আছে। তাঁর কাছে এই পৃথিবী মনে হয়েছে—পাণ্ডু ধরাতল, বন্ধ্যা উপকূল, অপবিত্র, রুক্ষ আকাশ। এ সমস্ত পেয়ে যাই ক্ষণিকা, হে বিধাতা প্রেম ও প্রাণ, মোরা তার গান রচি ইত্যাদি কবিতায়।

বুদ্ধদেব বসু হয়তো ধর্ম, ভগবান, শাশ্বতবোধ ইত্যাদিতে তিরিশের কবিদের মতোই অবিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর কালচেতনার সঙ্গে বৈনাশিকতা বোধ অনুপস্থিত নয়। প্রেমিক-প্রেমিকা বহমান কালস্রোতে ক্ষণিক আবেগে আপ্লুত হলেও 'পশ্চাতে নিষ্ঠুর কাল বসন্তের অন্তিম বিদায়ে মেলিয়াছে বদন করাল।'

শব্দানুষঙ্গে 'বন্দীর বন্দনা'

"বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথমেই শব্দের প্রেমে পড়েছেন। তাঁর কাছে শব্দ সুন্দর, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, তিনি শব্দের আলো ছড়াতে চেয়েছেন দূরে, আর শব্দের বিভায় কাছে আনতে চেয়েছেন গোপন; সেজন্য শব্দের বিবর্ধমান বিবরণ, ধ্বনি আর আবেগ তাঁকে উৎপন্ন করেছে শস্যের মতন। তিনি বারে বারে নিজেকে ফলিয়েছেন, শব্দের মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন নিজেকে ও অন্যকে, এবং এই অন্যটি তিনি নিজেই। অন্যের আয়নায় তিনি নিজেকে দেখেছেন, নিজেরই কথা বলা শুনেছেন, দেখছেন শব্দে তৈরি হচ্ছে জগৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিংবা নিশীথের ভীষণ থেকে বদান্য দিন পর্যন্ত, শব্দে জেগে ওঠে উন্মত্তা, শব্দে চঞ্চল হয় সর্বজীব, শব্দে লিপ্ত হয় মানুষেরা।...শব্দপ্রেম আসলে ভাষারই প্রেম, আর ভাষাচর্চা তাঁকে ভাষার মূলে নিয়ে যায়, এক্ষেত্রে সংস্কৃত আর সংস্কৃতের সঙ্গে জড়িত ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য। তিনি শুরু করেছেন নিঃসঙ্গ আবেগ নিয়ে, সেজন্য প্রাথমিকভাবে তাঁর শব্দ উত্তাল কিংবা অস্থির, উজ্জ্বল ও বিচ্ছুরিত, কিন্তু অন্তিমে, গন্তব্যে পৌঁছে তিনি ঘন আর সংহত, তিনি নিজের মধ্যে সংহার করেছেন তাঁর আবেগের উত্তালতা, সংবরণ করেছেন উচ্ছ্বাসের অমিতাচার, বদলে লাভ করেছেন ভাষার সংহতি আর বেগ, দূরস্পর্শী ইঙ্গিত আর রীতির ঘনত্ব, সেজন্য শেষ পর্যায়ে তাঁর নায়কেরা কিংবা তিনি শব্দকে ভাষার মধ্যে শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর, ঐতিহ্যের খোঁজে বর্ধিত বেগ, এভাবেই বুদ্ধদেব বসু শব্দের গন্তব্যে পৌঁছে ভাষার উৎসে নিজেকে নিয়ে গেছেন।"[১]

'শব্দের গন্তব্যে পৌঁছে' 'ভাষার উৎসে নিজেকে নিয়ে' যাওয়া কবির একমাত্র জীবনসাধনা না হলেও অন্যতম সাধনা বটে। বিশেষত সেকাল যদি হয় জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার কাল। আবার যুগের জটিলতা যে সর্ব কবিচিত্তে প্রশ্নাতুরতা সৃষ্টি করবে এমন কোনো নিঃসংশয় শর্ত নেই। যিনি কালসচেতন, সমাজ-আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লাবনে যাঁর চিত্তদেশ বিপুল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকে অথচ তাকেই একমাত্র সত্য বলে মনে না করে, ইতিহাসের সারাৎসারে আপনাকে ঋদ্ধ করে তোলেন তিনি। অবশ্য যে অর্থে বুদ্ধদেব বসু সামাজিকতার ফলভাক্, সেই অর্থে আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত সামাজিকতা বিচার্য নয়। বুদ্ধদেবের মধ্যে যে 'সচল-উজ্জ্বল সংস্কৃতিমনস্কতা' ছিল তাই তাঁকে বার বার এক পর্ব থেকে আর এক পর্বান্তরে যাত্রা করিয়েছে; ফলে বুদ্ধদেব বসু শব্দের এক জগৎ থেকে অন্য জগতে প্রস্থানী পথিক। বুদ্ধদেবের সমাজসচেতনতা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিসচেতনতার ফলশ্রুতি মাত্র; আর এই কারণেই বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তিবাদী। এই বিশেষণটি বুদ্ধদেবের নামের আগে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা চলে এবং এতে তাঁর গৌরব বাড়ে। "কেন-না তথাকথিত 'সমাজ-সচেতন' সাহিত্যিকগণ যখন এক নাতিস্পষ্ট জনসমাজের সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁদের একান্ত পার্শ্ববর্তী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে গাঢ় উদাসীনতা পালন করেন, তখন বুদ্ধদেবকে দেখি সমস্ত সাহিত্য তথা সাহিত্যিক সমাজের জন্য চিন্তিত। বস্তুত, বুদ্ধদেব সাহিত্যের যে সামাজিক দায়িত্ব উদ্‌যাপন করেছেন,

কোনো সাহিত্যিকই—কোনো 'সমাজ-সচেতন' বাঙালি সাহিত্যিকই তা করেননি। কিন্তু বুদ্ধদেব সদর্থে ব্যক্তিবাদীই ছিলেন; কেন-না সমস্ত বহির্দুনিয়া ঢুকে পড়েছিল তাঁর মধ্যে।"[২]

আসলে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিবাদিতা তাঁর সমাজসচেতনতারই অঙ্গ, কেন-না কোনো কবিই তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাজবিচ্যুত হতে পারেন না। যদি কোনো কবি সমাজসচেতন না হন তা হলে তিনি শব্দসচেতন হতে পারেন না; কারণ সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দগত চেতনাবোধও পরিবর্তিত হয়। কোনো কবি যতই ব্যক্তিবাদী হোন না কেন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিগত রূপান্তর তাঁর মনে সমান প্রভাব বিস্তার করবেই এবং কবি সেই কল্পান্তের কালরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে নতুন দিনের সাধনায় মুক্তির ললিত-লগ্নকে করধৃত করবার জন্য শব্দের চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে সচেষ্ট হবেন। কোনো কবি যদি পরিবর্তিত যুগচেতনার প্রেক্ষাপটে শব্দের মূল্য নির্ণয়ে তৎপর না হন তা হলে কবিতা হয়ে যাবে শুধু তাঁর কাছে নয়, সমাজ পাঠকের কাছে মূল্যহীন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় ব্যক্তিরূপে এমনভাবে প্রতিভাত হয়েছেন যে, বাংলা কবিতার রাজ্যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র তুলনায় তাঁকে ব্যক্তিবাদী অভিধায় অভিহিত করা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবাদী নন, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। "বুদ্ধদেব নিশ্চিতভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁর অভিজ্ঞতা সংগ্রহের ধরন একান্তভাবে ব্যক্তিক, জগৎ সংসার সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও কবি কল্পনার মধ্যে একটা ফারাক আছে, কোনো সাঁকো নেই, দুইয়ের মধ্যে, সেজন্য বুদ্ধদেবের পারাপার নেই বিষয় বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তিক বিষয়ীর, তাই তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর অভিজ্ঞতায় শুদ্ধি ঘটায় না, তিনি নিজেকে কখনও ছাড়তে পারেন না। তাঁর নিজের প্রতি ভালোবাসা তীব্র, জ্বলন্ত, প্রখর,সেজন্য তাঁর রচনায় বিস্ময়কর নাটকীয়তা ও নৈপুণ্য জ্বলজ্বল করে, কিন্তু তাঁর আত্মপ্রেম, লোভ ও আসক্তি তাঁর শিল্প-জিজ্ঞাসার চৈতন্যের শুদ্ধতা তৈরি করে না, তিনি থেকে যান অতুলনীয় কুশলী হিসেবে, তাঁর শিল্পের নন্দনতত্ত্ব চমকের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, সমগ্র জীবনের বদলে মুহূর্তের সন্ধানে তিনি পশ্চিমি সাহিত্যের বিভিন্ন ঝোঁকে তাল মেলাতে থাকেন, এভাবেই তাঁর কাছে এসে যায় ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রবলতা।"[৩] অর্থাৎ, "কবি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য, শব্দসচেতনার স্বাতন্ত্র্য তাঁকে যে মৌলত্ব দান করেছে সেই মৌলত্বই তাকে ব্যক্তিবাদী—এই অভিধায় অভিহিত করিয়েছে, সম্ভবত এ জাতীয় চিন্তা অবিলম্বে, অপনোদিত হওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধদেব নিজেকে কবিতায় পরিপূর্ণ ও অগুপ্ত প্রয়োগ করছেন বলেই, যখনই তা সত্যিকার কবিতাসম্মত তথা শিল্পসম্মত হয়ে উঠেছে, তখনই তার মধ্যে প্রবেশ করেছে স্থায়ী মানুষ-প্রকৃতি, তাঁর কবিতায় তাঁর বয়স বাড়ার যে ছাপ আছে তার সঙ্গে আমরাও তো একাত্ম: ...ফলত, বুদ্ধদেবের কবিতাও—শেষ পর্যন্ত—এইভাবে আত্মঅতিক্রমী ও সর্বজনভোগ্য হয়ে ওঠে।"[৪]

[দুই]

যৌবন, প্রেম, কবিতা, শিল্প—বুদ্ধদেবের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়। 'মর্মবাণী' থেকে শুরু করে 'স্বাগত-বিদায় ও অন্যান্য কবিতা' অর্থাৎ ১৯২৪-১৯৭১ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের ক্লান্তিবিহীন পদক্ষেপে উল্লিখিত বিষয়ের প্রাধান্য। উল্লিখিত বিষয়গুলিকে যদি একটি সমগ্র বৃত্তে আবদ্ধ করতে চাওয়া হয় তাহলে বুদ্ধদেব যে পরিচয়ে শনাক্ত হয়ে ওঠেন তা হয়ে ওঠে প্রেমের কবি। অর্থাৎ

বুদ্ধদেবের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় প্রেম। "বুদ্ধদেবের মনের ধর্ম প্রেম। তিনি প্রেমের কবি। ...কিন্তু এ প্রেম রোম্যান্টিক প্রেম নয়। প্রেমকে রোম্যান্টিক কবিদের মতো অতীন্দ্রিয়, অমূর্তভাবে তিনি দেখেননি, দেখেছেন মূর্ত, শরীররূপে।" [৫] 'মর্মবাণী' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু কবিতা নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো শব্দ-স্বাতন্ত্র্যের বা শব্দ-সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি সেখানে বাংলা কবিতার শাব্দিক প্রথাবদ্ধতার শিকার। কাব্যগ্রন্থটি বিষয়বস্তু ও পরিবেশনা উভয় দিক থেকেই অনুল্লেখ্য; রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত সচেতন কবি ছিলেন বলে উপলব্ধি করেছিলেন—"গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে!" [৬]

বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০) 'ভাবনা ও প্রকরণের অভিনব রূপান্তরে' এবং 'শব্দচয়নের উদ্ভাবনী প্রতিভায়' অনন্য। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব স্বপ্রকাশিত হলেন—"বন্দীর বন্দনাতেই নিনাদিত হয়ে উঠল তাঁর সেই যন্ত্রণাঃ প্রকৃতি, আর যন্ত্রণাজয়; সংস্কৃতির স্বরূপ"। [৭]

আর এক সমালোচক বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"বন্দীর বন্দনা" কাব্যগ্রন্থে সমস্যা-জর্জর জটিল আধুনিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'বন্দীর বন্দনা' নিঃসন্দেহে কবির মনের বিদ্রোহের কবিতা। যে যুগে, যে সমাজে ব্যক্তির কোনো নিজস্ব মর্যাদা নেই, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই অবলুপ্তির পথে সেখানে ব্যক্তির প্রেমের প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও শিল্প-শক্তিমত্তার অধিকার দাবি প্রকারান্তরে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেরই বিজয়ঘোষণা। যুগের সংকীর্ণতা, সৌন্দর্যহীনতা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কবির সংবেদনশীল আত্মা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

[তিন]

বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থ বিষয়বস্তুতে এবং শিল্প প্রকরণায় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহনকারী। এখানে কবি শব্দকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে আসক্ত করিয়েছেন; শব্দ এখানে অন্বিষ্টও বটে। শব্দ এবং কবিপ্রাণ ভাবনার ইন্ধন জোগায়, প্রথাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হয়ে তীব্রতম জীবন পিপাসার আকুতিকে সঞ্চারিত করে পাঠকের গোপন গহন অন্তর্দেশে। শরীর, কোনো কালেই বাংলা কবিতায় অচ্ছুৎ নয়; গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার সকলের কবিতাতেই শরীর যথেষ্ট মূল্যবান; অচিন্ত্যকুমার, অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কেউই শরীরকে অবহেলা করেননি; কিন্তু বুদ্ধদেবের উপস্থাপনার পদ্ধতি নতুন—মানুষের জীবনের যে নিরন্তর সংঘর্ষ চিরকালের অথচ একটি বিশেষ সময়ের, বুদ্ধদেব তাকেই 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে উদ্দাম চকিত বাক্য বন্ধনের কলরোলে প্রকাশ করলেন। "একদিকে 'সহস্র পঙ্গুতা ভঙ্গুর' 'হৃদয়', আরেকদিকে দেবতার মতো অপরূপ, ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময় কান্তি; একদিকে পঙ্কতিলক, আরেকদিকে পঙ্কজের কোল;—এককথায়ঃ একদিকে প্রকৃতি, আরেকদিকে সংস্কৃতি।" [৮] 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সমালোচকের

এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। উক্ত কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়।

১. 'আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।
সুদুর কুসুম গন্ধে তার যাত্রা বাঁশি বেজে ওঠে,
দৈন্যভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার।

(শাপভ্রষ্ট / বন্দীর বন্দনা)

২. 'সেই পদ্মখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব সম্পুটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ি আমি লিখন তাহার:
'হে তরুণ, দস্যু নহো, পশু নহো, নহো তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি'।

(পূর্বোক্ত)

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বন্দীর বন্দনা' প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মতো যার ভিতর সূর্যের রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।' [৯] অর্থাৎ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুগত ও প্রকরণগত মন্তব্য একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে সমুদ্ভাসিত। শাব্দিক প্রকরণের কলাকৌশলে 'বন্দীর বন্দনা' বিষয়বস্তুকে যেমন সমর্থন করেছে, তেমনি আবার কবির দ্বিধাদ্বন্দ্ব-জর্জর মানসিকতা প্রকাশেও একটি স্থির দৃষ্টান্ত বাংলা কবিতার জগতে দাঁড় করিয়েছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে শব্দের কোনো অপপ্রয়োগ ঘটেনি যদিও আবেগোচ্ছ্বাস অনুপস্থিত নয়; শব্দাতিরেক দুর্লক্ষ্য, যদিও রোমান্টিক কবিমন তীব্রতম আবেগে প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সোচ্চার কণ্ঠ। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে কবি তৎসম শব্দের অধীনতা থেকে নিজেকে যে মুক্ত করতে পারলেন না তার কারণ বোধহয়—প্রেমের ন্যায় মহত্তম বিষয় আলোচ্য কাব্যের প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এখানে যৌবন তার আনুষঙ্গিকে বাসনা-কামনা নিয়ে মুক্তির প্রার্থনা জানিয়েছে; কবি বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন 'সবিতার দীপ্তিসম' তাঁর কবিতা যেন অক্ষয় হয়। ফলশ্রুতিস্বরূপ 'কবিতাগুলিতে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় উপমায় ঐশ্বর্যশালী।' [১০] স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন—'বন্দীর বন্দনা is certainly remarkable'। [১১] 'বন্দীর বন্দনা' স্মরণীয় হয়ে আছে শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, শব্দানুষঙ্গে, উপমার ব্যবহারে, তৎসম বিশেষণের সাবলীল প্রয়োগে, সর্বোপরি শব্দের ধাতব প্রয়োগে এবং বিভিন্ন রংবাচক শব্দের সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ ব্যবহারে।

[চার]

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে মোট ২৮টি কবিতা আছে। আলোচ্য ২৮টি কবিতায় 'মতো' এবং 'সম' ব্যতীত অন্য কোনো উপমাবাচক শব্দ কবি প্রয়োগ করেননি। অর্থাৎ কবি তাঁর কাব্যের

বিষয়বস্তু সম্পর্কে এতই নিঃসংশয় ও প্রত্যয়নিষ্ঠ ছিলেন যে তাঁর পরিবেশনা সম্পর্কে কবির মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। ফলে তিনি উপমাবাচক শব্দ প্রয়োগ না করে প্রত্যক্ষভাবে বক্তব্য পস্থাাপিত করেছেন। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় উপমাবাচক 'মতো' কটি তালিকা উপস্থিত করলে কবির মানসিকতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়—

কবিতা	উপমাবাচক শব্দ	কতবার ব্যবহৃত
১. শাপভ্রষ্ট	মতো	৫
২. ক্ষণিকা	×	×
৩. কালস্রোত	×	×
৪. নীল পূর্ণিমা	মতো	১
	সম	২
৫. বন্দীর বন্দনা	×	×
৬. মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান	×	×
৭. অমিতার প্রেম	মতো	১
	সম	৩
৮. অপর্ণার শত্রু	মতো	৪
	সম	১
৯. হে বিধাতা আর কিছু নহে	×	×
১০. মোহমুক্ত	মতো	৫
	সম	১
১১. মানুষ (এই অংশে চারটি কবিতা আছে)	×	×
১২. কোনো বন্ধুর প্রতি	মতো	২
	সম	১
১৩. প্রেমিক	মতো	৭
১৪. বিজয়িনী ও পরাজিতা (২টি কবিতা)	×	×
১৫. কোনো অভিনেত্রীর প্রতি (২টি কবিতা)	×	×
১৬. আর কিছু নাহি সাধ	×	×
১৭. প্রেম ও প্রাণ ৬টি কবিতা	মতো	৩
১৮. মোরা তার গান রচি	×	×

উক্ত তালিকা প্রমাণ করে যে, মোট ২৮টি কবিতায় ৩৫ বার উপমাবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। উপমাবাচক 'মতো' এবং 'সম' প্রয়োগের ফলে 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে উপমা অলংকারের প্রয়োগ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণভাবে প্রেমের কাব্যে রংবাচক শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য লক্ষ করা যায়। প্রেমের আরক্ত সংরাগ প্রকাশক্ষম রংবাচক শব্দের উপস্থিতি কাব্যের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হতে দেখা যায়। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গো আমরা লক্ষ করি যে, বুদ্ধদেবের আলোচ্য কাব্যে রংবাচক শব্দ প্রায় অনুপস্থিত। রংবাচক শব্দের ব্যবহারে বুদ্ধদেব সম্ভবত জীবনানন্দের মতো নিগূঢ় রোম্যান্টিক সংসক্তি অর্জন করতে পারেননি। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে রংবাচক শব্দের ব্যবহারে কবির অবিস্মরণীয় অনীহা সত্যই বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক।

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে রংবাচক শব্দের ব্যবহার:

১.	রক্তিম, রক্তিমা, আরক্তিম—শাপভ্রষ্ট	৩ বার
২.	রক্ত—কালস্রোত	১ বার
৩.	রক্ত—নীলপূর্ণিমা	১ বার
৪.	সুনীল—নীলপূর্ণিমা	৬ বার
৫.	নীল—নীলপূর্ণিমা	১ বার
৬.	রক্ত—মানুষ	১ বার
৭.	রক্তিম—মানুষ	১ বার
৮.	রক্তিম—কোনো বন্ধুর প্রতি	১ বার
৯.	রক্ত—প্রেমিক	১ বার
১০.	শাদা—প্রেমিক	১ বার
১১.	লাল—প্রেমিক	১ বার
১২.	ধূসর—প্রেমিক	২ বার
১৩.	লালচে—প্রেমিক	১ বার
১৪.	বাদামি—প্রেমিক	১ বার
১৫.	লালচে-বাদামি—প্রেমিক	১ বার
১৬.	রক্ত—প্রেম ও প্রাণ (৩)	১ বার
১৭.	রক্ত—প্রেম ও প্রাণ (৪)	১ বার
১৮.	রক্ত—প্রেম ও প্রাণ (৬)	১ বার
১৯.	রক্ত—বন্দীর বন্দনা	২ বার
২০.	আরক্ত—বন্দীর বন্দনা	১ বার

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বুদ্ধদেব বসু গুরুত্ব আরোপ করেছে কামনাবাচক শব্দের উপর। প্রয়োগিক ক্ষেত্রে সমস্ত রংবাচক শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত এবং কবির মানসিক সংরাগের

তীব্রতা এখানে প্রকাশিত। 'লালচে', 'বাদামি' এবং 'লালচে-বাদামি' রং বাচক শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে প্রেমিকার দেহকে বাসনা-কামনা সংসক্ত করেছে।

যেমন—'তোমার বাদামি চোখ' / 'তোমার লালচে চুল' / 'সেই চুলে—লালচে বাদামি' [প্রেমিক]। প্রেমিকার চুলের বর্ণনায় বুদ্ধদেব বসু প্রথাবদ্ধতার অবসান ঘটালেন। ভারতীয় / বাঙালি নারীদের কৃষ্ণকেশর বর্ণনার পরিবর্তে 'বাদামি', 'লালচে', 'লালচে-বাদামি' চুলের বর্ণনা পাঠকের মনে বিদেশিনী প্রেমিকার অনুষঙ্গাবোধ জাগিয়ে তোলে। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে ঋতুবাচক শব্দের ব্যবহারও অত্যন্ত বিরল। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে 'শ্রাবণ' ব্যতীত কোনো মাসবাচক শব্দের ব্যবহার নেই। 'শ্রাবণ' এই মাসবাচক শব্দটি 'নীলপূর্ণিমা' কবিতায় একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। 'বসন্ত' ঋতুবাচক শব্দটি সাতবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

বসন্ত—ক্ষণিকা—১ বার / অপর্ণার শত্রু—২ বার / বিজয়িনী ও পরাজিতা—৩ বার / কোনো বন্ধুর প্রতি—১ বার।

শীত—অপর্ণার শত্রু—১ বার।

হেমন্ত—কোন বন্ধুর প্রতি—১বার।

বুদ্ধদেব বসু অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারে প্রায় সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথের অনুকারী। তাঁর 'কালস্রোত', কবিতার 'উচ্ছলিয়া, উল্লাসিয়া', 'ঝর্ঝরিয়া', রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা', কবিতার হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া...ছত্রের কথা যেন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের বিরুদ্ধে দুরূহতার অভিযোগ আনা যায় না, যদিও তিনি তৎসম শব্দ ব্যবহারের অনুপন্থী। তবে এই কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো ছত্রে দেশজ ভাষার এমন রূপ উদ্ভাসিত ও উদ্‌বর্তিত যা পরবর্তীকালে 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থে সংলক্ষ্য। বিশেষণ প্রয়োগে বুদ্ধদেব তৎসম / সংস্কৃত শব্দের অনুরাগী হলেও বাসনা-কামনা সংসক্ত আরক্তরাগরঞ্জিত প্রেমপূর্ণ যৌবন বিলাসিতার যে উপাসক—এ কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে প্রযুক্ত বিশেষণের তালিকা স্বতঃই পাঠককে এ ভাবনায় অনুভাবিত করে যে, বুদ্ধদেব কি তৎসম শব্দে কবি-মুক্তির আশ্রয়প্রার্থী না পরিণতিতে উপনীত হওয়ার পূর্বশর্তরূপে ভারতীয় শব্দভাণ্ডারের ঐতিহ্যকে স্মরণ ও ব্যবহার করে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে বিশুদ্ধ দেশজ অথবা মিশ্ররীতির প্রয়োগে তৎপর হবেন।

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত বিশেষণ

আরক্তিম কামনা, তরঙ্গামথিত ফেনা, গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি, অসহ্য লজ্জা, উদার নীলিমা, শীতল প্রণয়, নিরুদ্ধ বেদনা, নিঃসম্বল নীলাম্বর, স্বর্ণরেখাদীপ্ত ঊষাকাশ, গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিন, (শাপভ্রষ্ট) /; রৌদ্ররাগদীপ্ত পরিপূর্ণদেহ, ব্যথাগার নীলিমার স্নিগ্ধঘন মাস, অনাগত বেদনা, অনাদ্যন্ত তিমির (কালস্রোত) /; অন্তরঙ্গ আলাপন, নীলপ্রভা বিচ্ছুরিত রজনী (নীলপূর্ণিমা) /; অবিচ্ছেদ্য কারাগার, উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার / সুন্দরের মন্দির, ক্ষুধিত যৌবন, উপবাসী শৃঙ্গারকামনা, ক্লেদলিপ্ত লোভ, কুৎসিত দংশন, জ্যোতির্হীন বন্দীশালা, লাঞ্ছিত বাসনা,শাশ্বত সংগ্রাম, উদ্দীপ্ত উল্লাস

(বন্দীর বন্দনা) /; বলিষ্ঠ বিলাস, জঘন্য নক্কার, বীভৎস ইন্দ্রিয় মিলন, উজ্জ্বল আশ্বাস, জ্বলন্ত মহিমা, প্রবল প্রণয় (মানুষ) /; অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল, সদ্যোজাত অধর, ক্লেশকর তপশ্চর্যা, ফুরফুরে প্রজাপতিপনা (প্রেমিক) /; সুতীক্ষ্ণশায়ক, দুরন্ত পবনস্বনে (বিজয়িনী ও পরাজিতা) /; জ্যোৎস্নাধৌত বাতায়ন (আর কিছু নাহি সাধ) /; নিঃশব্দ নিঃশ্বাসপাত, উৎসুক শ্রবণপথ, ধ্যানলব্ধ অমৃত-বারতা, ফেনময় উন্মাদনা (প্রেম ও প্রাণ) /; পুঞ্জীভূত কুৎসিত জঞ্জাল, নৃত্যক্ষিপ্ত রিক্ত মহাকাল (মোরা তার গান রচি) /; তৃপ্তিহীন বিজয়তৃষ্ণা, কটাক্ষ ঈক্ষণ, মন্দাকিনী বারিস্নাত মন্দারের মালা, দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল, অসার অভিনয় (মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান) /; ধীরে-ধীরে ঝরে পড়া মধুভরা কথা, হীনজন্মা পঙ্ককীট (অমিতার প্রেম) /; আশ্লেষ আবেশ তৃষ্ণা চিরন্তন অশ্লীলতা (মোহমুক্ত)!

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিপ্রাণতার অনিঃশেষ সৌন্দর্যসাধনার অবিস্মরণীয় পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বুদ্ধদেব প্রাক্-বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত মানবদেহ, মূলত নারী দেহের বর্ণনার যে ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য ছিল বুদ্ধদেব বসু সেই উপাদানগুলিকে কাব্যে নবরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

নারীদেহ উপাদানগুলি কোথাও ইন্দ্রিয়-কামনা উদ্দীপক, কোথাও বা শুধুই সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত। কবি সমালোচ্য কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় দেহ-উপাদানবাচক এসব শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন; অধর, আঁখি, অলক, অঙ্গুলি, ওষ্ঠ, ওষ্ঠাধর, নয়ন, বদন, চক্ষু, কটাক্ষ, চুম্বন, হস্ত, কর, মুখ, বক্ষ, ভাল, কর, পদতল, ভুরুলতা, ঠোঁট, বাহুলতা, বুক, কপোল, ললাট, চিবুক, বাহু, হাত, বাহুডোর, মুখ, চরণ, স্তন, তনু, দেহ, নাসা, কটি, কটিতট, জঘন, উরু, বিম্বাধর, জানু, চুল, নয়ন, বুক, করভোরু, ললাট ইত্যাদি। প্রাচীন সাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্যে কবিরা রূপবর্ণনার জন্য মানুষের বিশেষত নারীর বিভিন্ন অঙ্গকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছেন। অঙ্গ বর্ণনা, কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, কবির রূপানুরাগের পরিচয় বহন করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কবি সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য দেহরূপের বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মনে হয় বুদ্ধদেব বসু 'অলংকারলুব্ধ কবি'।

বিদ্যাপতির রূপমুগ্ধতার আলোচনায় সমালোচক বিদ্যাপতির অলংকারকে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো অচ্ছেদ্য বলেছেন।[১২] 'কিম্বা যখন তাহা প্রসাধনও, তখন তাহা সেই ধরনের প্রসাধন, যাহা থাকিয়া রমণীকে রমণী করিয়া তোলে, অর্থাৎ অস্তিত্বের অংশ'।[১৩] বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা চলে যে বুদ্ধদেবের অলংকারগুলি তাঁর কবিতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ এবং 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রমাণ করবে কীভাবে রূপমুগ্ধ বুদ্ধদেব দেহ-বর্ণনায় রূপের সীমাতেই আবদ্ধ থাকেননি; এখানে তিনি দেহবর্ণনাকে অনেকখানি দেহোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। সমালোচ্য কাব্যগ্রন্থের অঙ্গবর্ণনামূলক উদ্ধৃতিগুলি বুদ্ধদেবের উল্লিখিত মানসিকতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

১. অশ্রুহীন **নয়নের** উদ্দীপ্ত বেদন (ক্ষণিকা)।

২. বাক্যহারা **কটাক্ষের** চকিত ইঙ্গিত (কালস্রোত)।

৩. বহ্নির **চুম্বন** রাগে রঞ্জিত হয়েছে মহাকাশ। (ঐ)।
৪. **ওষ্ঠ**তটে হাসি (নীলপূর্ণিমা)।
৬. উদ্বেল বাসনা মোর প্রসারিলো **কর** (নীলপূর্ণিমা)।
৭. হাস্য মুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার স্রোতে (বন্দীর বন্দনা)।
৮. বাসনার **বক্ষো**মাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন (ঐ)।
৯. শুধু একবার মোর **কটাক্ষ**-ঈক্ষণে (মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান)।
১০. কেউ ভালোবাসিয়াছে ভীরু দুটি **ভুরুলতা** তব (অমিতার প্রেম)।
১১. তব দুটি **ঠোঁট** হতে ধীরে ধীরে ঝরে পড়া মধুভরা কথা (অমিতার প্রেম)।
১২. সুখহীন শয্যা'পরে **ওষ্ঠাধর** চেপে ধরি (অমিতার প্রেম)।
১৩. দুটি স্নিগ্ধ **বাহুলতা** প্রসাহিত করি মোর প্রাণ (অপর্ণার শত্রু)।
১৪. ম্লান **মুখে** করিনি মিনতি (হে বিধাতা আর কিছু নহে)।
১৫. **স্তনাগ্র** চূড়ার স্পর্শ কনিষ্ঠার ক্ষীণ প্রান্তভাগে (মোহমুক্ত)।
১৬. কৃত্রিম রক্তিম **ওষ্ঠে** লালসার বলিষ্ঠ বিলাস (মানুষ)।
১৭. **বিম্বাধর কৃশ** কটি, করভোরু প্রশস্ত **জঘন** (কোনো বন্ধুর প্রতি)।
১৮. তোমার যে **স্তন** রেখা বঙ্কিম, মসৃণ, ক্ষীণ, সতত স্পন্দিত (প্রেমিক)।
১৯. **চরণের** অলক্তকে ফোটে মোর মৃত্যু শতদল (বিজয়িনী ও পরাজিতা)।
২০. পেলবাঙ্গা, তনুমধ্যা; **চক্ষে** তার অপরূপ প্রীতি, **ওষ্ঠে** তার পুষ্প মধু
(কোনো অভিনেত্রীর প্রতি)।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণে নয়নের মূল দুটি কাজ—'কটাক্ষ করা' 'অশ্রুবিসর্জন করা' কবি অত্যন্ত চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। প্রথমটিতে আছে দৃষ্টির বর্ণনাগত বহ্নি বেদনার ব্যাকুলতা আর দ্বিতীয়টিতে আছে কামনার ইঙ্গিত।

দ্বাদশ উদাহরণে তীব্র কামনার আরক্ত সংরাগ—এখানে যেন কাব্য রূপবন্ধে অলংকারের তৃষ্ণাধর্মিতা প্রকাশিত। ঊনবিংশ উদাহরণে অলক্ত রঞ্জিত চরণকে কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; কবি যেন প্রেমিকার অলক্ত রঞ্জিত পদতলে মৃত্যুর শতদল প্রস্ফুটিত হতে দেখেছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধুই বর্ণনা (যেমন ২০)—এ যেন স্বভাবোক্তি অলংকার। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ উদাহরণে কবি দেহরূপে আবদ্ধ থেকেও সৌন্দর্যের এক ভাবরূপকে পাঠকমনে সঞ্চারিত করেন। প্রেমের কবিতায় নারীর চিত্র এক অপরূপ অলংকারময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং বাংলা কবিতার রাজ্যে কবির বর্ণনা শুনে নায়িকা / প্রেমিকা যেন শরীরী হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেব বসু শব্দসচেতন ছিলেন বলে তাঁর কাছে পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিমার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন সংস্করণে তিনি বিপুলভাবে শব্দ পরিবর্তনে অকপট প্রয়াসী ছিলেন। কবির এই পরিমার্জনা প্রসঙ্গে জানা যায়—

১. "বন্দীর বন্দনার ৪র্থ সংস্করণ অর্থাৎ ১৯৬২ সাল থেকে—'তারে তোমারে আমারে নিজেরে আপনারে' ইত্যাদি কাব্যিক শব্দ 'তাঁকে তোমাকে আমাকে' এই কথ্য বাংলায় রূপ নিয়েছে। কবিতায় সুরের সঙ্গে মিলিয়ে পূর্বে ব্যবহৃত—'দেবো করেছে দিবে ফিরে চলে জানি না' ইত্যাদি। তা ছাড়া 'আজ', হয়েছে 'আজি', 'সেথায়' হয়েছে 'সেখানে'।

২. ধ্বনি এবং সামঞ্জস্যের কথা ভেবে কিছু কিছু বিশেষণেরও বদল ঘটেছে; 'অস্বচ্ছ, অনির্বাণ স্বার্থপর, কৃপণ, চরণ, নগ্ন, খিন্ন, ক্লান্ত, মহান, মোহান্ধ প্রভৃতি শব্দ বদলিয়ে যথাক্রমে করা হয়েছে 'অনচ্ছ অতুলন, ক্লেদলিপ্ত, কর্কশ, পরম, সূক্ষ্ম, দীন, ঘন, বিরাট এবং কামার্ত।'

৩. পরিবর্তন সর্বত্র সমার্থবাচক শব্দ দিয়ে করা হয়নি বলেই স্পষ্টতই সচেতনভাবে অর্থের ব্যাপ্তি সৌষ্ঠব এবং উৎকর্ষ ঘটানো হয়েছে। 'নয়নের' হয়েছে 'স্মরণের' সহসা / ঈষৎ, পদাঘাতে / হাস্যমুখে, পদতলে / পদতটে, মদ্যগন্ধ / পদ্মগন্ধ এবং নেত্রকণ্ডুয়ণ / গাত্রকণ্ডুয়ণ। অর্থের ব্যতিক্রম না ঘটিয়েও পরিমার্জনায় দু-একটি বৈশিষ্ট্যসূচক তৎসম শব্দের প্রয়োগ হয়েছে: 'বিক্লান্তির' পরিবর্তে 'বিক্লম' 'ভেঙে গেছে-র পরিবর্তে 'অন্তর্হিত'।

৪. পরিমার্জনাকালে কোথাও কাব্যিক ব্যুৎক্রমের পরিশোধন ঘটেছে: 'ভবনে তোমার' করেছেন 'তোমার ভবনে'; কোথাও আবার নতুন ব্যুৎক্রমের প্রয়োগ হয়েছে: 'তব চক্ষে / চক্ষে তব।' তৎসম শব্দের আরও কিছু পরিবর্তন—'মৃদুভাষে' হয়েছে 'মৃদুস্বরে'; 'ধরণী ভবনে' / ধরণী অঙ্গনে, 'সুরভি বিভোর / সৌরভে বিভোর ইত্যাদি। ...অর্থাৎ তৎকাল সম্ভব কবিতার ধ্বনি এবং রূপ অবিকল রেখেও সম্ভাব্য-উৎকর্ষ সাধনে অবিরাম রত ছিলেন কবি।"[৫]

সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু পল ভ্যালেরির মতো কবিতার শব্দ পরিমার্জনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কবিতা কবির কাছে নিরন্তর পরিমার্জনা ও উৎকর্ষ বিধান প্রত্যাশা করে। মনে হয়, এটাই ছিল 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের কবি বুদ্ধদেবের বিশ্বাস।

বুদ্ধদেব বসু নাগরিক কবি, যৌবনের কবি, প্রেমের কবি, ফলে শব্দ তাঁর কাছে নানা পরিচয়বাহী। তিনি শব্দকে রূপান্তরিত করেন, আয়াসসাধ্য শব্দের বা আভিধানিক শব্দের প্রয়োগে তিনি সিদ্ধকাম নন। তিনি তৎসম শব্দ ব্যবহার করলেও অচলিত বা আভিধানিক তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেননি। তবে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভা বোধহয় সহজ সত্যে প্রমূর্ত হতে চায়। তিনি যখন লেখেন—'বিদ্যুময় বিরহ গৌরব' তখন বিরহের আর্তি মনোভূমিকে আর্ত-বিচলিত করে না; কিন্তু যখন লেখেন 'মসৃণ, চিক্কণ ত্বক্, ওষ্ঠাধর প্রবল উত্তাপ, পদতটে পদ্ম গন্ধ, বাহুডোরে মদির প্রলাপ'—তখন শারীরময়তার তীব্র শিহরণ সমগ্র চেতনার তটভূমিতে আছড়ে পড়ে যেন এক অনতিতীব্র প্রেমের রাগিণীতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

জানার এবং বোধের যে আধুনিকতা, বুদ্ধদেব তাকে কাব্যে সঞ্চারিত করেন বলেই তাঁর কাছে শব্দ শুধু শব্দ থাকে না; প্রেমের তাৎপর্যময়তায় বিধৃত হয়। পরিশ্রমী কবিরূপে তিনি শব্দকে শনাক্ত করেছেন, শব্দের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, স্পষ্ট করে তুলেছেন বাংলা কবিতার সম্ভাবনার বলয়কে। বুদ্ধদেব বসুর শব্দচেতনা সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য অত্যন্ত যথার্থ বলে মনে হয়: "শব্দের চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধহয় শব্দও একরকমের

অভিজ্ঞতা। এ কথা বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে কয়েকবার আমার মনে হয়েছে। নইলে ঘর ছেড়ে যিনি নড়েন না, বাইরের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক প্রধানত লেখা আর মুখে শব্দে—কী করে তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন? আসলে মানুষ শুধু লেখা বদলায় না, লেখাও মানুষকে বদলায়—বাইরের তাড়নায় যতটা না, তাঁর চেয়ে অন্তঃপ্রেরণাটাই হয় সে পরিবর্তনের আসল চাবিকাঠি। যত দিন গেছে ততই বুদ্ধদেব যে মাটির টান বেশি-বেশি করে অনুভব করছেন, তার কারণ বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর নাড়ীর বন্ধন।

শব্দের ভেতর দিয়ে এই যোগ। দেশজ ভাবনায় এ যেন তাঁর দূর দেশান্তর থেকে ক্রমশ ঘরে ফেরা"।[১৫] বুদ্ধদেব শব্দের লোকাচারের ঐতিহ্য, মুখের বুলি ও লোকজ বুলির টানের পাশাপাশি খুঁজে ফিরেছেন বাক্যের সংহতি, গাঢ়তা ও ঘনত্ব। তাই 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থে কবি দেশজ ভাষা প্রয়োগ শুরু করলেন এবং কথ্য ভাষা থেকে সৌন্দর্য নিষ্কাষণ করলেন, "বুদ্ধদেব ভাষা, শব্দ ক্ষেত্রে নির্লোভ হতে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত, ভাষা জিজ্ঞাসায় উপলব্ধি করেছেন ভাষার চিত্তশুদ্ধিতা দরকার, তাই আবেগ, উচ্ছ্বাস ছেড়ে শব্দকে ঘন, গভীর শাণিত করে তুলেছেন; কিন্তু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তিনি নির্লোভ হতে পারেননি, সেজন্য বিষয়বিশ্বের কাছে ব্যক্তিবিষয়ীর আত্মবিসর্জন তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে না, তাঁর অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশ শেষ পর্যন্ত থেকে যায় একান্ত বাহ্যিক, তাঁর জ্ঞান ও কল্পনার মধ্যে, তাঁর আবেগ ও শিল্পজিজ্ঞাসার মধ্যে থেকে যায় বারবার এক পাঁচিল ! উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা বুদ্ধদেব নেই! আশ্চর্য প্রাণশক্তি ও অসাধারণ রূপ দক্ষতা তাঁর প্রতিভাকে চিহ্নিত করে, তিনি খুঁজে ফিরেছেন মৌল ভিন্নতা: জড় ও চৈতন্যের, নরনারী সম্বন্ধের ওই মৌল ভিন্নতাকে তিনি কল্পনার আবেগে তীব্র বোধশক্তিতে, প্রখর উপলব্ধিতে তাঁর সাহিত্যকর্মে মেলে ধরেছেন, বুদ্ধদেবের জীবনে এভাবেই সাহিত্য আশ্রয় পেয়েছে।"[১৬]

১। বুদ্ধদেব বসু: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকার। [বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪]

২। বুদ্ধদেব বসু: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (পূর্বোক্ত)।

৩। বুদ্ধদেব বসু: দশ দিগন্তের স্রষ্টা। আবদুল মান্নান সৈয়দ। ১৯৮০।

৪। পূর্বোক্ত: আবদুল মান্নান সৈয়দ। ১৯৮০।

৫। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়: দীপ্তি ত্রিপাঠী, ১৯৭৭

৬। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক: প্রবন্ধ সংকলন: বুদ্ধদেব বসু, ১৯৬৬

৭। পূর্বোক্ত—আবদুল মান্নান সৈয়দ।

৮। পূর্বোক্ত—আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৮০।

৯। 'পরিচয়', কার্তিক, ১৩৪০

১০। রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীর বন্দনা' বিষয়ক আলোচনা; কবিতা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)—বুদ্ধদেব বসু / (গ্রন্থপরিচয় অংশ দ্র:) সম্পাদক: নরেশ গুহ।

১১। কবিতা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) বুদ্ধদেব বসু / গ্রন্থপরিচয় অংশ দ্র:)। সম্পাদক: নরেশ গুহ।

১২। দ্র: চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি/শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

১৩। পূর্বোক্ত / শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

১৪। কবিতা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) বুদ্ধদেব বসু / সম্পাদক: নরেশ গুহ। (গ্রন্থপরিচয় পৃ: ৩৯৪—৩৯৫), ১৯৮০

১৫। শাপভ্রষ্ট দেবশিশু: সুভাষ মুখোপাধ্যায় (কলকাতা / বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা)। ১৯৬৮-৬৯

১৬। বুদ্ধদেব বসু: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (পূর্বোক্ত)

বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী ও লোকনায়িকা কঙ্কাবতী

['কঙ্কাবতী' কবি বুদ্ধদেব বসুর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৩৭। কবিতার সংখ্যা ২৫। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৪৩। দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতার সংখ্যা বেড়ে ৩৮। তৃতীয় এবং পরিবর্ধিত নাভানা সংস্করণ এপ্রিল ১৯৫৭। কবিতার সংখ্যা ৪৩। অথচ দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ডে [সম্পাদক: নরেশ গুহ। প্রকাশক: দে'জ পাবলিশিং] মোট কবিতার সংখ্যা ৩১। উক্ত খণ্ডে 'কঙ্কাবতী' থেকে অংশে ৪টি কবিতা আছে। আবার বুদ্ধদেব বসুর 'রচনাসংগ্রহ' অষ্টম খণ্ডে [প্রকাশক: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা] ৩৮টি কবিতা আছে। অর্থাৎ এখানে দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসৃত হয়েছে। তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থ পরিচয় অংশে সম্পাদক নিরঞ্জন চক্রবর্তী এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। আমার আলোচনা 'কবিতা সংগ্রহ'কে অবলম্বন করেই হবে।]

দুই

বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং 'বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী'-কে তাঁর কবিতার দুটো মহল বলেছেন। সম্ভবত প্রেমের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তিত হওয়ার জন্যই কবির এ জাতীয় মন্তব্য। বাংলার প্রাচীন লোকনায়িকা কঙ্কাবতীর প্রতি অন্তরঙ্গ আকর্ষণ এ কাব্যের মূল বিষয় আর তা স্বাভাবিকভাবেই প্রেমকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত প্রেম অভিজ্ঞতাকে চিরায়ত করার জন্যই তিনি লোকপুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' কাব্য লোকপুরাণের আধারে ব্যক্তিপ্রেমের কবিতা। সাধারণভাবে সুদূরের প্রতি আকর্ষণ, অপ্রাপনীয়দের জন্য আকাঙ্ক্ষা, সুদূরাভিসার ইত্যাদি রোমান্টিক কবিদের বৈশিষ্ট্য। কঙ্কাবতীও কবির বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে কবির মনে দূর অতীতের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। অনেক সময় চিরায়ত লোকপুরাণের সঙ্গে ব্যক্তিগত রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাকে অন্বিত করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। পুরাকাহিনি কেন কবিকে প্রাণিত করবে সে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: "পুরাণ কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে—শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে—বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।" [মহাভারতের কথা]

'বন্দীর বন্দনা' কবিতার 'প্রেমিক' কবিতায় প্রথম 'কঙ্কাবতী'-র ব্যবহার:

১. ওগো কঙ্কাবতী!
কয়েক তাকাই যদি তব মুখপানে।

২. তুমি নারী, কঙ্কাবতী, প্রেম কোথা পাবে?

৩. ওগো কঙ্কাবতী—
মধুর! মধুর!

৪. ওগো কঙ্কাবতী—
মহান মহান!

৫. আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব, ওগো কঙ্কাবতী!
আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
ওগো কঙ্কাবতী!
ওগো কঙ্কাবতী!

মনে হয়, কাব্যের সূচনাপর্ব থেকেই কঙ্কাবতী লোকনায়িকা কবির অবচেতনায় বিরাজিত ছিল। 'কঙ্কাবতী' কাব্যে কঙ্কাবতীর উল্লেখ আছে:

১. কঙ্কাবতীর জানালার 'পরে রজনী বাড়ে; 'আরশি' কবিতার বহু পঙ্‌ক্তিতে কঙ্কাবতীর উল্লেখ আছে।

২. 'সেরেনাদ' কবিতাটি কঙ্কাবতীকে কেন্দ্র করেই রচিত।

৩. নাম কবিতা 'কঙ্কাবতী' সমগ্রত কঙ্কাবতী কেন্দ্রিক।

৪. 'রূপকথা' কবিতায় কঙ্কাবতীর উল্লেখ বেশি না হলেও কবি তাকেই নিয়ত স্বপ্ন দেখেন।

[৩০টি কবিতার মধ্যে মাত্র ৫টি কবিতায় কঙ্কাবতীর উল্লেখ আছে।]

'কঙ্কাবতী' প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের উচ্ছ্বাস-আবেগ-সংবেদনা সঞ্জাত রোমান্টিক প্রেমের কাব্য। বাংলার লোকসাহিত্য থেকে 'কঙ্কাবতী' কাব্যের নাম-শব্দ এসেছে। বাংলার এই প্রাচীন লোকনায়িকা এবং তার মেঘবরণ কালো কেশ সম্পর্কে কবির মনে যে অবচেতন আকর্ষণ ছিল তাই এখানে পরিব্যক্ত। অবশ্য সেই লোকনায়িকা পাশ্চাত্য সাহিত্যের নারীর রূপসৌন্দর্যের আকর্ষণে আরও আধুনিক হয়ে উঠেছে। কঙ্কাবতীর প্রেমের সমস্ত রহস্যজাল আজ কবির কাছে উন্মোচিত।

কাল, কখনো, কোনো মেয়ের প্রতি, অন্য কোনো মেয়ের প্রতি, চুল ইত্যাদি কোনো কবিতাতেই কঙ্কাবতীর স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, মনে হয়, কবি যেন কারও প্রতীক্ষায় উন্মুখ। শেষ পর্যন্ত 'আরশি' কঙ্কাবতীর কথা—আর সে কথা কখন, যখন 'কঙ্কাবতীর জানালার পরে রজনী বাড়ে'। আকাশ পারে একাদশীর চাঁদ যখন একা ঘুমায় তখন কবি কঙ্কাবতীর অনুপম রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করেন: কঙ্কাবতী সে চুল এলো করে দিয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় মূলত কঙ্কাবতীর চুলেরই বর্ণনা:

১. রেশমি নরম লাল সে চুল।
২. হালকা, হলুদ লালচে চুল।
৩. শুকনো সোনালি লাল সে চুল।
৪. হালকা, সোনালি লাল সে চুল।
৫. ঝিকিমিকি সোনা লাল সে চুল।
৬. শুকনো নরম লাল সে চুল।
৭. লাল ঊষা! আলতায় সোনা! লাল সে চুল।
কঙ্কাবতীর চুল কিন্তু এলো চুল।

তার চোখের তারার ঘুম নেই, চোখে চুমো নেই, 'চুমো নেই তার দুইটি ঠোঁটে।' তার ঠোঁট দুটি আপেল পাকা।

বুদ্ধদেবের কবিতায় এই যে চুলের বর্ণনা, ঠোঁটের বর্ণনা এবং শব্দের যে সমারোহে কঙ্কাবতীর রূপ বর্ণনা তা কিন্তু বাংলাদেশের লোকনায়িকার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র বর্ণনা নয়। চুলের বর্ণনা থেকে মনে হয়, এ নায়িকার রূপসৌন্দর্য বিদেশাগত। লোকসাহিত্য অনুযায়ী কঙ্কাবতীর চুল হল মেঘবরণ আজানুলম্বিত ও তৈলসিক্ত; অথচ বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনায় তা সম্পূর্ণ বিপরীত। বুদ্ধদেব বসু বাংলাদেশের লোকপুরাণের নায়িকা কঙ্কাবতীর সঙ্গে প্রতীচ্য নায়িকার রূপবর্ণনার অনুষঙ্গ এনেছেন। 'কঙ্কাবতী' কাব্য থেকে যে বর্জিতাংশ সেখানে 'বন্যা' নামক কবিতায় এর ইঙ্গিত আছে:

ওগো মোর কঙ্কাবতী, এলে তুমি বন্যাস্রোতে ভেসে,
অকল্পিত কলোচ্ছ্বাসে এলে তীব্র আবর্ত প্রবাহে;
স্তিমিত, বিশীর্ণ, শুষ্ক আমার প্রাণের উপকূলে
উচ্ছ্বসি পড়িলে ভেঙে উপপ্লবী বাণীর শ্রাবণে,

******

যেখানে তোমার স্রোত অন্তিম সমুদ্রে এসে মেশে
সুদূর দিগন্ত পরে, যে সঙ্গম থেকে নিয়ে এলে
আশ্চর্য সিন্ধুর ফুল, বহুবর্ণী বিচিত্র উদ্ভিদ,
আনিলে সমুদ্র স্বাদ, ধারালো লবণ-গন্ধ তার।
দিগন্তের অন্তরালে অজ্ঞাত, অদৃশ্য যে অসীম
ওগো মোর কঙ্কাবতী, তার স্পর্শ নিয়ে তুমি এলে।

তিন

'কঙ্কাবতী' কাব্য রচনার পটভূমিকা সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর মতে,' "এম. এ.-তে আমি বিশেষপত্র নিয়েছিলাম ভিক্টরীয় কবিতা—প্রথম শুধু কবিতা বলে, আর যেহেতু, ইংরেজের এই দূর উপনিবেশে, ভিক্টোরিয়ানরাই তখনও প্রায় সর্বাধুনিক, জর্জিয়ানরা সবে এসে পৌঁচেছেন। আমাদের পাঠক্রমে প্রধান কবি অ্যালফ্রেড টেনিসন—তাঁর মরুপ্রতিম নাটকগুলিও ডিঙোতে হয়েছিল আমাকে—কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন ব্রাউনিং তাঁর এবড়োখেবড়ো ছন্দ আর ইতালির গালগল্প নিয়ে, একটি উন্মাদনা ছিলেন সুইনবার্ন; একটি প্রণয় প্রির‍্যাফেলাইট গোষ্ঠী এবং চিত্রকলায় আমার প্রথম প্রবেশের সরু রাস্তাটিও তাঁরাই। আমার এই তখনকার প্রিয় কবিদের কাছে আমি যা কিছু শিখেছিলাম, আমার 'কঙ্কাবতী' বইটাতে তার নিদর্শন আছে।" [বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড।] প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর কবিদের স্বপ্নমধুর রোম্যান্টিক পরিবেশ বুদ্ধদেব বসুর অবলম্বন ছিল কঙ্কাবতীর রূপসৌন্দর্য নির্মাণে। প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রশিল্পী ও কবিরা যেমন মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন পূর্ববতী ভুবনে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি বুদ্ধদেব

বসুও আধুনিক যুগজীবনের যন্ত্রণা আততি ও আর্তি থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বাংলার রোম্যান্টিক লোকনায়িকা কঙ্কাবতীকে বরণ করতে চেয়েছিলেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী মনে করেছেন, 'আধুনিক যন্ত্রযুগের মধ্যে স্বপ্নমাধুরীর সন্ধান না পেয়ে, তিনি প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের মধ্যে স্বপ্নপ্রয়াণ ঘটিয়েছেন; কিন্তু এমন ধারণা কতদূর সংগত তা বিতর্কের। কেন-না, আলোচ্য কাব্যের কবিতাগুলি ১৯৩০-এ রচিত; আর ঢাকা তখন বর্তমান কালের বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভ্রষ্টতায় জীর্ণ নয়; অথবা যন্ত্রের কালিমালিপ্ত নয়। আসলে বুদ্ধদেবের অন্তরশায়ী রোম্যান্টিক মনোলোক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রূপসৌন্দর্যকে মুগ্ধতার বিস্ময়ে অবলম্বন করে কবিচিত্তের মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন।

'কঙ্কাবতী' কাব্যের নাম-কবিতা 'কঙ্কাবতী' স্মরণীয় কবিতা। কবিতাটি বেশ দীর্ঘ কবিতা, কবিতাটির ধ্রুবপদ 'কঙ্কা—কঙ্কা—কঙ্কাবতী!/কঙ্কাবতী গো'। কবির কানে আর প্রাণে তার নামের শব্দ গানের মতো অবিরাম বাজে। 'সুপ্তির পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত', সারাদিন কঙ্কার নামের শব্দ কবির কানে বাজে। দিনের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে, অতীত স্বপ্নে কবি তার নাম শোনেন অথবা নামের স্বপ্ন বয়ন করেন। কবির মনের গুহায় অর্থাৎ অবচেতনায় আবার মনের অপার আকাশে কঙ্কার হাজার প্রতিধ্বনি। রাতের ঘুমের সময় নায়ক কঙ্কার নামে মুখর হয়ে ওঠেন, মাঝরাতে আকাশের বুকে ঝক্‌ঝকে তারায় কঙ্কাতে কবি লক্ষ করেন:

আকাশের বুকে ফুটেছে তোমার নামের শব্দ একশো কোটি,
তোমার নামের শব্দ আমার মনের আকাশে তার মতো,
ফুটেছে তোমার নামের শব্দ তারার মন একশো কোটি—
কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী গো! কঙ্কাবতী!
তারার মতন একশো কোটি।

আবার যখন তারাদের উজ্জ্বলতা দুর্লক্ষ, যখন একসার মেঘ সরু এলোমেলো আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো গাছের সবুজ জড়িয়ে ধরে; যখন জলের নীচে বাঁকারেখা চাঁদ তখনও আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কঙ্কার সুর ঝরে পড়ে। অর্থাৎ প্রকৃতির নানা পর্যায়িক পরিস্থিতিতে কবির অস্তিত্বে কঙ্কাবতী। আবার যখন:

সাপের মতন জড়ানো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সাপের মতন দ্রুত বিদ্যুৎ
লাল বিদ্যুৎ, দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে,
আকাশ ফাটায়ে লাল বিদ্যুৎ বজ্র বাজায়—কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী।

কবির কল্পনায়, কঙ্কাবতী যেভাবে গড়ে ওঠে তা যেন 'তিলোত্তমা'। 'কঙ্কাবতী' কবিতায় রোম্যান্টিক পৃথিবীর প্রতি অভিসার যাত্রা কবির যত সার্থক; বাস্তব পৃথিবীর চিত্র ততখানি সার্থক নয়। দীর্ঘ সংগীতিক গড়নের কবিতাটিতে যেন সুর ঘুরে ঘুরে নাচে, রাতের নদীতে, এলোমেলো জল স্রোতে, আকাশে চাঁদে, মেঘে, দিগন্ত পরে, মেঘের শরীরে, গাছের ছায়ায়, আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বত্রই কঙ্কাবতীর মহাসাংগীতিক আয়োজন। কবির অপরূপ প্রেমাবেগের আলিঙ্গন শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে, চিত্র ও চিত্রকল্পের পারস্পরিক সংলগ্নতায়, ছন্দের দোলনে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মর্ত্য থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে যায় বিচূর্ণ বিভঙ্গে।

'কঙ্কাবতী' কাব্যের 'আরশি', 'সেরেনাদ' 'কবিতা' এই তিনটি কবিতাতে প্রতীচ্যের উপকরণ ব্যবহৃত এবং এই কবিতাত্রয়ী যেন ব্রাউনিং ও রসেটির কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি। 'কবিতা' কবিতাটি প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং জানিয়েছেন: 'রসেটির 'Troy Town' পঠিতব্য'।

চার

'সেরেনাদ' শব্দটি প্রসঙ্গে নরেশ গুহ জানিয়েছেন: "ইতালীয় ভাষায় সেরেনো [Sereno] অর্থ খোলা হাওয়া, তা থেকে সেরেনাতা [serenata] খোলা হাওয়ার গান বা রমণীর বাতায়ন তলে পুরুষ কর্তৃক রাত্রে যে গান গাওয়া হয়। ইংরেজিতে [serenade] রূপে এই শব্দ আমাদের পরিচিত, কিন্তু nade-এর উচ্চারণ made-এর মতো বলে বাংলায় তা ব্যবহারের অযোগ্য। এবং বিদেশি শব্দের ইংরেজি রূপ বা উচ্চারণকে আদর্শ বলে মানতে আমরা বাধ্য নই। 'সেরেনাদ' লিখে শব্দটিকে বাংলার কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা গেলো"। [কবিতা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড: বুদ্ধদেব বসু।] 'সেরেনাদ' কবিতার আবহমণ্ডল এবং প্রেমাদর্শ উভয়ই প্রতীচ্য। যদি বাংলা লোকপুরাণের নায়িকা কঙ্কাবতী আলোচ্য কবিতার কেন্দ্রে অবস্থিত, কিন্তু বেহালা, জানালার কাচ, বেহালার সুর ইত্যাদি প্রতীচীয় অনুষঙ্গ। যখন আঁধার ধরণী, যামিনী নিঝুম, আকাশ কালো, মেঘের মুখেতে মুখ রেখে চাঁদ ঢলে পড়ে তখন কঙ্কাবতী ঘুমায়। কিন্তু প্রাচ্য কবির মনে জাগে ইতালীয় প্রেমিক প্রেমিকারা জানালার নীচে বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে—এক চমৎকার রোম্যান্টিক আবহমণ্ডল যেন মধ্যযুগের কোনো প্রতীচীয় নগর থেকে নেমে আসে বাংলাদেশের পাঠকের সামনে:

জানালার কাচ জ্বলেছে তোমার—জ্যোছনা কণা,
কঙ্কাবতী!
রাঙাভাঙা চাঁদ—খানিকটা তামা, খানিক সোনা
কঙ্কাবতী!
জানলার নীচে ধূ ধূ সাদা পথ, আলো-আঁধার
ধবধবে পথ-শুধু ধূ ধূ বালি, শাদা ধূলার; কঙ্কা, শোনো!

******

হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ায় বেহালাখানি,
কঙ্কাবতী!
জানালার কাছে হানা দেয় তার আবেগের বাণী,
কঙ্কাবতী!

'সেরেনাদ' কবিতাটির ছন্দ প্রসঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠী মনে করেন: "কবিতাটির ছন্দ টেনিসনের 'The Ballad of Oriana'—কে স্মরণে জাগায়"। [আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।] প্রসঙ্গত পূর্বোক্ত গ্রন্থে আরও প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যে বলা হয়: "আকাশের বুকে যেমন কোটি তারা, কবির মনের আকাশেও তেমনি কোটি নামের নামাবলি। শুধু তারার মধ্যে নয়—আকাশে,

চাঁদে, জলে, মেঘে, বজ্রে বিদ্যুতে, দিগন্ত পারে, গাছের ছায়ায় বেজে ওঠে কঙ্কাবতীর নাম। এ যেন প্রেমের প্যানথিইজম।"

বুদ্ধদেব বসুর 'সেরেনাদ' কবিতাটি সম্ভবত টেনিসনের 'The Ballad of Oriana' দ্বারা প্রাণিত। 'Oriana' নামটি যেমন প্রাচীন লোকগাঁথা থেকে আগত, তেমনি 'কঙ্কাবতী' নামটিও লোকপুরাণাগত। টেনিসনের কবিতাটিও আবার 'The Ballad of Halen of Kirkonell' কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। "The poem was in some measure inspired by the ballad of Helen of Kirkonell." [The Poems of Tennyson. Ed. by Christopher Picks.]

"কঙ্কাবতী' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'কবিতা'টিও বেশ দীর্ঘ কবিতা। আলোচ্য কবিতাটিতে 'বুদ্ধদেব বসু প্রত্যাবর্তন করেন পাশ্চাত্য কাব্য-ঐতিহ্যের কাছে। ভেনাসের হেলেনের অর্ঘ্যদান রূপ পেয়েছে প্রি-র‍্যাফেলাইট শিল্পী—কবি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির কবিতায়। কবিতাটি গ্রিক মহাকাব্য হোমারের 'ইলিয়াড' বর্ণিত হেলেন প্যারিসের প্রেমের পটভূমিতে রচিত। ভেনাসের পায়ে নতজানু হয়ে প্যারিস, প্রেমিকা সর্বকালীন পুরুষের বাসনার রানি হেলেন নিজের স্তনের ছাঁচে গড়া বাটি অর্ঘ্য দিচ্ছে। হেলেনের দেহসৌন্দর্য, ক্লাসিক মহাকাব্যে বিধৃত হেলেন—প্যারিসের প্রেম—স্মৃতি ও ট্রয় ধ্বংস রসেটির মনে যে আবেগ-দোলা সৃষ্টি করেছিল তাই তাঁর 'ট্রয় টাউন' কবিতার উপজীব্য। রসেটি শুধু আফ্রোদিতি মন্দিরে নতজানু হেলেনের দেহসৌন্দর্য ও তাঁর প্রেমের অনুরণন বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধদেবের কবিতায় রসেটির লেখার অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তিনি তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে একত্র বসে 'ট্রয়-টাউন' পাঠ করছেন এবং মূল কবিতার আবেগ-দোলা ও রোম্যান্টিক স্বপ্নাবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি স্তবকের প্রথম অংশে কবি ধরেছেন নিজস্বপ্রেম ও 'ট্রয়-টাউন' পাঠকালীন সংবেদনা এবং বন্ধনীযুক্ত 'ট্রয়-টাউন' কবিতার বিষয়যুক্ত আবেগ। হেলেনঘটিত কাব্য-ঐতিহ্যের দুটি স্তর বুদ্ধদেবের কবিতায় বর্তমান—হোমারের ইলিয়াড এবং রসেটির 'ট্রয় টাউন'; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধদেবের নিজস্ব প্রেম।" (বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, বিষয় ও প্রকরণ: মাহবুব সাদিক।)। আলোচ্য কবিতায় বুদ্ধদেবের বিষয়-যুক্ত আবেগ যথাক্রমে নিম্নরূপ:

১. হেলেনের বুকে মনের বাসনা বেঁধেছে বাসা।

২. হেলেনের বুক নিখুঁত, নিটোল, নরম শাদা।

৩. হেলেনের বুকে দুটি পাকা ফল ভরেছে রসে।

৪. হেলেন রচেছে অর্ঘ্য নিজের বুকের ছাঁচে।

৫. সোনার সে বাটি মধুর দুরাশা সব পুরুষের।

৬. সোনার সে বাটি গড়া হেলেনের বুকের ছাঁচে।

৭. আমার বুকের ছাঁচে গড়া এই সোনার বাটি
বাসনার রসে আনিয়াছি ভরে সব পুরুষের।

৮. মোর বুকে দুটি পাকা ফল ভরেছে রসে।

পাঁচ

'কঙ্কাবতী'র প্রথম কবিতা 'কাল'-এ নায়িকার জন্য প্রেমিকের উদ্‌বেগাকুল অপেক্ষমান হৃদয়, 'অন্য কোনো মেয়ের প্রতি' কবিতায় অতি রোম্যান্টিক পার্থিব ইন্দ্রিয়ঘনত্ব; 'একখানা হাত', আর্তি আবেগোচ্ছল প্রেম কবিতা; 'কিছুই প্রেমের মতো নয়' কবিতায় কবি দেহোত্তীর্ণ প্রেমের রূপকার, 'হে ঈশ্বর এ কী অপরূপ' কবিতায় দেহমিলন ব্যতীত প্রেমের নিঃসীম তৃষ্ণা। আবার 'বিবাহ' কবিতায় প্রেমসম্ভোগের তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা; কবি তাঁর প্রিয়ার কণ্ঠে, কৃষ্ণকেশে, ললাটে, করতলে, ওষ্ঠাধরে, বক্ষের অগ্নিগিরিতে, চরণতলে চুম্বনের মালা পরিয়ে দিয়েছেন, তবুও:

> আহা, তৃপ্তি নেই, হলো না সব বলা,
> বাসনা যে বিশ্বপ্লাবন, ক্ষুদ্র এই দেহ।
> পারবো প্রিয়তমারে এক অনিঃশেষ মালা,
> তাই তো এই গাঁথিনু বাণী মনের সোনা জ্বলা।

ছয়

'চুল' 'কঙ্কাবতী' কাব্যের অন্যতম স্মরণীয় কবিতা। চুলের চিত্র বুদ্ধদেব বসু প্রথম অঙ্কন করেন 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের 'প্রেমিক' কবিতায়। 'একটি কথা' কাব্যের 'গান' কবিতাতেও চুলের কথা আছে। 'প্রেমিক' কবিতায় চুল এলোমেলো, লালচে, নরম—এ সমস্তই বিদেশিনীর চুলের ইঙ্গিতবাহী; কিন্তু কঙ্কাবতীর চুল মেঘবরণ। বুদ্ধদেবের চুল-বিষয়ক অনেকগুলি অনুবাদ কবিতা আছে। যেমন: চুল, একমাথা চুল, নর্তকী সাপিনী, সে রাতে ছিলাম, বিকেলের গান, বিতৃষ্ণা, লাল চুলের ভিখিরী মেয়েকে, এক শহীদ, বিয়াত্রিচে।

সাত

বুদ্ধদেবের কবিতায় চুলের ব্যবহার ও চিত্রকল্প কবির নিজস্ব স্বভাবজাত। বোদলেয়ারের 'চুল' কবিতার অনুষঙ্গও বুদ্ধদেব বসুর 'চুল' কবিতা রচনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। বুদ্ধদেবের 'চুল' কবিতার রচনাকাল জুলাই ১৯২৯; আর বোদলেয়ারের 'চুল' কবিতার অনুবাদকাল ১৯৩০। সুতরাং বুদ্ধদেব বোদলেয়ারের দ্বারা প্রাণিত নাও হতে পারেন। অবশ্য বোদলেয়ারের চিত্রকল্প প্রবণতা বুদ্ধদেবের 'চুল' কবিতাতে সঞ্চারিত হতে পারে।

"বোদলেয়ার-এর 'চুল' কবিতা বুদ্ধদেবের তুলনায় অনেক দূরস্পর্শী, গভীরতর রোম্যান্টিক ভাবনার দ্যোতক ও ব্যঞ্জনাধর্মী। বুদ্ধদেবও এ কবিতায় রোম্যান্টিক, তিনিও বাস্তবের সংক্রাম-সংঘর্ষ এড়িয়ে ('খুলে দাও চুল / এ-দিন উজ্জ্বল বড়ো, এ-আলোক পারি না সহিতে') স্বপ্নপ্রয়াণে যান চুলের অরণ্যে ডুব দিয়ে। পরবর্তীকালে রচিত 'কঙ্কাবতী'র 'শেষের রাত্রি' কবিতায় এই ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। বুদ্ধদেব বসু ও শার্ল বোদলেয়ার-এর উপর্যুক্ত দুটি কবিতায় ভাবনা যেখানে সামান্য, তা হচ্ছে, দুজনই চুলের অরণ্যে অন্বেষণ করেন শান্তি ও কামনার পরিতৃপ্তি। বোদলেয়ার 'এক মাথা চুল' কবিতা দুবার লেখেন, গদ্যে ও পদ্যে। 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংকলিত গদ্য কবিতাটির অনুবাদ আলোচনা গ্রহণ করা হয়েছে। পদ্য কবিতাটিও পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব অনুবাদ করেন, তার একটি পঙ্‌ক্তি এরকম: 'প্রবল অলক, হও ঢেউ, যাতে আমিও উধাও।'

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় চুলের গভীর ও ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছে, যা বোদলেয়ার-এর কবিতায় অনুপস্থিত। 'চুল' 'চোখ' 'ঠোঁট'—এইসব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ উপাদান সম্পর্কে পাশ্চাত্যে সাহিত্যে ইন্দ্রিয়ঘনত্ব [Sensuousness] ও দৈহিক রূপ সম্পর্কে চেতনার মাত্রা ভারতীয় সাহিত্যের তুলনায় বেশি। প্রাচ্যমানসে দেহকে অতিক্রম করার প্রবণতা সুপ্রাচীন সচেতনতা ভারতীয়দের মানস-বৈশিষ্ট্য। চুল-চর্চার বর্ণনা সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের নানা এলাকায় আছে। জীবনাচরণেও ভারতীয়রা কেশ ও কেশচর্চার নানা উপকরণ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই ভেবে এসেছে। ভারতীয় জাতিসত্তার শিল্পীমানসও কেশ-প্রসাধনরত নায়িকার প্রচুর ছবি এঁকেছে। বুদ্ধদেবের 'চুল' প্রসঙ্গটি তাঁর ভারতীয় মানসবৈশিষ্ট্যের ফল। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং বোদলেয়ারের কবিতাও তাঁকে উজ্জীবিত করে থাকতে পারে।

'নতুন পাতা' পর্যন্ত কাব্যের প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু চুলের চিত্রব্যঞ্জনার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। 'কঙ্কাবতী'তে 'চুল' কবিতা ছাড়াও প্রিয়ার কেশপাশের প্রসঙ্গ এসেছে 'আরশি' 'একটি স্বপ্ন' 'বিদেশিনীর প্রতি', 'রূপকথা' এবং 'শেষের রাত্রি' কবিতায়। 'নতুন পাতা' 'যে-কোনো মেয়ের প্রতি', 'পদধ্বনি', 'ভীরুতা', 'তুমি যখন চুল খুলে দাও' এবং 'মোড়' কবিতায় চুলের প্রসঙ্গ ব্যবহৃত। 'চুল' বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় নানামাত্রিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

'কঙ্কাবতী'র 'চুল' কবিতায় কবি নায়িকার ঘনকালো অন্ধকার চুলের আড়াল কামনা করেন বাস্তবের সংঘাত-সংঘর্ষ এড়াবার জন্য। 'আরশি' কবিতায় লোকনায়িকার চুল লাল, রেশমি ও নরম। বাংলার লোকসুন্দরীকে লোকমানস থেকে গ্রহণ করলেও বুদ্ধদেব বসু একে আধুনিক মনন ও মানসের সঙ্গে মিশ্রিত করে নিয়েছেন। কঙ্কাবতীর রূপের সঙ্গে মিশ্রিত করে নিয়েছেন। কঙ্কাবতীর রূপের সঙ্গে মিশেছে বিদেশিনীর শুকনো নরম লাল রঙের চুল। 'রূপকথা'য় কঙ্কাবতীর চুল কালো-মৃত্যুর মতো অমোঘভাবে তা জড়িয়ে আছে কবির হৃদয়। 'শেষের রাত্রি'তে রূপকথার দূর-অতীত থেকে আসা কঙ্কাবতীর চুলের ঘনতমসার আড়ালে ডুব দিয়ে কবি ঢেকে দিতে চান প্রখর বাস্তব ও ক্রূর সময়কে। চুল তাঁর কবিতায় অবিরলভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।" (বুদ্ধদেব বসুর কবিতা। বিষয় ও প্রকরণ: মাহবুব সাদিক)

আট

'বুদ্ধদেব বসুর 'শেষের রাত্রি' কবিতাটি 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি সমাপ্তিতে লেখা আছে ১৯৩১-৩৭। 'কঙ্কাবতী' প্রথম প্রকাশিত হয় জুলাই, '৩৭-এ, তখন কবিতার সংখ্যা ছিল পঁচিশ। ১৯৪৩-এ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন কবিতার সংখ্যা ছিল আটত্রিশ। তৃতীয় এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-এ তে। কবিতার সংখ্যা তেতাল্লিশ। তৃতীয় এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-তে। কবিতার সংখ্যা তেতাল্লিশ। ১৯৩৭-এ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হলেও এই রচনাগ্রন্থের রচনারম্ভ ১৯২৯-এ 'শেষের রাত্রি' কবিতাটি 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও এর সৃষ্টির পটভূমিকা একটু ভিন্নতর। এবং কেন এই কবিতাটির শেষে ১৯৩১-৩৭ লেখা আছে তার কারণও বোঝা যাবে যদি আমরা 'কবিতা ও আমার জীবন: আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ' লক্ষ করি। বুদ্ধদেব বসু এই অংশে

আমাদের জানাচ্ছেন—" 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী' 'নতুন পাতা'র কবিতাগুলো, আমার সতেরো থেকে পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। ...কঙ্কাবতী'র শেষের রাত্রি' কবিতাটা প্রথম স্তবকের পর অনেকদিন এগোয়নি। সেটি লিখেছিলাম আমার ঢাকার জীবনের শেষ দফায়—তারপর কলকাতায় এসে বাসা বাঁধলাম, বিয়ে করলাম, আমার প্রথম সন্তান ও 'কবিতা' পত্রিকা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হলো। ততদিনে সেই প'ড়ে-থাকা স্তবকটি হয়তো ভুলেও গিয়েছিলাম, অন্তত পুরোনো খাতার পাতা ওলটাতে আর লুব্ধ হইনি—মনে প'ড়ে গেল যখন 'কঙ্কাবতী' বই ছাপবার তোড়জোড় চলছে। বইয়ের শেষ কবিতা হিসেবে এটা নেহাৎ মন্দ হবে না মনে হলো—তারই তাগিদে আরো কয়েকটা স্তবক তৈরি করে কবিতাটাকে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম।" (কবিতার শত্রু ও মিত্র: বুদ্ধদেব বসু)।

'তৈরি করে' কথাটি বুদ্ধদেব যথার্থ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কেন-না কবি তখন আর পুরোনো পল্টনের আবহাওয়ায়, 'কঙ্কাবতী'র আবহাওয়ায় বাস করছেন না। কবি পুরোনো পল্টনের প্রান্তর, বাতাস, চন্দ্রোদয় আর তারার আলো থেকে ভৌগোলিকভাবে যে দূরে চলে এসেছেন তাই নয়, মনের দিক থেকেও তিনি ভিন্ন পথের যাত্রী। তবু পাঁচ বছর আগেকার সুরে সুর মেলাতে কবির অসুবিধা হল না—এবং এ অভিজ্ঞতাটি বুদ্ধদেবের পক্ষে নতুন।—"এতদিন আমার কবিতা কবিতা ছিল চলতি মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে-আসা—আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন যা গ্রহণ করছি, অথবা যে সব আবেগ আমাকে নাড়া দিচ্ছে, আমি সেগুলোকেই আমার উপাদান ব'লে জেনেছিলাম, কিন্তু 'শেষের রাত্রি' শেষ করতে গিয়ে মনে হল আমাদের কল্পনা বেশি স্বাধীন।" (তদেব)। 'কঙ্কাবতী' মূলত প্রেমের কাব্য এবং 'শেষের রাত্রি' কবিতাতে সেই প্রেমভাবনার সুর আদ্যন্ত ধ্বনিত। 'কঙ্কাবতী' প্রথম সংস্করণের আলোচনাকালে জীবনানন্দ লিখেছিলেন: "বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য। ...এই কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি এবং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ...আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন,—সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে 'কঙ্কাবতী' মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য"। 'শেষের রাত্রি' কবিতার নায়িকা কঙ্কা—কঙ্কাবতী; এই নামটিতে রয়েছে রূপকথার স্পর্শ এবং এই কবিতায় দেশজ লোকসাহিত্যের সঙ্গে কবির যোগ হয়েছে নিবিড়। শুধু দেশজ লোকসাহিত্য নয়, " 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে বুদ্ধদেব দেশজ-চলিত-কথ্য ভাষার প্রয়োগ শুরু করলেন, এবং কথ্য ভাষার মধ্য থেকে নিষ্কাশন করে আনলেন সুন্দরতা। এই প্রথম তাঁর আঙ্গিক চেতনার আধুনিকতা শুরু হল। ...বুদ্ধদেবের রোম্যান্টিকতা এখানে উত্থিত হ'লো গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য থেকেই।" (দশ দিগন্তের স্রষ্টা: আবদুল মান্নান সৈয়দ)। বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতা সম্পর্কে উল্লিখিত সূত্র দুটি যথার্থ হলেও উক্ত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'শেষের রাত্রি' কবিতা সম্পর্কে এর যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। যদিও 'কঙ্কাবতী'র অন্যান্য কবিতায় দেশজ-চলিত-কথ্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন, তবুও 'শেষের রাত্রি' কবিতায় শব্দগত প্রয়োগ মূলত তৎসম। কবিতাটিতে মোট সাতটি স্তবক আছে। সাতটি স্তবকের প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করলে আমরা সেখানে তৎসম ও দেশজ শব্দের যে তালিকা খুঁজে পাই, তাতে তৎসম শব্দের দিকেই পাল্লা ভারী।

প্রথম স্তবক—যেইখানে, খালি মুখে, ঘুরে ঘুরে যায়, পরে, ঢাকা, মতো, তবু, চলে, এসো, কোরো না ইত্যাদি ব্যতীত সমস্তই তৎসম; কয়েকটি মাত্র তদ্ভব শব্দ আছে।

দ্বিতীয় স্তবক—মতো, নেমে, মুখে, এসেছে, মতন, ঘুমায়, থেমে, থেকে, খাঁ খাঁ, তবু, চলে এসো, কোরো না ইত্যাদি ব্যতীত সমস্তই তৎসম শব্দ।

তৃতীয় স্তবক—নেমেছে, হাজার, ভেঙে ভেঙে, চলো, আড়াল, বাঁকা, যেথা, মতো, চোখ, তবু, চলে এসো ইত্যাদি দেশজ লোকপ্রচলিত শব্দ।

বাকি স্তবকগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, 'শেষের রাত্রি' মূলত তৎসম শব্দপ্রধান কবিতা। এই কবিতায় কবি এলোমেলো, হলদে, মাড়ায়ে, আঁকাবাকা প্রভৃতি শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করলেও কবির প্রবণতা রয়েছে তৎসম শব্দের প্রতি। 'শেষের রাত্রি' কবিতাটিতে তৎসম শব্দের এমন ব্যাপক ও বহুল ব্যবহারের কারণ মনে হয় কবিতাটি রচনার ব্যাপারে দীর্ঘ সময়ক্ষেপ।

অন্যান্য কবিতার কবি যখন 'লালপেড়ে শাড়ি' (সুখান্বেষী)/'মাছের মতন ফেরা' (মধ্যবর্তী)/'ছোটো টুলে বসে থাকে।' (কোনো মেয়ের প্রতি)/'তোমার শাড়ির রং', 'আঁচল আঁটার ঢং', 'ঠোঁট দুটি গোল করে তুলে' (অন্য কোনো মেয়ের প্রতি)/'খসখসে চুলগুলি' (চুল) 'পা দুখানি ফেটে গেছে তার', 'পাদুখানি লাল তার লাল আলতার' (রূপকথা) 'ফুরফুরে ঠোঁট', 'ঠোকরাই পাখির মতো' (গান)/'ঠোঁটে-ঠোঁটে ঠুকঠুক মিঠে পাখিপনা' (কিছুর প্রেমের মতো নয়)—প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন ও দেশজ লৌকিক শব্দের সৌন্দর্য অন্বেষণে সচেষ্ট হন, তখন 'শেষের রাত্রি' কবিতায় তৎসম শব্দের বাহুল্য পাঠককে বিস্মিত করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে—আরশি, সেরেনাদ, কঙ্কাবতী, কবিতা, প্রেমিকের প্রার্থনা, শেষের রাত্রি প্রায় এক প্যাটার্নের কবিতা। মনে হয় এ জাতীয় কবিতার দেহগঠন দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যয়গত পরিকাঠামোর উপর। 'শেষের রাত্রি' কবিতার শেষের দিকে বুদ্ধদেব যতই অগ্রসর হয়েছেন, ততই লৌকিক শব্দের ব্যবহার কমতে আরম্ভ করেছে। কবি ক্রমশ 'পরিক্রমণ', 'দিগন্ত', 'উন্মাদনা', 'জ্যোতি', 'মরণপুঞ্জ', 'বিদ্যুৎময় দীপ্ত', 'ছিন্ন', 'বিরহ' প্রভৃতি শব্দের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

'শেষের রাত্রি' কবিতায় 'মতো' উপমাবাচক শব্দটি ১১ বার এবং 'মতন' উপমাবাচক শব্দটি ৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'মতন' শব্দটি কিন্তু কোনো বারে 'মতো' শব্দের ন্যায় অন্ত্যমিলের জন্য ব্যবহৃত হয়নি; 'মতো' শব্দটি চতুর্থ স্তবকে ১ম ও ২য় পঙ্‌ক্তিতে অন্তমিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 'তবু' অব্যয়বাচক শব্দটি তিনবার সাপেক্ষতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য কবিতার ধ্রুবপদ সম্ভবত 'কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না'। এই ছত্রটি বারবার কবিতায় আবৃত্ত হয়ে প্রেমিকাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছে। কবি এখানে প্রেমিকাকে হাতে হাত দেওয়ার জন্য যে অনুরোধ করেছেন তাতে নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে যৌনচেতনাকেও যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষণ ব্যবহারে বুদ্ধদেব এখানে কোনো উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিশেষণের তালিকা প্রমাণ করে যে, বুদ্ধদেব বিশেষণ ব্যবহারের প্রচলিত গণ্ডি উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

'শেষের রাত্রি' কবিতার ব্যবহৃত বিশেষণ তালিকা—ঘনকালো অন্ধকার/বিশাল আঁধার। বিশাল আকাশ/ক্লান্ত শিশু/ক্লান্ত সময়/ দূর দিগন্তে/ধূসর পৃথিবী/অসীম বাসনা/হলদে পাতা পীত স্মৃতি/উজ্জ্বলবিশাল বন্যা/মনোহীন তমো/আদিম রাতের।—'পীত স্মৃতি' এবং 'এলোমেলো প্রেত' ব্যতীত বিশেষণ ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধদেব প্রথাবদ্ধতায় আবদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে, 'শেষের রাত্রি' কবিতায় বুদ্ধদেব দেশজ লৌকিক ও কথ্যভাষার প্রয়োগ করেননি। তাঁর উপায়ও ছিল না। কেন-না গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য থেকে এখানে রোম্যান্টিকতা উত্থিত হয়নি। 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর এখানে প্রকাশিত। এ কবিতায় 'ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই' এ কবিতা কোনো বিদ্রোহের কবিতাও নয়। 'শেষের রাত্রি' 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের প্রাসঙ্গিক কবিতা—কেন-না এ কবিতার আধুনিকতা হল চিরন্তনের আধুনিকতা, কোনো কৃত্রিমতার আধুনিকতা নয়। 'কঙ্কাবতী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের বক্তব্যকে যদি 'শেষের রাত্রি' কবিতা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়, তাহলে বোধহয় ভুল হয় না—"যাঁরা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তবুও আরো ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না হলে দেখতে পারবেন না বলে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না—মানুষের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর কোনো একটা তুচ্ছতম দিনকে তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিন ব'লেই মনে করে শুধু সেইসব দারুণ মাস্তুলের কর্মধারগণ;—যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো কোনো মানুষের মন এককণা বালির ভেতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভেতর, হাতের তেলোর ভেতরই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভেতরই সময়হীনের আস্বাদ পায়।" 'শেষের রাত্রি' হল হাতের তেলোয় সীমাহীনতাকে আর অনুপলের ভিতরে সময়হীনতার আস্বাদ পাওয়ার কবিতা।'

(দময়ন্তী ও অন্যান্য কবিতা এবং বুদ্ধদেব বসু: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বুদ্ধদেব বসু: মননে অন্বেষণে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।)

নয়

'বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ ও চিত্রকল্পগুলি ইন্দ্রিয়ঘন, শরীর সংবেদী শব্দ ও চিত্রকল্প। এখানে তৎসম ও অতৎসম, এমনকি কথ্যচলিত রীতির বহুল প্রয়োগ সংলক্ষ; অথচ কবিতার কোনো রসবিপর্যয় ঘটে না। যেমন:

১. ছড়ায়ে গিয়েছে মুখে চোখে—ঠোঁটে রাশিকৃত সোনা:
তারপর কণ্ঠ ঘিরি কুন্দশুভ্র দুইটি হাতের কোমল উত্তপ্ত
দশটি পরির মতো দশটি আঙুল মোর বুকে। (কাল)

২. ঠোঁটের আরম্ভ রেখা, বাদামি সে চোখ। (কখনো)

৩. বইখোলা কোলের উপরে,
ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারা পিঠে,
শাদা সেমিজেরে ঘিরি কালো পাড় উঠেছে জড়ায়ে,

শাড়ির চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়। (কোনো মেয়ের প্রতি)।

৪.ক. তোমার চোখের আলো, গোল করে তোলা ঠোঁট দুটি,

একটু জিভের আভা—লাল আভা! ছোটো সাদা দাঁত-

চকিতের বিদ্যুৎ ঝলক!

খ. ঠোঁট দুটি গোল করে তুলে। (অন্য কোনো মেয়ের প্রতি)।

'কঙ্কাবতী' কাব্যে বুদ্ধদেব নারীদেহের ঠোঁট, হাত, আঙুল, চোখ, জিভ, দাঁত ইত্যাদি শারীর শব্দ থাকলেও চুলকে কেন্দ্র করেই তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রকল্পগুলি রচিত হয়। আর এই চুলের চিত্রকল্প সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় 'চুল' এবং 'শেষের রাত্রি' কবিতায়। যেমন:

১. তোমার সে চুল

জড়ানো সুতোর মতো, নিশীথের মেঘের মতন

তোমার সে কালো চুল, এলোমেলো অগোছালো চুল,

ঘুমের মতন ঠাণ্ডা, একমুঠো জমানো আঁধার—

******

শুকনো চুলের স্বাদ মোর উষ্ম, বিশুষ্ক অধরে;

দন্তাগ্রে কেশের গুচ্ছ, কাটি তাকে তৃণের মতন,

******

কেমনে তোমার চুলে খেলা করে আলোকের ফিতা,

কেমনে চুলের কালো আকাশের আলোকে শিহরে। (চুল)।

২. ক. তোমারই চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার।

খ. তোমারই চুলের বন্যার মতো অন্ধকার।

গ. তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার

ঘ. তোমার চুলের মনোহীনতম আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে। (শেষের রাত্রি।)

কথ্যক্রিয়াপদ ও কথ্যরীতির মিশ্রণে বুদ্ধদেব ঘরোয়া অথচ শরীরী ব্যঞ্জনার চিত্রকল্প সৃষ্টি করেন:

১. হলদে শাড়িটা—না, না, হলদে আলোয়

যাবে নাকো দেখা ওর রং,

লাল? তা বড্ড চড়া! নীল তাও নয়—

খয়েরিটা মানাবে বরং

যাক্‌গে, শাদাই ভালো—কালো পেড়ে শাড়ি। (বেহায়া)

২. তার মতো—ঠোঁটে ঠোঁটে ঠুকঠুক মিঠে পাখিপনা?

(কিছুই প্রেমের মতো নয়)

৩. জ্বলেছে নতুন চাঁদ, ঝিলমিল করে ওঠে পাৎলা কাপড়
হাওয়ায় হঠাৎ যায় সরে। (মেয়েরা)

৪. কালো চোখ তার পড়েছিলো মোর মুখের পরে ক্ষণেক তরে
—কে সে যে, সে কথা কবো না। (কালো চোখ।)

কথ্যরীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিশ্রণ এখানে যেমন সফলতার শিখরস্পর্শী, তেমনি কাব্যগন্ধি শব্দের সঙ্গে কথ্য বাগভঙ্গির ব্যবহারও এখানে কাব্যিক আবহকে ব্যাহত করে না। 'ছুয়ে ছেনে' 'ঠোকরাই', 'ঝপাঝপ', 'চুলবুলিয়ে', 'বড্ড', 'যাকগে', 'ছেঁড়া'—'ছাড়া', 'পাখি পনা' ইত্যাদি কথ্যশব্দ কবিতার শরীরে স্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চার করে। 'কঙ্কাবতী'-তে একই সঙ্গে বুদ্ধদেব গীতল কাব্যগন্ধি রাবীন্দ্রিক শব্দবন্ধের সঙ্গে কথ্যশব্দও ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধদেব ব্যবহৃত বিশেষণগুলি যথেষ্ট অন্তর্ভেদী। যেমনঃ

১. আকাশ কোমল, আকাশ কালো।

২. একসার মেঘ, সরু, এলোমেলো,
আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতন।

৩. হেলেনের বুক নিখুঁত, নিটোল, নরম, শাদা।

আবার কোথাও বা বিপ্রতীপ ব্যবহারও লক্ষগোচরঃ

শ্বেতমণির দ্যুতি বিলায় ক্ষণপ্রকাশ উরু।

'কঙ্কাবতী' কাব্যে অনুপ্রাসও কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিতঃ

১. ঘুম নেমে এলো মেদুর আকাশে, মধুর মেঘে।

২. হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ায় বেহায়া বেহালাখানি।

'কঙ্কাবতী', কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সংগীতের মোহজাল যা ধ্বনিময়তায় সঞ্চারিতঃ

তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্মের মাঝে মর্মরি বাজে, কঙ্কা? কঙ্কা কঙ্কাবতী

'উপমাই কবিত্ব' বুদ্ধদেব এ তত্ত্ব না মানলেও উপমাতে তাঁর শৈল্পিক নিপুণতা যথেষ্ট স্মরণ্যঃ

১. কঙ্কা, আমার স্বপ্নের' পরে বন্যার মতো তোমার চুল।

২. ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের মতো
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ আঁকাবাঁকা।

প্রকৃত কবিরা রূপক রচনায় যে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন বুদ্ধদেব বসু তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং তাঁর সৌন্দর্য, প্রেম, কামনা-বাসনা ইত্যাদির দ্যোতকঃ

১. মাঝরাতে দেখি আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা—আলোর পোকা।

২. রজনীর নীড়ে ঘুমের পাখিরা উঠেছে জেগে।

৩. অদৃষ্টের অন্তহীন অন্ধকার জলে
প্রবালদ্বীপপুঞ্জ সম চুম্বনের বেড়া
ওষ্ঠাধরে আজন্মের অঙ্গীকার জ্বলে।

দশ

'কঙ্কাবতী' যে মূলত প্রেমের কাব্য এ সম্পর্কে সংশয় নেই। আর এ কাব্যের প্রেমতত্ত্ব শারীর শিহরণের তত্ত্ব। এ কাব্যে রোম্যান্টিকতা আছে, প্রকৃতি আছে। সবই কিন্তু প্রেমতত্ত্বের পরিপূরক। জীবনানন্দ দাশ 'কঙ্কাবতী'-র প্রথম সংস্করণের সমালোচনা করেছিলেন তৃতীয় বর্ষের 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৩৪-এর সংখ্যায় যেখানে তিনি সংগতভাবেই বলেছিলেন: "বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী প্রেমের কাব্য। এসব কবিতা পড়তে বসে এগুলো কেন বিদ্রোহের কবিতা নয়, এসবের ভিতর ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই কেন...এরকম সব গূঢ় জিজ্ঞাসা আমার কাছে অবান্তর বলে মনে হয়।...এই কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ...যাঁরা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তবু আরও ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না হলে দেখতে পারবেন না বলে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না—মানুষের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিন বলেই মনে করে শুধু সেইসব দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণ; যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো কোনো মানুষের মন এককণা বালির ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভিতর, হাতের তেলোর ভিতরই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভিতরেই সময়হীনের আস্বাদ পায়। আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন,...সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে 'কঙ্কাবতী' মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য।"

স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা: পাঠকের দর্পণে

(বুদ্ধদেব বসুর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা'। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ খ্রি:। কবিতার সংখ্যা কুড়ি। প্রথম প্রকাশ ১৯৭১।)

বুদ্ধদেব বসু মূলত প্রেমের কবি এবং এ কাব্যেও কবির নতুন কোনো প্রেমভাবনা প্রকাশিত হয়নি। প্রেমমূলক স্মৃতি কবিতাই এখানে মুখ্যবিষয়। বার্ধক্যে কবির প্রেমের শরীরী আবেদন নিঃশেষিত বলে কবির কাছে জীবন পূর্বের ন্যায় উপভোগ্য নয়। কবি এখন আর প্রেমের বিস্মিত নির্জনে প্রবেশ করতে পারেন না, মাঝে মাঝে প্রাক্তন প্রেমের স্মৃতি কবির চিত্তদেশে উঁকি মারে অথবা কবি যৌবনে প্রেমের যে কথা বলতে পারেননি, সেই কথাই ভাবেন।

কিন্তু সমস্ত ভাবনা বা স্মৃতিকাতরতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কবির জীবন অতিক্রান্ত হয় নিম্নোক্ত কবিতার ভাবসরণিতে—

> সোনালি একে গর্ভে নেই কোনো চিন্তনীয় দুই—
> যুগপৎ কন্যা, জায়া—তাই আর ঘটে না কিছুই,
> না কোনো বন্ধুতা-রোষ-না বিস্মিত নির্জনে পা ফেলা।
> পর্দা টানা অন্ধকারে কেদারায় কাটায় সে বেলা
> হাঁটু নেড়ে, চক্ষু বুজে—নির্বিকার অনাক্রমনীয়।
>
> (বৃদ্ধ কবি)

কবি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ভাবছেন যে প্রায় অন্যান্য মানুষের মতো তিনিও শরীরী প্রেম থেকে বঞ্চিত—দৈহিক অক্ষমতার জন্য। তাই তিনি পরোক্ষ আস্বাদ কামনায় রত। কবি আসলে বৃদ্ধ হয়েছেন বলে প্রেমের স্মৃতি-উৎসবে মত্ত; তাঁর চৈতন্যের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করে আজ প্রেমের বোধস্মৃতি। শরীর অক্ষম হলেও প্রাজ্ঞ চৈতন্যে স্মৃতি অবসিত হয় না। যেমন:

> দিদিমা হন রসবতী নাৎনির বিয়েতে,
> দন্তহীন বিলোল কৌতুকে যেন চান ফিরে পেতে
> প্রায় ভুলে যাওয়া তাঁর সমর্থ অতীত। (কিম্পুরুষ)

লক্ষ করলে দেখা যাবে, আমাদের সমাজে এমন এক সম্প্রদায় আছে যারা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, নবজাত সন্তানের উৎসবে তারা মত্ত হয় মনের আকাঙ্ক্ষিত আবেগকে রূপ দেওয়ার জন্য—

> কেউ ডেকে পাঠায় না। তারা কিন্তু চলে আসে ঠিক—
> যখনই নূতন শিশু জন্ম নেয় গৃহস্থের ঘরে;
> যেন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার অদম্য উত্তরে
> নৃত্য করে অভ্যর্থনা, ঐকতানে গায় মাঙ্গালিক।
>
> (তদেব)

'স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা' আসলে কবির আত্মজীবন পর্যবেক্ষণ। তিনি নিজের প্রাজ্ঞ চৈতন্য থেকে এমন এক বোধ গড়ে তোলেন যেখানে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রেমসংবেদনা। 'সন্ধিলগ্ন' কবিতার বিষয়ও কবির আত্মজীবন। বুদ্ধদেব বসুর সদ্য মৃতা মাকে নিয়ে পিতার তোলা একটি ছবি দেখে কবির মনে যে অনুভূতি জাগে তাও অতীত স্মৃতির ক্ষরণ মাত্র—আলোচ্য কবিতাটি আত্মস্মৃতিমূলক। কবিতাটির শুরু হয় প্রপিতামহের নাম না-জানাকে কেন্দ্র করে, মাতার নামও অশ্রুত, তারপর মৃতা-মায়ের সঙ্গে পিতার ছবি দেখে কবির মাতৃ সম্পর্কিত স্মৃতিকাতরতার উদ্‌বোধন:

মা, আমি প্রণাম করি তোমাকে,
মা, আমি চুম্বন করি তোমাকে, অপরিচিতা, অদৃষ্টা
আমার,
নিরভিমানিনী। আমি তোমাকে দেখেছিলাম
একদা, অস্পষ্ট ম্লান সেপিয়াতে—চোখ বোজা,
ঘুমন্ত ঠোঁটের প্রান্ত,
কোনো এক ক্ষীণকায় যুবকের বাহুবন্ধে আপাতত তখনও
পার্থিব,
অপর্যাপ্ত বিস্রস্ত চুলের গুচ্ছে এমনকি রূপান্বিতা—প্রায়।
কিন্তু বলো, তুমি কি তখনই ছিলে অতিক্রান্ত, অন্য
এক দিগন্তে উদীয়মান,
অথবা স্বপ্নের মতো ভাসমান যুগপৎ জাগর নিদ্রায়—

কবিতার দ্বিতীয়াংশে পিতামহ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আছে। প্রয়াতা মাতাকে তিনি 'আত্মদাত্রী' রূপে অভিহিত করেন, কেন-না, কবির 'জন্মের জন্য কৃতকার্য প্রাণান্ত চেষ্টায় সবে মাত্র সক্রিয় যৌবনতাপে' গলে গিয়ে, বিলুপ্ত হয়েছিলেন। মাতা পিতার এই অস্বাভাবিক যুগলচিত্র 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় কবির প্রেমভাবনার চূড়ান্ত রূপসিদ্ধির পরিচয় হয়ে ওঠে। কবির মনে হয়:

কে এই দুজন? এই তন্বী তরুণী ও বিহ্বল যুবক, যারা
পরস্পর স্পর্শের কোমল ফাঁকে নিখিল বিশ্বকে ধরে আছে
কিংবা যেন এখনো অপেক্ষমান বিশ্বের তারাই
অগ্রদূত।

কবি এই চিত্র দেখে উদ্দীপ্ত হন এবং স্মৃতিচারণার বোধ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, 'আমিও স্রষ্টা হতে চাই।' বুদ্ধদেব বসুর 'নীলাঞ্জনের খাতা' উপন্যাসেও এমনই বর্ণনা আছে, যা 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ যুবক-যুবতীর চিরন্তনী প্রতিমাকে তিনি প্রেম ভাবনার সারাৎসার ভেবেছেন। প্রথম পর্বের দেহ-হৃদয় যুক্ত প্রেমমীমাংসা থেকে কবি বুদ্ধদেব প্রেমের বিচিত্র সংবেদনাকে রূপায়িত করতে চান জীবনের প্রায় উপান্তে উপনীত হয়ে। এ কবিতায় প্রেমের মাধ্যমেই কবি নিজেকে প্রকাশ করতে চান,—'আমি শুধু উৎসুক প্রেমিক শব্দের ও মেয়েদের।'

'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা' কাব্যে জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সম্বন্ধ ও সেতুবন্ধের কথা আছে বলে আলোচ্য কবিতা দুটিকে স্মরণীয় বলা যেতে পারে। 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় স্মৃতি মুখ্য —এখানে জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক সূত্র আত্মজৈবনিক সূত্রে গ্রথিত। মায়ের অস্পষ্ট ছবি কবিকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নিক্ষেপ করে! আলোচ্য কবিতাটিতে কবিমাতা মর্ত্যসীমা অতিক্রম করলেও যেন মানবীর লক্ষণে চিহ্নিত। মৃতা মাতাকে তাঁর মনে হয় 'চঞ্চল উৎসুক, সঞ্চরণশীল।' আলোচ্য কবিতায় বেশ স্পষ্টভাবে কবির জন্ম-মৃত্যুর ধারণা প্রকাশিত—

যেন প্রতিমুহূর্তেই জন্ম আর মৃত্যুর সন্ধির লগ্ন,
ঊনষাট বৎসর ধরে সেই এক মুহূর্ত পুনরাবৃত্ত
এক মৃত্যু-যুগপৎ নতুন জীবন;
অতএব তোমার মৃত্যুও যেন চিত্রকলাপ, কোনো এক
নিগূঢ় ইঙ্গিত,
যার ফলে তোমাকে হারিয়ে, আমি
হয়েছি সমর্থ, ঋদ্ধ—ক্ষতিগ্রস্ত নয়।

সমালোচ্য কবির মর্মবিদারী অভিজ্ঞতা—'এই মতো স্তব্ধ রাতে সজ্ঞাহীনতায় মনে হয় কবিতাও প্রবঞ্চনা।' কবি আক্ষেপ করেন—'আমি বৃদ্ধ সব হারিয়েছি।' আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়—'কিন্তু কিছুই হারায় না—সব থাকে—আছে,' 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় মাতৃ প্রকৃতির সঙ্গে কবি যেন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। কবি জানেন, তাঁর মা মর্ত্য পৃথিবীতে নেই; তবুও তার একান্ত প্রার্থনা:

একবার এসো মা তোমাকে দেখি;
সবেমাত্র আরব্ধ যৌবন নিয়ে—অতি সুকুমার—
দাও স্পর্শ—স্পর্শাতীত;
আর সেই অন্যখানে, এতদিনে
যদি কিছু শিখে থাকো, আমার যা এখনো
অজানা,
তাও বলে যাও।

আলোচ্য কাব্যের 'সেতুবন্ধ' কবিতাতে কবির জীবন-মৃত্যুর সেতুবন্ধের কথা বলেছেন। জীবন-মৃত্যু যেন একে অপরের পরিপূরক, এরা পরস্পর সংযুক্ত। কবিতাটির প্রথম দিকে দুয়ের মধ্যে ব্যবধানের কথা কবির মনে এলেও পরবর্তী পর্যায়ে জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সেতুবন্ধের ভাবনা কবির মনে এসেছে।

মনে পড়ে মৃত্যুও জীবন
পরস্পর সম্পৃক্ত অনবরত, অথচ অনন্ত দূর,
যেন দর্পণের কাঁচে চিরকাল বিভক্ত যুগলকক্ষ—
কিংবা তাও নয়—স্বচ্ছ নয়—সূক্ষ্মতর জ্যামিতিক
ব্যবধান,

অদৃশ্য, অনতিক্রম্য—যেন দুই সমান্তর ঋজুরেখা
যার ফাঁকে ফাঁকে

বৎসর, শতাব্দী, ঋতু, আমাদের অনুভূতি, সব অভিজ্ঞান এমন কৌশলে বোনা যে আমরা যদিও জীবৎকালে,

প্রতি মুহূর্তেই ম্রিয়মাণ
তবু সেই সীমান্ত পেরোনো
সম্ভবের পরপারে—যেমন কল্পনাতীত
একবার পার হলে, ফিরে আসা।

কবির মৃত্যুচেতনা আলোচ্য কবিতায় প্রকাশিত, সঙ্গে সঙ্গে জীবনচেতনাও ঘটে। জীবন ও মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করাতে কালাভিজ্ঞতা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কবির একান্ত আকাঙ্ক্ষা জীবন-মৃত্যুর সেতুবন্ধ রচনা করা। কিন্তু তা সম্ভব কি? মানুষের দেহগত মৃত্যু হলে তার জৈবিক সত্তার সঙ্গে অন্য কোনো মানুষের যোগাযোগ হয় না; কিন্তু আত্মিক সত্তার সঙ্গে হয়তো যোগাযোগ সম্ভব। জীবিত কবিসত্তা প্রয়াত কবিসত্তার সঙ্গে সংযোগের সংকেতে অভিজ্ঞ হয়। 'সেতুবন্ধ' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় কবি মনে করেছেন, মৃত্যুতে 'ক্ষান্ত সব আলাপ গুঞ্জন'। তারপর দীর্ঘকাল সেইসব অতি পরিচিত যা স্বল্প পরিচিত বন্ধুদের, কবিদের—কবির চোখে যেন ভাসে তাদের অবয়ব, ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর; কারও বা 'অরুণবর্ণ নেত্রকোনা'। কবি যার ফলে:

যাতে আমি বুঝি
আমিই তাদের পক্ষে অনন্য মিলনস্থল ছেদ
বিন্দু,
একমাত্র সূত্র, যাতে অনুবিদ্ধ তাদের পৃথক সত্তা,
সেই কেন্দ্র, যার পরিধির প্রান্তে নামাঙ্কিত
বিশিষ্ট এখনো
ঘুরে ফিরে তারা আসে যায়
সুধীন্দ্র, প্রভুচরণ, পরিমল রায়।

যারা বিস্মৃত, আপাত অবলুপ্ত, সেই পিতৃগণ, ধাত্রীগণ, বাল্যসখী, নর্মসহচর সকলেই যেন কবির সন্নিকটে আসে। এইভাবে জীবন-মৃত্যুর ভেদরেখা বিলুপ্ত হয় বলে কবি মনে করেন। মৃতদের সঙ্গে জীবিত কবিচৈতন্যের এই ভেদলুপ্ত অবস্থা থেকে সেতুবন্ধ রচিত হয় গভীর চৈতন্যে—অর্থাৎ এ কবিতার বক্তব্যে প্রতিভাত হয় কবির মৃত্যুচেতনা—যা গভীর দার্শনিকতায় পূর্ণ—'সেই স্থির অন্তরাল, সেই স্তব্ধ ঘূর্ণন, যেখানে তুমি, আমি, অন্য সকলেই।'

আপাতত পৃথক যদিও,
কেউ যুবা, কেউ বৃদ্ধ—মৃত কিংবা নিশ্চিন্তনিশ্বাস
আছি সম্মিলিত ভাবে, লুপ্তভেদ, অতিক্রান্ত,
আস্থারহিত—

যে দৃশ্য দেখেছিলেন অন্তত অর্জুন,
কিন্তু যা তোমার, আমার পক্ষে
অসহ্য, কল্পনাতীত মর্মান্তিক।

এমনকি আলোচ্য কাব্যের কয়েকটি কবিতার নামও মৃত্যু-বিষয়ক। যেমন—কবির মৃত্যু, কুমারীর মৃত্যু, কন্যার মৃত্যু, এক অপরিচিতা মৃতার স্মরণে, হনুমানের জীবন ও মৃত্যু। 'মাছ ধরা' কবিতায় তাঁর মৃত্যু-বিষয়ক ভাবনা—'সব পণ্ড হবে যদি মৃত্যু তাকে অকস্মাৎ করে নেয় চুরি'। 'মাছ ধরা' কবিতায় মাছ কবির কাছে কাব্যের উপাদানের প্রতীক। জেলের কাছে মাছ ধরার বৃত্তি হল জীবিকার্জনের উপায়। অথচ বুদ্ধদেব মাছের গতিশীল প্রত্যঙ্গ ও জলের পরিপার্শ্বে এক পরাবাস্তবতার অবতারণা করলেন—

হঠাৎ কখনো রৌদ্র দীর্ণ করে গহন আঁধার,
মুহূর্তে মিলিয়ে যায় অপ্সরার উজ্জ্বল উদ্ভাসে;
কিংবা দেয় হাওয়া, জল উল্টে যার অবোধ উচ্ছ্বাসে,
মুহূর্তে মিলিয়ে যায় কম্পমান অঙ্গসমাচার।
—মাছ? নাকি জ্বলন্ত জলের কাব্য ও স্বপ্নের ছলনা?
কিন্তু ফের কাঁপে জল, রূপ নেয় বিশ্বাস্য বাস্তবে:
ঐ তো সপ্রাণ রশ্মি, মূর্তিমতী সম্মত বাসনা
ভেসে উঠে ডুবে যায়।

আবার যে কবির সর্বশেষ ভাবনা ছিল রূপের বৈভব, রমণীয় মুখ; সেই কবি হঠাৎ একদিন মৃত্যু মুহূর্তের ভাবনায় আক্রান্ত হলেন—

—হঠাৎ দেখে অনন্তের প্লাবিত উদ্ভাস,
ফেলেছিলো, অচিন্ত্য পুলকে পূর্ণ অন্তিম নিশ্বাস,
মৃদুহেসে, অবশেষে, চেয়েছিলো ক্ষমা?

আবার 'একটি কুমারীর মৃত্যু' কবিতায় কবি নিঃসীম বেদনার শরিক হয়ে পড়েন। কুমারী জীবনে সুখ, সাধ, প্রেম, স্বপ্ন কিছু পেল না। সেই কুমারীর—

রুদ্ধ হয়ে গেল দ্বার, পৌঁছলো না স্বামীও সন্তান;
ভ্রষ্ট হলো ভবিষ্যৎ, যেন টুকরো বেলোয়ারি চুড়ি,
সর্বস্বের সমর্পণে হৃদপিণ্ডে উন্মাদ হাতুড়ি—
কে এক অচেনা এসে নিলো তার নিগূঢ় সন্তান।

রাসবিহারী এভিনিউতে শবমিছিল দেখে কবির মনে হয়েছে মানুষ এই পৃথিবীতে ঝরে পড়ে কেউ পাকা ফলের মতো রস আহরণের পর; আর কেউ পার্থিব পৃথিবীর ইন্দ্রিয় বিবশ মায়া মুগ্ধতার আগেই মৃত্যুর শিকার হয়। মৃত্যু বুদ্ধদেব বসুর কাছে পূর্ণতার প্রতীক—মৃত্যু সম্বন্ধে দার্শনিক বুদ্ধদেব।

কিছুটা বিস্মিত মুগ্ধ—যেন কোনো অদম্য ডাকাত
সব দৃষ্টি, সব দৃশ্য, লুঠ করে নিয়েছে হঠাৎ,
রেখে গেছে আশ্চর্য আঁধার শুধু চক্ষুর কোটরে।

সুন্দর সংহত শান্ত, নারীত্বের আদিম স্বভাবে
সন্নত সূর্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখ, উন্মুক্ত নিষ্কাম,
যেন ধীর বিশাল গ্রীষ্মের যত্নে এই মাত্র পেকে ওঠা ফল
নিংড়ে নিয়ে মাটির সমর্থ মদ, ঋতুর নির্যাস,
পার হয়ে অবিশ্বাসী অপেক্ষার ভঙ্গুর উচ্ছ্বাস,
হলো সে চরম, পূর্ণ! এইবার খসে পড়ে যাবে।

আলোচ্য কাব্যের আর একটি কবিতা 'সে ও অন্যেরা'। এই কবিতাটিতে কবির দীর্ঘজীবন পরিক্রমা, কবিতার ঐতিহ্য এবং শিল্পজিজ্ঞাসা যেমন রূপায়িত তেমনি স্মৃতির নানা টুকরোও এসে যায়। যেমন—

ঠাকুর্দার জামিয়ার, বাবার আলবোলা,
আটশিঙা হরিণ, বরাহমুণ্ড,—কোনো এক ধূসর
জ্যাঠার স্মৃতি,

কোনো এক প্রপিতামহী স্পৃষ্ট এক টুকরো ঢাকাই মসলিন—কবি ক্রমশ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন—তাঁর মনে হয়, 'সুবিস্তীর্ণ বাস্তুভিটা' চলে গেলে তবে সে খুঁজে পাবে 'সম্পন্ন নিজেকে।' বংশ পরম্পরায় শোণিতের গতি চলে, পরস্পর পরস্পরে লীন হয়ে যায়—অর্থাৎ প্রবহমান জৈবনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আলোচ্য কবিতার মুখ্য বিষয়।

তারপর সেই চিরকালীন অভীপ্সার বাণীমন্ত্র উচ্চারণ করেন কবি কবিতার শেষাংশে:

হে সূর্য, তোমারই আমি কণামাত্র রশ্মির স্ফুরণ,
হে অনাদি উৎস, আমি একবিন্দু নিঃসরণ শুধু।
আমাকে ফিরিয়ে নাও।

'স্বাগত বিদায়' কবিতাটি বেশ দীর্ঘ কবিতা—এ কবিতায় রয়েছে ব্রুকলিনের স্মৃতি 'এপারে ব্রুকলিন, আর ওপারে মানহাটান স্কাইলাইন'। ব্রুকলিনে থাকার সময় কবির মনে পড়ে বাংলাদেশের বৃষ্টি 'রমনার বিস্তীর্ণ ঘাসে, বালিগঞ্জে ট্রামের রাস্তায়'। ফিফথ অ্যাভিন্যুর ফুটপাথে ভেজার অভিজ্ঞতাও এ কবিতায় বর্ণিত। দীর্ঘ বাক্যবন্ধে গদ্যছন্দে কবি আলোচ্য কবিতায় সমস্ত অতীতকে যেন অকস্মাৎ ফিরে পান। কবি বন্ধু পরিজন ইত্যাদির জন্য সমস্ত সাজিয়ে অভ্যর্থনায় রত—আর যারা এখন কেউই নেই। কবি আলোচ্য কবিতায় বর্তমানের মাধ্যমে অতীতের অভিজ্ঞতায় উপনীত হতে চান। দৈহিক অবলুপ্তি মানুষকে অস্তিত্বহীন করলেও কবি তাঁদের কাছেই উপনীত হতে চান—সেইসব শিল্পী-কবিবন্ধুদের কাছে। কেন-না, মানুষের কীর্তি থেকে যায়, যদিও মানুষ চলে যায়। কবির মনে হয়েছে, নিঃসঙ্গতা আসলে মৃত্যুর নামান্তর:

মাঝে মাঝে পরস্পরের পক্ষে মরে যায়,
মাঝে মাঝে নিজেও নিজের পক্ষে মরে যায়।

যে আমি আমার মনে, তার কি অস্তিত্ব নেই

আর?
আমারও কি মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যু; আছি, নেই—
সীমানাও স্পষ্ট নয়?
কিন্তু দ্যাখো আমি নই মৃত।
তাহলে এই যাকে আমি বলি 'আমি'
সে
কে?

কবির কাব্যের নাম 'স্বাগত বিদায়' কেন? কেন-না—'সে নিত্য বিদায় বলে স্বাগত' জানায়। কবির সত্ত্বা এখন:

'অনবস্থ, অথচ ধারাবাহিক,
উপস্থিত, অন্তর্হিত, আসন্ন, আগত।'

কবির মনে হয়, বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ যেন টোকা দেয়। আসলে সে আর কেউ নয়, সে হল মৃত্যু—'সে কেবল পরবর্তী তুমি'।

'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতার আর একটি স্মরণীয় কবিতা 'সাবিত্রীর জন্য কবিতা।' এটি কবির মৃত্যুচেতনা-বিষয়ক দীর্ঘ কবিতা। এবং কবিতাটি পৌরাণিক আবহকেন্দ্রে অবস্থিত মিথকেন্দ্রিক কবিতা। 'স্বাগত-বিদায়' কাব্যগ্রন্থে আর একটি পুরাকেন্দ্রিক কবিতা হল 'হনুমানের জীবন ও মৃত্যু'—এ কবিতার হনুমান যেন কবির প্রতিরূপক, আলোচ্য কবিতায় পৌরাণিক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা পৌরাণিক আবহমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক কবির জীবন ও মৃত্যুকে পৌরাণিক হনুমান কাহিনির প্রতিরূপকে কবি যেন প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি মনে করেন, হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘনের প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন, কবিও তেমনি পেয়ে যান কবিতা রচনার অলৌকিক প্রেরণা। 'লৌহকান্তি বিরাট পুরুষ' রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের সময় হনুমান প্রত্যক্ষ করলেন—'স্রস্তকেশ, ঈষৎ কপোল, একটি দুঃখিনী বাহু যার প্রান্ত থেকে যেন মাতা মাধবীকে প্রণাম অভিজ্ঞান-প্রণাম খসে পড়ে উত্তরীর, কেয়ুর কঙ্কন।' সীতার এই দিব্য রূপপ্রভায় হনুমান উঠে যেতে থাকে শূন্য থেকে মহাশূন্যে—তারপর সমুদ্র লঙ্ঘন আর অসম্ভব থাকে না—

বেগবান, আরো বেগবান,
পুষ্পকরথের চেয়ে তীব্রতর,
যন্ত্রের চেয়ে আরো নির্ভুল সক্ষম,

আনন্দিত, চেষ্টাহীন, সংকল্পে ও সম্পাদনে
অব্যবধান—
সাবলীল সামঞ্জস্যে ধাবমান
যেন যুথবদ্ধ ঊনঞ্চাশ বাতাস।

কবিও সেই জাতীয় কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার অলৌকিক জগতে প্রবেশ করে কবিতা রচনা করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত হনুমানকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, এবং মৃত্যুর পর খ্যাতিতে শ্রুতকীর্তি হন হনুমান। কবি বুদ্ধদেবও তেমনি নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার পথ অতিক্রম করে কবিতা রচনায় সফলতা অর্জন করেন এবং মৃত্যুর পর খ্যাতিমান হন।

আলোচ্য কাব্যের শেষ কবিতা 'সাবিত্রীর জন্য কবিতা'। এ কবিতাটিও পুরাকেন্দ্রিক কবিতা ও মৃত্যুচেতনা-বিষয়ক কবিতা। কবিতাটির সূচনা মৃত্যুর সরল স্বীকৃতিতে। সকলেই চায় বিনাকষ্টে সরল মৃত্যুর অঙ্কে ঢলে পড়তে। যেমন চেয়েছিলেন তরুণ কবি কিটস। তাঁর কাছে মৃত্যু ছিল 'বাসন্তিক বরমাল্য' 'পুষ্পসারে চন্দ্রলোকে গাঁথা'। কিন্তু মানুষের কাছে মৃত্যু আসে ভয়ংকররূপে। কবিতাটির সূচনা কিটসের মৃত্যু ঐতিহ্যে—কিন্তু কবিতাটি শেষপর্যন্ত গড়ে-ওঠে সাবিত্রী সত্যবানের পুরাকাহিনিতে। আলোচ্য কবিতায় যেন কবির মৃত্যু ও পুনর্জন্মের দর্শন অভিব্যক্ত হয়। পৌরাণিক কাহিনিতে আছে সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত ভালোবাসায় স্বামীর জীবন ফিরে পেয়েছিল। চিরন্তন নিয়মে মৃত্যুর পর মানুষ ফিরে আসে না; কিন্তু এখানে সত্যবানের যে পুনরুজ্জীবন ঘটল তা হল প্রাকৃতিক নিয়ম—জন্ম-মৃত্যু এবং পুনরুজ্জীবন। কবি আসলে পুরাকাহিনির নবতাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। কবি সাবিত্রী মিথকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। মৃত্যু আসলে আত্মসমর্পণ—কবি যার জন্য অপেক্ষারত—আর এই আত্মসমর্পণ তা আসলে পুনরুজ্জীবনের নামান্তর—

আর প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে কণ্টকিত অপেক্ষা
তোমার—
এই সব সম্বলের ব্যবহারে কোনো এক মুহূর্তে তুমি
হয়তো বা ঈশ্বরের শ্রুতিগম্য হতে পারো,
যেতে পারো অবিরল—বর্তমান বিচ্ছেদ পেরিয়ে।
সেই অতি কঠিন চেষ্টারই নাম আত্মসমর্পণ,
যার মুখবন্ধে মৃত্যু, পরিণামে পুনরুজ্জীবন।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় শব্দ

"আমি শুধু উৎসুক প্রেমিক"

শব্দের, * * * * *

আর যার সম্বল কেবল শব্দ, তাকে বাধ্য হয়ে

শব্দেই চালাতে হবে সব কাজ—যতই কঠিন মনে হোক।

তাই আমি অবিরল পরিশ্রমী

[সন্ধিলগ্ন: স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা]

"আমার সদ্য-জেগে-ওঠা আত্মচেতনার ফলাফল 'দময়ন্তী' বইটার উপর পুরোপুরি ভালো হয়নি। তখন আমি কবিতার ভাষা নিয়ে ভাবছি—সেই প্রথম আমার মনে হয়েছে সেটা চিন্তার কোনো বিষয় হতে পারে, কেন-না চারিদিকে তখন রব উঠেছে কবিতার ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। 'দময়ন্তী'র কবিতাগুলোতে সেই দিকেই চেষ্টা ছিলো আমার *** আর শুধু কবিতা লিখে খুসি না থেকে, কিছুটা অসতর্ক উৎসাহের ধাক্কায়, বইটাতে একটা জাঁকালো ঘোষণাপত্র জুড়ে দিয়েছিলাম। আমার আদর্শ ছিলো এজরা পাউন্ডের ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো—আধুনিক যুগে পদ্য কীভাবে লিখতে হবে তার কয়েকটা নিয়ম বেঁধে দিতেও আমি দ্বিধা করিনি। 'সনে', 'ছিনু', 'মম', 'তব' প্রভৃতি কাব্যিক শব্দ ছেঁটে ফেলতে হবে, আকাশকে 'গগন' বা সূর্যকে 'তপন' বলা কখনোই না, 'সাধুভাষার' ক্রিয়াপদগুলিকে উপড়ে ফেলা চাই, একমাত্রিক মিল সসম্মানে স্থান পাবে—নিয়মাবলীর চুম্বক হলো এই। চল্লিশ দশকের সংলগ্নতায় সূত্রগুলির প্রয়োজন ছিল মানতেই হবে—'সাধু' ক্রিয়াপদ ও কাব্যিক ভাষা বর্জনের প্রস্তাবটি কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয়েছিলো।"

[কবিতা ও আমার জীবন: কবিতার শত্রু ও মিত্র]

বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃত বক্তব্যে তাঁর কবিতায় শব্দ ব্যবহার সম্পর্কিত ধারণার প্রকাশ লক্ষ্যগোচর। এবং একথা ঠিক যে, শব্দ ব্যবহারে তাঁর পরিশ্রম বিফলে যায়নি। 'দময়ন্তী' কাব্যের প্রথম সংস্করণে যে ইস্তাহারটি কবি ছেখেছিলেন পরবর্তী সংস্করণ থেকে সে ইস্তাহারটি তিনি বর্জন করেন। এমনকি কোনো প্রবন্ধগ্রন্থেও তার স্থান হয়নি। তবে সেই ইস্তাহারটি আমাদের দেখে নেওয়া উচিত। ইস্তাহারটি নিম্নরূপ:

১। "বাক্যবিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হবো না।

২। সাধু ক্রিয়াপদ হইবে, বলিব, করিতেছে প্রভৃতি ব্যবহার করবো না।

৩। কাব্যিক ক্রিয়াপদ কুটি, চলিছে, হতেছে ইত্যাদি বর্জনীয়।

৪। কাব্যিক শব্দকে সম্পূর্ণ বয়কট করে চলবো। মম, তব, কভু, যেথা, মোদের, সাথে, মাঝে, আঁধার, মনে, যহে, মতন, পরান এই ধরনের কথাগুলিকে কাছেই ঘেঁষতে দেবো না।

৫। মতো অর্থে প্রায়, দাও অর্থে দেহ, দেখতে অর্থে দেখিবারে, এলাম অর্থে এনু, পারি না অর্থে নারি এসবও নির্মমরূপে বর্জনীয়। প্রতিশব্দ এড়িয়ে চলবো। হাতকে হস্ত, গাছকে তরু, ফুলকে পুষ্প, হাওয়াকে পবন, পৃথিবীকে ভুবন বলবো না। মুখের কথায় এদের যা বলি কবিতাকেও তাই বলবো। অধিকরণে তে (ঘরেতে, টেবিলেতে) পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক রীতি হলেও, কিংবা সেইজন্যেই প্রাদেশিকতা বলে বর্জনীয়।

৬। অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সাংস্কৃতিক; সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন? সূর্যকে রবি কিংবা আকাশকে গগন বলবো না; কেন-না ওগুলো আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের কথা, কিন্তু 'রতিহ্রস্ব' কি 'স্বতঃশ্লথ' বলতে দোষ নেই, কেন-না ও ধরনের কথা আমাদের মৌখিক আলাপে কখনোই ব্যবহৃত হয় না।"

[শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা' থেকে পুনরুদ্ধৃত]

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যে তিনি ঘোষণাপত্রের আদর্শে এজরা পাউন্ডের ম্যানিফেস্টো দ্বারা অনুপ্রাণিত। এজরা পাউন্ডের নির্দেশিত সূত্রাবলি নিম্নরূপঃ বিষয়টি বস্তুগত বা ভাবগত নিরপেক্ষভাবে তাকে প্রত্যক্ষরূপে ব্যবহার করতে হবে। অনিবার্যতাহীন শব্দ বর্জিত হবে। ছন্দস্পন্দনের পরম্পরা না মেনে সাংগীতিক বাগধারা অনুসৃত হবে। ইমেজিজম এর সূত্রমালা হলঃ চলতি কথা থেকে শব্দ চয়ন করতে হবে, অলংকারময় শব্দ বর্জনীয়। ছন্দগত-স্বাধীনতা প্রয়োজন, কবির বিষয়নির্বাচনগত স্বাধীনতা থাকবে, চিত্রকল্প নিবিড় হবে, কবিতা হবে দৃঢ় সংবদ্ধ, স্পষ্ট ইত্যাদি।

এজরা পাউন্ড যেমন তাঁর ইমেজিজম-এর ঘোষণাপত্রে আবদ্ধ রইলেন না, তেমনি বুদ্ধদেব বসুও তাঁর ঘোষণাপত্রে আটকে রইলেন না। 'দময়ন্তী' কাব্যে বুদ্ধদেব কথিত সূত্রাবলি সম্পূর্ণত প্রযুক্ত হয়নি; তবে একথা সত্য যে; বুদ্ধদেব বসু উক্ত ঘোষণাপত্রের দ্বারা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ভাষাকে পরিবর্তনের যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে অনেক সফল হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব ভাষাভঙ্গি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতার ভুবনেও ভাষাভঙ্গির ও শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তমানতা লক্ষিত হচ্ছিল।

দুই

"আধুনিকতার অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে শব্দ। পরিবর্তমানতার বিভিন্নতায় রূপান্তরীকরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হলেও, কবিতার আধুনিকতা শব্দানুষঙ্গতার উপর যে অধিকাংশ পরিমাণে নির্ভরশীল—এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। যদিও রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতাকে নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে উপমিত করেছেন, তবুও কবিতার পাঠক বা সমালোচককে মনে রাখতে হবে যে, কালিক পরিবর্তমানতাই আধুনিক কবিতার একমাত্র মৌল লক্ষণ নয়। কেন-না কবিতার মাধ্যমিকতা তার শব্দে। আবার কবিতার ব্যাপ্তিও তার শব্দে। শব্দ অজস্র সম্ভাবনাবাচকতার অন্যতম নিদর্শন। শব্দ ব্যতিরেকে কবিতার দেহ নির্মাণ অসম্ভব ও অবাস্তব বলেই শব্দকে বাদ দিয়েই কবিতায় আধুনিকতার অন্বেষণ অবিজ্ঞানোচিত। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির মৌল পরিবর্তন মানবিক ভাবজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করলেও, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বস্তুজগৎ নিয়ন্ত্রিত হলেও, এ কথা অনস্বীকার্য যে, কবিতার শারীরিক সত্তা ও অন্যান্য ভাবনাকেন্দ্রিক পরিবর্তমানতার প্রতিভাষণ ঘটে শব্দের মাধ্যমে।

শব্দই হচ্ছে কবিতার একমাত্র উপাদান। শব্দের মাধ্যমেই কবিতার চিত্রলতা ও গীতলতা ব্যক্ত। শব্দ যেন চিত্রকলার রং। যেমন বিভিন্ন রঙের সমবায়ে ও সমন্বয়ে চিত্রের একটি সামগ্রিক অর্থ আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়, তেমনি কবিতাতেও শব্দের উপাদান কখনও বিচ্ছিন্ন কখনও অবিচ্ছিন্নভাবে, একটি সমগ্রতার ব্যঞ্জনায় আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয়। শব্দের মাধ্যমে যুগগত বোধ ও মানসিকতা একই সঙ্গে ব্যক্ত হতে পারে। কবিতার অব্যক্ততাও শব্দকেন্দ্রিক; অর্থাৎ শব্দকে কেন্দ্র করে কবিতার ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী জগৎ আবর্তিত। শব্দগত পরিবর্তন কবিতাকে বাঙ্ময় অথবা অবাঙ্ময় করে তোলে। শব্দ স্বপ্রকাশিত হলে কবিতা স্বপ্রকাশিত; আর অপ্রকাশিত হলে কবিতার অব্যক্তময়তা। তা হলে, কালিক জাগতিক পরিবর্তন অতিক্রামী ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত কবিতার শব্দে। সমস্যা হচ্ছে যে, কবিতার যে আধুনিকতা শব্দানুষঙ্গে উদ্ভাসিত তার পটভূমিকায় কি কোনো যুগগত সাধনা বা যুগগত পরিবর্তন থাকে? পরিবর্তিত ইতিহাসের গতিপথ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, মানবসমাজে রাজনৈতিক পরিবর্তন এলেও, শিল্পক্ষেত্রে বৃহত্তম পরিবর্তন দুর্লক্ষ থাকে। এ কথা বলার অর্থ এই যে, ইতিহাসগত বিস্ফোরণ মানব-সভ্যতার গতিপথ-নির্ধারক হলেও, তা' কখনও শিল্পের জগৎকে তাৎক্ষণিক পরিবর্তনে নিয়মবন্ধ করে না। আসলে, শিল্প যখন তার সাধনা সম্পর্কে সচেতন হয় অর্থাৎ শব্দ সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়, তখনই শব্দানুষঙ্গজনিত পরিবর্তমানতার ঢেউ প্রবাহিত থাকে। বস্তুগত ও ভাবগত ইতিহাসে কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও, শিল্পগত সাধনার ক্ষেত্রে পরিবর্তনজনিত প্রবণতামূলক সাধনা শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যুগান্তকারী ঘটনা, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব, সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক দর্শন সাধনাকে ত্বরান্বিত করে মাত্র; আর এই ত্বরান্বিত করণের মাধ্যমেই কবিতার আধুনিকতা দৃশ্যমান হয়। ইতিহাসগত পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে কবিতার ভাব বা দেহরূপকে নিয়ন্ত্রিত করে না, শব্দ মাধ্যমেই কবিতা কবিতা হয়। সুতরাং শব্দ কবিতার ভাগ্যনিয়ন্ত্রী এ কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। শব্দ কবিতার মৌল সত্তা, যার উপর নির্ভর করে কবিতার কাঠামো; আবার কবিতার কাঠামোর মাধ্যমে যুগ প্রতিফলিত হয় বলে, শব্দানুষঙ্গতাই কবিতার মূল সম্পদ। শব্দানুষঙ্গে কবিতার আধুনিকতা বিচার্য, কেন-না কবিতায় আধুনিকতা ও শব্দানুষঙ্গতা অভিন্ন। কখনও এই শব্দ প্রতীকী, কখনও রূপকী, কখনও সাধারণ হয়েও লক্ষের অভ্রভেদী ব্যঞ্জনায় সূচিমুখ তীব্র। কবিতার গতি তীব্রতায় খরদীপ্ত শব্দের জন্যই। শব্দ-নির্বাসিত কবিতা আদৌ কবিতা নয়। আটপৌরে জীবনের মতো ম্যাড়মেড়ে। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, আটপৌরে শব্দের মধ্যে কোনো দীপ্তি নেই। শব্দ যাই হোক না কেন সেটি নির্ভর করবে তার দীপ্তি এবং দ্যুতির উপর। অর্থাৎ শব্দের ব্যবহারযোগ্যতাই তার প্রাণ।

শব্দের নিজত্ব বা নিজস্ব প্রাণ আছে কিনা তা গভীর বিবেচনার ও আলোচনার বিষয়। শব্দের নিজত্ব অর্থাৎ শব্দের ব্যক্তিত্বই কবিতার ব্যক্তিত্ব; কবিতার নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই; শব্দের ব্যক্তিত্বে কবিতা গৌরবী। কবিতায় শব্দকে অর্থবহতায় উত্তীর্ণ করিয়ে দিতে হবে; ব্যবহৃত শব্দ যেন অনুভূতির, বস্তুর না আবেগের প্রতীক হয়। কবিতার অর্থবহতা যেমন একটিমাত্র শব্দে সমর্পিত তেমনি আধার শব্দের সামগ্রিকতা কবিতার একটিমাত্র প্রকাশিত ব্যক্তিত্ব, শব্দ জীবন-জিজ্ঞাসার বাহন, শব্দ বক্তব্য প্রকাশের সীমা, শব্দ প্রতিদিনের হলেও গভীর দ্যোতনাবাহী।

আধুনিক কবিতার কলাবিধিতেও শব্দের সমর্থন স্মরণীয়। শব্দানুষঙ্গ আধুনিক কবিতার মূল চরিত্র ভিত্তি।

কবিতা সর্বদেশের সর্বকালের নিত্যসামগ্রী। দেশে কালে তা এক ও অবিভাজ্য না হলেও সমস্ত শিল্পের ন্যায় কবিতাকে মাধ্যমে আবিষ্কার করতে হয়, আর সে মাধ্যম শব্দ। শব্দের নিত্য নতুন অর্থ আবিষ্কারের মধ্যেই কবিতার আধুনিকত্ব বা অনাধুনিকত্ব নিহিত। শব্দ চৈতন্যের প্রতিক্ষেপণ মাত্র। শব্দ তাৎপর্যমণ্ডিত হয় তার ব্যবহারযোগ্যতার ওপর; আর সেই ব্যবহারযোগ্যতা সমাজ-মানসের ক্রমাভিব্যক্তিতে নিহিত; শব্দ-বহতা সমাজ মানসিকতার প্রতিফলন; সমাজ-আর্থ-রাষ্ট্রনীতি শাব্দিক সমন্বয়ধর্মিতায় আধুনিক কবিতায় প্রতিফলিত বলে শব্দানুষঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা উল্লেখ্য। কিন্তু এই বিষয়বস্তুর ওপর কোনো নির্দিষ্ট প্রত্যসঞ্জাত সার্থক বা নঞর্থক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভব নয়। শুধু একটি রেখাঙ্কন মাত্র করা চলে। কারণ কবিতা, বিশেষভাবে আধুনিক কবিতা, স্থাবর নয়; যাতে করে পরিণাম নির্দেশ করা চলে, জঙ্গাম সূর্যের মতো দুরন্ত আবেগে ভরপুর আধুনিক কবিতার যাত্রাপথ বহু দূরে বিসর্জিত। তা ছাড়া, কবিতা নিরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান বলে পরিবর্তিত সামাজিক শিবির ও শ্রম বিন্যাসের সঙ্গে কবিতার রূপান্তর ঘটে। বিষয়বস্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, আলোচিত হতে পারে। অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা সম্ভব। যে সমস্ত চেষ্টা পৃথক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়; এখানে সাময়িক শব্দের অনুষঙ্গে আধুনিক কবিতা কোন্ পথে তার একটি বক্তব্যের উপক্রমণিকা মাত্র এখানে উপস্থাপিত করা হবে।

মানবসমাজে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো তাৎক্ষণিক বৃহৎ পরিবর্তন না আনলেও, কবিতায় শব্দের ব্যবহার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে যে, বৃহৎ জাগতিক পরিবর্তন কবিতার ক্ষেত্রে অনেক আগেই অনুভূত হতে থাকে এবং সেই অনুযায়ী শব্দানুষঙ্গেরও পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অনুভাবনাবোধ জড়িত। কেন-না, আধুনিক কবিতার সমস্যা শুধু বুদ্ধির বা কল্পনার নয়, আঙ্গিকের বটে; বিশেষভাবে শব্দানুষঙ্গের। শব্দানুষঙ্গের এই পরিবর্তমানতার ফলে আজকের কবিতা নতুন বিবেচনার উৎভূমি।"

[বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও শব্দানুষঙ্গ / ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়]

"বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথমেই শব্দের প্রেমে পড়েছেন। তাঁর কাছে শব্দ সুন্দর, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, তিনি শব্দের আলো ছড়াতে চেয়েছেন দূরে, আর শব্দের বিভায় কাছে আনতে চেয়েছেন গোপন; সেজন্য শব্দের বিবর্ধমান বিবরণ, ধ্বনি আর আবেগ তাঁকে উৎপন্ন করেছে শস্যের মতন। তিনি বারে বারে নিজেকে ফলিয়েছেন, শব্দের মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন নিজেকে ও অন্যকে, এবং এই অন্যটি তিনি নিজেই। অন্যের আয়নায় তিনি নিজেকে দেখেছেন, নিজেরই কথা বলা শুনেছেন, দেখেছেন শব্দে তৈরি হচ্ছে জগৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিংবা নিশীথের ভীষণ থেকে বদান্য দিন পর্যন্ত শব্দে জেগে ওঠে উম্মতা, শব্দে চঞ্চল হয় সর্বজীব, শব্দে লিপ্ত হয় মানুষেরা।...শব্দপ্রেম আসলে ভাষারই

প্রেম, আর ভাষাচর্চা তাঁকে ভাষার মূলে নিয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত আর সংস্কৃতের সঙ্গে জড়িত ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য। তিনি শুরু করেছেন নিঃসঙ্গ আবেগ নিয়ে, সেজন্য প্রাথমিকভাবে তাঁর শব্দ উত্তাল কিংবা অস্থির, উজ্জ্বল ও বিচ্ছুরিত, কিন্তু অন্তিমে, গন্তব্যে পৌঁছে তিনি ঘন আর সংহত, তিনি নিজের মধ্যে সংহার করেছেন তাঁর আবেগের উত্তালতা, সংবরণ করেছেন উচ্ছ্বাসের অমিতাচার, বদলে লাভ করেছেন ভাষার সংহতি আর বেগ, দূরস্পর্শী ইঙ্গিত আর রীতির ঘনত্ব, সেজন্য শেষ পর্যায়ে তাঁর নায়কেরা কিংবা তিনি শব্দকে ভাষার মধ্যে শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর, ঐতিহ্যের খোঁজে বর্ধিত বেগ, এভাবেই বুদ্ধদেব বসু শব্দের গন্তব্যে পৌঁছে ভাষার উৎসে নিজেকে নিয়ে গেছেন।" বুদ্ধদেব বসু: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪]

'শব্দের গন্তব্যে পৌঁছে' 'ভাষার উৎসে নিজেকে নিয়ে' যাওয়া কবির একমাত্র জীবনসাধনা না হলেও অন্যতম সাধনা বটে। বিশেষত সেকাল যদি হয় জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার কাল। আবার যুগের জটিলতা যে সর্ব কবিচিত্তে প্রশ্নাতুরতা সৃষ্টি করবে এমন কোনো নিঃসংশয় শর্ত নেই। যিনি কালসচেতন, সমাজ-আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লাবনে যাঁর চিত্তদেশ বিপুল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকে অথচ তাকেই একমাত্র সত্য বলে মনে না করে, ইতিহাসের সারাৎসারে আপনাকে ঋদ্ধ করে তোলেন তিনি। অবশ্য যে অর্থে বুদ্ধদেব বসু সামাজিকতার ফলভাক্, সেই অর্থে আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত সামাজিকতা বিচার্য নয়। বুদ্ধদেবের মধ্যে যে 'সচল-উজ্জ্বল সংস্কৃতিমনস্কতা' ছিল তাই তাঁকে বার বার এক পর্ব থেকে আর এক পর্বান্তরে যাত্রা করিয়েছে; ফলে বুদ্ধদেব বসু শব্দের এক জগৎ থেকে অন্য জগতে প্রস্থানী পথিক। বুদ্ধদেবের সমাজ-সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি সচেতনতার ফলশ্রুতিমাত্র; আর এই কারণেই বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তিবাদী। ব্যক্তিবাদী এই বিশেষণটি বুদ্ধদেবের নামের আগে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা চলে এবং এতে তাঁর গৌরব বাড়ে। "কেন-না তথাকথিত 'সমাজ-সচেতন' সাহিত্যিকগণ যখন এক নাতিস্পষ্ট জনসমাজের সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁদের একান্ত পার্শ্ববর্তী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে গাঢ় উদাসীনতা পালন করেন, তখন বুদ্ধদেবকে দেখি সমস্ত সাহিত্য তথা সাহিত্যিক সমাজের জন্য চিন্তিত। বস্তুত, বুদ্ধদেব সাহিত্যের যে সামাজিক দায়িত্ব উদ্‌যাপন করেছেন, কোনো সাহিত্যিকই—কোনো 'সমাজ-সচেতন' বাঙালি-সাহিত্যিকই তা করেননি। কিন্তু বুদ্ধদেব সদর্থে ব্যক্তিবাদীই ছিলেন; কেন-না সমস্ত বহির্দুনিয়া ঢুকে পড়েছিলো তাঁর মধ্যে।" [বুদ্ধদেব বসু: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। পূর্বোক্ত]

আসলে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিবাদিতা তাঁর সমাজসচেতনতারই অঙ্গ, কেন-না কোনো কবিই তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাজবিচ্যুত হতে পারেন না। যদি কোনো কবি সমাজসচেতন না হন তা হলে তিনি শব্দসচেতন হতে পারেন না; কারণ সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দগত চেতনাবোধও পরিবর্তিত হয়। কোনো কবি যতই ব্যক্তিবাদী হোন না কেন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিগত রূপান্তর তাঁর মনে সমান প্রভাব বিস্তার করবেই এবং কবি সেই কল্পান্তের কালরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে নতুন দিনের সাধনায় মুক্তির ললিত-লগ্নকে করধৃত করবার জন্য শব্দের চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে সচেষ্ট হবেন। কোনো কবি যদি পরিবর্তিত যুগচেতনার

প্রেক্ষাপটে শব্দের মূল্য নির্ণয়ে তৎপর না হন তা হলে কবিতা হয়ে যাবে শুধু তাঁর কাছে নয়, সমাজ পাঠকের কাছে মূল্যহীন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় ব্যক্তিরূপে এমনভাবে প্রতিভাত হয়েছেন যে, বাংলা কবিতার রাজ্যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র তুলনায় তাঁকে ব্যাক্তিবাদী অভিধায় অভিহিত করা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবাদী নন, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। "বুদ্ধদেব নিশ্চিতভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁর অভিজ্ঞতা সংগ্রহের ধরন একান্তভাবে ব্যক্তিক, জগৎ সংসার সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও কবি কল্পনার মধ্যে একটা ফারাক আছে, কোন সাঁকো নেই দুইয়ের মধ্যে, সেজন্য বুদ্ধদেবের পারাপার নেই বিষয় বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তিক বিষয়ীর, তাই তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর অভিজ্ঞতায় শুদ্ধি ঘটায় না, তিনি নিজেকে কখনো ছাড়তে পারেন না। তাঁর নিজের প্রতি ভালোবাসা তীব্র, জ্বলন্ত, প্রখর, সেজন্য তাঁর রচনায় বিস্ময়কর নাটকীয়তা ও নৈপুণ্য জ্বলজ্বল করে, কিন্তু তাঁর আত্মপ্রেম, লোভ ও আসক্তি তাঁর শিল্প-জিজ্ঞাসার চৈতন্যের শুদ্ধতা তৈরী করে না, তিনি থেকে যান অতুলনীয় কুশলী হিসেবে, তাঁর শিল্পের নন্দনতত্ত্ব চমকের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, সমগ্রজীবনের বদলে মুহূর্তের সন্ধানে তিনি পশ্চিমী সাহিত্যের বিভিন্ন ঝোঁকে তাল মেলাতে থাকেন, এভাবেই তাঁর কাছে এসে যায় ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রবণতা।" [বুদ্ধদেব বসু: দশ দিগন্তের স্রষ্টা। আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৮০]

তিন

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় তৎসম, দেশজ, বিদেশি, যৌগিক শব্দের সার্থক প্রয়োগের সঙ্গে নামবাচক বিশেষ্যপদ, বিশেষণপদ, সর্বনামের তুচ্ছার্থ ও গৌরবার্থরূপ, অব্যয়, ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের ব্যবহার, নামধাতুর প্রয়োগ, স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার ইত্যাদিতেও বেশ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় তৎসম শব্দের ব্যবহার কিন্তু কোনো দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেনি। আসলে দুরূহ বা অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করলেও তা যেন কৃত্রিমতা দোষদুষ্ট না হয়—এমনই ছিল তাঁর অভিমত। বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি কবিতার উদাহরণ প্রমাণ করে যে তৎসম শব্দের ব্যবহার কোনো দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেনি। যেমন:

১. নবার্করঞ্জিত পট্টবাস। ২. মৃত্যুর মদিরামত্তা। ৩. কটাক্ষ ঈক্ষণ। ৪. মন্দাকিনী বারিস্নাত। ৫. চতুর্বর্গ বিনিন্দিত। ৬. কামার্ত গৃধ্নুতা ইত্যাদি, অথবা একটি স্তবক:

৭. বিম্বাধর, কৃশকটি, করভোরু, প্রশস্ত জঘন,
আশ্চর্য যুগলস্তন, কৃষ্ণকেশ, আমধ্যলুণ্ঠিত,
কুসুমকোমল ত্বক আরক্ত মাংসের আচ্ছাদন,
মধুরাত্রে রতিক্রীড়া জ্যোৎস্নাধৌত পুষ্পশয্যা....ইত্যাদি।

তবুও তিনি মনে করেছিলেন, "বাঙলা কবিতার ভাষা আরো সহজ হবে—রবীন্দ্রনাথের চেয়েও সহজ—প্রায় প্রত্যেক অতি আধুনিক কবিতেই এই tendency দেখতে পাচ্ছি। আমরা শব্দের মধ্যে জাতিভেদ করে মাতৃভাষাকে দুর্বল করে রাখছি। কিন্তু এই কৃত্রিম ভেদজ্ঞান কিছুতেই

চিরস্থায়ী হতে পারবে না। আমাদের কবিতায় চলতি কথা ক্রমশই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে—শীগ্‌গিরই আসবে—যেদিন সংস্কৃতর শরণাপন্ন হতে হলেই আমরা লজ্জার বিষয় মনে করবো।" [বাঙলা কবিতার ভবিষৎ: বু. ব. রচনাসংগ্রহ. অষ্টম খণ্ড] মৌলিক কবিতাতেই নয়, অনূদিত কবিতাতেও বুদ্ধদেব বসু বেশ অর্ধ বা ভগ্নতৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন: গরজে, স্বপন, মরম, মগন, যতন, বারতা ইত্যাদি। তবে তাঁর কবিতায় দেশজ শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট সার্থক। যেমন—ছেনে, আকুলি-বিকুলি, শিথান, মশকো, ফাৎরায়, হিড়হিড়, ছাউনি, কামাই, খদ্দের, ট্যাঁক, পাটাতন, জাঙাল, দুদ্দাড়, ব্যামো, ফুসমন্তর, কৌটা, কাঁথা ইত্যাদি। এমনকি 'শার্ল বোদলেয়ার ও তাঁর কবিতা' অনুবাদকাব্যে বুদ্ধদেব বসু উকুন, কোদাল, ডেরা, গেরো, ট্যাঁক, চাতাল, দড়িদড়া, হামাগুড়ি, বেবাক, হোঁচট, মাদুর, তাকিয়া ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার করেছেন। আবার মধ্যযুগীয় কাব্যিক শব্দও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়। যেমন:

১. প্রেমের সমাধি হতো অগোচরে মোদের **দোঁহার**।

২. মোদের **দোঁহার** মাঝে অলক্ষিতে দাঁড়ালো কখন।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বিদেশি শব্দের বিপুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এই বিদেশি শব্দগুলি হল যথাক্রমে আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, তুর্কি, ইংরেজি।

(ক) **আরবি**— মেজাজ, তুফান, হারেম, মোলায়েম, আতর, মালুম, আলখাল্লা, মৌতাত, মহড়া, কবর, মুশকিল, কবুল, জাহান্নম ইত্যাদি।

(খ) **ফারসি**—রোজ, শুর্মা, নিশান, শরম, চাবুক, কয়েদি, বেগার, গ্রেপ্তার, দুখম, বরবাদ, আন্দাজ, দস্তানা, জল্লাদ, শামিয়ানা ইত্যাদি।

(গ) **উর্দু**—তলোয়ার, সাচ্চা ইত্যাদি।

(ঘ) **হিন্দি**—মাতোয়ারা, ফালতু ইত্যাদি।

(ঙ) **তুর্কি**—পাহারা, তক্‌মা ইত্যাদি।

(চ) **ইংরেজি**—গ্রামোফোন, প্ল্যাকার্ড, ট্র্যাফিক, ল্যাম্পপোস্ট, ড্রয়িং রুম, রেডিয়োগ্রাম, সার্চলাইট, পলিটিকস, প্রোফেসর, লেক, ইজি-চেয়ার, ডায়ালেকটিক, এরোপ্লেন, ব্ল্যাক আউট, ডিভান, লিপিস্টিক, ক্যাথিড্রাল, রোম্যান্টিক ইত্যাদি।

আবার অনেক বিদেশি শব্দকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষা ভাণ্ডারে এনেছেন। এ প্রসঙ্গে 'সেরেনাদ' কবিতাটির উল্লেখ করা চলে। এ জাতীয় বাংলা যা বিদেশি শব্দ ভাণ্ডারে (ইতালীয় ভাষায়) নেই। বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং এ শব্দটি সম্পর্কে জানিয়েছেন:

"ইতালীয় ভাষায় সেরেনো (SERENO) অর্থ খোলা হাওয়া, তা থেকে সেরেনাতা (SERENATA)—খোলা হাওয়ার গান বা রমণীর বাতায়ন তলে পুরুষকর্তৃক রাত্রে যে গান গাওয়া হয়। ইংরেজিতে SERENADE—রূপে এই শব্দ আমাদের পরিচিত, কিন্তু NADE-এর উচ্চারণ NADE-এর মতো বলে বাংলায় তা ব্যবহারের অযোগ্য এবং বিদেশী শব্দের ইংরেজি রূপ যা উচ্চারণকে আদর্শ বলে মানতে আমরা বাধ্য নই। সেরেনাদ লিখে শব্দটিকে বাংলার

কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা গেলো।" [কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড] যৌগিক শব্দের প্রয়োগে বুদ্ধদেব বসু অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী। কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার উদাহরণ এর পক্ষে রায় দেয়। যেমন:

১. সর্বদেহে মাখিয়াছি প্রণয়ের **চন্দন-কুঙ্কুম**

২. সঞ্চিত আশার জ্যোতি ডুবে গেছে **বিস্মৃতি-তিমিরে**

৩. ফুটুক **আনন্দ-পারিজাত**

৪. **রমণীরমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা** মাগে নিতি

৫. বন্ধনহীন **আনন্দ-উচ্ছ্বাসে**

এই জাতীয় সীমাহীন উদ্ধৃতির প্রয়োগ দেখানো যেতে পারে। কিন্তু উদ্ধৃতি না তুলে যৌগিক শব্দের একটি নির্বাচিত তালিকা উপস্থিত করা যেতে পারে।

ক. **বন্দীর বন্দনা:** বাদ্য-নিদ্রা-জাগরিত, নীলাম্বর-তলে, আনন্দ-অভিলাষী, অমৃত-মন্দাকিনী, নবার্ক-রঞ্জিত পট্টবাস, আশ্লেষ-আবেশ-তৃষ্ণা, উষ্ণতনু-আস্বাদন, বিলাস-বিন্যাস-বল্কল, বসন্ত অন্তরাল, অন্তর-বিমোহিনী ইত্যাদি।

খ. **কঙ্কাবতী:** ছন্দ-শিহর, মৃত্যু-আঁধার, স্বপ্ন-পাথার, তরঙ্গ-তীর, রুধির সমুদ্র, নিশীথ-অরণ্য ইত্যাদি।

গ. **দময়ন্তী:** নীহারিকা স্বপ্নাকুল, অকুণ্ঠলুণ্ঠনকারী, কল্পনা আশ্রয়ী, রাকেশ-লোভন ইত্যাদি।

ঘ. **দ্রৌপদীর শাড়ি:** তীব্র-থরো-থরো, ঘন-চুম্বন, ফেন-উচ্ছল, ফ্যাকাশে-হলদে ইত্যাদি।

ঙ **শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর:** স্বর্ণ-সেতার, জাগরণ-উপবন, সিন্ধু-মোহনা, সন্ধ্যা, অহনা।

চ. **যে আঁধার আলোর অধিক:** শাদা-ডোরাকাটা-বরাভয়, ইতি-উতি, স্তন গৌরব ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় নামবাচক বিশেষ্যপদের প্রয়োগ নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত হতে পারে:

১. **পৌরাণিক ও বর্তমানকালের ব্যক্তিত্ব**—সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, বাসুকি, যক্ষ, দ্রৌপদী, মদন, পার্বতী, শিব, পাঞ্চালী, চিত্রাঙ্গদা, কৃষ্ণা, অভিমন্যু, রাধিকা, উর্বশী, দশভুজা, বলরাম, পরশুরাম, কুবের ইত্যাদি।

দাভিঞ্চি, মিকালাঞ্জেলো, ম্যাকবেথ, গেব্রিয়াল, ডনজুয়ান, গ্যালিলিও, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, হেগেল, দান্তে, গ্যেটে, কলম্বাস ইত্যাদি।

প্রতীচ্য পুরাণের মধ্যে আছে—অফ্রোদিতে, ফস্টাস, প্রফার্পিনা, ম্যাডোনা, আন্দ্রোম্যাকি, এলেকট্রা, ইকারুস, অর্ফিয়ুস ইত্যাদি।

২. **স্থান বা দেশনাম**— উজ্জয়িনী, অজন্তা, মহেঞ্জোদাড়ো, তাঞ্জোর, বিদিশা, বালিগঞ্জ, বাগবাজার, দিল্লি, আগ্রা, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, চেকোশ্লোভাকিয়া, হনলুলু, জাপান, ঠাঁচি কুমিল্লা, শান্তিনিকেতন, পুরানাপলটন ইত্যাদি।

৩. **প্রাণীজগৎ**— হরিণ, ভালুক, জোনাকি, ঘোড়া, মাছি, কাক, চিল, অক্টোপাস, তিমি, উকুন, প্যাঁচা, ঘাসফড়িৎ, ময়াল, চাতক ইত্যাদি।

৪. **বৃক্ষ-লতা-ফুল**—কমল, বকুল, পারিজাত, বনলতা, অটবি, আইভিলতা, কৃষ্ণচূড়া, লিলি, ধান, কুরুবক, মালতী, কুবলয় ইত্যাদি।

৫. **সংগীত ও নৃত্যবিষয়ক**—ভৈরবী, কর্তাল, বেহালা-শঙ্খ, বাঁশরী, বীণা, দীপক, হেমন্তের গান, বেলো, বিশ্বজয়ী গানের মন্ত্র ইত্যাদি।

বিশেষণ ব্যবহারে বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। প্রথমে বিভিন্ন কাব্য থেকে স্মরণীয় বিশেষণের তালিকা দেওয়া হবে। পরবর্তী অংশে বিভিন্ন কবিতায় বিশেষণ ব্যবহারের বিচার করা হবে। বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন কাব্যে ব্যবহৃত বিশেষণের তালিকা:

১. **বন্দীর বন্দনা**: আরক্তিম কামনা, তরুণ রক্তিমা, অসহ্য লজ্জা, শীতল প্রণয়, নিঃসম্বল নীলাম্বর, গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিন, নির্মাল্য অম্লান, ব্যথাগাঢ় নীলিমার স্নিগ্ধঘন বাস, বিদ্যুৎময় বিরহগৌরব, অপার পিপাসা, রক্তাক্ত ক্ষতের বিভীষিকা, নিষ্ঠুর বিদ্রুপ, কায়াহীন বুভুক্ষু অধর, আশ্লেষ আবেশ তৃষ্ণা, উষ্মতনু আস্বাদন ইত্যাদি।

২. **কঙ্কাবতী**: রাঙা ভাঙা চাঁদ, আগ্নেয় যৌবন, স্পন্দমান কান্না, আহত সময় ইত্যাদি।

৩. **দময়ন্তী**: অবরুদ্ধ ক্ষীণতা, জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড, মৃন্ময় আঁধার, অবিচ্ছেদ ধূসরতা, ধূসর মুহূর্তদল, স্তব্ধ আলোর প্রপাত, দুরন্ত সোনালি বাঘ, আতাম্র পশ্চিম, পীচ আরক্ত মত্ততা, সারমেয় গণতন্ত্র ইত্যাদি।

৪. **দ্রৌপদীর শাড়ি**: রৌদ্রের প্রাসাদের ধারালো জ্বলোজ্বলো জানালা, সৌর-সৌখিন দীপ্ত জানালা, স্ফূর্তির ফেনায় স্ফীত শহর ইত্যাদি।

[তালিকাটি অসম্পূর্ণ; এবং সমস্ত কাব্যের বিশেষণ এখানে নেই।]

ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের ব্যবহারও তাঁর কবিতায় অলভ্য নয়। 'বন্দীর বন্দনা'য় করেছিনু, গিয়েছিনু, লভেছিনু, পেয়েছিনু, সম্ভাষিণু, রহিনু, করিলু, দিনু, গেনু ইত্যাদি ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হলেও তিনি পরবর্তীকালে এই জাতীয় ক্রিয়ারূপ ব্যবহারে উৎসাহ দেখাননি। আবার 'বন্দীর বন্দনায়' কহিয়া, কয়েছে, দিয়েছি, চলিসে, কহিবারে, লভিবেন ইত্যাদি ক্রিয়ারূপেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তা ছাড়া হারায়েছে, ঝরায়েছে (কঙ্কাবতী), পারতুম, দিতুম, চেয়েছিলুম (নতুন পাতা), ভাসায়ে, ফুটিয়েছি, বাজিয়েছে (শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর) ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার দুর্লক্ষ্য নয়।

'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে নামধাতুর ব্যবহার সুপ্রচুর হলেও অন্যান্য কাব্যে তেমন নয়।

১. **বন্দীর বন্দনা**—উদগারিছে, আন্দোলিয়া, চমকিয়া, উপেক্ষিয়া, ধ্বনিয়া, রনিয়া, নিশ্বসিয়া, বিথারিয়া, উচ্ছ্বলিয়া, আন্দোলিছে, প্রসারিলো, প্রকাশিলে, কণ্টকিয়া, উদগারিয়া, আকুলিয়া, অবহেলি, রোমাঞ্চিয়া ইত্যাদি।

সেই তুলনায় 'কঙ্কাবতীতে' নামধাতুর প্রয়োগ অনেক সীমিত। যেমন—স্বনিছে, স্পন্দিছে,

অপেক্ষিছে ইত্যাদি। 'দময়ন্তী'তে মঞ্জরিবে, আকর্ষিবে, উচ্ছুলি এবং দ্রৌপদীর শাড়িতে বিতরে, তুষিতে ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহারে তিনি এমন অনেক যোজনা করেছন যা প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রে পরীক্ষিত না হলেও কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। যেমন—অতীবা, অপার্থিবা, পূর্ণপ্রাণা, কণ্ঠনীতা, লোভনা, বূপতৃপ্তা, দীপ্তিরচনরতা, নগ্নদেহা, নতনেত্রা, মনোলীনা, অতলা ইত্যাদি।

চার

পূর্ববর্তী অংশে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় নানা শব্দের একটি তালিকা (যদিও অসম্পূর্ণ) করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবার আমরা দেখাবার চেষ্টা করব বিভিন্ন শব্দ নানা কবিতায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছ এবং কাব্যিক সুষমার সঞ্চার করেছে অথবা ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'দময়ন্তী' কাব্য রচনার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত কাব্যিক শব্দ ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলেও ওই সময় থেকেই কিন্তু কথ্যশব্দ, ক্রিয়াপদ বা কথ্যরীতির মিশ্রণও লক্ষগোচর। যেমন:

১. তারই মাঝে যত তব ঝিকিমিকি, ফুরফুরে প্রজাপতি প্রতিমা।

২. তোমার বাদামি চোখ—চকচকে হালকা চটুল।

৩. খুলে দাও চুলের বোঝা ঝপাঝপ ইতস্তত,
ফুটফুট নরম বুকে টেনে নাও বাহুর টানে।
টেনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে,
হৃদয়ের গোপন কথা টিপটিপ নরম বুকে,

'কঙ্কাবতী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় যখন পাওয়া যায় কুন্দশুভ্র হাতের কোমল উত্তাপ, ঠোঁটের আরক্ত রেখা, সোনার ঢেউয়ের মতো কেশের উচ্ছ্বাস, সেখানে অকস্মাৎ কথ্যরীতির মিশ্রণ কবিতায় এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে 'কঙ্কাবতী' কাব্যের 'বেহায়া' কবিতাটি মনে করা যেতে পারে—

হলদে শাড়িটা—না, না, হলদে আলোয়
যাবে নাকো দেখা ওর রং,
লাল?—তা বড্ড চড়া! নীল তাও নয়—
খয়েরিটা মানাবে বরং।

ওই কাব্যেরই 'সুখান্বেষী' কবিতায়—

শ্যামল মেঘের বুকে দেখিয়াছি বজ্রসম ছলা—
কোমল দেহের মাঝে কামনার অসুস্থ বিকার।

আবার ওই কাব্যেরই 'কোনো মেয়ের প্রতি' কবিতায়—

বই খোলা কোলের উপরে,
ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারা পিঠে,

সাদা শেমিজেরে ঘিরে কালো পাড় উঠেছে জড়ায়ে,
শাড়ির চওড়া পাড়, সাদাশাড়ি, মিশকালো পাড়।
ঠিক তব পাশে নয়—তবু কাছে, বসিবো চৌকাঠে।

দেখা যাচ্ছে, কাব্যগন্ধি শব্দ, বাক্য ইত্যাদির সঙ্গো কথ্য বাগ্‌ভঙ্গি ও ক্রিয়াপদও কবি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। যেমন—মুখ, ঠোঁট, আঙুল, বুক, হাত, শাদা, ভান, ছাঁচ, হালকা, চটুল, ঠাঁই, নেবো ইত্যাদি। 'বন্দীর বন্দনা' এবং 'কঙ্কাবতী'তে কাব্যিক, গীতল রাবীন্দ্রিক শব্দের ব্যবহার এবং তৎসম শব্দ ও সাধুক্রিয়াপদের ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়। কিন্তু 'নতুন পাতায়' সাধুরীতি ক্রমশ পরিত্যাজ্য হল এবং এখানে গদ্যছন্দের আমদানি লক্ষ করা গেল। 'নতুন পাতা' গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও হয়তো ভাব ও ভাষার সম্পূর্ণ ভিন্নস্বাদের কবিতা লেখা হবে এমন ইঙ্গিত ছিল। আলোচ্য কাব্যে কবির লক্ষ হল 'বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে।'

১। যদি একটু কথা বলো তোমায় দাঁতের শাদা ধার ছুটে আসে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো।

২। তোমার লাল ঠোঁট চাবুকের মতো আমাকে মারে।

৩। এ কি ফাঁকি? না কি বুজরুকি? কোথায়
সূর্য? এরই জন্যে এই শীতে এলুম নাকি?
আরে দাঁড়াও, এক্ষুণি দেখবে।
পিছনে চোখ রেখো, দেখছো এভারেস্ট?

কবিতার ভাষায় বিশেষ ঝোঁক, প্রবণতা বা গতিশীলতা সঞ্চারের জন্য কথ্যবাক্‌ভঙ্গি অর্থাৎ কথ্যশব্দ, কথ্যক্রিয়াপদের ব্যবহার যে অনিবার্য তা বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেন বলেই 'দময়ন্তী'-র কবিতা এ সমস্তের বাহন হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য 'দ্রৌপদীর শাড়ি' ও 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যেও এর উদাহরণ দুর্লক্ষ নয়। যেমন:

১। বেকার, বীমার দালাল। বড়ো কর্তা সাক্ষাৎ কার্তিক,
তার উপর অহিংস কংগ্রেসপন্থী, নিরামিষভুক,
মৃত মাংসে রুচি নেই, জীবন্ত মাংসের পণ্যে বনেদি খদ্দের।

২। হাওয়া দেয়, উনুনে ধোঁওয়ায়,
নিচু হয়ে গাল দুটি ফুলিয়ে ফুঁ দেয়
একটি ছোট মেয়ে,
যখন দাঁড়ালো উঠে মুখখানি তার
ছাই লেগে হাঁড়ির তলার মতো কালো।

৩। আজকে না-হয় ম্যালেই চলো।
ভারি সুন্দর বিকেল—না?
মিমির জন্যে কী খেলনা

কিনবে? দোকনে গেলেই হলো।
তোমার নতুন কী চাই, বলো?

[তিনটি উদ্ধৃতি 'দময়ন্তী' থেকে নেওয়া।]

৪। বালিগঞ্জে বাড়ির গম্ভীর ভিড় যদি কোনো ফাঁকে
মেলে দেয় একটু সবুজ, ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে
অচন্দ্রচেতন যুবা ঘণ্টা দুই ব্যাডমিন্টন খেলে।

৫। বন্দী করেন সুশ্রী ঠোঁটের মিশ্রি গুঁড়োয় যিনি;—
মনোহরণ দোকানে যাঁর চলেছে রাতদিনই
দুচার আনার বেচাকেনার আহলাদি হৈ চৈ
খুচরো গোনায় ব্যস্তলাজুক চুড়ির রিনিঝিনি।

৬। পাশ কাটিয়ে চলে যায় শালপ্রাংশু সস্ত্রীক পাঞ্জাবি,
আর কটমটে জোয়ান চেহারার বাঙালি সাহেব—
উরু দেখানো ইজের পরা, হাতে চামড়া বাঁধানো ছড়ি।
মান্দ্রাজি কেরানি গাছতলায় বসে বই পড়ে
বোধহয় কোনো ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার।

[তিনটি উদ্ধৃতি 'দ্রৌপদীর শাড়ি' থেকে গৃহীত।]

৭। মনে করুন আপনি যখন দেখেছিলেন
একটি মেয়ের হাতের নড়া
ঝলক দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে,
তারই নাম তো প্রেমে পড়া?

৮। ভাবছিলে, আহা, না পেয়ে আমারে
জীবনটা ওর গেলো ছারেখারে—
আবার কি ডাকবো কাছে খুচরো আলিঙ্গানে।

[দুটি উদ্ধৃতি 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর থেকে গৃহীত।]

এই সমস্ত উদ্ধৃতিতে কথ্যশব্দ, কথ্যক্রিয়াপদ, সর্বোপরি কথ্যঢং গতানুগতিক কাব্যিক রীতির পরিবর্তে কবিতাকে জীবনের কাছাকাছি এনেছে। এখানে ধ্বনিসংগঠনমাধুর্য, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধি যেমন আছে, তেমনি দৈনন্দিনতার তুচ্ছতা কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় কুচুটেপনা, মস্তান, এঁটে, ঠ্যাং, মিশকালো, কাৎরানি, বেহদ্দ, খিস্তি, কসাই ইত্যাদি শব্দও কবিতার ভুবনে ব্যবহৃত হয়ে নাগরিক জীবনের চিত্রকে সমাজবাস্তবতায় উন্নীত করায়। যেমন:

১। যে কোনো পুরুঠোঁট লম্পটের বিড়ি ধরাবার
জন্য? কিংবা তারাই আজ চর্বি আর কুচুটেপনার
বস্তা, যে যার পাড়ায় মস্ত বড়ো মাস্তান?

২। আপিশে, ফ্যাক্টারিতে, ফাটকাবাজারে বা অন্য যে-কোনো উত্তেজনায়
[একদিন: চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা গ্রন্থ থেকে গৃহীত।]
৩। এদিকে রাস্তায় তুমি যে-কোনো অন্যের মতো সাবলীলভাবে
পরোটা ও মাংস খেয়ে, মুখে পুরে এলাচের দানা,
বাস্-এর এঁটেল ভিড়ে ঈষৎ আরামে দাঁড়াবার
স্থানটুকু জুটে গেলে প্রীত হবে প্রতিবেশিতায়।
৪। দৌড়ে গিয়ে আগে-ভাগে দ্রুত,
কখনো বা ঠ্যাং তুলে কুকুরের সহজ অভ্যাসে
কখনো বা আড়চোখে দেখে নিয়ে সে দূরযাত্রীকে
[স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা থেকে গৃহীত]

বুদ্ধদেব বসুর অনেক কবিতায় আঞ্চলিক দেশজ, কথ্যশব্দ ব্যবহৃত হলেও তা স্বচ্ছন্দও হয়েছে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই কাব্যিক সফলতা করায়ত্ত হয়েছে—এমন বলা যাবে না। যেমন—

জীবনটা খোড় বড়ি
খাড়া, বড়ি খাড়া থোড়, তবে কি গলায় দড়ি?
নাকি জলে ডুবে মরি, ট্যাঁকে নেই কানাকড়ি,
নই ধড়িবাজ বাটপার—'দময়ন্তী' কাব্যের 'চলচ্চিত্র' কবিতায় কাব্যিক সাফল্য যতটা সার্থক, ততটা সার্থক নয় কিন্তু 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যের 'খণ্ড দৃষ্টি' কবিতায়—

থামো তো তুমি।
পান থেকে চুন খসলেই অস্থির হওয়া তোমার স্বভাব।

অনেক বিদেশি শব্দের বিশেষণরূপে যথেষ্ট তাৎপর্যমণ্ডিত; কবিতায় তাঁর বিশেষণ ব্যবহার স্বভাবতই জীবনানন্দের বিশেষণ ব্যবহারের বৈচিত্র্য স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বর্ণনাপ্রধান, ইন্দ্রিয়প্রধান, সৌন্দর্যপ্রধান ইত্যাদি নানা জাতীয় বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। প্রবন্ধের সূচনায় বিশেষণের একটি তালিকা (অসম্পূর্ণ) উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে কবিতার উদ্ধৃতির দ্বারা প্রমাণিত হবে কবিতায় বুদ্ধদেবের বিশেষণ ব্যবহার কত তীব্র লক্ষ্যভেদী ও ব্যঞ্জনাধর্মী। বিশেষণের সংগত ব্যবহার, বিপ্রতীপ ব্যবহার, গুণবাচক ব্যবহার ইত্যাদির ফলে কবিতা পাঠকমনে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। যেমন—

১। **নিষ্ফল** আক্রোশে তার **ক্রূর** জিহ্বা উদগারিছে বিষ,
তরঙ্গমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকতশিখরে।
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল। [শাপভ্রষ্ট]
[এখানে বিশেষণের ব্যবহারে রুদ্ররূপ প্রকাশিত।]
২। **ক্ষণিক** সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহবল। [ঐ]
[বিশেষণের শান্তরূপ]

৩। স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকাল। [ঐ]

[বর্ণনাপ্রধান]

৪। **রৌদ্ররাগদীপ্ত** পরিপূর্ণ দেহে। [কালস্রোত]

৫। **অবরুদ্ধ** ক্রন্দনের ক্ষান্তিহীন বিলাপগুঞ্জন। [ক্ষণিকা]

৬। বিরহের **অনাদ্যন্ত** তিমিরের তীরে। [কালস্রোত]

৭। রক্তের **আরক্ত** লাজে লক্ষবর্ষ **উপবাসী** শৃঙ্গারকামনা। [বন্দীর বন্দনা]

৮। মৃত্যুর **মদিরামত্তা** রাত্রির প্রেয়সী। [মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান]

৯। **রক্তিম** স্তনাভা। [কোনো বন্ধুর প্রতি]

১০। আকাশের **লজ্জাহীন নিলীম** নগ্নতা। [অসূর্যম্পশ্যা]

১১। একাদশী **রূপসী** জ্যোৎস্না। [মুক্তিস্নান]

১২। ঠোঁটের **আরক্ত** রেখা। [কখনো]

১৩। গোল করে তোলা ঠোঁট। [অন্য কোনো মেয়ের প্রতি]

১৪। **কোমল-কালো** সে আকাশের বুকে **ঝকমকে** তারা। [কঙ্কাবতী]

১৫। **পীত** স্মৃতিগুলি যেন **এলোমেলো** প্রেমের মতো। [শেষের রাত্রি]

১৬। **উপপ্লবী** বাসনার **বর্বর** জোয়ার। [দময়ন্তী]

১৭। **ক্ষণিক** রঙের **বণিক** সূর্য। [ম্যাল-এ]

১৮। **আর্দ্র, উজ্জ্বল ধারাল-ছলোছল** ভাদ্রের **হলদে** বারান্দা। [কালোচুল]

১৯। **মাংসহীন শেষ শূন্য** শীতের মুক্তির। [মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে]

২০। **লিপ্সাময় বিষণ্ন** প্রেমিকা। [সনাতন সংঘর্ষ]

২১। **রোদনরূপসী** তুমি কেন কাঁদো। [রোদনরূপসী]

২২। **নগ্ন, গোল, দ্যুতিময় অগাধ** আকাশ। [ইকারুস]

২৩। **ভগ্ন জানু, দীর্নস্তন, ছিন্নবাহু কোনারক** সুন্দরী। [মন ও প্রাণ]

২৪। **রোদনপুলকিত** হৃদয় অবশেষে অর্ঘ্য দেয় সৌন্দর্যে। [মোহমুদগর]

২৫। **দক্ষিণে লম্বিত সূর্য** তৃপ্তকাম প্রেমিকের মতো। [মরত্ব সঙ্গীত]

উদ্ধৃত বিশেষণগুলি নানা অবস্থার বর্ণনাত্মক রূপ, বা গুণধর্মী বৈশিষ্ট্য বা স্বভাববাচকতা হলেও কোথাও কিন্তু আরোপিত যা অপ্রযুক্ত মনে হয়নি। পাঠকের চেতনার সম্প্রসারণ ঘটায় উদ্ধৃত বিশেষণগুলি। বিশেষণগুলির ব্যবহার অর্থব্যঞ্জনার, অর্থদ্যোতনার সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে জৈবজীবন, নিসর্গপ্রকৃতি, সৌন্দর্যপ্রীতি, বিপ্রতীপতা, এমনকি সংগতির এমন সৌষম্যময় পরিমণ্ডল রচনা করে যা বুদ্ধদেবের কবিতার ভুবনকে আলোকিত বৃত্তে সংবদ্ধ করে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় এমন কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায় যা সম্পূর্ণ নতুন। এখানে হয়তো আভিধানিক সূত্রাবলি প্রযুক্ত হয় না; কিন্তু পাঠক চৈতন্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। যেমন—অনাকর [কার্তিক. দময়ন্তী], কালাঙ্কিত [দময়ন্তী. দময়ন্তী], অতরুণ [ম্যাল-এ. দময়ন্তী], নিস্তেল [কোনো

দুর্ঘটনায় মৃতের স্মরণে. দ্রৌপদীর শাড়ি], দ্বিরালাপ [কেবল তোমাকে নিয়ে. ঐ], নির্মন [বৃষ্টির দিন. একদিন চিরদিন], প্রিয়মাণ [সনাতন সংঘর্ষ. যে আঁধার আলোর অধিক], অত্বর [রাত তিনটের সনেট. ঐ] ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় শব্দ ব্যবহার তাঁর নির্মাণকলা ও প্রয়োগ দক্ষতার উদাহরণ। তিনি প্রচলিত শব্দের রীতি পদ্ধতিতে পালটে দেন অথবা নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেন। অনেক সময় তাঁর শব্দ সংস্থাপনা গদ্যরীতিরও সীমানা অতিক্রম করে। জটিলতার নানা আবেগের রূপায়ণের জন্য কবিতায় শব্দ ব্যবহারে পরিবর্তন আসে এবং বুদ্ধদেব বসু সে ব্যাপারে সার্থক শিল্পী।

পাঁচ

বুদ্ধদেবের রোমাণ্টিকতা গার্হস্থ্য জীবন থেকে উত্থিত হলেও এবং দেশজ-কথ্য-চলিত ভাষার প্রয়োগ শুরু করলেও, কথ্যভাষার মধ্য থেকে সুন্দরতা নিষ্কাশন করলেও 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতা সম্পর্কে এ সূত্র যতখানি প্রযোজ্য 'শেষের রাত্রি', কবিতা সম্পর্কে তা ততখানি প্রযোজ্য নয়। 'শেষের রাত্রি' কবিতায় শব্দ প্রয়োগ মূলত তৎসম। সাতটি স্তবকের কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে সেখানে তৎসম ও দেশজ শব্দের তুলনামূলক বিচারে তৎসম শব্দের পাল্লাই ভারী।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে যথাক্রমে যেইখানে, খালি, মুখে, ঘুরে ঘুরে, যায়, পরে, ঢাকা, মতো, তবু, চলে এসো কোরো না ইত্যাদি; মতো, নেমে, এসেছে, মতন, ঘুমায়, খাঁ খাঁ, তবু ইত্যাদি; হাজার, ভেঙে ভেঙে, চলো, আড়াল, বাঁকা, যেথা, চোখ, ইত্যাদি দেশজ শব্দ থাকলেও তৎসম শব্দেরই প্রাধান্য বেশি। 'শেষের রাত্রি' মূলত তৎসম শব্দ প্রধান কবিতা। এই কবিতায় এলোমেলো, হলদে, আঁকাবাঁকা প্রভৃতি শব্দ থাকলেও কবির প্রবণতা তৎসম শব্দের প্রতি। মনে হয়, কবিতাটির রচনার ব্যাপারে দীর্ঘ সময়ক্ষেপের জন্য তৎসম শব্দের এমন ব্যাপক ও বহুল ব্যবহার ঘটেছে।

অন্যান্য কবিতায় কবি যখন লালপেড়ে শাড়ি, মাছের মতন ফেরা, ছোটো টুলে বসে থাকো, তোমার শাড়ির রং, আঁচল আঁটার ঢং, ঠোঁট দুটি গোল করে তুলে, পাদুখানি কেটে গেছে তার, পাদুখানি লাল তার লাল আলতায়, ঠোঁটে ঠোঁটে ঠুকঠুক মিঠে পাখিপনা—ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন তখন 'শেষের রাত্রি' কবিতায় তৎসম শব্দের ব্যবহার পাঠককে বিস্মিত করে। 'শেষের রাত্রি' কবিতার শেষের দিকে বুদ্ধদেব যতই অগ্রসর হয়েছেন ততই লৌকিক শব্দের ব্যবহার কমতে আরম্ভ করেছে। কবি ক্রমশ পরিক্রমণ, দিগন্ত, উন্মাদনা, জ্যোতি, মরণপুঞ্জ, বিদ্যুৎময় দীপ্ত প্রভৃতি শব্দের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। 'শেষের রাত্রি' কবিতায় 'মতো' উপমাবাচক শব্দ ১১ বার এবং 'মতন' উপমাবাচক শব্দ ৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'মতন' শব্দটি 'মতো' শব্দের ন্যায় অন্ত্যমিলের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। 'তবু' অব্যয়বাচক শব্দটি সাপেক্ষতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'শেষের রাত্রি' কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষণ—**ঘনকালো** অন্ধকার, **বিশাল** আঁধার, **বিশাল** আকাশ, **ক্লান্ত** সময়, **দূর** দিগন্ত, **ধূসর** পৃথিবী, **অসীম** বাসনা, **কুটিল** শাখা, **ধূসর** স্মরণ,

উজ্জ্বলবিশাল বন্যা, **মনোহীন** তমো ইত্যাদি। মনে হয়, আলোচ্য কবিতার রোম্যান্টিকতা গার্হস্থ্য জীবন উত্থিত নয় বলে এখানে দেশজ, কথ্য, লৌকিক ভাষার প্রয়োগ অপ্রতুল।

বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কাব্যের ঋতুবদল হল 'দময়ন্তী' কাব্যে। 'দময়ন্তী' পুরাণাশ্রিত কাব্য; এখানে তিনি নরনারীর জৈবপ্রেমের অনিবার্য কঙ্কালময় পরিণতি দেখে বেদনার্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের শাশ্বত রূপ আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রেমদর্শনের তাত্ত্বিকতা ব্যতীত 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের মূল্য অন্যত্র নিহিত। প্রথমত, এখানে কবি কাব্যের আবেগসঞ্চারী স্বভাবের সঙ্গে গদ্যের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সাধু ক্রিয়াপদ বর্জন করতে চাইলেও তা এসে গেছে। তৃতীয়ত, বাক্‌ভঙ্গি ও রচনাভঙ্গিতে আধুনিকতা আনয়ন। উদাহরণ:

১। ১. একদিন হংসদূত এসে। ২. শুনায়েছে প্রিয়তম নাম। ৩. একথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না।

২। ১. কাটায়েছি/আসিবে/শুনায়েছে/আকর্ষিবে।

৩। ১. যে ত্রিবলি/তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরী প্রতিম/অজ্ঞতা লাবণ্যময় করুণ, মধুর।

২. সংকীর্ণ কঙকালে রয়েছে সকাম।

৩. বিনষ্ট সংকল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন/স্বার্থ কেন্দ্রচ্যুত বিশ্ব ফিরেছে আদিম মহিমায়।

"দময়ন্তীতে বুদ্ধদেব প্রথম সচেতনভাবে কাব্যিক শব্দ, সাধু ক্রিয়াপদ ইত্যাদি বর্জন করলেন; সচেতনভাবে গ্রহণ করলেন আধুনিকতা—বাক্‌ভঙ্গি, রচনাভঙ্গি ইত্যাদিতে। এই কাব্যে কবি যেন যৌবনের দুকূল-ভাসানো আবেগোচ্ছ্বাসকে সংদমন করেছেন, তেমনি বাক্য বিন্যাসের মধ্যেও শমিত করেছেন আবেগস্রোত।" [বুদ্ধদেব বসু—প্রকৃতি ও সংস্কৃতি: দশদিগন্তের স্রষ্টা/আবদুল মান্নান সৈয়দ।] 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের 'ব্যাং' কবিতাটি যেন ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। কবি এখানে প্রথাসিদ্ধির সুযোগ না নিয়ে ব্যাং-এর উচ্চারিত ক্রোক্ ধ্বনির মাধ্যমে মিলনপিয়াসীর প্রত্যাশামন্দ্রিত করেছেন। বিচ্ছেদের, ক্ষুধার এবং মৃত্যুর—এই তিনটি শব্দ দ্বারা জীবনের একটি আবর্তিত ভঙ্গিমার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কবিতাটি মূলত তৎসম শব্দনির্ভর; কবিতাটি বিশেষণ নির্ভরও বটে—যদি একটি বিশেষণও এখান থেকে নির্বাসিত করা হয় তবে কবিতাটির অঙ্গাদ্যুতি এবং ধ্বনির স্পন্দিত তরঙ্গোদ্‌বেলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিশেষণ তালিকা এর পক্ষে রায় দেয়—উচ্চকিত ঐকতান/আদিম উল্লাস/উন্মুক্ত কণ্ঠ/ঘনমেঘ/স্বচ্ছ জল/উদ্ধত আনন্দগান/স্পর্শময় বর্ষা/মসৃণ তরুণ কর্দম/চিক্কণ কান্তি/কাচ স্বচ্ছ উর্ধ্বদৃষ্টি/গম্ভীর বন্দনা গান/স্তম্ভিত আকাশ/উচ্চকিত উচ্চসুর/স্তব্ধ পৃথিবী/নিগূঢ় মন্দ্র/নিঃসঙ্গ ব্যাং। একমাত্র 'অন্ধকার শতচ্ছিদ্র' ব্যতীত সর্বত্রই বিশেষণ বিশেষ্যের পুরোবর্তী। আধুনিক বাগবিন্যাসের বাস্তবতা, বাক্যবিন্যাসে আবেগ দমনের প্রবণতা, গদ্যের পরিচ্ছন্নতা, সংহত বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি আধুনিকতাকে কবি এ কবিতায় প্রয়োগ তৎপর—বর্ষায় ব্যাঙের স্ফূর্তি, ঘাস হলো ঘন মেঘ, স্পর্শময় বর্ষা এলো, একটি অক্লান্ত সুর—প্রভৃতি বাক্যবিন্যাস বুদ্ধদেবীয় দীর্ঘতায় যেন অনেকখানি ব্যতিক্রম বলে মনে হয়।

'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যের 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' কবিতাটিতে কবি শব্দসংস্থাপনের মাধ্যমে জীবনদর্শনের গভীরতম স্তরে পাঠককে যেন প্রবেশ করিয়েছেন। এ কবিতায় একটি শব্দে একটি ছত্র যেমন আছে তেমনি এগারটি শব্দে গঠিত দীর্ঘতম ছত্র অনুপস্থিত নয়। আলোচ্য কবিতায়—

১. জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য: ১৩

২. ভূগোলবাচক শব্দ: ৪ [বাংলা, কলকাতা, দিল্লি, শান্তিনিকেতন]

৩. খ্রিস্টীয় ধর্মোৎসব: ১ [ক্রিসমাস]

৪. পাখিবাচক শব্দ: কাক ৫/শালিক ৫/চড়ুই ৩

৫. সংখ্যাবাচক শব্দ: বারো ১/দ্বিতীয় ২/পঁচিশ ১

৬. রং বাচক শব্দ: নীল ১/সবুজ ১

৭. পশুবাচক শব্দ: কুকুর ১

৮. জন্মসম্পর্ক বাচক শব্দ: পিতা/মাতা/মাতামহী/নাতনি।

৯. মাসবাচক শব্দ: বৈশাখ।

১০. ঋতুবাচক শব্দ: শীত।

১১. ভোগবাচক: লেপ, বিছানা, টেবিল, চেয়ার।

১২. যৌন ও অনুষঙ্গবাচক শব্দ: যৌবন, জনন, নারী, গর্ভ, ওষ্ঠ, যোনি, আঙুল।

১৩. -তম যুক্ত বিশেষণ: স্বল্পতম, ন্যূনতম, হ্রস্বতম

১৪. চলিত শব্দ: হল্লা, হুল্লোড়, অব্দি, পচা, বুড়ো, কড়া, খাড়া, চড়া, তিতো, হাৎড়ায়, কাৎরায়।

আলোচ্য কবিতাটি যেন বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের দলিল। এ কবিতা শুধুমাত্র ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কাব্যরূপায়ণ নয়; "বরং বলা যায় এ কবিতা চেতনার উপর স্তরের বিশ্বাস নিয়ে লিখিত, এবং অবচেতনের গভীরে তাকে নামতে হয়নি, যা হলে, হয়ত কবিতাটিতে আর একটি বিস্ময়ের মাত্রা যোগ হতে পারে।" [ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও বাংলা কবিতা মৃণালকান্তি ভদ্র।]

'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' কবিতাটি বুদ্ধদেবের যৌবনকামনা ও মৃত্যু সম্পর্কিত জীবনতত্ত্বের কথা। সুতরাং এখানে যৌবনবাচক ও মৃত্যুর শীতলতাবাচক শব্দময় পঙ্ক্তির সহাবস্থান লক্ষ্যগোচর।

১. যৌবনবাচক— ক. যৌবন যখন ছিল যৌবনের করেছি বন্দনা। খ. যৌবন যখন যায় তখনও আবার যৌবনের করেছি বন্দনা। গ. কেননা জীবন যৌবনেরে ভালোবাসে—প্রকৃতির রীতি এই। ঘ. যৌবনের বন্দনা আবার সে কি শুধু জননশক্তির পূজা?

২. মৃত্যুর শীতলতাবাচক— ক. স্বল্পতম সূর্যালোক, ন্যূনতম তাপ আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আভার চাঁদ। খ. দিগন্তের জন্ম যন্ত্রণারে কণ্ঠ দেয় শালিক,

চড়ুই, কাক ওঠে কাক/তীক্ষ্ণ ডাক, শঙ্খ ডাকে অন্ধকারে—
আরো দিন। আরো একদিন/মুখ-ঢাকা বুক চাপা অন্ধকারে,
লেপের গোপন গুহায়/রাত্রি কাৎরায়, আর রাত্রিরে জুড়ায়ে
ঘুম হাৎড়ায় স্বপ্নের শেষ।

এমনকি নারীকেও যে মৃত্যুর শীতলতা তা শব্দসংস্থাপনায় অভিব্যক্ত হয়—

(ক) নারীর শরীরে আর নেশা নেই, শাড়ির তরঙ্গে আর গান নেই/চোখ চোখে কথা নেই, হাতে হাতে চকিত পরশে নেই কবিতার তাপ।

(খ) নারীর শরীরে আর কল্পনার শিরা নেই। শিরার বন্যায় আর/কবিতার সুরা নেই।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব বসু অন্যতম শব্দস্থপতি বলা যেতে পারে। আবার শুধু শব্দস্থপতিই নন, শব্দভাস্করও বটে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ শব্দের সামগ্রিক সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মুক্ত করে। গীতল কাব্যিক শব্দ, রোম্যান্টিক শব্দ, বাস্তব শব্দ, তৎসম, তদ্ভব, দেশজ, লৌকিক, কথ্য শব্দ সমস্তই ব্যবহৃত হয় প্রয়োজনের মানদণ্ডে। বুদ্ধদেব বসু নাগরিক কবি, যৌবনের কবি, প্রেমের কবি। ফলে শব্দ তাঁর কাছে নানা পরিচয়বাহী। তিনি শব্দকে রূপান্তরিত করেন; আয়াসসাধ্য শব্দের বা আভিধানিক শব্দে তিনি ততটা সিদ্ধকাম নন। তবে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভা বোধ হয় সহজ সত্যে প্রমূর্ত হতে চায়। লালচে, বাদামি, লালচে বাদামি ইত্যাদি শব্দে প্রেমিকার বাসনা-কামনা সংসক্ত দেহরূপের প্রকাশ। তিনি যখন লেখেন—মসৃণ চিক্কণ ত্বক, ওষ্ঠধরে প্রবল উত্তাপ, পদতটে পদ্মগন্ধ, বাহুডোরে মদির প্রলাপ—তখন শরীরময়তা তীব্র শিহরণ সমগ্র চেতনার তটভূমিতে আছড়ে পড়ে যেন এক অনতিতীব্র প্রেমের রাগিনীতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রোত্তর অন্যান্য কবিদের তুলনায় বুদ্ধদেবের কবিতায় দেহবাচক শব্দের প্রয়োগ (অধর, আঁখি, অলক, অঙ্গুলি, ওষ্ঠাধর, কটাক্ষ, চুম্বন, বক্ষ, ভাল, স্তন, পদতল, জানু, নয়ন, চুল ইত্যাদি) রূপানুরাগের জন্যে, তাঁর কবিতায় শরীর বর্ণনা যেমন বাসনা—কামনার, ইন্দ্রিয়-কামনা উদ্দীপকের, তেমনি আবার সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যেও বটে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রতীক

[প্রতীক বিণ [প্রতি + √ই + ঈক – ক ১. প্রতিকূল। বিলোম, প্রতীম। — তীক পুং [+ ঈক– ণ; অবয়ব ঋগ্বেদ] প্রতিতিসাধন, অঙ্গ, অবয়ব—তীক ক্লী ১. প্রতিরূপ প্রতিমূর্তি। প্রতীকোপম। ২. শ্লোকাদির প্রথম পদবা মুখ। বৃহদারণ্যক ৬.২.৩। /বঙ্গীয় শব্দকোষ। দ্বিতীয় খণ্ড/হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য অকাদেমি। ১৯৬৭।

সুতরাং প্রতীক শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিরুদ্ধ, প্রত্যঙ্গ, রূপ অবয়ব, নিদর্শন ইত্যাদি। অমরকোষে বিগ্রহ, মূর্তি, প্রতিমা, প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিবিম্ব, প্রতিনিধি ইত্যাদি যে সমার্থবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি অঙ্গ বা শরীরবাচক। অমলেন্দু বসু মনে করেন, 'ইংরেজি symbol শব্দটি [ফরাসি symbole, জার্মান symbol, ইতালীয় symbolo, রুশ symbol] মূল গ্রিক শব্দ sumbolon থেকে গৃহীত। প্রতীক শব্দটি বৈদিক সংস্কৃতে থাকায় এটি বৈদিক সংস্কৃত শব্দ। বর্তমানে প্রতীক শব্দটি যে অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় প্রাচীনকালে সে অর্থে প্রযুক্ত হত না।

প্রতীক এক জাতীয় চিহ্ন হলেও চিহ্ন হলেও চিহ্ন মাত্রেই কিন্তু প্রতীক নয়। যে শ্রেণির চিহ্নে গভীর ভাবব্যঞ্জনা থাকে তাকেই প্রতীক বলা হয়। সমস্ত চিহ্নই প্রতীক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপকে ব্যঞ্জনায় প্রতীক স্পষ্টীকৃত হলেও আধুনিক ক্ষেত্রে কাব্যে প্রতীক বলতে যা বোঝায় তা অনেক সময় রূপকের ব্যঞ্জনায় স্পষ্ট হয় না। অনেকে প্রতীক ও চিত্রকল্পকে এক বলে মনে করলেও, সমার্থক ভাবলেও প্রতীক ও চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা সমপর্যায়ী নয়; অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতীককে এক জাতীয় চিত্রকল্প বলা হয়েছে। চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রতীক প্রকাশিত হলেও প্রতীকের মাধ্যমে চিত্রকল্পের প্রকাশ ঘটলেও চিত্রকল্প ও প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: "চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, কার্যত তাদের একদিকে থাকে চিত্ররচনা, আর অন্যদিকে থাকে গভীর রহস্য, যাতে জাল ফেলে আমরা তুলে আনতে পারি—হয়তো শূন্যতা, হয়তো এক মুঠো শামুক, হয়তো কখনো মুক্তো বা আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর কখনো যার স্তরে স্তরে ডুবে গিয়ে বহু রত্ন উদ্ধার করে আনি।" মনে হয়, এই কথাটাই ঠিক যে, প্রতীকের ভিতরে থাকে রহস্য আর চিত্রকল্পে চিত্ররচনা। সুকুমার সেনও মনে করেছেন: "শব্দের যা অর্থ তাই প্রতিমা, আর শব্দার্থের যে গভীরতর, রূপান্তর যার মধ্যে শব্দের অর্থ বিলুপ্ত তাই প্রতীক।" চিত্রকল্পের সঙ্গে প্রতীকের পার্থক্য সম্বন্ধে অনেকেই প্রায় একমত। একটি জিনিস দিয়ে আরেকটি জিনিস বোঝানো হলে তাকে প্রতীক বলে—কিন্তু তা ব্যাপকতম অর্থে। আর ব্যবহৃত শব্দ আক্ষরিক অর্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর অর্থের ইঙ্গিত প্রদান করলে সাহিত্যের পরিভাষায় তাকে প্রতীক বলে। জাহাঙ্গীর তারেক তাঁর 'প্রতীকবাদী সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন:

"গভীরতর সত্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবরণসদৃশ যে প্রকাশভঙ্গি, তারই উদ্‌বর্তিত রূপ আমরা দেখি প্রতীকের মধ্যে।" রূপক ও প্রতীকের পার্থক্য প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য:

"রূপক মনোযোগ আকর্ষণ করে শিল্পাভিব্যক্তির পূর্বেই বিদ্যমান একটি প্রত্যয়-এর প্রতি। অভিব্যক্তি এই প্রত্যয়েরই বহিরঙ্গ। তাই রূপকের ভিতরে থাকে একটি ভাব বা চিন্তা, যা ইন্দ্রিয়ঘন রূপকল্পে রূপান্তরিত হওয়ার পরেও নিজের বিশিষ্ট চারিত্র অক্ষুণ্ণ রাখে। পক্ষান্তরে প্রতীক ভাবকে উপস্থাপিত করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে, ভাবকে শোষণ করে নেয় নিজের ভেতর। ভাবের যেহেতু কোনো পূর্ব অস্তিত্ব নেই, তাই নিজেকে বিশ্লিষ্টও করতে পারে না নিজের আবরণ থেকে। *** প্রতীকের ভেতরে আছে বিভিন্ন অর্থের এক রকম উপর্যুপরি বিন্যাস এবং অনেকক্ষেত্রে আপত প্রতীয়মানতার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহস্যময় গভীরতা।"

দুই

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় প্রায় সমস্ত কবি প্রচলিত প্রকরণ, আঙ্গিক, শিল্পরীতি ও ঐতিহ্যের পরিপোষণ ইত্যাদির সাহায্যে আপনাপন কবিতার ভুবন সৃষ্টি করলেও পাশ্চাত্যের নানা কাব্যপ্রকরণ, শিল্পান্দোলন তাঁদের মনোভূমিতে যে রসদ জুগিয়েছে তা অনস্বীকার্য। বুদ্ধদেব বসু প্রতীকী কাব্য-আন্দোলনকে বাংলা কাব্যপ্রকরণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং তা সম্ভবত সম্ভব হয়েছে বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদের দ্বারা, কেন-না পাশ্চাত্যে বোদলেয়ারের কবিতাই প্রতীকী কাব্যের উৎস। সে অর্থে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রথম দিকে কিন্তু তেমন প্রতীক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য থেকেই বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রতীক-প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতার অনেক পঙ্‌ক্তিতে প্রতীক শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন:

১. বালুতে ফেলিয়া যাও লক্ষ লক্ষ চরণ স্বাক্ষর,
সে চিহ্নে আঁকিয়া যাও আমাদের প্রাণের প্রতীক।

২. ভেনাস তোমার দ্বীপে শুধু এই প্রতীক প্রোথিত।

৩. সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে।

৪. নির্ভুল ছবি, নিখুঁত প্রতীক এরা।

৫. অলস, মহান, নির্জনতার অঙ্গীকার। আঁকা এ চিত্র প্রতীকে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় এমন অনেক শব্দ আছে যা প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। যেমন: অন্ধকার, আগুন, বিদ্যুৎ, চাঁদ, পদ্ম, বীজ, শীত, চুল, গুহা ইত্যাদি। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে সাপ, ঊর্ণনাভ, ব্যাং, পাখি, জোনাকি, বাঘ, ঈগল, তিমি, মোষ, কাক, পোকা, মাছি, টিকটিকি ইত্যাদি আছে। আবার ব্যক্তি প্রমিথিয়ুস, অর্জুন, আফ্রাদিতে, কঙ্কাবতী ইত্যাদি নামও প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রমিথিয়ুস মানবকল্যাণের ও মুক্ত মানবতার প্রতীক। অফ্রোদিতে প্রেমিকার আর কঙ্কাবতী হল কবির মনের প্রেমের প্রতীক। বুদ্ধদেব বসুর অর্জুন বিষ্ণু-দে-র অর্জুনের মতো শ্রেণি প্রতিনিধি নয়, ব্যক্তিক প্রতিনিধি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

"তাঁর অর্জুন বিষ্ণুর-দে-র অর্জুনের মতো শ্রেণী-প্রতিনিধি নয়, একান্ত ভাবেই ব্যক্তি প্রতিনিধি। স্মৃতি এখানে ব্যক্তির নিভৃত স্মৃতি। স্মৃতি চারণ করতে করতে তাঁর পক্ষে অর্জুন কল্পনায় উত্তরণ স্বাভাবিক। কীর্তিমান মধ্যবিত্তের অনিবার্য ঐতিহাসিক পতনের নাটকীয়তা প্রত্যক্ষ করে বিষ্ণু-দে-র

অর্জুন কল্পনা। বুদ্ধদেব বসুর অর্জুন বিকল্পে শিল্পীই। *** শেষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার আগে স্মৃতিই চিনিয়ে দেয় সত্যাসত্য, শেষ সমালোচক সে-ই। বুদ্ধদেবের অর্জুন তাঁর কবিতায় এই কাল নিগৃহীত সত্তার স্মৃতিধর প্রতীক"। [কবিতার কালান্তর।] বুদ্ধদেবের ইকারুস অদম্য আকাঙ্ক্ষার প্রতীক; তাঁর কবিতায় দিওতিমা প্রেরণাদাত্রী প্রেমিকার প্রতীক আর ভেনাস সৌন্দর্যময়ী নারীর প্রতীক। তিনি অনুবাদ কবিতার মাধ্যমে বাংলা কবিতার ভুবনে এদের আনয়ন করলেন।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় মানবেতর প্রাণীর মধ্যে ঊর্ণনাভ চক্রান্তকারী কিংবা অত্যাচারী শক্তির প্রতীক।

ঊর্ণনাভ অন্ধকারে বসে
আপনারে কেন্দ্র করি যেমন বুনিয়া যায় জাল
চারিদিকে, রাজ্যাকাশে সূর্যতা লভিয়া তাহারাও
ধর্মভ্রমে করিতেন রাজত্ব বিস্তার। [কোনো বন্ধুর প্রতি]

কুকুর পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায় কবির দ্বিখণ্ডিত মনের প্রতীক।

হাজার উন্মত্ত কুকুর আর কিছু না-পেয়ে ছিঁড়ে
ফেলতে চায় আমাকেই। [তবু কোকিল ডাকে]

'তবু কোকিল ডাকে' কবিতায় কোকিল কবির অচেতনাকে ধারণ করে, আশ্বাসের মতো শোনায়।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ব্যবহৃত 'ব্যাং' ও 'জোনাকি' যেন নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। ব্যাং-এর নিঃসহগ নিগূঢ় মন্ত্রোচ্চারণ কবির নিঃসঙ্গ একক কাব্যসাধনার প্রতীক। 'জোনাকি' কবির বিচ্ছিন্ন কবিসত্তার প্রতীক। কোথাও জোনাকি আবার আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্মৃতির প্রতীক। যেমন:

'লুকিয়ে রাখা আশার মতো/বাঁশের ফাঁকে, ইতস্তত/ একটি দুটি ম্লান জোনাক/ক্বচিৎ নেবে, জ্বলে।' [সমর্পণ: যে আঁধার আলোর অধিক]

বুদ্ধদেব বসুর মানবেতর প্রাণীময় একটি প্রতীক সমৃদ্ধ কবিতার উল্লেখ দেখিয়ে দেয় তাঁর কবিতার মানবেতর প্রাণীগুলি কীসের প্রতীক!

রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরে : শুধু নয় বাংলার জঙ্গলে
আগুন-রঙের বাঘ, আল্পসের কল্পনাকৈলাসে
দারুণ ঈগল, বারুণী বরফে তপ্ত তিমি, শুধু
দীপ্ত দৃপ্ত দুর্জয়েরে নয়, দিয়েছো সবারে স্বত্ব
সহজাত রাজত্বের: ঘোলা-জল ধোবার ডোবায়
গলা-ডোবা কালো মোষ ভাদ্রের রোদ্দুরে, গলা-ফোলা, গলা-খোলা ব্যাং
বৃষ্টিশেষ বিকেলের হলুদ রোদ্দুরে, মেঘলা দুপুরে
আকাশে একলা কাক, কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি,

রাক্ষস টিকটিকি:—সকলেরে রাজত্ব দিয়েছো, প্রভু, সকলেরই
প্রভুত্ব নিয়েছো মেনে।...এ-স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি
বঞ্চিত শুধু কি আমি? ...আমি কবি। ...শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত ...নির্বাসিত? ...অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে? শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস?...সত্যি তা-ই? ...না কি আমি, কবি-আমি,
কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্য, হীন প্রভু মেনে নিয়ে !

[অন্যপ্রভু: দ্রৌপদীর শাড়ি]

"এখানে বাঘ, ঈগল, তিমি, মোষ, ব্যাং, কাক, পোকা, মাছি, রাক্ষস, টিকটিকি অস্তিত্ব রক্ষার প্রতীক হিসেবে উল্লেখিত এবং আমি অর্থাৎ কবি কিংবা বলা যায় বর্তমানে সময়ের মানুষ অস্তিত্বের অস্বস্তির দাসের প্রতীক। কবি সন্দেহ পোষণ করলেও বলা যায় প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হলেও প্রতিকূল যুগ মানুষকে শুধু অস্বস্তি দিয়েছে। 'অন্য হীন প্রভু' এখানে অত্যাচারীর প্রতীক যে কখনো মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন চায় না।" [আধুনিক বাংলা কবিতা: শিল্পরূপ বিচার/সৈকত আলগর]

বোদলেয়ারের কবিতায় যে শৃগাল, শকুন, সর্প, বৃশ্চিক, কীট, মর্কট ইত্যাদির উল্লেখ আছে তারা সকলে কুচক্রীর প্রতীক। বুদ্ধদেব বসু সেই প্রতীকগুলিকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় এনেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় সাপ শব্দটি কামনা-বাসনা, অশুচি, পঙ্কিল এবং আদিম কামনার প্রতীক রূপে উপস্থাপিত। অবশ্য কোথাও রূপক বা চিত্রকল্প রূপে উপস্থাপিত হলেও তা প্রতীক। যেমন:

১. চুম্বনের তিক্ত বিষ সঞ্চিত করিয়া রাখে অধরের ফণা। [মোহমুক্ত: বন্দীর বন্দনা।]

২. রাত্রি লাফিয়ে উঠছে কেউটের কালো ফণার মতো:
আমাকে শাসাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। [বিচ্ছেদের দিন: নতুন পাতা।]

অন্ধকার প্রতীকটি 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'নতুন পাতা' পর্যন্ত নানা প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। অন্ধকার শব্দটি কামনা-বাসনা, পাশবপ্রবৃত্তি, অন্ধকার মনোজগৎ, অন্ধযৌবন, পাপবোধ ইত্যাদি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। 'বন্দীর বন্দনা'র 'শাপভ্রষ্ট' এবং 'আর কিছু নাহি সাধ' কবিতায় অন্ধকার পাশববৃত্তি ও বিরহের প্রতীক।

উদাহরণ:

১. তোমার অন্ধকার, প্রচণ্ড নীরবতা
আমাকে আচ্ছন্ন করে দিক।

* * * * * * * * *

তোমার অন্ধকারের নির্মম নিষ্পেষণে
আমি যেন উষ্ম সুরায় মত ঝরে ঝরে পড়ি

[যে কোনো মেয়ের প্রতিঃ নতুন পাতা]

২. টেনে নিয়ো সেই অতল অনির্বচনীয় অন্ধকারে।

[সন্ধ্যায়ঃ ঐ]

৩. যদিও তার শরীর থেকে সবুজ ডালপালা বেরিয়ে
নুয়ে নুয়ে মিলিয়ে গেলো না তার অন্ধকারে।

[বৃদ্ধ রাজাঃ মরচে পড়া পেরেকের গান]

অন্ধকার শব্দটি নানা মাত্রায় ব্যবহৃত হয় 'গানের মধ্যে গান', 'জন্ম', [নতুন পাতা]; 'মৃত্যুর পরেঃ জন্মের আগে', 'আকাশ পাতাল', 'নেপথ্য, নাটক', 'মধ্যতিরিশ', 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' [শীতের প্রার্থনাঃ বসন্তের উত্তর] প্রভৃতি কবিতায়। এ সমস্ত কবিতায় অন্ধকার মন, প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদি নানা মাত্রিকতায় ব্যবহৃত হয়। 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যে অন্ধকার নানা প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

১. 'এগিয়ে আসে অন্ধকার'। [যাওয়া-আসা]
২. 'প্রস্থানের অন্ধকারে পড়ে যেতে যেতে।' [অর্জুনের প্রতি—কোনো নামহীনা]
৩. 'বয়ে যায় তৃষ্মার পাথর কেটে আঁধার ঝরনা'। [নির্বাসন]
৪. 'লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার'। [রাত তিনটের সনেটঃ ১]
৫. 'প্রাকৃতিক অন্ধকারে বৎসরের অদ্ভুত বিনয়'। [না লেখা কবিতার প্রতিঃ ৩]

বুদ্ধদেব বসুর নানা কবিতায় অন্ধকারের নানা প্রতীকী প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমনঃ

১. 'গাড়ির মধ্যে অন্ধকারের সন্ধানী হাত'।
২. 'তুমি মিলিয়ে গেলে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে'।
৩. 'আঁধার বেমার স্বত্ব, কিন্তু তাই আলোর অধিক'।
৪. 'তাও নয় নিথর একত্বময়, নিরঞ্জন—স্তব্ধ নয়, স্বরগ্রামে পরিবর্তমান'।
৫. 'আছে স্মৃতি অন্ধকার তাই আশান্বিত।'

নতুন পাতার 'কোকিল ওগো কোকিল' কবিতাটি অন্ধকারকে পরাজিত করার এক দুর্মর অনুপমতাঃ

'কোথায় ছিলে তুমি শীতের দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ রাত্রিতে,
কোথায় ছিলে কোকিল, যখন উন্মথিত অন্ধকারের
বুক চিরে বেরিয়ে এলো চিরকালের লাল পদ্ম
অপরূপ জ্যোতির্ময়।'

আগুন শব্দটিও বুদ্ধদেবের নানা কবিতায় প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। আগুন বিভিন্ন অর্থমাত্রায় কবি কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে। আগুন শব্দটি কামনা, প্রেম, জৈবতা, যৌবন, তীব্র আবেগ,

প্রেমাকাঙ্ক্ষার প্রতীক, শিল্পের প্রতীক ইত্যাদি নানাভাবে ব্যবহৃত। এ প্রসঙ্গে, 'এর নাম নেই', 'স্পর্শের প্রজ্জ্বলন', 'রূপান্তর', 'পঞ্চাশের প্রান্তে', 'আরোগ্যের তারিখ', 'একদিন: চিরদিন' ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা চলে।

১. 'কেমন করে আমি বাঁচবো, যদি তোমার চোখ,
আগুনে ভরা
যদি তোমার ঠোঁট আগুনের মতো লাল,
যদি তোমার চুল, আগুনের নিচে ছায়ারাশির মতো
নৃত্যশীল।

২. 'ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা।'

৩. 'ফুরোয় না যে আগুন, সে কি আমার?'

৪ 'জ্বলবে আমার আগুন তোমার জোয়ারে'।

বিদ্যুৎ শব্দটি প্রেমের চাপল্যে, কামনার দীপ্ত সংস্পর্শে বা মিলন অনুষঙ্গে বুদ্ধদেবের নানা কবিতায় ব্যবহৃত। যেমন:

১. 'চোখে তোমার হানা দেয় চাপা বিদ্যুৎ।'

২. 'কালো বিদ্যুৎ জ্বলে চক্ষে তোমার।'

৩. 'লাল বিদ্যুৎ জ্বলে চক্ষে তোমার।'

৪. 'স্পর্শ কেন বিদ্যুতের অত্যাচারে গড়া।'

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় চাঁদ আশার প্রতীক, প্রেমের প্রতীক।

১. হয়তো উঠবে চাঁদ
উঠবে হলদে চাঁদ,
মাথার উপরে। [আশার প্রতীক]

২. 'যেমন সন্ধ্যার আকাশে একটি একটি করে তারা ফোটে
তেমনি, তোমার চোখে
একটু একটু করে হয়তো কুঁড়ি ধরতে দেখলাম।
কুঁড়ি হলো ফুল, ফুল হলো তারা,
তারা সরিয়ে দিয়ে চাঁদ উঠলো,
ধরা দিলে তুমি।'

চাঁদ শুধু আশা বা প্রেমের প্রতীক নয়; বাসনা কামনা, যৌবন, নিঃসঙ্গতার প্রতীক রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

১. 'জ্বলেছে নতুন চাঁদ, ঝিলমিল করে ওঠে পাৎলা কাপড়।'

২. 'বুকের রেখায় চাঁদের কণা,
পূর্ণিমা চাঁদ বুকের পরে।'

৩. 'শীতের রোদের চাঁদের আলো যেমন আকাশে মগ্ন একা।'

বুদ্ধদেবের কবিতায় পদ্ম শিল্প ও সৃষ্টিকর্মের প্রতীক। 'নতুন পাতা'র 'সমুদ্রস্নান কবিতায় পদ্ম সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পের উজ্জ্বলতার প্রতীক। যদিও আলোচ্য কবিতায় বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে; তবুও কবি পুরাণের কাহিনির রূপান্তর ঘটিয়ে কবি ও তাঁর প্রেমিকার মিলন থেকে শিল্পের পদ্ম প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন:

'তারপর তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ফুটে উঠলো এই পৃথিবী,
ফুটলো সূর্য, অপরূপ জ্যোতির্ময় পদ্ম'
* * * * * * * * *
ফুটে উঠুক কিছু ফুটে উঠুক
তোমার আর আমার সংস্পর্শে, তোমার আর আমার মাঝখানে
যেমন একদিন পৃথিবী ফুটে উঠেছিলো পদ্মের মতো
বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে।
* * * * * * * *
তাই হবে আশ্চর্য
সদ্য-ফুটে-ওঠা পদ্মের মতো।'

তাঁর কবিতায় পদ্ম-এর প্রতীকে শিল্পের রূপান্তর, সৌন্দর্য ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। পদ্ম শব্দটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার নিজস্ব অভিধা বিচ্যুত হয়েছে। যেমন:

১. 'জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে।'
[রূপান্তর: দ্রৌপদীর শাড়ি]

২. 'কবিতার ভালোবাসা ছিলো, তারই শ্বেত শিখার,
পদ্মেরে ফুটিয়েছি মনে মনে নারীকে মৃণাল করে।'
[মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে: শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর]

'মায়াবী টেবিল' [দ্রৌপদীর শাড়ি] কবিতায় শিল্প প্রসঙ্গে পদ্মের ব্যবহার কবির প্রতীক চেতনার অবিস্মরণীয় উদাহরণ:

'রঙের তরঙ্গে বেঁধে তপ্ত ঘন খনির কোরকে—
ধাতুর ধমনীতলে, পাথরের পদ্মের শিখায়
জ্বালায় অব্যর্থ, ক্রূর, অফুরন্ত চোখের হীরকে।'

'মরচে পড়া পেরেকের গান' কাব্যের 'রোদনরূপসী' "কবিতায় পদ্ম কবিতার প্রতীক। স্বর্ণ পদ্ম যাঁর অশ্রুনীর থেকে জন্মায় সেই নারী নিখিল-পুরুষের কামনার আধার। সে আরাধ্যা হলেও বাস্তবে তাকে লাভ করা অসম্ভব। কবিই তাকে জন্ম দেন। মহাভারতকার এই নারীর পরিচয় ও তার কান্নার কারণ ব্যাখ্যা করেননি। অভাব-বিচ্ছেদবোধ-স্বপ্ন, স্মৃতি-হৃদয়স্পন্দন কবিতার এইসব উপকরণ বুদ্ধদেব বসু আরোপ করেছেন এই রূপসীর মধ্যে।" [বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ/ মাহবুব সাদিক]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়, বীজ হল 'মননকল্পনায় সুপ্ত অভিজ্ঞানের প্রতীক'। বীজ কোথাও সৃষ্টিশীলতার, কোথাও সৃষ্টিসম্ভারের, কোথাও নবজন্মের প্রতীক। বুদ্ধদেব কবিতায় প্রতীক ব্যবহার করেন প্রতিকূল সময়, বাস্তব পৃথিবীর দ্বন্দ্ব, ক্লেদাক্ত জীবন ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য। বীজ যেমন অন্ধকার থেকে বহির্গত হয়ে ফসলের সমারোহে ধরিত্রী পূর্ণ করে তোলে, তেমনি বুদ্ধদেবের কবিতায় বীজ সত্তার উন্মোচনের প্রতীক রূপে আসে। যেমন:

১. 'স্বর্গ বীজ! জ্যোতির জন্মের রতি!'

২. 'আছি বিশ্বের প্রাণের মূলে
বীজময় নির্জনে।'

৩. 'কিন্তু মাটির বুক চিরে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে একদিন
আবার দেখা দেয়, অন্য নামে, নতুন জন্মে, রাশি রাশি
ফসলের ঐশ্বর্যে।'

তিন

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রতীক প্রয়োগ যথাযথভাবে শুরু হয় 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ রচনার কাল থেকে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা দময়ন্তী প্রতীকী। সে হয়ে উঠেছে মানবিক সুখ-স্বর্গের প্রতীক। আলোচ্য 'দময়ন্তী' কবিতাটি একদিকে যেমন আদিম কামনার প্রতীকী রূপ, তেমনি ভারতীয় তান্ত্রিকদের কামসাধনার প্রতীকও বটে:

'কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।'

'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যের নাম কবিতাও কবির কবিসত্তার উন্মোচনের প্রতীক। যদি দ্রৌপদীকে সৌন্দর্যের আধার মনে করা হয় তাহলে সৌন্দর্যের উন্মোচন আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত হয়। আসলে প্রকৃতির রহস্য দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ির মতোই, তাকে জানার ও রূপায়ণজনিত উন্মোচনাকাঙ্ক্ষা এখানে প্রতিফলিত। তাঁর কাব্য-কবিতায় অর্জুন মিথ হয়েও প্রতীক। প্রসঙ্গত 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের 'কর্কটক্রান্তি', 'শিল্পীর উত্তর' ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা চলে। 'মরচে পড়া পেরেকের গান'—এর ইকারুস কবির স্বাধীনতা ও বন্ধনহীনতার প্রতীক। 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কাব্যে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' থেকে গৃহীত তিনটি কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাকাহিনির হলেও যেন কবির সন্তপ্ত বঞ্চিত অতৃপ্ত, জীবনের প্রতীক। 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের 'নেশা' কবিতাটি কবি ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্কে প্রতীকী ব্যঞ্জনায়পূর্ণ। আলোচ্য কাব্যের 'রাত তিনটের সনেট: ২', 'ফাউস্টের গান', 'রবীন্দ্রনাথ', 'কেন' ইত্যাদি প্রতীকী কবিতার সংযত সংহত রূপায়ণ। 'না-লেখা কবিতার প্রতি: ৩' কবিতার কৌতূহলী বালিকা আলোচ্য অংশে কবিতার প্রতীক:

'বালিকার মতো কৌতূহলে
এখনো দেখতে চাও কতদূর প্রস্তুত প্রয়াস?'

'মরচে পড়া পেরেকের গান', 'একদিন: চিরদিন' প্রভৃতি কাব্যে প্রতীকের ব্যবহার বেশ

কম। তবে 'একদিন: চিরদিন' কাব্যের 'আমার জীবন' কবিতাটিতে 'জনসভা', 'গুহা', 'পাতাল' ইত্যাদি শব্দ যেন কবির জীবন, মন, স্মৃতি, অবচেতন মন ইত্যাদির প্রতীক হয়ে উঠেছে। "একদিন: প্রতিদিন'—এর নাম কবিতা সামগ্রিকভাবে প্রতীকী এবং বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির অন্যতম। অস্তিত্বের ভারবাহী মানবসত্তা প্রত্যাবর্তন-প্রত্যাশী—বার্ধক্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে কৈশোরে। এই অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যর্থতা, অতৃপ্তি, বিষাদ ও বেদনা এ কবিতার বিষয়। এর মধ্যে কবির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি বিন্দুর মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ। অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা এখানে চিরদিনের প্রতীকে ভাস্কর। চমৎকার কয়েকটি খণ্ড-প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে এ কবিতায়। প্রকৃতি এবং নারী ও কবিতায় একাকার হয়ে একটি চিরন্তন নারীর প্রতীকে সমর্পিত হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত প্রতীক: জুতোর ফিতে, গিঁট, আগুন, ছাগল, কাম। পরাবাস্তব উপকরণ সমৃদ্ধ এই প্রতীকপুঞ্জে নানা ভাবব্যঞ্জনার বিচ্ছুরণ ঘটেছে। জুতো এবং গিঁট বিচ্ছিন্নতা ও নাগরিক জটিল জীবনের প্রতীক। জীবন জটিলতায় আবদ্ধ কবি জীবন গিঁটের প্রতীকে রূপায়িত।"

[বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ মাহবুব সাদিক]

'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর'—এর 'ঘাস' কবিতার ছাতা, জুতো, বর্ষাতি বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। 'স্বাগত-বিদায়'-এর 'মাছ ধরা', 'সে ও অন্যেরা', 'বিলাপ', 'বৃদ্ধ কবি', 'কবির বার্ধক্য', 'কবির মৃত্যু' ইত্যাদিতে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি কবির জীবন ও অস্তিত্ব, আশানিরাশা, বেদনা ও স্মৃতির তাৎপর্যবাহী। কবি বুদ্ধদেবের অবিস্মরণীয় প্রতীকী কবিতা 'সে ও অন্যেরা'। কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। কবিতাটির বিষয় কবি জীবন ও কাব্য ঐতিহ্যভাবনা ও শিল্পজিজ্ঞাসা। এখানে 'কিমাকার বাজিকরেরা' অগ্রজ কবিদের, প্রপিতামহীর ঢাকাই মসলিন, ঠাকুর্দার জামিয়ার, বাবার আলবোলা, আটশিঙা হরিণ, বরাহমুণ্ড ইত্যাদি প্রাচীন উপাদান অগ্রজদের শিল্প ঐতিহ্যের প্রতীক। এইভাবে তাঁর কবিতায় ঐতিহ্য প্রতীকায়িত হয়ে যায়।

এইভাবে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সাধারণ শব্দের মধ্যে তাৎপর্যবাহী প্রতীকধর্মিতা সঞ্চার করে কবিতাকে অভিধা অর্থ অতিক্রম করায় এবং অনেক সাধারণ শব্দও প্রতীকায়িত হয়ে ব্যঞ্জনধর্মী হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতায় প্রতীকের প্রয়োগে বুদ্ধদেব পথিকৃতের দায়িত্ব অনেকখানি পালন করেও স্মরণীয় প্রতীকধর্মী কবিরূপে প্রতীচ্যের অনেক ভাবনাকে বাংলা কবিতার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট করান।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় চিত্রকল্প

An image in that which presents an intellectual and emotional complex in an instant time.—Ezra Pound.

"চিত্রকল্পের জন্ম হয় বিমূর্ত চেতনালোকে। বহির্জগতের অভিঘাত এবং সামাজিক ভাবসূত্র স্রষ্টার হৃদয়ে সংগুপ্ত স্মৃতি-কল্পনা-আবেগ ইত্যাদির দ্বারা আলোড়িত হয়ে যে শব্দচিত্রের জন্ম দেয় তাকেই Image বা চিত্রকল্প বলে। সাধারণভাবে ইংরেজি ইমেজ্ শব্দের প্রতিশব্দরূপে বাংলায় চিত্রকল্প শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ইমেজের প্রতিশব্দরূপে কেউ কেউ 'বাক্-প্রতিমা', 'ভাবরূপচিত্র', 'মানসপ্রতিবিম্ব' ইত্যাদিও ব্যবহার করতে চেয়েছেন। 'বাণীশিল্প', 'রূপকল্প', 'শব্দকল্প' ইত্যাদিরও উল্লেখ পাওয়া যাবে। তবে 'চিত্রকল্পে'র ব্যুৎপত্তিগত দ্যোতনার আবেদন অনেক বেশি। এখানে 'চিত্র' শব্দের সঙ্গে 'কল্প' প্রত্যয়টি 'প্রায়' অর্থে প্রযুক্ত। 'ইমেজ'কে নিছক চিত্র না বলে কল্পচিত্র বলাই সঙ্গত। ফরাসি সমালোচকের মতে, 'paintings not to the eye but to the imagination'। চিত্রকল্প সামগ্রিক সৃজনক্রিয়ার অংশ বলে সেখানে শিল্পীর চেতনালোকের স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকে। এর প্রাথমিক উদ্ভাস বস্তুধর্মী হলেও অর্ন্তলীন চেতনাই শেষ পর্যন্ত এর অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে অবশ্যই কল্পনা ক্রিয়াশীল থাকে এবং কল্পনাই অভিজ্ঞতার ভাববীজগুলিকে পল্লবিত করে দেয়। চিত্রকল্পের মৌল ধর্মই হল প্রত্যক্ষতা এবং স্বতন্ত্র কোনো অলংকার না হলেও চিত্রকল্পের অবস্থান উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-সমাসোক্তির নানা বৃত্তে। কবিতায় চিত্রকল্পের প্রবেশ অনিবার্য এবং এর অধিকার সুবিস্তৃতও। অবশ্য একথাও ঠিক, যে-কোনো উপমা-রূপকই চিত্রকল্পে উন্নীত হতে পারে না। আবার এমনও দেখা গেছে যে একটি শব্দই কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের গৌরবপ্রাপ্ত হয়েছে। উপমায় সাংগঠনিক শৈথিল্য থাকলেও, উৎপ্রেক্ষা দৃঢ়সংবদ্ধ হলেও শুধুমাত্র উপমা-উৎপ্রেক্ষা বা রূপকের অবস্থান যে চিত্রকল্পের উৎস-এ কথা আজ তার স্বীকৃত নয়। কেন-না— "The image is a pure creation of the mind. It cannot emerge from a comparison but only from the bringing together of two more distant realities." ইংরেজি 'ইমাজিনেশন' শব্দের প্রতিশব্দরূপে কল্পনা এবং 'ইমেজ' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে 'বাক্প্রতিমা' শব্দটির কথাও কেউ কেউ বলেছেন। শিল্পীর দ্বিধাদীর্ণ সত্তাসমূহ অস্থির, বিচ্ছিন্ন, অসহিষ্ণু, বিকলচিত্ত বলে বাক্প্রতিমাও সেই বৈশিষ্ট্যগুলি বহন করে। 'ইমেজ' বা 'ইমেজারি' কাব্যস্বভাবের এবং শিল্পীর অতল রহস্যময় সত্তার স্পর্শ রাখে বলে কেউ কেউ 'ইমেজ' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বাক্প্রতিমা শব্দ ব্যবহার করতে চান। তাঁদের মতে, 'ইমেজ' শব্দের অর্থ বহুধাব্যাপ্ত; সেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়নির্ভর অনুভূতি, দৃশ্যমান ও শ্রাব্যমান অনুভূতি, স্পর্শানুভূতি, স্বাদানুভূতিলিপ্ততা ইত্যাদির সামগ্রিক বোধ থাকে বলে 'ইমেজ' বললে চিত্রকল্প না বুঝিয়ে 'বাক্প্রতিমা' বোঝানো উচিত। বাক্প্রতিমার 'প্রতিম', 'প্রতিমা', 'প্রতিমান'-এর ভাবনা মূল লাতিন অর্থের সাদৃশ্যভাবনা ও বহুব্যঞ্জনায় দীপ্যমান হয়ে

ওঠে। সাদৃশ্য সৃষ্টি চিত্রকল্পের অন্যতম কাজ হলেও সাদৃশ্যভাবনার উদ্দীপনে চিত্রকল্পের কার্যকারিতার সমাপ্তি ঘটে না। চিত্রকল্পের মাধ্যমেই কবিচেতনার প্রসারিত ভূমিকা তথা ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটে। যার দ্বারা পাঠকের কল্পনাবৃত্তি নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হয়। মায়কোভস্কি মনে করেন, চিত্রকল্পের মাধ্যমে বিষয়কে বিশদ করা হয়। চিত্রকল্প আমাদের জীবনযাপন ও বিশ্বাসের উপকরণ থেকে গৃহীত হয়। আর. এইচ ফোগল যথার্থই বলেছেন, "The essential quality and function of imagery is a kind of creation, by bringing together of diverse objects, states of mind, or concepts, now relationship...born of the fruitful mating of ideas and things apparently disparate and isolated from each other."

'ইমেজ' শব্দটি বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে রূপচিত্র, চিত্রক, কল্পক, বিম্বক, প্রতিমা, বাক্‌চরিত্র ইত্যাদি ব্যবহার থাকলেও সাধারণভাবে 'ইমেজ'-এর প্রতিশব্দরূপে 'চিত্রকল্প' শব্দটির ব্যবহারই অধিক প্রচলিত। বুদ্ধদেব বসু, 'চিত্রকল্প' শব্দটির উদ্ভাবনার কৃতিত্ব সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে প্রদান করলেও আবু সয়ীদ আইয়ুব-ই সর্বপ্রথম 'ইমেজে'র বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'চিত্রকল্প' শব্দটির ব্যবহার করেন।

চিত্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে করেছেন। অমলেন্দু বসু তাঁর 'সাহিত্যচিন্তা' গ্রন্থে বাক্‌প্রতিমার (চিত্রকল্পের) বিচিত্র, অগণিত, বহুসংখ্যক রূপকল্পনা করেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রূপান্তর-সাধনী চিত্রকল্পের কথা বলেছেন। মায়্‌কোভস্কি পরিসংখ্যানগত চিত্রকল্পের কথা বলেছেন। সিসিল. ডে. লুইস বলেছেন ভগ্নচিত্রকল্পের কথা। কেউ কেউ বলেছেন, সরল, জটিল এবং গূঢ় চিত্রকল্পের কথা; আবার কেউ কেউ একক, মিশ্র ও জটিল চিত্রকল্পের কথা ভেবেছেন। কেউ বলেছেন—চিত্রকল্প মূল ও সহযোগী চিত্রকল্প এই দুভাগে বিভক্ত। 'মিথস্‌ অ্যান্ড মোটিফস্‌ ইন লিটারেচার' গ্রন্থে বলা হয়েছে—'A concrete representation of a sensory experience, personal image, a representation in the unconscious of a personal experience' ইত্যাদি। বিভিন্ন সমালোচকের বিভিন্ন চিন্তাভাবনার কথা মনে রেখে চিত্রকল্পকে সাধারণ, মানবিক, ইন্দ্রিয়জ, চিরায়ত, ভগ্ন, গতি, ঐতিহ্য, বিষয়গত, পরিসংখ্যানগত ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আবার ফিউচারিস্ট, ইম্প্রেশনিস্ট, এক্সপ্রেশনিস্ট, বাস্তববাদী ইত্যাদি ভাবে চিত্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। ঐতিহ্যগত চিত্রকল্প দেশি, বিদেশি, আগন্তুক হতে পারে। ইতিহাস-বিজ্ঞান-নৃতত্ত্ব-ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ক চিত্রকল্পও হতে পারে। আর্কিটাইপকে বিশুদ্ধ চিত্রকল্প বলা যাবে কিনা তা বিতর্কের; কেন-না কখনো-কখনো তা আবেগ বা চিত্রকল্প রূপে দেখা দেয়।

চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমার নির্মাণ যে আধুনিক কালের অন্বেষণ তা নয়, প্রাচীনকালেও বাকপ্রতিমা নির্মাণের বিষয়টি সাহিত্য সৃষ্টির অন্তর্গত ছিল। ভারতীয় সাহিত্যালোচনায়, বিশেষত সংস্কৃত কাব্যালোচনায় সমালোচকবৃন্দ উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা অলংকারের কথা বলেছেন এবং কাব্যের শিল্পগত বিচারে উপমা, রূপকের প্রয়োগনৈপুণ্যের ভূমিকাকে গোচরে এনেছেন। ঋগবেদের কৌষিতকি উপনিষদে প্রত্যক্ষ চিত্রকল্পের প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেই দূর অতীতে

'অলংকার' নামক সাহিত্যতত্ত্ব অসৃষ্ট বলে পরবর্তীকালে যাস্ক, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখের ব্যাকরণ গ্রন্থে উপমা অলংকারের বর্ণনা আছ। ভরতমুনির নাট্যাশাস্ত্রে রসের পরিচয়; দণ্ডী অলংকারকে বললেন, কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক ধর্ম। ভামহ, অভিনবগুপ্ত, আনন্দবর্ধন, রাজশেখর, ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের যে পরিণামী সংজ্ঞা দিলেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' সেখানেও শোভন, রসস্বভাবযুক্ত চিত্রের উল্লেখ রইল। কাব্যে অলংকার যেন নারীদেহের শোভাবর্ধক ভূষণমাত্র। কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা রসসৃষ্টিকেই অন্তিম উদ্দেশ্য বলেছেন। মহাকাব্যের যুগে কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কাব্যে বর্ণাঢ্য চিত্রসৃষ্টির মধ্যে ব্যঞ্জনাগর্ভ চিত্রকল্পের আয়োজন লক্ষ করা যায়। যেমন, কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ আছে—'মাল্যবান পর্বতের সানুদেশে বর্ষণসিক্ত মৃত্তিকার বুক থেকে উত্থিত হচ্ছে ধূম্রবর্ণের বাষ্প, মাঝে মাঝে সেই বাষ্পজালকে ভেদ করে তরুণীর সলজ্জ দৃষ্টিপাতের মতো রক্তবর্ণের নবকন্দল পুষ্প দৃষ্টিপথে আত্মপ্রকাশ করছে, সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সীতার 'বিবাহধূমারুণলোচনশ্রী'। এ-সব উদাহরণ মনে রেখেও বলতে হয়, চিত্রকল্প সম্পৃক্ত আন্দোলন আধুনিক কালের প্রবর্তনা। শুধু ভারতীয় কেন, গ্রিক ও রোমক মনীষাও মনে করতেন, অলংকারই হল বাক্‌প্রতিমা এবং অলংকারকেই কাব্যের শ্রেষ্ঠগুণ বলে মানতেন। কিন্তু আধুনিক কালের কবি-সমালোচকরা মনে করলেন, ছন্দ যেমন কবিতা নয়, তেমনি বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্প মানেই অলংকার নয়। একালের কাব্যদেহে চিত্রকল্প এক শোভনীয়, আদরনীয় উপাদান। এই ধারণা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রূপ পেল উনিশ শতকে বোদলেয়রের ফরাসি দেশে কবিতার মায়াময় মোহময় রাজ্যে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'ভাব ভাষা আর ছন্দ' এই তিনের সন্নিপাতে কাব্য গড়ে ওঠে'। ভাষার সম্মোহনী শক্তিতেই রসপ্রতিপত্তির অভিধা অনির্বচনীয় রূপ লাভ করে, শৈল্পিক কারুকৃতিতে গড়ে ওঠে বাগৈশ্বর্য; তা অনির্বচনীয় ও অবিশ্লেষণীয়। বাক্‌প্রয়োগরীতিতেই জন্ম নেয় চিত্রকল্প। বাক্‌সমষ্টি খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপ নির্মাণ করে, আবার খণ্ড চিত্ররূপ অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত হয়ে শব্দানুভূতির ঐশ্বর্যে ইন্দ্রিয়জ বা ইন্দ্রিয়াতীত অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার করে। ভাবের রূপনির্মাণ বাক্যগুচ্ছকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে আর অন্তিম বিশ্লেষণে তাই হয় চিত্রকল্প। কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের কালে স্রষ্টার সৃজনশীল চেতনায় তাঁর পরিমণ্ডল অনুযায়ী রং, রূপ, রেখা, প্রকৃতি ইত্যাদির আয়োজন হয়। চিত্রকল্পের উৎস, রং, আলো, অন্ধকার, গতির তারতম্য, চিত্রের মূর্ত-বিমূর্ত ভাব, আবেগ, মনন ইত্যাদি কবিসত্তার বিচিত্র বর্ণালিম্পনের দিগন্ত পাঠকের কাছে উন্মোচিত করে। চিত্রকল্পের সাংগঠনিক অবয়বও কবির চেতনার সূত্র নির্ণয়ে সাহায্য করে। কবি কখনও সহজ-সরল চিত্রকল্পের বিন্যাসে হৃদয়ের ভাবতন্ময় রূপটি প্রকাশ করেন; আবার কখনও মিশ্র জটিল চিত্রকল্পে, একাধিক উপাদানের সংলগ্নতায় ভাবনার ক্রমবলয়িত, পূর্ণাঙ্গ, দীর্ঘাবয়ব, গভীরতর রূপটি প্রত্যক্ষ করান। কবিতায় চিত্রকল্প শুধু অবচেতনের সম্পদ নয়; সচেতন শিল্পমনীষার উৎকর্ষ সেখানে প্রকাশিত। সার্থক চিত্রকল্প শব্দে-রঙে-রেখায় কবিতার আবহ সৃষ্টি করে। চিত্রকল্প কবিতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় যেমন তেমনি আবার অন্তিমে সামগ্রিক রসপরিণামের জন্যে চিত্রকল্পের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। চিত্রকল্পই কবিতার ঐশ্বর্য। এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতা কল্পনালতা' গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক' প্রবন্ধে

বলেছেন—'কবিতার সমগ্রতার টানে এর (চিত্রকল্পের) প্রস্ফুটন, আবার সেই প্রস্ফুটিত চিত্রকল্প তার বিনিময়ে কবিতার সমগ্রতাকেই সমৃদ্ধ করে'। চিত্রকল্পকে বলা যেতে পারে সেই 'জাদুদর্পণ'—যা একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে আলোকোদ্ভাসিত করে—"The images in a poem are like series of mirrors set at different angles so that, as the theme moves on it is reflected in a number of different aspects. But they are magic mirrors : they do not merely reflect the theme, they give it life and form: it is their power to make a spirit visible." কালের চেতনার দ্বারাও চিত্রকল্প নিয়ন্ত্রিত। সমকালীন ভাব, বস্তু, চিন্তা, চেতনা ইত্যাদি কবির ভাবনায় বিশেষ রস সঞ্চার করে। শ্রেষ্ঠ কবির মনীষায় ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন ঘটে, পুনর্নির্মাণের ও পুনর্বিন্যাসের ফলে চিত্রকল্প নবায়মান হয়ে ওঠে। কবি নিজের নিজের যুগে যে বিশিষ্ট চেতনা তার দ্বারা আবর্তিত হবেন এবং তাঁর ভাষায়, রূপনির্মাণে, অলংকরণে যে চিত্র তিনি অঙ্কন করবেন—তা একান্ত করে এই যুগেরই ভাবনা হবে। তাই এ যুগের চাঁদ হয় কাস্তে, না হয় পোড়া ঝলসানো রুটি। কাল যদি জটিলতর হয় তবে অনেক সময় সৌষম্যের শৃঙ্খলা ভেঙে যেতে পারে; তাই আধুনিক চিত্রকল্প হয়ে ওঠে অস্থির, তির্যক, দূরযানী—অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব এখানে সমীকৃত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' থেকে একটি উদ্ধৃতি নেওয়া যায়—'কালের চিত্র আধুনিক কাব্যে হয়ে দাঁড়াল পিকাসোর ছবির মতো, এক মুহূর্তে তারা দেখলেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে। বোরের ইলেকট্রনের মতো ভাবনাও এক চিত্রকল্প থেকে আর এক চিত্রকল্পে, এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উল্লম্ফন করতে লাগল। তার ফলে, ডারেলের ভাষায়, দেখা দিল এক Semantic distrubance অর্থাৎ বাক্যের কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির পারস্পরিক-এর স্থলে দেখা দিল আবেগগ্রথিত পারস্পর্য।'

অথচ সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে কল্পনাপ্রতিভা বিষয়কে এমন অনতিক্রম্য ব্যবধানে স্থাপন করেনি। এই পর্যায়ে সমাজের আদিম মৌল প্রথায় জাত অনেক প্রত্যয় ও স্বপ্ন 'মিথ'-এর আকারে কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট হল। 'মিথ'-এ বিরাজিত স্বপ্নের গোপন অর্থের তাৎপর্য, সংকেতের রহস্যময় ব্যঞ্জনা, অসীম ও নিবিড়তায় চিত্তের নবীন আবিষ্কারের দিগন্ত প্রসার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ইমেজে দেখা দিল। একালের চিত্রকল্পের সঙ্গে ক্লাসিক চিত্রকল্পের তুলনায় দেখা যাবে যে, ক্লাসিক কবিদের চিত্রকল্প নির্বাচনের প্রধানতম উৎস নিসর্গ—অজটিল, মুক্ত, উদার আরণ্যক জীবনের বিশালতা, বিস্ময়করতা। তাই বাল্মীকি-ব্যাস-হোমার-ভার্জিল-কালিদাসের মহাকাব্যের জগতে, অগ্নি, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, বায়ু, সূর্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নানাভাবে দৃশ্যমান। ক্লাসিক চিত্রকল্প বিস্তৃত, ব্যাখ্যাধর্মী এবং উপমানির্ভর। কিন্তু ক্রমশ জীবনব্যবস্থায় পরিবর্তন এল; উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকল্পের ভাবনাও পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মানুষ যখন নিরুদ্‌বেগ স্থিতি লাভ করে তখনই চিত্রকল্পে সৌন্দর্যে-অন্বেষা ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে। সভ্যতার বিবর্তনে ব্যক্তি ক্রমশ জাতিতে, জাতি ক্রমশ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হল; চিত্রকল্পেরও প্রকৃতি পরিবর্তিত হল। অষ্টাদশ শতকে বিরাজিত সুশৃঙ্খল ক্লাসিক আদর্শ বিপর্যস্ত করে ফরাসি বিপ্লবে জাগ্রত রোম্যান্টিক কবিরা রূপের মধ্যে অরূপ, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড ও

সীমার মধ্যে অসীমতার সম্ভাবনার এক রহস্যময় সংকেত তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হলেন। ফলত চিত্রকল্প হয়ে উঠল নির্বস্তুক ব্যঞ্জনা প্রধান। চিত্রকল্পের চরিত্রর-পরিবর্তনে সর্বাধিক প্রভাব ফরাসি প্রতীকী কবিদের—তাঁর ব্যঞ্জনায় বিশ্বাসী, সংকেতধর্মী কল্পনার উদ্‌বোধক। বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, মার্লামে, ভ্যালেরি এবং ইংরেজ কবি এলিয়ট প্রতীকী চিত্রকল্প ব্যবহারে বিশিষ্ট; যা অনুপস্থিত ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কিটসের চিত্রকল্পে। আত্মিক আবেগ ও অনুভব-তাড়িত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রোম্যান্টিক চিত্রকল্পগুলি ছিল সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী কাব্যচিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পরিবেশগত পার্থক্যও চিত্রকল্প নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করে। কোথাও বা উত্তপ্ত ধাতব আকাশে মধ্যাহ্নের রক্ত সূর্য স্থির (কোলরিজ); কোথাও বা প্রকৃতি অনুর্বর; ধূসর, নিঃসঙ্গ, বিষাদময়, পোড়ো জমি (এলিয়ট); কোথাও বা সমুজ্জ্বল নীলাকাশ কুয়াশায় আবৃত (মালার্মে) ইত্যাদি। কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতার চেতনা সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ—এ যেন স্বপ্নাশ্রয়ী চিত্রকল্পমালার উপস্থাপনা।

কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান যাই হোক্ না কেন কবিতায় তার প্রয়োগ শৈল্পিক পরিচর্যা ও বিচার দাবি করে। চিত্রকল্প যেহেতু বস্তুর, ভাবের সঙ্গে ভাবের, অথবা ভাবের সঙ্গে বস্তুর সমবলয়ে অবস্থিত বলে তাদের সাদৃশ্য কল্পনা সমসূত্রিক হতে হবে। চিত্রকল্প শুধু একক অবয়বে নয়, ভাব-আবহ-রস পরিণাম ইত্যাদির সুসমঞ্জস স্থাপনায় বিচার্য। কবিতার সঙ্গে চিত্রকল্পের সংযোগ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে একটি কবিতার পক্ষে একটি সম্পূর্ণ চিত্রকল্প হয়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। সাংগঠনিক অসামঞ্জস্যের জন্যে উপমান-উপমেয়ের জটিলতা, দূরান্বয় ইত্যাদি অথবা সামগ্রিক পরিবেশে বৈপরীত্য চিত্রকল্পকে অসার্থক করে তোলে। যে-কোনো রকম চিত্রকল্পই কল্পনানির্ভর ও আবেগধর্মী বলে চিত্রকল্পের সার্থকতা নির্ভর করে অচিরাচরিত প্রথাবহির্ভূত নবীনশিল্পরূপ গঠনে।

বাক্‌সমন্বয়ে শব্দসৃষ্টিতে পরিস্ফুট প্রতিমায় যদি ইন্দ্রিয়জ শক্তির উদ্‌বোধন হয়ে তবেই চিত্রকল্প সার্থক মনে করা যেতে পারে। এক একটি চিত্রকল্প আবার একই সঙ্গে চিত্র-ধ্বনি স্বাদ-স্পর্শ অর্থাৎ দর্শন-শ্রবণ-ঘ্রাণ-ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় এ জাতীয় চিত্রকল্পের আয়োজন লক্ষ করা যায়। আর এক জাতীয় চিত্রকল্পে ইন্দ্রিয়জ এক ধারণা থেকে অন্য আর এক ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সমালোচনা পদ্ধতিতে একে 'সিনেস্‌থিসিয়া' বলে। এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা অন্য এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় আশ্রয় নিয়ে পূর্ণ প্রতিমারূপ ধারণ করে। যেমন, জীবনানন্দের নিম্নোক্ত কবিতাটিতে মূলে শব্দরূপময়তা থাকলেও তা ক্রমে স্বাদরূপময়, চিত্ররূপময় এবং শেষে অনুভূতিময় হয়ে ওঠে—'যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়/হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে/তাহারাও তোমার মতন;/ক্যাম্পে বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়/কথা ভেবে কথা ভেবে ভেবে/কোথাও ফড়িঙে কীটেমানুষের বুকের ভিতরে/আমাদের সবার জীবনে'। আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন—'নিবে গেল দীপাবলী; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন/স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে/বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী/নম্রকণ্ঠে মরমী আহ্বান, জাগিল বিনম্র সুরে/কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ'—তখন

শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়ে স্তব্ধতা নেমে আসার পরে থেকে বাঁশরী বেড়ে ওঠার আয়োজন পর্যন্ত শব্দচিত্রের বহুল বিস্তারে এক একটি চিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ধ্বনিরূপ একটি মাত্র দৃশ্যময় চিত্রকে প্লাবিত করে দেয়। ইংরেজিতে আর এক জাতীয় বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্প আছে যাকে পার্সোনিফিকেশন বা নরত্বারোপের চিত্রকল্প বলা যেতে পারে, যেখানে নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে নরত্বারোপ করে কবি সৃষ্টির আনন্দে অবগাহন করেন। যেমন—রবীন্দ্রনাথের—'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রলসা/সোনার আঁচল খসা/হাতে দীপশিখা'। অনেক সময় প্রতিমাপুঞ্জের দ্বারা একটি চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জনতা চিত্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জনতাচিত্রকল্প সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের সৃষ্টিতেও লক্ষ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জনতা চিত্রকল্পে কবি অবশ্য জনতার থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন—'সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি'। সুভাষের জনতা চিত্রকল্পে অবশ্য জনতার ভ্রাতৃশক্তির বক্তব্য প্রকাশিত—১. 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে/বিপ্লব ঘোষণা করে গেছে।' ২. 'নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন।'

অনেক সময় কবিতাতে দীর্ঘ, বিস্তৃততর, মহৎ চিত্রকল্প পাওয়া যায়। সাধারণত এই মহৎ বা sublime বাক্‌প্রতিমার প্রকাশ লক্ষ করা যায় মহাকাব্যে। মহাকাব্য ব্যতীত দীর্ঘকবিতা—যেমন—রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী, বৈশাখ, শিশুতীর্থ, বসুন্ধরা; বিষ্ণু দে-র অন্বিষ্ট; সুধীন্দ্রনাথের যযাতি প্রভৃতি কবিতায় এই জাতীয় সুমহৎ বিশাল চিত্রকল্পের আয়োজন দেখা যায়। আবার বর্ণবহুল ও চিত্রল প্রতিমার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ, সমুদ্রের প্রতি, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি কবিতায়। মহাযুদ্ধগত বিভীষিকা, অমঙ্গল, দুঃস্বপ্নবোধ, লালসা, শূন্যতাবোধ ইত্যাদিও একালের কবিতাকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে; ফলে চিত্রকল্পও হয়ে উঠেছে ভিন্নমাত্রার অধিকারী। একালের চিত্রকল্পে শুধুই মঙ্গল, লাবণ্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য নেই; আছে শতাব্দীর অভিশাপ, সভ্যতার সংকট, ক্লান্তি, সংশয়, বেদনা, নৈরাশ্য আর এক অদ্ভুত আঁধার—'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়—অলীক প্রয়াণ/মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর/যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে যুদ্ধের নান্দীরোল/মানুষের লালসার শেষ নেই।"

[আধুনিক কবিতার স্বরূপ চেতনা চিত্রকল্প এবং অন্যান্য/ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়]

ত্রিশোত্তর কবিরা সচেতনভাবে চিত্রকল্প রচনা করলেও পাশ্চাত্ত্য চিত্রকল্পবাদী কাব্যান্দোলনে তেমন সাড়া দেননি। বুদ্ধদেব বসুও ইমেজিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে কাব্যকলার নিয়ম-নির্দেশ রচনা করলেও চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'কঙ্কাবতী' পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসু চিত্রকল্পের ব্যবহার বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। এ সমস্ত কাব্যে চিত্রল বর্ণনা থাকলেও চিত্রকল্পের অপূর্বতা, প্রগাঢ়তা, আবেগকল্পনা প্রায় অনুপস্থিত। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে ঘন ও গাঢ়বন্ধ রূপক চিত্র থাকলেও, পূর্ণ চিত্রকল্প রচিত হয়নি। 'একটি কথা' ও 'পৃথিবীর পথে' কাব্য অনেক বেশি চিত্রল। যদিও এই পর্বে চিত্র ও গাঢ়বন্ধ আবেগ পরস্পর অন্বিত এবং চিত্রকল্পের সঙ্গে গভীর কল্পনার অঙ্গাঙ্গীময়তা দুর্লক্ষ, তবুও এখানেই কয়েকটি চিত্র চিত্রকল্পের মর্যাদায় উন্নীত। যেমনঃ

১. 'চুলে তার খেলা করে হেমন্তের বিকালের সোনালি আলোক,
তরল নয়নে তার আলো ভরা অন্ধকার করে টলমল।'

২. 'শিশিরের মত ঘুম ঝরে পড়ে, নিশীথের আকাশের তলে।'

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে স্নিগ্ধ, আবেগসঞ্চারী ইন্দ্রিয় সংবেদ্য চিত্র চোখ, চুল, অন্ধকার, বিদ্যুৎ, চাঁদ, জ্যোৎস্না ইত্যাদি রোম্যান্টিক উপাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'কঙ্কাবতী' কাব্যে চিত্রল বর্ণনা থাকলেও এবং 'নতুন পাতায়' বিরল সংখ্যক চিত্রকল্পের জন্ম হলেও বুদ্ধদেব এখানে প্রথম স্মরণীয় চিত্রকল্প রচনা করলেন। যেমন—'সমস্ত রাত্রি বিশাল একটা রূপালি পাখি হয়ে উঠলো। তার ক্ষুধিত ঠোঁটের মধ্যে আমারসত্তা'। 'নতুন পাতায়, চিত্রকল্পের জন্মমুহূর্ত অনেক পূর্ণ ও সমৃদ্ধ। আবেগ-স্মৃতি-মননের চৈতন্য জ্যাবদ্ধ টানে যে চিত্রকল্পের জন্ম তা এখানে অনেক প্রগাঢ়—১. 'তোমার চুলের গন্ধ দুরন্ত মৌসুমী হাওয়ায় মতো আছাড় খেয়ে। পড়তো বুকের উপর।' ২. 'নাচে তোমার ঠোঁট আগুনের মতো লাল/নীচে তোমার চুল উদ্দাম আগুনের নিচে উন্মত্ত নৃত্যশীল ছায়ারাশির মতো।' এই পর্বের 'ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা', 'সমুদ্রস্নান', 'চিল্কায় সকাল', 'অলস সকাল' ইত্যাদি চিত্রশোভিত, কিন্তু পূর্ণ চিত্রকল্পমণ্ডিত নয়। অবশ্য 'চিল্কায় সকাল'—এর নিম্নোদ্ধৃত স্তবকটি দৃষ্টিগ্রাহ্যই নয়, তা চেতনায় আনে নতুন ভাবনা:

'রূপোলি জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝরে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে।—এখানে জ্বলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে?'

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রথম পর্যায়ের রোম্যান্টিক আবেগ দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিশীলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকল্পগুলিও অনেক সংহতি অর্জন করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়েই বুদ্ধদেব পাউন্ড প্রবর্তিত চিত্রকল্পবাদী কবিতার রূপরীতি আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। 'দময়ন্তী' থেকে শুরু করে 'শীতের প্রার্থনা': বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত কবিতায় চিত্রকল্পগুলি অনেক সংহত ও উজ্জ্বল। যেমন—১.'সূর্যাস্তের জ্বলন্ত জঙ্গলে/দুরন্ত সোনালি বাঘ থাবা চাটে'। ২. 'রূপোলি রাত্রির খোঁপার কাঁটাগুলি/হিরের ফোঁটা হয়ে নামলো/হলদে সিল্কের শয্যায়'। ৩. 'সূর্যাস্তের জ্বলন্ত জঙ্গলে/দুরন্ত সোনালি বাঘ থাবা চাটে।' ৪. 'ফুটপাথের গাছের ডালের/সবচেয়ে উঁচু, লঘু সবুজ বিনুনি থেকে যেই/খসে পড়ে রোদ্দুরের সোনার চিরুনি।'

বুদ্ধদেব বসরু চিত্রকল্পে কার্তিকের বিবর্ণ আকাশ যেন শ্বাপদের চিত্রকল্প; হেমন্ত ঋতুর বিবর্ণ আকাশ যেন ওঁৎ পেতে-থাকা শ্বাপদ। আকাশ যে তার সৌন্দর্য হারায, তার কারণ আধুনিক কবি তার নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশকে দেখেন।

বুদ্ধদেব বসুর 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র চিত্রকল্প অনেক গাঢ়বন্ধ। এ কাব্যের কবিতা প্রতীকী হলেও এর অর্থব্যঞ্জনা কিন্তু চিত্রকল্পের পথ বেয়ে প্রকাশিত। প্রতীকের গূঢ় 'মরচে পড়া পেরেকের

গান' অনেক নির্মেদ, প্রগাঢ় এবং চিত্রকল্পগুলি অভিনব কল্পনাসমৃদ্ধ। যেমন—(ক) 'চোখে চোখ রেখে ছিলে তুমি অনিমেষ/ঠোঁটে প্রলোভন, কৌতুকে আঁকা ভুরু/মৃত হৃদয়ের লুপ্ত আদরে মাথা/বাতিচেলিমুখ, পাণ্ডুর।' (২) 'কাউন্টারে/কনুই রাখা, হাতের গর্তে থুৎনি, তাকিয়ে আছে/পথের দিকে, দুরে দিকে, এক অস্পষ্ট ভবিতব্যের/ছায়ার মধ্যে যেন।' 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র চিত্রকল্পে আসে আকাশের নীল, গাঢ় রৌদ্র, মেঘের গতিশীল ছায়া এবং এই সমস্ত চিত্রকল্প সৃষ্টিতে বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

চিত্রকল্প শব্দটির প্রতি সমধিক আগ্রহী কবি বুদ্ধদেব বসুই চিত্রকল্প নির্মাণে সমাধিক কাব্যিক কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর চিত্রকল্পকে সাধারণ, মানবিক, ইন্দ্রিয়জ, সমষ্টিগত, আগন্তুক, গুচ্ছ ইত্যাদি চিত্রকল্পে বিন্যস্ত করা চলে। 'পৃথিবীর মাটিরে মদির করে চুমো খায় উজ্জ্বল আঙুর'; 'চুমো খায় চোখে মেঘলা সবুজ হাওয়া', 'ফুটপাতে অদ্ভুর জনতার ফেনিল বিশাল খরস্রোত'; 'তোমার দুই বুক কল্পনার গ্রন্থির মতো দোলে' ইত্যাদি তাঁর নানা চিত্রকল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। মৃত্যু ও সময় সম্পৃক্ত চিত্রকল্পে বুদ্ধদেব শিল্পীত মহিমায় বিরাজিত। যেমন—১. 'নিশ্চিত মৃত্যুর মতো/আসন্ন শীতের বেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে।' ২. 'বর্তমান এক/অন্তহীন পিঁপড়ে সারি, আমার পায়ে পায়ে অনবরত মরে যাচ্ছে।'

পরাবাস্তব চিত্রকল্পে বুদ্ধদেব স্মরণীয় মর্যাদায় সমাসীন। পরাবাস্তববাদে যে স্বপ্নশায়ী চিত্রকল্পমালা'র সন্ধান পাওয়া যায় বুদ্ধদেব সেই ধরনের চিত্রকল্পের অবতারণায় বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে করেছেন। উদাহরণ—'আমার চোখে তোমার দুই বুক/স্বর্গের স্বপ্নের মতো/তোমার বুকের পর উত্তপ্ত উৎসুক/আমার হাতের স্পর্শ, কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক/আমার হাতের স্পর্শে যেন কোন অদৃশ্য নদীর/খরস্রোত; তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর/চিহ্ন মুছে যায়; শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর/তীব্র আবর্ত, যেখানে আমরা জয়ী।'

বাংলা কবিতার ভুবনে বুদ্ধদেব বসু এমন বিচিত্র চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন যে তাঁকে 'বৈচিত্র্যময় চিত্রকল্পের কবি' বলা যায়। তাঁর কবিতায় সাধারণ চিত্রকল্প, ইন্দ্রিয়জ চিত্রকল্প, মানবিক চিত্রকল্প, সমষ্টিগত চিত্রকল্প, আগন্তুক চিত্রকল্প, গুচ্ছ চিত্রকল্প, মৃত্যু চিত্রকল্প, সময় সম্পৃক্ত চিত্রকল্প ইত্যাদির সুপ্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

(ক) সাধারণ চিত্রকল্প:

১. 'সোনার ঢেউয়ের মতো কেশরাশি উঠিছে উচ্ছ্বসি,
ঠোঁটের আরক্ত রেখা নদীতে দীপের ছয়াসম
ভাঙ্গিয়া ছড়ায়ে যায় সারা মুখে, যখন যে হাসে।
বাদামি সে চোখ দুটি, নদীতে দীপের ছায়া সম
ভাসিয়া বেড়ায় ঘুরে'—

২. তোমার সে চুল
জড়ানো সুতোর মতো, নিশীথের মেঘের মতন,
তোমার সে কালো চুল, এলোমেলো, অগোছালো চুল,
ঘুমের মতন ঠাণ্ডা, একমুঠো জমানো আঁধার।

(খ) ইন্দ্রিয়জ চিত্রকল্প:

১. নয়নে কামনা তার, অধরে অমৃত, আর পরশে মিনতি,
নখকোণে, আঁখিকোণে বাসনার গুঞ্জরণ, দৃষ্টিতে দুরাশা,
করতলে, বাহুতলে, পদতলে, বাহুতে, আঙুলে তার বহে ভালোবাসা

২. বাতায়নে তারা জাগে, চাঁদের রূপালি আলো শয়ন-শিহরণে
শিশিরের মত ঘুম ঝরে পড়ে নিশীথের আকাশের তলে
নয়ন জড়ায়ে আসে, নয়ন ভরিয়া যায় স্বপ্নের ফসলে।

(গ) মানবিক চিত্রকল্প:

১. বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।

(ঘ) সমষ্টিগত চিত্রকল্প:

১. ছায়ামুড়ি দিয়ে ছায়মূর্তির মতো
জটিল জনতা প্রগল্‌ভ গতিশীল,
স্বৈরী মেঘের পূর্ণ স্বরাজ
দেখেই কি ওরা এমন দরাজ,
স্বেচ্ছাচারের উচ্চচূড়ার জঙ্গমতা
বঙ্গমাতার সন্তানেরাও আজি কি পেলো?

(ঙ) গুচ্ছ চিত্রকল্প:

১. আমার চোখের সামনে স্বর্গের মতো দোলে
তোমার দুই বুক; কল্পনার গ্রন্থির মতো খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর; ঝড়ের পাখির মতো দোলে
আমার হৃৎপিণ্ড;

২. এদিকে সে বিদেশিনী মেয়ে—
নাম তার আনা পিফনিং
কিংবা কিছু ঐ ধরনের—
ম'জে আছে পুরোনো পাথরে।
সকালে চা খেয়ে রোজ যায় বেরিয়ে,
খাটো ঘাগরা, পায়ে মোজা নেই,
মাথায় শোলার টুপি, কালো চশমা চোখে:
ক্যামেরা ঝুলছে কাঁধে, ব্যাগে আছে কাগজ-পেনসিল।

(চ) মৃত্যু চিত্রকল্পঃ

নিশ্চিত মৃত্যুর মত
আসন্ন শীতের বেলা
হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসে;
শূন্য দিনে শূন্য মনে শুয়ে শুয়ে
শহরের বিমর্ষ গোঙানি শুনি,
কাক আর কুকুরের ডাক;
শহরের মুমূর্ষু নিশ্বাস শুনি।

(ছ) বাস্তবধর্মী চিত্রকল্পঃ

কোন দূর সন্ধ্যার বারান্দা বেয়ে আলাদীন জ্বালায় প্রদীপ।
এপারে ব্রুকলিন, আর ওপারে মানহাটান স্কাইলাইন,
মধ্যিখানে বন্দর, অর্ণবপোত, সেতুর চিত্রল ভঙ্গি,
উড্ডীন আশার মতো ইতস্তত হেলিকপ্টার।
আছি হোটেলের ঘরে, এতদিনে অভ্যস্ত, নিজস্ব প্রায়;
ঋতু গ্রীষ্ম, তরুণ সুন্দর জুন, জানালায় সমুদ্রসমীর—
জুন, কিন্তু আসন্ন আষাঢ়।

বুদ্ধদেব বসুর 'ব্যাং' কবিতাটি কবিতার রাজ্যে প্রায় অন্ত্যজ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত। অথচ এখানে চিত্রকল্পের সমারোহে কোনো ক্লান্তি নেই। কবি যখন বলেন: 'ঘন হলো ঘনমেঘ; স্বচ্ছ জল জমে আছে মাঠে'—তখন যে শ্যামলমেঘের প্রতিবিম্ব সমাকুল প্রাকৃতিক চিত্রই অঙ্কিত হয়, তা নয়; বাদল পরিবেশ ও যৌন পরিবেশ একত্রিত হয়ে জীবনের সৃষ্টির উল্লাসকে ব্যক্ত করে। 'স্পর্শময়' শব্দ ব্যবহারের দ্বারা একটি ইন্দ্রিয়মগ্ন চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়। বর্ষার জলে গলিত কর্দম কবির কাছে 'তরুণ' ও 'মসৃণ' মনে হয়। আর সেখানে ধ্বনিত হয় স্কন্ধহীন জীবের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি যা মনে হয়েছে সপ্তমের অর্থাৎ 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'র শরীরী প্রকাশ। এখানে একটি চাক্ষুষ ও শ্রুতিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের মিলন ঘটে। 'সংগীতের শরীরী সপ্তম' চিত্রকল্পটি অনেক অভিনব।

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটিতেও বুদ্ধদেব বসু চিত্রকল্প সৃষ্টিতে কাব্যিক কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর কবিতায় নানা জাতীয় চিত্রকল্প দেখা গেলেও এবং সাধারণ চিত্রকল্প নির্মাণে বুদ্ধদেব কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দ্রিয়জ ও পরাবাস্তব চিত্রকল্পে। আলোচ্য কবিতাটিতে তিনি সাধারণ ও মানবিক, সময় সম্পৃক্ত ও মৃত্যুচিত্রকল্পের আয়োজনেই ব্যস্ত। যেমন: 'সভ্যতার শ্মশান শয্যা' (সাধারণ চিত্রকল্প), 'প্রাণ লক্ষ্মী নির্বাসিতা' (মানবিক চিত্রকল্প), 'রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিন' (সময় সম্পৃক্ত চিত্রকল্প), 'মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন' (মৃত্যুবহ চিত্রকল্প), 'লুব্ধতার লালা ঝরে' (সময় সম্পৃক্ত চিত্রকল্প), 'জীবনের সোনার হরিণ' (মানবিক ও পরাবাস্তব চিত্রকল্প)।

'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'মৃত্যুর পরে জন্মের আগে' কবির জীবনদর্শনের গভীর স্তরে প্রবেশের কবিতা। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য কবির ন্যায় বুদ্ধদেব বসুও মৃত্যু সম্পর্কে এমন এক তত্ত্বের উপস্থাপনা করলেন যা নির্মোহ; আর এই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিবশত তিনি মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে ঘুমের উষ্ম আরাম বা তামসী মাতার নির্বাণ করুণ যোনির চিত্রকল্প কবিতায় এনেছেন। আলোচ্য কবিতায় বুদ্ধদেবের কাছে মৃত্যু অন্ধকার প্রতিম এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা 'ফিরে যেতে চাহি যেন তামসী মাতার গর্ভে, তারপর 'অজাত আত্মার/নিশ্চিত নির্বাণে'। বার্ধক্যের নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য কবি ঘুমের উষ্ম আরামে ডুব দিতে চাইছেন—ঘুম আর মৃত্যুর রূপকল্প কবিতাতে একইভাবে উপস্থাপিত—'মনে হয় ঘুম যেন জীর্ণ কোনো/জন্তুর গোপন গুহা, ছোটো তার অন্ধকার রেখেছে ঠেকিয়ে/আরো বড়ো অন্ধকারে এখনো এখনো/আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় ঘুম যেন মাতার মমতা/তামসী মাতার নির্জন করুণ যোনি/পরিমিত অন্ধকারে, মমতার নরম উষ্মতা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে/অন্তহীন অন্ধকারে, কঠিন ঠান্ডারে/আরো একদিন—আরো একদিন'। এই কবিতায় বুদ্ধদেব তাঁর যৌবনকামনা ও মৃত্যু সম্পর্কিত জীবনতত্ত্বের কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। আলোচ্য দীর্ঘ কবিতাটি চিত্রকল্পের অনন্যপূর্ব কুশলতায় দীপ্যমান। যেমন:

১. 'মাংসহীন শীতের শরীর।' ২. 'আয়ুর সিঁড়িতে বসে শুনি পিছে স্মৃতির প্রপাত।' ৩. 'সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা।' ৪. 'তরুণী নাতনীর হাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন।' ৫. 'আয়ুর শীতের সিঁড়িতে।' ৬. 'তামসী মাতার নির্জন করুণ যোনি।'

তবে মৃত্যুর শীতলতাবাচক চিত্রকল্পগুলি যেন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনিতে আরও বেদনাকরুণ। যেমন:

১. 'স্বল্পতম সূর্যালোক, ন্যূনতম তাপ আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আভার চাঁদ।'

২. 'দিগন্তের জন্ম যন্ত্রণারে কণ্ঠ দেয় শালিক, চড়ুই,
কাক, ওঠে ডাক/তীক্ষ্ণ ডাক, শঙ্খ ডাকে অন্ধকারে—
আরো দিন/আরো একদিন/মুখ-ঢাকা বুক-চাপা
অন্ধকারে, লেপের গোপন, গরম গুহায়/রাত্রি কাৎরায়,
আর রাত্রিরে জড়ায়ে ঘুম হাৎড়ায় স্বপ্নের শেষ।'

নারীর চিত্রকল্পেও এসেছে মৃত্যুর শীতলতা:

১. 'নারীর শরীরে আর নেশা নেই, শাড়ির তরঙ্গে আর গান নেই/চোখে চোখে কথা নেই, হাতে হাতে চকিত পরশে নেই কবিতার তাপ।'

২. 'নারীর শরীরে আর কল্পনার শিরা নেই, শিরার বন্যায় আর/কবিতার সুরা নেই।'

'মরচে পড়া পেরেকের গান'—এর 'কেবল তোমাকে নিয়ে' কবিতার 'তুমি সেই মৃত মেয়ে' ছত্রের চিত্রকল্পের মৃত মেয়েটি কবিতারই প্রতীক। উক্ত কবিতার 'পল্লবে যার নীড় বেঁধে পথশ্রান্ত ইচ্ছারা ঘুমিয়ে পড়ে' চিত্রকল্পে শ্রান্ত-ক্লান্ত কবির শান্তি ও বিশ্রামপ্রত্যাশী নীড় বাঁধার আকাঙ্ক্ষা। 'মৌলিনাথের স্বপ্ন' কবিতার চিত্রকল্পটি স্পর্শ প্রধান:

'কে তুমি আমাকে ছুঁয়ে গেলে আজ স্বপ্নে
পায়রা পাখায় কোঁকড়া বাতাসে হালকা'।

আবার উক্ত কবিতার 'চোখে চোখ রেখেছিলেন তুমি অনিমেষ' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে যতিচেলির আঁকা কোনো মুখের চিত্রকল্প কবিকল্পনার স্পর্শে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় পাওয়া যায় সমকালীন নাগরিক চিত্রকল্প, প্রিয় নগর কলকাতার চিত্রকল্প, আবার বিশ্বায়নের নগর চিত্রকল্প যেন তাঁর কবিতায় আগে থেকেই অঙ্কিত হয়ে যায়।

(ক) সমকালীন নাগরিক চিত্রকল্প:

১. 'এও কি সম্ভব যে তারা ঈর্ষার অনলে
পুড়ে পুড়ে পানের দোকানের দড়ি হয়ে ঝুলছে—
যে কোনো পুরু ঠোঁট লম্পটের বিড়ি ধরাবার
জন্য? কিম্বা তারাই চর্বি আর কুচুটেপনার
বস্তা, যে যার পাড়ায় মস্ত বড়ো মাস্তান।'

(খ) নগর কলকাতার চিত্রকল্প:

'আজ আকাশ ভরে মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে আমারই
আত্মার কালিমার মতো; আর এই বূঢ় বৃষ্টির তলায়
কলকাতা পড়ে আছে যেন কামুক স্বামীর ভারপিষ্ট
কোনো নির্বোধ নিঃসাড় ক্লান্ত সহিষ্ণু প্রৌঢ়া।

* * * * * * * * *

কেউ দোকান খুলে বসে,
কেউ ফেরে বাজার থেকে, আর একে একে ট্রামের
স্টপে লোকেরা এসে দাঁড়ায়—ছাতা নিয়ে, বর্ষাতি নিয়ে'

(গ) বিশ্বায়নের নগরচিত্র:

'এই দোকানগুলো দেখতে আমার ভালো লাগে।
এখানে খেলা করে অমর লোভ, সনাতন দম্ভ, অভাবের
সঙ্গে প্রয়োজনের যুদ্ধ চলে; মহিলারা লজ্জা ভুলে
নিজেদের স্তন আর বাহুর ডৌল নিরীক্ষণ করেন;
কাচের জানালায় প্রতিহত হয়ে কত ইচ্ছা মাছির মতো
মরে যায়।
আর দোকানিরা—তাদেরও আমি লক্ষ করি: তাদের
চাটুকারী ভঙ্গি, তাদের গৃধ্নু ও সতর্ক চোখ, আর সেই
সঙ্গে তাদের অপেক্ষার ধৈর্য।'

যদিও মধুসূদনের কাব্য-কবিতা-মহাকাব্য রচনার কাল থেকে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূচনা তবুও যে 'নিরূপাধিক ব্যঞ্জনা' আলোর মতো অদৃশ্য প্রতিফলনে চিত্রকে সীমা থেকে

সীমাতীত ব্যাপ্তিতে প্রসারিত করে দেয় বাংলা কবিতায় সেই পূর্ণতার অভিঘাতের সূচনা উনিশ শতকের তিরিশের দশকের কবিদের সাধনায়। মধুসূদনের সমৃদ্ধ প্রতিভার অভিঘাতের বিচ্ছুরণে বাংলা কবিতা 'চিত্ররূপময়' হল এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যেই প্রথম আধুনিক চিত্রকল্পের সন্ধান পাওয়া গেল। 'মানসী' থেকে শেষ কাব্যপ্রবাহ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাতের মনীষা, মেধা ও কবিপ্রাণতা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের স্বর্ণতোরণ উন্মুক্ত করেছে। যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে আপনাপন জীবনাভিজ্ঞতা মনীষা, পঠনপাঠনে প্রাচ্য ঐতিহ্যকে যেমন রূপায়িত করেছেন; তেমনি রবীন্দ্রোত্তর কবিরা প্রতীচ্যের নানা কাব্যান্দোলনের অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করে চিত্রকল্প রচনায় বিভা সঞ্চার করেছেন। একালের কবিতার চিত্রকল্পে পরাবাস্তবতা, মগ্নচৈতন্যের রূপরেখা, কালচেতনা, বিজ্ঞানভাবনার প্রাধান্য, বৈদেশিক চিত্রকল্পের প্রাধান্য ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। ত্রিশোত্তর কবিরা সচেতনভাবে চিত্ররচনা করলেও পাশ্চাত্য চিত্রকল্পবাদী আন্দোলনে তেমন সাড়া দেননি। এমনকি বুদ্ধদেব বসুও চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। কবি সচেতন-আচেতনভাবে প্রতিমা নির্মাণ করে চলেন। চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবির পথ—খোঁজা অবিরাম। সাম্প্রতিক কবিতার বাগৈশ্বর্যে মননের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবনাপুঞ্জ যখন একাকার হয়ে য়ায় তখনই গড়ে ওঠে বাগপ্রতিমা। মহৎ কবিদের হাতে জীবনদর্শনে জাত হয় শ্রেষ্ঠতম প্রতিমা, চিত্রকল্প। বুদ্ধদেব বসু এমনই একজন কবি যাঁর চিত্রকল্পে ক্রিয়াশীল থাকে জায়মান সত্তার দুর্জ্ঞেয় সৃজনশক্তি যা প্রজ্ঞায় অন্তর্লীন; বাগবৈভবের বর্ণচ্ছটায় দীপ্যমান, আবার কবিতার তত্ত্বের বিকীর্ণ বলয়।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় অলংকার

১. "তথাকথিত অলংকারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেও মহৎ কবিতা সম্ভব হতে পারে, এবং ভালো কবিতায় যখনই এদের ব্যবহার হয় তখনই এরা অলংকারমাত্র থাকে না, অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কবিতাকে আমরা একটি অখণ্ড সত্তা বলে ধারণা করি; তাতে আদর্শ অনুসারে, এমন কিছুই থাকবে না যা তার হয়ে ওঠার পক্ষেই প্রয়োজন ছিল না, শুধু শোভা বৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়েছে। শোভিত বা শোভমান হওয়া কবিতার কাজ, এ-কথা স্বীকার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

[কালিদাসের মেঘদূত, ভূমিকা বুদ্ধদেব বসু]

২. "চিরাচরিত সমালোচনা শাস্ত্রে উপমা একটি অলংকার রূপে এবং বিশেষভাবে কাব্যের অলংকার রূপে গণ্য। গদ্যরচনায়—এমনকি কাব্যেও—উপমার বহুলতা অনেক দূষ্য বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু কিছুই তার নিজের কারণে মান্য অথবা দূষণীয় নয়, কৌশলমাত্রেই ব্যবহারনির্ভর। তা ছাড়া, উপমা জিনিসটাকে সূক্ষ্ম বিচারে ঠিক অলংকারও বলা যায় না কেননা সেটা বিস্তারিত বিশেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। যেটা অলংকার, সেটা থাকলেও চলে, না—থাকলেও চলে—যেমন কবিতার মিল। কিন্তু বিশেষণ ছাড়া ভাষা হয় না, এবং উপমা বাদ দিলে ভাষার প্রকাশশক্তি এতটা খর্ব হয়ে পড়ে যে উপমাকেও ভাষার অপরিহার্য অঙ্গরূপেই বিবেচনা করা যেতে পারে।"

[রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য/বুদ্ধদেব বসু]

৩. "উপমাতেই কবিত্ব।" কথাটা বলেছিলেন জীবনানন্দ দাশ, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে হবে। **** এর আগে পর্যন্ত আমরা জেনেছিলাম—**** যে কবিতা রচনার বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটি হলো উপমা, বলা যেতে পারে কৌশল, বা সংস্কৃত মতে অলংকার। আর অলংকার শব্দের আক্ষরিক অর্থ যেহেতু কেউ আমাদের বলে দেননি, তাই আমরা ভাবতুম যে উপমা একটা আভরণ মাত্র, থাকলেও চলে না-থাকলেও ক্ষতি নেই; আর কার্যত এমন অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার সঙ্গে ততদিনে আমাদের চেনা হয়ে গেছে, যার মধ্যে—যাকে ব্যাকরণের ভাষায় উপমা বলে, তার নাম গন্ধ নেই। তাই চমকে উঠেছিলুম একথা শুনে যে 'উপমাতেই কবিত্ব'। **** আমি মানতে বাধ্য যে গত তিরিশ বছর ধরে আমি দিনে দিনে বুঝেছি যে জীবনানন্দ খুব একটা খাঁটি কথা বলেছিলেন। কোনো নতুন কবির কবিতা যখন পড়েছি, যা কোনো পুরোনো কবিকে হৃদয়ঙ্গম করেছি নতুন করে—তখনই দেখতে পেয়েছি যে কবিতার যা প্রাণসঞ্চার করে –যে বিশেষ গুণটির জন্য কয়েকটি শব্দের পারম্পর্য গদ্যের সমতল ছেড়ে কবিতার আকাশে পাখা মেলতে পারে, তা গতানুগতিক অর্থে ছন্দ বা মিল নয়, বা কোনো মহান চিন্তাও নয়—গভীরতম অর্থে তা উপমা।"

[সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ / বুদ্ধদেব বসু]

ঋগ্‌বেদে প্রাপ্ত 'অরংকৃতা' শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় অলংকৃত নামে পরিচিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকারের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতকে আলংকারিক দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' বলেছিলেন, অলংকার কাব্যের সৌন্দর্য বিধায়ক ধর্ম। সপ্তম শতকের আলংকারিক ভামহও মনে করেছেন, কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগে। বামনও মনে করেছেন, কাব্যের সৌন্দর্যই হচ্ছে অলংকার। কবিতায় অলংকার থাকবে কিনা এ সম্পর্কে নানা বিতর্ক থাকলেও বিশ শতকের শেষে এসেও দেখা গেল কবিরা তাঁদের কবিতা থেকে অলংকার একেবারে বর্জন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও অলংকারের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চিন্তাকে পরিস্ফুট করার জন্য অলংকারের ভূমিকা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত একমাত্র কবি যিনি কাব্যে অলংকারের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তবুও তিরিশোত্তর কবিরা তাঁদের কবিতায় অলংকারের রূপের, বৈভবের, বিভার ভুবন সৃষ্টি করেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় অনুপ্রাস (শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস), ধ্বন্যুক্তি, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস, সন্দেহ, স্বভাবোক্তি, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, অন্যাসক্ত, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি প্রায় সমস্ত অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে উপমা ও রূপক অলংকারেই তাঁর কবিপ্রতিভার দ্যুতি সমধিক।

উপমা না থাকলে ভাষার প্রকাশশক্তি খর্ব হয় এবং কবির বিমূর্ত ভাবনাকে রূপ প্রদানের জন্য উপমার প্রয়োজন আছে। আবার শুধুমাত্র উপমার চমৎকারিত্বেই কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। কবিতার সামগ্রিক ভাবনা পাঠকের গোচরে আনয়নের জন্য উপমার গুরুত্ব স্বীকার্য। সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিতের উদ্ভাসনই উপমার প্রাণ। কবি তাঁর অন্তর্জগতের বিমূর্ত ভাবনাকে রূপ প্রদানের জন্য উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় উপমা তত সমৃদ্ধ নয়; তবুও সেখানে উপমা ব্যবহারে ইঙ্গিতময়তার দ্যুতি দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথম পর্বে তাঁর কাব্যভাবনা জীবনাভিজ্ঞতায় গাঢ়তর হয়নি, ফলে এই পর্বে তাঁর উপমার জগৎ মূলত রোম্যান্টিক বলয়ে সংবদ্ধ। আকাশ, নক্ষত্র, মেঘ, আলো অন্ধকার, রাত্রি, মৃত্যু ইত্যাদি রোম্যান্টিক উপাদান ও প্রকৃতি জগৎ তাঁর উপমার উৎসস্থল। এই জাতীয় উপমার উদাহরণ:

১. '... অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো
আনন্দের মন্দির সোপানে।'

২. 'ক্ষণে ক্ষণে আপনার ছায়া,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময়।'

৩. 'অনন্ত মিলন যেথা অনন্ত মরণ সম রাজে।'

৪. 'অদৃশ্য ছায়ার মতো রবো আমি তব সাথে সাথে।'

৫. 'যে প্রেম ফুলের মতো গোপনে ফুটিয়া ওঠে।'

৬. 'যে স্বপ্ন মেঘের মতো মনের নয়ন' পরে গাঢ় নীলাঞ্জন দেয় মেখে।'

৭. 'সাপের মতন জড়ানো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সাপের
মতন দ্রুত বিদ্যুৎ।'

৮. 'রাত্রির মতো তোমার চুল
* * * *
মৃত্যুর মতো তোমার চুল।'

উদ্ধৃত উপমাগুলি প্রথাসিদ্ধ উপমা এবং প্রকৃতি জগৎ ও রোম্যান্টিক উপাদান থেকে গৃহীত। এই জাতীয় উপমা কবিতার অঙ্গে কোনো বিশেষ ইঙ্গিতময়তা সঞ্চার করে না। অবশ্য এই পর্বের 'কঙ্কাবতী' ও 'নতুন পাতা' কাব্যে বেশ কয়েকটি দ্যুতিময় উপমার উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন:

১. 'এসেছিলো যত রূপকথা রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো।
রাতের আঁধারে সাপের মতন আঁকাবাঁকা কত কুটিল শাখা।'

২. 'তলোয়ারের মতো দীর্ঘ দীপ্ত দিন;
ডালে আর পাতায় আর হাজার অদৃশ্য পাখির উপনিবেশে মর্মরিত
গাছের মতো রাত্রি।'

৩. 'আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে
তোমার দুই বুক; কল্পনার গ্রন্থির মতো খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর; ঝড়ের পাখির মতো দোলে
আমার হৃৎপিণ্ড।'

৪. 'কোনো ক্লান্ত পাখির স্তব্ধতার মতো।'

৫. 'তবু গুহার মধ্যে হাওয়ার নিঃশ্বাসের মতো,
ব্যর্থ জীবনে কাব্যরচনার ছিদ্রপথের মতো,'

'কঙ্কাবতী' কাব্যের 'শেষের রাত্রি' কবিতায় 'ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তম' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে "উপমেয় ও উপমান দুইই সংগৃহীত হয়েছে রোম্যান্টিক উপাদান থেকে। চুলের কালো রংকে কবি প্রথমত বিশেষিত করেছেন এবং পরে আবেগায়িত উপমেয়র উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন অজানা রহস্যময় 'মরণ'-কে। 'মরণ' রহস্যময় বলেই আমাদের কাছে অন্ধকার এবং কালো। সাদৃশ্যের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা এ উপমাকে রহস্যমণ্ডিত করেছে। 'কেশের তম' যেমন উজ্জ্বল বিশাল তীব্র বন্যার মতো, মরণও তেমনি আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো। আদিম রাত্রির সঙ্গে তমসার অনুষঙ্গ জড়িত, মরণের সঙ্গেও তাই জড়িত। বর্তমান জীবন 'ধূসরতম' বলে কবি 'কেশের তম'—এর সঙ্গে অতিক্রম করতে চান বর্তমান সময়ের ঝড়। কবিতার গভীর বক্তব্যের অনুষঙ্গেই এই উপমাটি রচিত।" [বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ/মাহবুব সাদিক]

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবি উপমার উপাদান রোম্যান্টিক উৎস থেকে সংগৃহীত হলেও সেখানে বাস্তব জগৎ, নাগরিক জীবনের বিস্তৃত পরিসরও উপমার উৎস রূপে দেখা দিয়েছে। কবির জীবনবোধ গাঢ়তর হওয়ায় অনেক ইঙ্গিতময় উপমা এ পর্বে লক্ষ্যগোচর। আলোচ্য পর্বে উপমার বৈশিষ্ট্য হল সাদৃশ্য চেতনা, উপমান-উপমেয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ প্রাণবন্ত সম্পর্ক, উপমান-উপমেয়ের প্রতিভাসিত সৌন্দর্য ইত্যাদি। স্বভাবতই এ সমস্ত কবিতায়, অনিবার্য ও অপরিহার্য রূপে, প্রাণসঞ্চার করে। এ সমস্ত উপমায় চেতনা, আবেগ, বোধ, প্রতিকূলতা, গতিশীলতা, অনিবার্যতা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' এই ত্রয়ী কাব্যে ব্যবহৃত উপমা উপরিউক্ত বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন:

১. 'সেদিন মুখশ্রী তোর পূর্ণিমার মতো
আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দুজনের চোখে।'

[দময়ন্তী: দময়ন্তী]

২. 'কোনো ভাগ্যবান বাচ-খেলার লম্বা, শাদা নৌকাটাকে নিয়ে
সুন্দর একটি তীরের মতো দুধ রঙের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায়।'

৩. 'নারকোলের ঝাঁকড়া মাথায় ঝিলিক দেয় সোনার মতো আলো।'

[২.৩. উদ্বাস্তু: দ্রৌপদীর শাড়ি]

৪. (ক) 'শাদা নরম নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।'

(খ) 'আস্তরণের অন্তঃপুরে বীজের মতো—যেখানে অপেক্ষা কার আছে
তোমার চিরকাল।'

(গ) 'নেকড়ের মতো অন্ধকার ***
আততায়ীর ছুরির মতো শীত'

(ঘ) 'প্রেমের চীৎকারের মতো হাওয়া।'

(ঙ) 'লুকিয়ে থাকা তারার মতো কম্পমান।'

[শীতরাত্রির প্রার্থনা: শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর]

শেষতম পাঁচটি উপমায় (৪. ক-ঙ) নিঃসঙ্গ চেতনা, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, শীত রাত্রির হাওয়া, হিমরাত্রির ঝড়ো হাওয়া, শীত আততায়ীর ছুরির মতো ইত্যাদি মৃত্যুর দ্যোতনায় ব্যঞ্জনা লাভ করে।

তৃতীয় পর্যায়ে 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'মরচে-পড়া পেরেকের গান', 'একদিন: চিরদিন', 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা'-য় উপমার প্রয়োগ বাহুল্য ক্রমশ কমে আসতে থাকে। এর কারণ মনে হয়, কবির প্রতীকী কাব্যকলার আশ্রয় গ্রহণ। 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যে উপমার প্রয়োগ বেশ কম; তবে আলোচ্য পর্যায়ের শেষ দিকে আবার উপমার প্রয়োগ বাহুল

লক্ষ্যগোচর। আলোচ্য পর্বের উপমা অলংকারে স্মৃতিলোক, বর্তমান জীবন, কাব্যকলার সাধনায় বিধ্বস্ত জীবন, পুরাণ-কাহিনির পুনর্নির্মাণ, নিঃসঙ্গতা, বিপন্ন নাগরিকতা, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, মৃত্যু-বেদনা-শঙ্কা-আতঙ্ক ইত্যাদি সমস্ত প্রতিফলিত হয়। এ পর্বের কয়েকটি উজ্জ্বল ও গতিশীল উপমার উদাহরণ বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমনঃ

১. 'প্রাগৈতিহাসিক/নীলিমায়—যেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলে/মানবের ভাগ্য আর অফুরান ঐশ্বর্য তোমার।'

২. 'ভাঙা কাচ বিলোল দাঁতের মতো।'

৩. 'লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার।'

[১-৩ : যে আঁধার আলোর অধিক।]

৫. 'শূলবিদ্ধ শূকরের মতো নড়ি, জীবনের অজ্ঞান চেষ্টায়।'

৬. 'আনীল আকাশে
দক্ষিণে লম্বিত সূর্য তৃপ্তকাম প্রেমিকের মতো।'

৭. 'তার কণ্ঠ একটি প্রাণবন্ত, রজ্জুর মতো বাঁধলো আমাকে।'

৮. 'বাহুতে হিল্লোল তুলে এগিয়ে এলো, জলের স্রোতে
জ্যোৎস্নার মতো
চঞ্চল,
পল্লবের ফাঁকে যেমন রৌদ্রকণা, তেমনি তার কঙ্কণের রশ্মি,
শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুটি কান যেন উজ্জ্বল কমাণ্ডলু,
বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বিদগ্ধ ও বর্তুল,
শরতের বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ ও আর্দ্র তার দৃষ্টি।'

৯. 'মড়ক লাগা কোনো সৈকতের মতো শূন্য।'

১০. 'বাঁকা চাঁদের মতো উজ্জ্বল দুটি ঠোঁট।'

[৫-১০: মরচে-পড়া পেরেকের গান।]

১১. 'দাও ঈশ্বরের মতো কবির নিঃসঙ্গতা,
কিংবা জ্বরের প্রলাপের মতো আনন্দ।'

১২. 'উষার মতো উষ্ণ'/উষার মতো সোনালি।'

[১১-১২: একদিনঃ চিরদিন।]

১৫. 'উড্ডীন আশার মতো ইতস্তত হেলিকপ্টার।'

১৪. 'চেয়েছিলে প্রবিষ্ট ও সংরক্ষিত হতে
প্রেমিকার গূঢ়তম অন্তঃপুরে—যেমন ডিমের মধ্যে পাখি।'

১৫. 'যেমন সকালবেলা বিছানায় চায়ের চুমুকে
রৌদ্রের প্রথম স্বাদ।'

[১৩-১৫: স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা।]

বুদ্ধদেব বসুর উপমাকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে:

(ক) **সাধারণ উপমা:** এ জাতীয় উপমা বৈচিত্র্যমণ্ডিত নয়, প্রচলিত ও গতানুগতিক।

উদাহরণ: ১. 'অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা/সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো/আনন্দের মন্দির সোপানে।'

(খ) **গুচ্ছ উপমা:** এ জাতীয় উপমার উদাহরণ তাঁর কবিতায় সুপ্রচুর।

উদাহরণ: '১. কত সমুদ্রের মতো নিঃসঙ্গতা সাঁৎরে পেরিয়েছি/তবু যে দেয়নি ধরা, সতেজ বৃক্ষের মতো স্বাভাবিক উৎসাহে ওঠেনি বেড়ে/বরং কৌটোর মধ্যে কর্পূরের মতো/শক্ত আটো ঢাকনা সত্ত্বেও।'

(গ) **বৈশিষ্ট্যসূচক উপমা:** এ জাতীয় উপমা বুদ্ধদেব বসুর আলংকারিক কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

উদাহরণ: ১. 'কালরাতে পথ চলতে চলতে আমরা দেখেছিলাম/একটি মেঘ বিশাল হ্রদের মতো পড়ে আছে।'

২. 'শুয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি, কুঁকড়ে লুকোই/পশুর গুহার মতো লেপের গহ্বরে।'

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষার বেশি সন্ধান যায় এবং তাঁর রচিত উৎপ্রেক্ষাগুলি তাঁর রোম্যান্টিক কবিসত্তার যেমন পরিচয়বাহী তেমনি কাব্য-সৌন্দর্যেরও পরিচয়জ্ঞাপক। যেমন:

১. 'একটি জ্বলন্ত তারা/আকাশের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন।'

২. 'তোমার জানালার বাইরে রাত্রি চুপ করে দাঁড়িয়ে/
যেন কোনো মেয়ে প্রিয়তমের চুম্বনের অপেক্ষায় স্তব্ধ।'

৩. 'কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তাল।'

৪. 'বয়ে যায় শরীর যেন সোনালি স্রোত।'

৫. 'ভ্রষ্ট হলো ভবিষ্যৎ, যেন টুকরো বেলোয়ারি চুড়ি।'

প্রায় সমস্ত উৎপ্রেক্ষাতেই বুদ্ধদেব বসুর চেতনার অভিজ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। উৎপ্রেক্ষার শিল্পসাফল্য (উদা. ২), সুরিরিয়ালিস্টিক উপাদান (উদা. ৪), ব্যঞ্জনাবাহিতা (উদা. ৫) ইত্যাদি সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তার উৎপ্রেক্ষায় সংলক্ষ।

রূপককে বলা হয়েছে কবিতার প্রাণ; আবার কেউ এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, রূপকই কবিতা। ইংরেজিতে যা Metaphar, বাংলায় তাই রূপক। Metapharসম্পর্কে বলা হয়েছে: "Metaphar is not nuerely a grace or ormament or added power of language, it is its constitutive form."

[Literary criticism W.K. Winsatt, C Brook.]

কবি যখন রূপক প্রতিমা নির্মাণ করেন তখন তা কবি মানসেরও পরিচয় প্রদান করে। রূপক রচনাতেও বুদ্ধদেব স্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি তাঁর অনূদিত বোদলেয়ারের একটি কবিতায় 'রূপক' শব্দটি প্রয়োগ করে তাঁর রূপক আসক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শুধু অনুবাদ নয়,

মৌলিক কবিতাতেও বুদ্ধদেবের রূপক ব্যবহার তাঁর প্রতিভার অনন্য সার্থকতামণ্ডিত। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের রূপক তাঁর সার্থকতার অনন্য উদাহরণ। তাঁর রূপক অলংকারে দর্শন, রাজনীতির গোলকধাঁধা, দূরকল্পনা, অসীম ও শ্বাশত সময়পটে ক্ষণকালীন মনুষ্যজীবন, নিঃসঙ্গতা, প্রেম, প্রেমহীনতা, সৌন্দর্য, কামনা-বাসনা, মানসচৈতন্য ইত্যাদি সমস্তই রূপায়িত হয়ে যায়। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত রূপকের একটি তালিকা উপস্থাপিত করলে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাত হয়। যেমনঃ বিস্মৃতি-তিমির, অজ্ঞান বালিশ, কৌমার্যের আঁধারে, চুম্বনের বেড়া, কালের কঙ্কাল, স্মৃতির বিদ্যুৎ, যৌবনের তাপে, কুয়াশার বিস্তীর্ণ শিবির, মেঘের নরম মোম, অধরের ফণা, সুশ্রী ঠোঁটের মিশ্রি গুঁড়োয়, তুষারের রূপালি আগুন, বিরহের অমা, মরণের তিক্ত কালকূট, তিমির তোরণে স্মৃতির গুঁড়া, ঐতিহ্যের বিরাট কঙ্কাল, আকাঙ্ক্ষার অরণ্য, স্মৃতির যূপে, বেদনার বৃহদারণ্য, আঁধারের অশ্রুকণা, হর্ষের বিজলি, স্তুতির তোরণ, স্মৃতির প্রপাত, মর্মের অরণ্য, নাভিপদ্ম, আগুনের ঝরণা, আলোর ঝরণা, কান্নার তুফান, সত্তার শিকড়, ঘৃণার চাবুক, ক্রন্দনের কৈলাস, সন্ধ্যার বারান্দা ইত্যাদি। অ্যারিস্টটল যে বলেছেন, 'রূপকের যথাযথ প্রয়োগ-কুশলতা আয়ত্ত করাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এই একটা জিনিসই আছে যা অন্য কারওর কাছ থেকে শেখা যায় না। রূপকের প্রয়োগ-ক্ষমতা অতি উচ্চস্তরের কাব্য সামর্থ্যের লক্ষণ'—বুদ্ধদেব বসু সেই 'কাব্য সামর্থ্যের লক্ষণ'কে স্মরণীয়ভাবে তাঁর কাব্যে ধারণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রযুক্ত অন্যান্য অলংকারের ব্যাখ্যা প্রদান না করে তাঁর বিভিন্ন অলংকারমন্ডিত কয়েকটি কাব্যপঙ্ক্তির উদ্ধার প্রমাণ করবে তিনি অন্যান্য অলংকার প্রযুক্তিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমনঃ

(১) **ধ্বন্যুক্তিঃ**

থরথর, গুমগুম, ভুরভুর, মিটমিট, ছলছল, ঝলঝল, থমথম, টনটন ইত্যাদি।

(২) **বক্রোক্তিঃ**

১. 'আমি ভালোবাসিয়াছি এতটুকু ভালোবাসা তব
অমিতা, তাও দিতে পারিলে না?'

২. 'তবেই কি তাঁরাই সার, বীজ, বৃষ্টি—আমি শুধু পিপাসিত জমি?'

৩. **পুনরুক্তবদাভাসঃ**

১. 'শতদল—পদ্ম তবে—সেই থেকে একটি পল্লব
ছিঁড়ে দিতে পারিবে না?'

(৪) **সন্দেহঃ**

১. 'আরো এক প্রশ্ন; তার সর্বশেষ কী ছিলো ভাবনা?
কোনো স্বপ্ন—অবিরল ছিন্ন, তবু চিরকাল যা রয় সম্ভব?'

(৫) **স্বভাবোক্তিঃ**

১. 'হে আমার দগ্ধদিন, স্নিগ্ধরাত্রি, সুন্দর প্রভৃতি,
আলস্যের লাস্যভরা লীলায়িত মন্থর,
ক্লান্তি ঘেরা অপরাহ্ন উদার, উদাস।'

(৬) **অতিশয়োক্তি:**

১. নীল সমুদ্রের টলটলে জলের মতো একটু জ্যোছনা
এসে পড়েছে
যেন কোনো অপরূপ মেয়ে তার নিজের লাবণ্যের বন্যায়
ভেসে...

(৭) **উল্লেখ:**

১. 'অমিতর লাবণ্য কি স্পর্শ করে
ধরণীর ধূলি কভূ? সুচরিতা কভু জন্ম নেয়
মর রমমীর গর্ভে? দেখিতে কি আশা করো, সখা,
পরিষ্কার সূর্যালোকে গড়ুইন দুহিতারে কভু?
অথবা 'বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন মধ্যযুগ হতে
উঠে এসে কখনো কি দাঁড়াইবে সম্মুখে তোমার
আবেলাদ-প্রিয়া? ব্যারেট কখনো এসে ভালোবেসে
আঙুল বুলায়ে দিবে তব রুক্ষ কেশগুচ্ছ মাঝে?'

(৮) **সমাসোক্তি:**

১. 'গোধূলি রয়েছে শুয়ে পশ্চিমের গোলাপি বালিশে।'
২. 'তোমার জানালার বাইরে রাত্রি চুপ করে দাঁড়িয়ে।'
৩. 'ছায়া আর হাওয়া বেহালা বাজায়।'
৪. 'রূপোলি জল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে।'

বুদ্ধদেব বসু কবিতায় অলংকার ব্যবহারের পক্ষপাতী না হলেও এবং বিরোধিতা করলেও তাঁর কবিপ্রতিভা সচেতন বা অবচেতনভাবে কবিতায় অলংকার ব্যবহারে প্রাণিত করেছে তাঁকে এবং তিনি অলংকার ব্যবহারের পক্ষপাতী না হলেও অলংকার তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। রবীন্দ্রোত্তর কবিতার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু অলংকার প্রয়োগে যে শিল্পনিদর্শন রেখেছেন ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা কবিতার ভুবনে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ: কবিতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর

"কাব্যের প্রধান বাহন ভাষার সেই সুনিয়ন্ত্রিত বেগবিকশিত ভঙ্গি, যার নাম ছন্দ। প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে ছন্দ জিনিসটা কৃত্রিম নয়, মিল অনুপ্রাসাদি আনুষঙ্গিক অলংকার নিয়ে শুধুমাত্র একটা কৌশলও নয়, কাব্যের প্রাণের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। কোনো একটা কথা আবেগ দিয়ে বলতে গেলে ছন্দ এসে পড়ে স্বভাবেরই অনতিক্রম্য প্রভাবে। *** আমাদের সাহিত্যে পয়ার ত্রিপদীর বাঁধন ভেঙে নতুন ছন্দ জাগলো বৈষ্ণবকাব্যে, তারপর রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দোবৈচিত্র্য আনলেন তা পূর্বযুগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। ছন্দের এই বৈচিত্র্যকে শুধু একটা কারুকলার চর্চা মনে করলে ভুল হবে; তা শুধু উপায়নৈপুণ্য বা টেকনীকের উৎকর্ষ নয়, কবির চিত্ত স্ফূর্তিরই অনুরণন সেটা, দেশের জেগে-ওঠা কাব্যপ্রতিভার অদম্য আনন্দধ্বনি। *** রবীন্দ্রনাথ ভাঙাচোরাকে সুসম্পূর্ণ করেছেন, এবড়োখেবড়োকে পরিমার্জিত করেছেন, সমস্তটিকে সুসঙ্গত করে মিলিয়েছেন আধুনিক বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে;—শুধু তাই নয়, তিনটি ধারারই স্বরূপ তাঁর কবিচৈতন্যে প্রতিভাত হয়েছে এমনভাবে যে পুরোনো ছন্দের নব নব বিস্ময়কর প্রকরণ অবিরাম তরঙ্গ তুলেছে তাঁর কাব্যে সংগীতে গীতি নাট্যে, শেষ দিন পর্যন্ত তার বিরাম ছিলো না। বাংলা ছন্দের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি; সে বৈচিত্র্যে আজকের দিনে আমরা এতই অভ্যস্ত যে তার বিস্ময়করতা সম্বন্ধে সব সময় আর সচেতন থাকি না, কিংবা একথাও সবসময়ে মনে পড়ে না যে রবীন্দ্রনাথই এই বৈচিত্র্যের উৎসস্থল।" [বাংলা ছন্দ: সাহিত্যচর্চা/বুদ্ধদেব বসু]

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী'-তে (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের ছন্দোভঙ্গি প্রধান হয়ে উঠলেও কবি ক্রমশ, সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন। 'মর্মবাণী'-কে রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন অন্যান্য কবিদের অনুসরণ বলা চলে। কিন্তু ক্রমশ 'বন্দীর বন্দনায়' (১৯৩০) কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর যেন অনেকখানি শোনা গেল। আলোচ্য কাব্যের প্রধান বাহন মুক্তক মিশ্রবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে প্রবহমান মুক্তক মিশ্রবৃত্ত বা মিশ্রকলা বৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনা করে বাংলা কবিতার নবদিগন্ত উন্মোচন করলেন, তেমনি বুদ্ধদেব বসুও মুক্তক মিশ্রবৃত্তের রূপকলাতে আধুনিক কবিদের কাছে 'বন্দীর বন্দনা' উপহার দিলেন।

বুদ্ধদেব বসু মিশ্রবৃত্ত (অক্ষর বৃত্ত/তানপ্রধান), কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত/ধ্বনিপ্রধান) এবং দলবৃত্ত (স্বরবৃত্ত) তিন প্রকার ছন্দেই কবিতা রচনা করেছেন। সনেট ও গদ্য কবিতাও রচনা করেছেন। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতার কথাই আলোচিত হবে। মিশ্রবৃত্ত/মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দই তাঁর কবিতার প্রধান বাহন। গদ্যছন্দে রচিত কিছু কবিতা 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে লক্ষ করা যায়। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্য মূলত মিশ্রবৃত্তে রচিত হলেও রাবীন্দ্রিক মিশ্রবৃত্তের মাধুর্য হয়তো কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে—এমন বলা চলে। তা ছাড়া কবি এখানে সাধু ক্রিয়াপদ ও তৎসম শব্দ ব্যবহারে বেশি প্রবণতা দেখিয়েছেন বলে ছন্দে

কোথাও আড়ষ্টতা দুর্লক্ষ নয়। 'বন্দীর বন্দনা' রচনাকালে তিনি বেশ কিছু কাব্যিক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং সমিল ও অমিল মুক্তক মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। সাধু ক্রিয়াপদ এবং সংস্কৃতানুসারী শব্দের ব্যবহার থাকলেও তিনি বাক্স্বাতন্ত্র্য নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

অমিল দীর্ঘ পয়ারবন্ধের কবিতা বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে আছে। যেমন: 'কোনো বন্ধুর প্রতি'।

তুমি আর আমি

বিধাতার নির্বাচিত, দেবকুলবংশোদ্ভূত মোয়া—
এ পন্থা মোদের নহে। মোরা কবি, কাব্য সরস্বতী
আমাদের চিরপ্রিয়তমা। এই বিংশ শতাব্দীর
বহু দুঃখ দিয়েছে মহিমা, বহু কবি করেছেন
বহু স্বপ্নে ঐশ্বর্যশালিনী; মোরা তাহারই সন্তান।
উন্মুক্ত আকাশতলে লভিয়াছি উদার জীবন,
সহজন্মা কবিতারে।

তিনি মনে করতেন, কথা বলার স্বাভাবিক ছন্দই হলো পয়ার। মিশ্রবৃত্তের ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা তাঁর কবিতায় বিস্তারধর্মিতা লাভ করেছে তিনি এ জাতীয় ছন্দে যতি বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং প্রবহমান মিশ্রবৃত্তে যতিপাতের আরও বৈচিত্র্য সম্ভব কিনা তাও তিনি ভেবেছেন—"আমি ভাবছি ছড়ার ছন্দে তিন মাত্রার পর্ব কতদূর পর্যন্ত সংগত হতে পারে, প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে যতিপাতের আরো বৈচিত্র্য সম্ভব কিনা, কবিতার মধ্যে দীর্ঘ ও জটিল বাক্য কেমন করে চালিয়ে দেওয়া যায়।" [কবিতা ও আমার জীবন/কবিতার শত্রু ও মিত্র]

'বন্দীর বন্দনা'র শাপভ্রষ্ট, অমিতার প্রেম, কালস্রোত, প্রেমিক, মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান, অপর্ণার শত্রু, বন্দীর বন্দনা কবিতায় ২ মাত্রা থেকে ৩০ মাত্রা পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের প্রবহমান পঙ্ক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এ ছন্দের রূপরীতি রবীন্দ্রনাথের মতো কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এখানে অনুপস্থিত এমন বলা যাবে না। যেমন: মুক্তক মিশ্র-বৃত্তের কবিতা:

তবু ভালো বাসি/৬
নতুন ননীর মতো/তব তনুখানি ৮ + ৬
স্পর্শিতে অগাধ সাধ,/সাহস না পাই। ৮ + ৬
সিন্ধুগর্ভে ফোটে যত/আশ্চর্য কুসুম ৮ + ৬
তার মতো তব মুখ,/তার পানে তাকানর ছল ৮ + ১০
খুঁজে নাহি পাই।/ ৬

মনে করি, কথা কবো: / আকলিবিকুলি করে/কত কথা রক্তের ঘূর্ণিতে ৮ + ৮ + ১০

'একটি কথা' ও 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে প্রথম শব্দের আগের মতো প্রচুর না

হলেও কবিতায় প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ এখানেও এমন কিছু কম নয়। 'কঙ্কাবতীতে' কথ্য শব্দের ব্যবহার বেড়েছে, যদিও কবি এখানে কথ্য বাগভঙ্গি সম্পূর্ণত ব্যবহার করেননি। কথ্যশব্দ ব্যবহারের ফলে ছন্দে এক জাতীয় স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বাক্‌স্পন্দের ব্যবহারে কবির আবেগও প্রকাশিত। যেমন—

আবার কখনো / জেগে রয় রাতে / একা বাঁকা চাঁদ / পশ্চিমেতে,
রাতের নদীতে / আরো জেগে রয় / আঁকাবাঁকা চাঁদ / জলের নিচে,
পশ্চিম ভরা / আকাশ ফাঁকা।
তারাদের কেউ / দেয় নাই দেখা, / আকাশ ফাঁকা, /
একা চাঁদ জাগে / —তাছাড়া সকল / আকাশ ফাঁকা /

বুদ্ধদেবের কবিতার ছন্দ আলোচনায় দেখা যাবে যে, তিনি ছন্দোমাত্রায় স্বাধীনতা গ্রহণের খুব বেশি চেষ্টা করেননি। ছন্দের নিয়ম-নীতি মেনেই ছন্দে প্রবহমানতা সঞ্চার করেছেন।

'দময়ন্তী' কাব্যে কবি ছন্দের নতুনত্বের জন্য ভাষারীতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'দময়ন্তী'-র শেষ দিকে মুদ্রিত ইস্তাহারটি আমাদের স্মরণ করতে হয় যেখানে তিনি লিখেছিলেন—"বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন। ...গভীরতম চিন্তা থেকে লঘুতম পরিহাস মনের সকল মহলেই তার অবাধ আনাগোনা। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের পাশেই মুখের একটা চলতি বুলি সহজেই সে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেয়। একই কবিতার মননশীলতা ও ব্যঙ্গ, বাস্তবিকতা ও কল্পনা, এই ধরনের আলাদা-আলাদা সুর পাশাপাশি বসাতে হলে পয়ারের মতো প্রশ্রয় কোথাও পাওয়া যায় না। * * * কাব্যিক ভাষা যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলতে হবে, কিন্তু যদি কখনো আন্তরিক ভাবাবেগের প্রেরণায় দু-একটা কথা অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে, তাহলে সুদ্ধু সেইটে এড়াবার জন্য কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত সহজ রূপটিকে নষ্ট না করে, কিংবা সমস্ত কবিতাটি বর্জন না করে বরং সেটাকে সহ্য করাই ভালো। কবিতা সম্বন্ধে কোনো আঁটোসাটো ধরা বাঁধা আইন-কানুন কোনোদিনই সম্ভব নয়, সবই মোটামুটির ব্যাপার। ...শেষ পর্যন্ত যা টেঁকে তা কবিতার প্রাণবস্তু।" [কবিতা সংগ্রহ: বুদ্ধদেব বসু. দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক, নরেশ গুহ। গ্রন্থ পরিচয় অংশ।]

কথ্যভাষার বাক্‌রীতি কবিতায় সম্পূর্ণ সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়—কেন-না সাধারণভাবে কবিতার ভাষায় একটা কৃত্রিমতা থাকে। কাব্যিক শব্দ এবং সাধু ক্রিয়াপদ বর্জন করলেই যে মৌখিক ভাষার বাক্‌স্পন্দ কবিতায় সঞ্চারিত হবে—এমন বলা যাবে না। 'দময়ন্তীর' সমস্ত কবিতাই যে মৌখিক ভাষার এমন নয়; যদিও সেখানে সাধু ক্রিয়াপদ ও কাব্যিক শব্দ বর্জিত হয়েছে। মনে হয়, মৌখিক ভাষার বাক্‌ভঙ্গি অনুযায়ী কাব্যভাষা সম্পূর্ণরূপে বিন্যস্ত হতে পারে না। 'দময়ন্তী' কাব্যের কয়েকটি কবিতার উদাহরণ তা প্রমাণ করে যে কবিতায় গদ্যপদ্যের মিলন বা সাধুক্রিয়াপদ বর্জনের সংকল্প কোথাও যথাযথভাবে গৃহীত হয়নি। যেমন—

(১) যে মুহূর্তে তরঙ্গিত সময় সলিলে
দ্বিখণ্ডিত হলো ক্রূর অদৃষ্টের শিলা,

ম্লান হলো হুতাশন, ব্যর্থ হলো যমদণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ
বিশ্বাস না হয় যদি জননীরে সুধায়ে দেখিস।

[দময়ন্তী]

(২) এ শরীর অবলুপ্ত জান্তব যৌবনে
হঠাৎ হারায়। কল্পনা বাড়ায় প্রেত হাত,
দীর্ঘ ছায়া পার হয়ে অতীতেরে আনে সে ছিনায়ে।

[ঐ]

(৩) এ রাঁধাবাড়ার
ধূলিলীন দীনতার সংকীর্ণ ভাঁড়ারে
আকস্মিক আলো করে দিয়ে গেলো।
হাসিগল্প আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে
ঘরকন্না চলে বাঁকে বাঁকে।

'কঙ্কাবতী'র তুলনায় 'দময়ন্তীর' কবিতা লিখতে যে প্রচুর সময় লেগেছে ও প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে, একথা কবি স্বয়ং স্বীকার করেছেন। পরিশ্রমের প্রধান কারণ রূপে 'গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগসঞ্চারী স্বভাবের মিলন' ঘটানোকেই দায়ী করা হয়েছে। কেন-না, বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেছেন—"আমি দেখছি পদ্যকে দিয়েও গদ্য কবিতার কাজ করিয়ে নেয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার করেছেন। অধুনা পদ্যের সেই রূপটিই আমারে মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। *** এখানে সতর্কতা দরকার। পদ্য, অথচ গদ্য কবিতার মত মৌখিক ভাষায় গঠিত, বাংলা পদ্যের নতুন পরিণতি বোধহয় এই দিকেই।" [কবিতা সংগ্রহ. ২. বুদ্ধদেব বসু। সম্পাদিত. নরেশ গুহ। গ্রন্থ পরিচিতি।] তবে পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হয়েছে। 'দময়ন্তী' কাব্যের প্রবহমান মুক্তক মিশ্রবৃত্ত ছন্দে বুদ্ধদেব যে আবেগ ও ছন্দোস্পন্দ সঞ্চার করেছেন তা স্মরণীয়। যেমন—

উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।
জরায় জটিল রেখা শরীরেরে
কঠিন পাথরে ঘেরে;
এ দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমনীয়,
নিশ্চিন্ত আমার সত্তা; অনর্গল অক্লান্ত ইন্দ্রিয়
এতদিনে বুদ্ধ হলো। অপরাহ্ন ছিন্ন অঙ্গ মেঘে
সবুজ হলুদ নীলে পশ্চিমে অনন্ত
বাসর সাজালো। [দময়ন্তী]

কাব্যবাক্‌ভঙ্গির স্বছন্দ ব্যবহার কবি বুদ্ধদেবের যে সমস্ত কবিতাকে স্বচ্ছন্দ করেছে তার মধ্যে 'বিদেশিনী' কবিতাটি অন্যতম। এই কবিতাটি নিয়েই একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ (১৯৪৩) এবং

এটি 'দময়ন্তীর' পূর্ববর্তী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটি চিঠিতে (১৫ এপ্রিল, ১৯৪৬) বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন—'আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প।' অথচ তিনি ঐ বছরের ২৩ এপ্রিল বুদ্ধদেব বসুকে তাঁর দীর্ঘ 'বিদেশিনী' কবিতা সম্পর্কে লিখলেন—'বিদেশিনী' আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন, এবং উপর উপর দেখে মনে হলো আমি যাকে গদ্যগুণ বলি, তার বিস্ময়কর প্রাচুর্য ওই কবিতাটিতে। অবশ্য কবিতা হিসাবে দময়ন্তীর একাধিক রচনাই রসোত্তীর্ণ; কিন্তু গদ্যের, রীতি সর্বত্র হয়তো নিখুঁতভাবে রক্ষিত হয়নি।" [কবিতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭]

এ বড়ো অদ্ভুত, সত্যি। তবু এও কম কথা কয়
যে আমি, সতীশ সেন,
বি. এ. ফেল, বীমার দালাল
খাশ মেমসাহেবের সঙ্গে বসে গল্পে মশগুল
বাংলোর বারান্দায়, সন্ধ্যার ছায়ায়।
হায়রে তম্বুরাপুর নিতান্ত নির্জন।
আপিলের বড়োবাবু, কিংবা ঐ বিলাতফেরৎ
তোৎলা তালুকদার
একবার দেখলো না আমার এ আশ্চর্য গৌরব।
[বিদেশিনী]

এ প্রসঙ্গে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'বন্ধু' কবিতাটিও স্মরণ্য—

আজ কি তোমার মনে পড়ে
যেদিন আমার ঘরে শশাঙ্কশেখর
প্রথম উদিত হলো।
হলদে গায়ের রং, চেহারাটা চৈনিক ছাঁদের,
অতএব বাঙালির চোখে হাস্যকর।
কথা তার বলে দেয় সে যে পূর্বদেশী,
আমরা বাঙাল যারা আমাদের সেটা
অতি লজ্জাকর ঠেকে।

'বিদেশিনী' কবিতার উচ্চারণ ভঙ্গিমা কিন্তু সংশ্লিষ্ট নয়, বেশ বিশ্লিষ্ট—কাটা-কাটা উচ্চারণ; ছোটো ছোটো বাক্য অথচ পূর্ণতায় মণ্ডিত গদ্য কাব্য। যেমন:

শুনে হাসি পায়।
রোজ রোজ বৌ-বদলের ঘটা
বাপের বাড়ির পাশে ছেলে এসে হোটেলে ওঠেন,
মা ছেলেকে সারাদিন চোখেও দ্যাখে না—

ওরা কি মানুষ নাকি।
ওরা তো বাঙালি নয়, কী করে জানবে
মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী
এসব কথার মানে কী!

পরবর্তীকালের অনেক কবিতায় এ জাতীয় ছন্দোবন্ধ উদাহরণ লক্ষ করা যায়। 'বিদেশিনী' কবিতার ছন্দের যে রীতি— গন্ধ পেতে না পেতেই/আমি এসে হয়েছি হাজির/ পকেটে তিনটি চিঠি/মগজে কিঞ্চিৎ, বুদ্ধি নিয়ে/

—তা 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যের অনেক কবিতায় লক্ষ্যগোচর। এ প্রসঙ্গে 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' কবিতার উল্লেখ করা চলে। এখানে এই জাতীয় অনেক পঙ্‌ক্তি আছে। 'বাংলোর বারান্দায়/সন্ধ্যার ছায়ায়'—এমন পঙ্‌ক্তি যেমন 'বিদেশিনী'তে আছে তেমনি 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' কবিতাতেও আছে। যেমন:

১. কলকাতার ক্রিসমাস/দিল্লীতে উল্লাস/ আর শান্তিনিকেতনে
মেলা খেলা সারাবেলা/—বেলা যায় যায়
২. দিনের টেবিলে/আর রাতের লেপের তলে
৩. বৃষ্টির বন্যতায়/রাত্রির অন্ধতায় শুধু
৪. ছন্দের ইন্দ্রজালে/শব্দের সম্মোহনে...ইত্যাদি।

প্রবোধচন্দ্র সেন একে বলেছেন 'অক্ষরসংখ্যার গন্ডি থেকে মুক্ত' এবং 'ধ্বনিমাত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত।' অথচ শঙ্খ ঘোষ বলেন—"কবিতা পড়ায় দেখা যায় খানিকটা কৃত্রিমতা, গদ্যের ধ্বনিসঞ্চার কিছু যা বাধা পায়, চলতি চাল সত্ত্বেও রচনায় আসে যেন এলায়িত ভঙ্গিমা।" [ছন্দের বারান্দা।] তিনি মনে করেছেন—"আজকের দিনে অক্ষরবৃত্তের এই বিশ্লেষ কোনোক্রমেই আর অসঙ্গত নয়, কিন্তু সংশ্লেষণের তুলনায় এর প্রতি কবির অপার পক্ষপাত আমাদের আর একবার জানিয়ে দেয় তাঁর স্রোতস্বান্ মেজাজের কথা, শীতল প্রবাহের প্রতি তাঁর অধীর আগ্রহের কথা।" [পূর্বোক্ত]। সংহত রচনার যে চূড়ান্ত রূপ কবিতার মৌল লক্ষ্য তা স্পর্শ করেছে 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থ। এখানে 'এলায়িত ভঙ্গিমা' বা 'গীতল প্রবাহ' নেই। যেখানে আমাদের মনে পড়বে প্রবহমান মিশ্রবৃত্তের কবিতাগুলির কথা। যদিও 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই সনেট। তবুও সনেট নয় এমন কবিতাও এখানে আছে—সমুদ্রের প্রতি জাহাজ থেকে, আবির্ভাব, সমর্পণ, বহুমুখী প্রতিভা, যাওয়া-আসা, শিল্পীর উত্তর, দায়িত্বের ভার ইত্যাদি। এই জাতীয় কবিতা বাদ দিলে অধিকাংশ কবিতাই অসমমাত্রিক প্রবহমান মিশ্রবৃত্তের উদাহরণ। যেমন:

(১) যুদ্ধে হয়েছি অজেয়
নির্বিবেক পক্ষপাত মেনে নিয়ে, যার রূপে প্রথম কৌন্তেয়
বধ্য হলো, একলব্য বিকলাঙ্গ, আর যদিও সত্তায়
ক্ষাত্রধর্ম বদ্ধমূল, অস্ত্র ফেলে, অমল ব্যথায়

সময় সংকটে যবে অপ্রকৃতি উপচীয়মান—
শুনেছি অমৃতকণ্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান।
[শিল্পীর উত্তর]

কিন্তু পরবর্তী কাব্যগুলিতে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেল। এ প্রসঙ্গে 'মরচে পড়া পেরেকের গান'—এর 'রোদনরূপসী' কবিতার কথা বলা যায়:

কে তুমি সুন্দরী, যার বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে ভেসে যায়
পদ্ম হয়ে নদীর স্বচ্ছল স্রোতে অবিরল?
কোন প্লুত নীলিমায় লুপ্ত তুমি? কোন পুণ্যজল
তোমার লাবণ্যসার আপনার তরঙ্গে মেশায়?

আবার বুদ্ধদেব বসুর 'মরচে পড়া পেরেকের গান'—এর এমন একটি কবিতার উল্লেখ করা যায় যেটি আবেগ স্পন্দনে, যুক্তিগ্রন্থিতে, চিত্রকল্পে, সংহতিতে, গদ্যভঙ্গির সুমিত ব্যবহারে মুক্তক মিশ্রকলাবৃত্তের স্মরণীয় উদাহরণ:

উপজাত স্বপ্নেরা বিকীর্ণ করে বীজ
ঊর্ধ্বে, নিম্নে, অন্তরালে, অন্তরিক্ষে; শূন্যে ঝোলে ফল
অমূল, অদৃশ্য বৃক্ষে; দোলে ডালে দ্যুলোক, দেবতা,
পরমাত্মা, পুনর্জন্ম, ইত্যাদি যা নিতান্ত অলীক
অথচ অপ্রতিরোধ্য। তাই আমি আসন্ন মৃত্যুকে,
বুকে বেঁধে, দাঁড়িয়ে ধ্বংসের প্রান্তে, বন্ধুর বিচ্ছেদে
ভরা স্তব্ধতায়, প্রতিবাদে কণ্টকিত কণ্ঠ নিয়ে—
তবু বলি, আমিহীন বিশ্ব নেই, চরাচরে আমিই বিম্বিত।

'স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা' কাব্যের কবিতাগুলিতে মুক্তক মিশ্রবৃত্তের প্রবহমানতা, সংহতি, বাক্‌স্পন্দ ও ছন্দস্পন্দের সম্মিলিত সমন্বয় স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ করা যায়:

যখন কোমল রৌদ্রে/তারুণ্যকুসুমে সব/পাপড়িও খোলেনি,
বালকের হাতে ছেঁড়া/অসম্পূর্ণ মঞ্জরীর মতো/
উদঘাটিত হয়ে গেলে/হৃদয়ের একটি ঝঞ্ঝায়/
যাত্রাপথে, কোনো ভুল/ইস্টেশনে ফেলে-আসা/তোরঙ্গের মতো
নিজেকে হারিয়ে ফেলে, রুদ্ধ করে দিলে সব দ্বার।/
আমার বিলাপ তাই।/ অন্য প্রান্তে ঘন হয়ে/নেমে আসে শীত।

মিশ্রবৃত্ত বা মুক্তক মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতার বাহন করলেও কলাবৃত্ত ছন্দেও তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় তো কলাবৃত্তেরই প্রাধান্য। 'পৃথিবীর পথের' একটি কবিতায় কলাবৃত্ত রীতিতে কথ্যস্পন্দ সোনা যায়—

মিছে মোরে আজি/তুলিলে উজলি/

আলোক বিতর/রতা
তুমি চলে যাবে/আমি রবো পড়ে/
নিঃস্ব দিগন্তরে/
বলে দাও মোরে/কেমনে সহিবো/
সে অসীম শূন্যতা/
ওগো বিদ্যুল্লতা। [ওগো বিদ্যুল্লতা]

তবে 'কঙ্কাবতী' কাব্যে বুদ্ধদেব বসু কলাবৃত্ত রীতির কবিতা রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের শিখরস্পর্শী। আলোচ্য কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় ৬+৬+৫ কাব্যের ছন্দদোলা ব্যবহৃত। যেমন: 'আরশি' ও 'সেরেনাদ' কবিতা ৬+৬+৫ হলেও 'শেষের রাত্রি' কবিতার মাত্রারীতি ৬+৬+৬+৫।

উদাহরণ—

১. মাঝরাতে আজ/বাতাস জেগেছে/শুনতে পাও/ ৬+৬+৫
কঙ্কাবতী/
এলো এলোমেলো/ব্যাকুল বাউল/উতল যাও/৬+৬+৫
কঙ্কাবতী/

২. নেমেছে হাজার/আঁধার রজনী/তিমির তোরণে/চাঁদের চূড়া ৬+৬+৬+৫
হাজার চাঁদের/চূড়া ভেঙে ভেঙে/হয়েছে ধূসর/স্মৃতির সুড়া ৬+৬+৬+৫
চলো চিরকাল/জ্বলে যেথা চাঁদ/চির আঁধারের/আড়ালে বাঁকা। ৬+৬+৬+৫
আবার—এসো চলে এসো/যেখানে সময়/সীমানাহীন ৬+৬+৫
সময় ছিন্ন/বিরহে কাঁপে না/রাত্রিদিন ৬+৬+৫
সেখানে মোদের/প্রেমের সময়/সীমানাহীন ৬+৬+৫
কঙ্কা শঙ্কা/কোরো না।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে 'কঙ্কাবতী' এবং 'কবিতা' এই দুটি কবিতাকে প্রহমান মুক্তক মাত্রাবৃত্তের (কলাবৃত্তের) উদাহরণ বলেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন মাত্রাবৃত্তে 'যথার্থ মুক্তক রচনা' অসম্ভব বললেও তিনিই আবার রবীন্দ্রনাথের 'সেঁজুতি'র 'যাবার মুখে' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। অবশ্য বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং জানিয়েছেন, 'এই কবিতাগুলি সেঁজুতি প্রকাশের অনেক আগে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।' [সাহিত্যচর্চা: বাংলা ছন্দ] 'দময়ন্তী' কাব্যের 'ম্যাল-এ' কবিতায় কলাবৃত্ত ছন্দ বেশ নিপুণতায় পরিবেশিত—

আপনারা কবে/আমরা এসেছি/সাতাশে ৬+৬+৩
ওকভিলে আছি/আসবেন এক/দিন ৬+৬+২
শাড়ির বাঁধনে/শোভে শরীরের/ইশারা ৬+৬+৩
ঠোঁটের গালের/রঙের চমকে/কী সাড়া ৬+৬+৩

এখানে ৬ মাত্রার দুটি করে পূর্ণ পর্ব ও ২ বা ৩ মাত্রার একটি করে অপূর্ণ পর্ব আছে। আবার আলোচ্য কবিতার ৩ সংখ্যক অংশটি প্রবহমান মুক্তক কলাবৃত্তে রচিত:

দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো/পায়ের তলায়/মেঘের মেলায়/আলো মিলায়

উত্তর জোড়া/তুষার চূড়ায়/খেয়ালি বিকেল/আগুন ছড়ায়

'সাগর দোলা' কবিতাটি ছয় ও পাঁচ মাত্রার মিশ্র পর্বের মিশ্রণে বেশ সুর সমন্বিত। যেমন:

জানালায় নীল/আকাশ ঝরে
সারাদিন রাত/ঢেউয়ের দোলা,
সমুদ্র জোড়া/দিগন্ত থেকে/দিগন্তরে
সারাদিন রাত/জানালা খোলা

'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যের স্বয়ংবরা, দোলপূর্ণিমার কবিতা, ঝরাফুলের গান, প্রৌঢ় প্রেম, শ্রাবণ ইত্যাদি কলাবৃত্তে রচিত কবিতা। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কবিতাটি পাঁচ মাত্রার কলাবৃত্তের বিশিষ্ট উদাহরণ:

সেদিন মেঘে/সোনার পাড়/	৫+৫
রৌদ্র ভিজে/ভিজে;	৫+২
গাছের গায়ে/আছাড় দেয়	৫+৫
হাওয়ার হিজি/বিজি।	৫+২
দুপুর যেন/বিকেল আর	৫+৫
বিকেল হলো/অন্ধকার;	৫+৫
সন্ধ্যাকাশে/উচ্চহাসে/	৫+৫
সূর্যপেলো/ছাড়া	৫+২
দুঃশাসন/করিলো পণ।	৫+৫
দ্রৌপদীর/শাড়ি	৫+২

যদিও আট মাত্রার কলাবৃত্ত রীতির কবিতা হয় না, তবুও বুদ্ধদেব বসু সাত ও আট মাত্রার মিশ্রিত পর্ব কলাবৃত্তে ব্যবহার করেছেন 'দ্রৌপদীর শাড়ি'-র 'কালো চুল' কবিতায়। একে বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত কবিতা না বলে মিশ্ররীতির কবিতা বলা চলে। যেমন:

আর্দ্র উজ্জ্বল/ধারালো ছলোছলো/ভাদ্রের হলদে/বারান্দায়
কঙ্কাবতী এসে/দাঁড়ালো
খুলে দিলো কালো চুল/বিপুল ঢেউ তুলে/লাল সূর্যাস্তের/সন্ধ্যায়
খুলে গেলো পশ্চিমে/সূর্যের জাদুকর/জানালা।

মনে হয়, কলাবৃত্ত রীতিতে সবচেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন, 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থে। যেমন: বাসা-ভাঙার গান, আকাশ পাতাল, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ উক্তি, বর্ষার দিন, মুক্তপ্রেম, নেপথ্য নাটক ইত্যাদি।

১. আমার মনের/মত্ত আঁধারে/হাজার কথার ৬+৬+৬
ঘুম ভেঙে যায়/ যেন পাখা পায়/আকাশ-তারার ৬+৬+৬
বিশাল রাত্রে/যেন উয়ে যায়/হাজার হাওয়ায় ৬+৬+৬

'অসম্ভবের গান' কবিতাটি ৭+৫ মাত্রার মিশ্রপর্বের বৈচিত্র্যমণ্ডিত কলাবৃত্ত রীতির কবিতা:

এখানে কিছু নেই/অন্ধকার ৭+৫
শূন্য তৃণ এক/বসন্তেই ৭+৫
এ বনে কেন তবে/আবার খোঁজো ৭+৫
অনিশ্চয়তার/অসম্ভবে। ৭+৫

বুদ্ধদেব ৬+৬+৫ এবং ৬+৬+৩ কলাবৃত্ত রীতিতে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন, 'মরচে পড়া পেরেকের গান'-এর 'মৌলিনাথের স্বপ্ন' কবিতাটির উল্লেখ করা চলে:

১. এখন জেনেছি/স্বপ্নের তুমি/সারাৎসার/ ৬+৬+৫
সকল ঘুমের/কৌটোয় তুমি/কৌস্তভ/ ৬+৬+৫
অবচেতনের/বীজানুব্যাকুল/ফুটিল অন্ধ/কারে ৬+৬+৬+২
[তোমারি]→ তোমারই সাহসে/জ্বলে খস্তার/বাতি/ ৬+৬+২
২. তবুও ক্ষণিকা/তোমাকে নিয়েছি/দেখে ৬+৬+২
চোখের হীরকে/আমার দগ্ধ/আশা ৬+৬+২
খোঁপার বিরাট/গমবুজে উজ্জ্বল/ ৬+৬
হাজার হারানো/স্মৃতির গোপন/রত্ন ৬+৬+২
৩. ভোর হয়ে এলো/এখনো তোমার/সৌরভ ৬+৬+৩
[তোমারি]→ তোমারই অধরে/বন্দী আমার/নিশ্বাস ৬+৬+৩

বুদ্ধদেব তাঁর 'মোহমুদ্গার' কবিতায় ৭+৭+৭+৫, ৭+৭+৭+৪, ৭+৭+৭+৩—এই তিনরকমের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

১. পরম আশাতীত/জড়ের পরাজয়/সূক্ষ্ম শৈবালে/অ্যামিবায় ৭+৭+৭+৪
যাত্রা শুরু করে/যুধিষ্ঠিরে এসে/ব্যক্ত হলো যার/প্রতিভার।
২. যে তুমি বিশ্বের/প্রথম শিহরণ/আলোর জাগরণ/মন্ত্র ৭+৭+৭+৩
অন্ধকার যার/পরশে সরে গিয়ে/পঞ্চভূতে দিলো/জন্ম
দেবাদিদেবে কাম/করুণা করো তুমি/আমার গুরু বৈ/রাগ্যে।

আবার নানা মাত্রার অসমমাত্রিক পর্বেও ধ্বনি-স্পন্দনে ছন্দের বৈচিত্র্য বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এমন কবিতাও দুর্লভ নয়। যেমন:

১. বেরিয়ে এল ফের/তুহিন বাত্যায় ৭+৬
পুঞ্জ বরফের/ধবলে ৬+৩
কিন্তু রাত্রির/খনিত গহবে ৬+৬
ট্যাক্সি চুম্বনে/তপ্ত ৬+৩
২. এ শুধু ছায়াছবি/পুকুরে ঢিল ছোঁড়া ৭+৭
বাতাসে খসে পড়া/পাতার নিস্বন ৭+৭

এ শুধু সন্ধ্যার/সোনালি ফুলঝুরি ৭+৭

ফুলের গন্ধের/যৌন আবেদন ৭+৭

দলবৃত্ত [স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ ইত্যাদি] ছন্দে বুদ্ধদেব বসু বেশি কবিতা লেখেননি। কেন-না, সাধারণত হাস্যরসের কবিতায় বা ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় দলবৃত্ত রীতির ৪+৪+৪, ৪+৪+৩, ৪+৪+২ মাত্রানীতি ব্যবহৃত হয়।

১. । । । । । । । । । ।

একটি কথা / বলবো তোমার / কানে ৪+৪+২

। । । । । । । ।

আনো তোমার / মুখখানি এই / খানে

। । । । । । । । । ।

আরো কাছে / আরো একটু / কাছে

। । । । । । । । ।

না হয় তোমার / চুলগুলি মোর / গালে

। । । । । । । । । ।

চুলবুলিয়ে / উঠলো ক্ষণেক / তার।

'জোনাকি' কবিতাটি দলবৃত্ত রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

এই / বাদলায়

কেন / কলকা

তায় / এলি তুই?

তোর / সঙ্গী

সব / পাড়াগাঁর

পথে / সারারাত

ঘন / অন্ধ

কারে / জ্বলছে।

একটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বুদ্ধদেব বসু তিনটি গম্ভীর রসাত্মক কবিতা লিখেছেন দলবৃত্ত ছন্দে। কবিতা তিনটি যথাক্রমে হল 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের 'এক তরুণ কবিকে', 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়' ও 'গ্যেটের নবম প্রণয়'। তা ছাড়া আমাদের মনে পড়বে 'মরচে পড়া পেরেকের গান'-এর 'লোকটা' শীর্ষক কবিতা।

১. পাঞ্জাবিতে / ইস্ত্রি রেখো / কড়া। ৪+৪+২

ছাঁটা চুলে / যত্নে এঁকো / টেরি। ৪+৪+২

লোকে দেখে / ভাবুক আমা / দেরই ৪+৪+২

নয়তো ঝড়ে / ছিঁড়বে দড়ি / দড়া। ৪+৪+২

। । । । । ।

[নয়তো = ২ মাত্রা, দেবই = ২ মাত্রা, ছিঁড়বে=২।]

[এক তরুণ কবিকে]

২. বর্তমানে / কাব্যে আমি / রাজা ৪+৪+২

গদ্য লেখায় / আমায় নেই / জুড়ি ৪+৪+২

কুঞ্জবনে / মরণ বটে / তাজা ৪+৪+২

কিন্তু আরেক / রক্ত রাঙা / কুঁড়ি ৪+৪+২

[লেখায় = ২ মাত্রা, আমার = ২ মাত্রা, মরণ = ২ মাত্রা, আরেক = ২ মাত্রা।

[গ্যেটের অষ্টম প্রণয়]

৩. । । । । । । । । । ।

তেমনি তুমি / যদিও রাত / হলো ৪+৪+২

। । । । । । । । । । ।

জলসা ঘরে / বিরামহীন / বাঁশি ৪+৪+২

। । । । । । । । । ।

কেমন করে / ঘুমোই আমি / বলো ৪+৪+২

'লোকটা' কবিতাও দলবৃত্ত ছন্দের উল্লেখ্য উদাহরণ—

। । । । । । । । । । । ।

লোকটা যখন / ছোকরা তাকে / রাত দুপুরে ৪+৪+৪

। । । । । । । । । । । ।

দেখতো পাড়ার / হুলো বেড়াল / কুলপিওলা ৪+৪+৪

। । । । । । । । । । । ।

আস্তে হেসে / উঠতো হঠাৎ / থামিয়ে চলা ৪+৪+৪

। । । । । । । । । ।

রাস্তা যেন / গল্প বলে / আস্তাকুঁড়ে ৪+৪+৪

বুদ্ধদেবের ছন্দ প্রতিভার প্রমাণ তাঁর নানাভাবে ও রীতিতে রচিত কবিতাসমূহ। তাই বলা যায়, বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ তাঁর কবিপ্রতিভার নিজস্ব কণ্ঠস্বর। সমস্ত ভাবের সমস্ত ছন্দের রীতির পরীক্ষা পরবর্তী বাংলা কবিতাকে প্রভাবিত করছে বলে তাঁর কবিতার ছন্দ যেন বাংলা কবিতার কবিদের কবি প্রতিভার অভিজ্ঞান।

গদ্যছন্দের কবিতা ও সনেট এবং বুদ্ধদেব বসু

মিশ্রবৃত্ত কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ব্যতীত বুদ্ধদেব বসু গদ্যছন্দেও বেশকিছু কবিতা লিখেছেন। কাব্য রচনার প্রথম পর্যায়ের অন্তিমপর্বে তিনি গদ্যছন্দকে কবিতার বাহন করেছেন। রবীন্দ্রোত্তর অন্যান্য কবিদের ন্যায় বুদ্ধদেব বসুও বাংলা কবিতার ছন্দে গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চারে যেমন নিয়োজিত ছিলেন, তেমনি গদ্যছন্দ চর্চাতেও মনোনিবেশ করেছিলেন। গদ্যছন্দের স্বচ্ছন্দ বাক্‌স্পন্দনের উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর 'নতুন পাতা'র বেশকিছু কবিতায়। সেখানে আবেগ কোথাও প্রবল, কোথাও প্রশমিত, কিন্তু কবিতার ছন্দোস্পন্দে পাঠকের মনে ভাবাবেগ সঞ্চারিত হয়। যেমন:

কী আমি করব?
কী আমি করতে পারি।
কেমন করে আমি বাঁচব, যদিও তোমার চোখ, আগুনে ভরা,
যদিও তোমার ঠোঁট আগুনের মতো লাল,
যদ্যি তোমার চুল আগুনের নিচে ছায়ারাশির মতো নৃত্যশীল,
আমার জীবনকে ঘিরে থাকে,
আমার শরীরকে জড়িয়ে ধরে,
পুড়ে যায় আমার মাংসের মধ্যে,
আমার রক্তকে জ্বালিয়ে তোলে উন্মত্ত নৃত্যে?

এখানে নিরূপিত ছন্দের অন্ত্যস্পন্দন লক্ষ করা যায়। আবার তিন চরণের স্তবকে গঠিত, অন্ত্যমিল সমন্বিত সংহত গদ্যকবিতাও দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন:

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মতো দোলে
তোমার দুই বুক; কল্পনার গ্রন্থির মতো খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর; ঝড়ের পাখির মতো দোলে।

আবার উক্ত কাব্যের মধ্যমিল ও অন্ত্যমিল সমন্বিত কবিতা 'জন্ম' স্মরণীয় থাকে ছন্দ্রস্রোতের জন্য:

তোমাকে বুকে করে/তোমাকে বুকে ভরে/কাটে আমার রাত্রি/সমস্ত চিরকাল/সেই উত্তাল/অন্ধকার মন্থিত মুহূর্তে/থমকে দাঁড়ায়/যেন পথ হারায়/অন্ধ অবায়ু চিরায়ু/মহাশূন্যের যাত্রী—কোন উদ্যত/খড়্গের মতো/আমার উত্তপ্ত/মাংসে মধ্যে খুঁজতে।

এখানে প্রথম ছত্রে করে/ভরে, দ্বিতীয় ছত্রে চিরকাল/উত্তাল, তৃতীয় ছত্রে দাঁড়ায়/হারায়, অবায়ু/চিরায়ু, চতুর্থ ছত্রে উদ্যত/মতো/উত্তপ্ত মধ্যমিল এবং রাত্রি/যাত্রী, মুহূর্তে/খুঁজতে—অন্ত্যমিল থাকলেও গদ্যকবিতার মেজাজ অনুপস্থিত নয়।

'নতুন পাতা'র অন্যান্য কবিতা বাক্‌ধ্বনির স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে, ক্রিয়াপদের চলতি রূপে গদ্যকবিতার বাক্‌স্পন্দের অনুগামী। এ প্রসঙ্গে এই শীত, ভীরুতা, বিচ্ছেদের দিন, মোড়, নতুন দিন, কোনো কথা বলিনি ইত্যাদি কবিতার কথা মনে পড়ে যায়।

আলোচ্য গ্রন্থের তিনটি কবিতার নাম করা যেতে পারে যেখানে গদ্য-কবিতার ধ্বনিস্পন্দ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। কবিতা তিনটি যথাক্রমে 'ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা' 'চিল্কায় সকাল' এবং 'চাঁদ'। 'ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা' কবিতাটি শুরু হয় একেবারে গদ্যবাক্যে—'বৃষ্টি কেটে গেছে।' এরপর আকাশের বর্ণনায় বিবৃতিমূলক গদ্য; মধ্যমিল বা অন্ত্যমিল কিছুই নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বৃষ্টি কেটে গেছে', 'পায়ের নিচে কাঁকর', 'বাতাসে ধার' ইত্যাদি যেন গদ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে; যদিও সমস্ত কবিতার পরতে পরতে গদ্যছন্দের একটি নিটোল পরিপূর্ণতা সংলক্ষ।

'চিল্কায় সকাল' কবিতাতেও গদ্যছন্দের সুনিরূপিত পরীক্ষা, কেন-না এখানে ছন্দ বাঁধাধরা কাঠামোতে অতিনিয়ন্ত্রিত নয়। গদ্যছন্দের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা দুরূহ। প্রখর ছন্দানুভূতি না থাকলে এর পরিমাণবোধ আয়ত্ত করা যায় না। কেন-না গদ্যকবিতার ছন্দ বাঁধাধরা নয়। গদ্যছন্দে পদ্যছন্দের মতো নাচের তাল নেই; গদ্যছন্দ স্বাভাবিক পদক্ষেপে সাধারণভাবে চলবে। গদ্যছন্দ অতি নিরূপিত নয়, সে স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'গদ্যছন্দের গোড়ার কথা হচ্ছে, ছন্দকে ভাবের বাহন করতে হবে। সেই জন্যই গদ্যকবিতা রচনাও সহজ নয়। বাঁধা নিয়মের ছন্দের অনুগামী হয়েই যে প্রচলিত কবিতার সব ভাব চলে তা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভাব বিশেষ ছন্দের উপর ভর করে। কেন-না সেই ছন্দ সেই ভাবের অনেকটা অনুপন্থী, কিন্তু অনেকটা হলেও ঠিক অনুপন্থী নয়। ওই রকম কবিতায় ভাব ও ছন্দের মধ্যে একটা আপস করার সম্বন্ধ ঘটে। কিন্তু গদ্যকবিতায় সে রকমটি হবার উপায় নেই। এই কবিতায় ছন্দকে ভাবের হুকুম মানতেই হবে, তা না হলে গদ্য কবিতায় কবিতা বাদ পড়ে শুধু গদ্যই থেকে যাবে।

'চিল্কায় সকাল' কবিতাটিও একটি স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, ছন্দিত গদ্যের কবিতা। এখানে নিসর্গ সৌন্দর্যের বিস্ময়, প্রেমানুভূতির আবেশ বিহ্বলতা স্মরণীয় গদ্যছন্দের প্রতিমায় মূর্ত হয়েছে। 'কি নির্মল নীল এই আকাশ'—সহজ বিস্ময়বোধের এই প্রকাশের পর 'কি অসহ্য সুন্দর' সৌন্দর্য উপভোগের অতি তীব্রতা প্রকাশ করে। ভালোলাগার অনুভূতি কেমন সহজ গদ্যে রূপায়িত হয়—'কি ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে।' আবার গদ্যছন্দের নিরূপিত বাঁধন—

> তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
> ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে তাই দেখতে।

এ যেন অসমাপিকা ক্রিয়ার পরপর ব্যবহারে কথ্য অসম্পূর্ণতা শেষ পর্যন্ত সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা—'এসে দাঁড়িয়েছে'—পূর্ণতা লাভ করে। আলোচ্য কবিতাটিতে প্রেমানুভূতির অনির্বচনীয় অনুভূতি গাঢ়তা, তীব্রতা, বিস্ময়াবিষ্ট সুখানুভূতি, ইন্দ্রিয়াবলির রক্তিম সংবাগ, ইন্দ্রিয় বাসনা বিহ্বল প্রেমের তীব্র সংরক্ত প্রকাশ গদ্যের অতিনিরূপিত বাঁধনে বাঁধা পড়ে কবিতাটিকে গদ্যছন্দের কবিতার নন্দনীয় শিরোপা দান করে।

'ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা', 'চিল্কায় সকাল', 'চাঁদ'—এই তিনটি কবিতার ধ্বনিস্পন্দ, আবেগ অন্যান্য কবিতার যেমন পৃথক, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার বাক্‌রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। হয়তো কবিতা তিনটিতে নিরূপিত ছন্দের দোলা নেই, কিন্তু একজাতীয় অনতিলক্ষ ছন্দস্রোত বহতা নদীর মতো—যা সঞ্চারিত হয় শব্দবিন্যাসের কৌশলে ও যতিপাতে। যেমন:

এই মুহূর্তে চাঁদ তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে,
কত বড়ো চাঁদ!
কী সম্পূর্ণ, কী সুন্দর, কী অবিশ্বাস্য সম্পূর্ণ সুন্দর।
কিন্তু তার চেয়েও আরো কত সুন্দর এই যে আমার মেঝেতে
কোনো রূপকথার নীল সমুদ্রের
টলমলে জলের মতো একটুখানি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর তিনটি কবিতা প্রসঙ্গে [চিল্কায় সকাল, ঘুমের গান, বিরহ] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন: "তোমায় কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান ছেঁড়া লিরিক, এবং লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে, অথচ সহজে নয়।" রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর গদ্য কবিতার অন্তস্পন্দে লিরিকের আবেগ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুও গদ্যছন্দের সমর্থনে বললেন—"ভাষার দুটো মহল আছে—গদ্য আর পদ্য। ছন্দ, রিদম এটা যে শুধু গদ্যেরই প্রাইভেট প্রপার্টি তা তো নয়, গদ্যের শিল্পরূপেরও তাতে অধিকার আছে। *** গদ্যে পদ্যের মতো সুনিয়মিত, সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট ধ্বনিবিন্যাস নেই, অর্থাৎ মিটার নেই, এ তো জানা কথাই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ আছে; রিদম আছে; গদ্যছন্দকে স্বীকার না করে উপায় কি। *** গদ্য যখন সাহিত্য হয়েছে, আর্ট হয়েছে, তখন ছন্দস্পন্দন জেগে উঠেছে অনিবার্য ভাবেই। গদ্যকবিতা কথাটা নতুন হতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দ চিরকালের।" [বাংলা ছন্দ: সাহিত্যচর্চা।]

'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'কবির স্ত্রী' এবং 'উদ্বাস্তু' কবিতাতেও গদ্যছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে স্বপ্রকাশিত। অন্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে এখানে বাক্‌স্পন্দেও সঞ্চারিত হয়েছে কথ্যরীতি। যেমন, 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'প্রৌঢ় প্রেম' কবিতাটি উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক:

আবার ভাষার ছন্দ, আমার ভাষার স্বপ্ন যদি
ঢেউ তোলে কোনো সুদূর আগামী কল্যে,
আমি বেঁচে আছি সেই কলাবৈকল্যে।
আসে যায় যার নবীন জীবন বণিক,
        সহজ সুখের ধনিক,
মুক্ত দুয়ার উদার তোমার প্রাণের প্রাঙ্গনে
        অমর কম্পনে?

বিপরীত দিকে এবার 'কবির স্ত্রী' কবিতাটির উদ্ধৃতি দেওয়া যাক:

তারপর প্রথম যখন দেখা হলো
তুমি এমন করে আমার দিকে তাকালে
যেন তুমি জানো আমার মনের কথাটি।
তোমার চোখে ডুবলো আমার সত্তা,
তোমার বাঁকা-বাঁকা ঝাঁকড়া চুলে আমার ইচ্ছা
তার লজ্জা হারালো,
আর আমার সিগারেটের ফিকে নীল ধোঁয়া
যখন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠলো
সেই নীল কেশগুচ্ছের উপর দিয়ে
আমার মনে হলো—জীবনে প্রথম বার মনে হলো—
সিগারেট খাওয়াটা পুরুষের একটা শোভা।

'কবির স্ত্রী' কবিতাটি বেশ দীর্ঘ, চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত; তার আবার কয়েকটি উপপর্যায়। কাহিনিধর্মী এই কবিতাটিতে কাব্যরীতির সাবলীলভঙ্গি গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। আবার বিপরীত দিকে 'উদ্বাস্তু' কবিতাটি কথ্যভঙ্গিকে স্বীকার করে নিলেও বাক্স্পন্দে সঞ্চারিত গাম্ভীর্য। যেমন: নারকোলের ঝাঁকড়া মাথার ঝিলিক দেয় সোনার মতো আলো,
ঠাণ্ডা আকাশে লাল ফুল ফুটে ওঠে,
নীলচে জলে একটি-দুটি করে পাপড়ি খসে পড়ে তার;
তারপর বুদ্ধ-মন্দিরের পিছনে, গাছপালার অন্ধকার ছিঁড়ে
এই মানুষ-ছড়ানো দৃশ্যের উপর পবিত্র হাস্যময় সূর্যদেব
মানুষের অতীত কোনো রঙ্গমঞ্চে নায়কের মতো দেখা দেন।

ছন্দ, বাক্রীতি, ও পরিবেশনাগত এই যে গম্ভীর উদাত্ত পরিবেশ তা দেখা যায় 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যের কোনো কোনো কবিতায়। 'নতুন পাতা'য় যে শিথিল রীতির গীতলভঙ্গি তা এখানে অনুপস্থিত। 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' গ্রন্থের 'মধ্যতিরিশ' কবিতায় দুটি পৃথক বাক্স্পন্দ, শব্দসজ্জা, ছন্দের প্রবাহ লক্ষ করা যায়। দুটি উদ্ধৃতিতে এ পার্থক্য লক্ষ্যগোচর:

১. স্বপ্নের মতো মনে পড়ে শ্যামল সতমল-শৈশবদেশ
নীলে সোনায় মেলামেশা, জাফরানি বেগনিতে গলাগলি।
কৈশোরদেশটি ছোটো, ঈষৎ, রুক্ষ, বন্ধুর,
অথচ লাবণ্যের আভাস দিচ্ছে থেকে থেকে,
আহা যৌবন সীমান্তের লাবণ্য। [মধ্যতিরিশ]

২. কত যত্নে লালন করেছি ওকে, কত ভালোবেসেছি,
প্রতিদিন খাইয়েছি নিজের হাতে,

বিরাট সেই ভোজ।
এর প্রচণ্ড ক্ষুধা, সব সময় যথেষ্ট খাবার জোটেনি,
তখন আমাকেই ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে,
শান্ত করেছি চাবুক মেরে।
আকণ্ঠ খাওয়া যখন দিতে পেরেছি
তখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে আমার পা চেটে দিয়েছে
সেটা মন্দ লাগেনি।

'শীতরাত্রির প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যের দুটি কবিতা 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' ও 'কলকাতা' কবিতা দুটিতে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যছন্দের বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর ধরা পড়ে যায়। আলোচ্য কবিতা দুটির গদ্যছন্দের গভীরে সংযত প্রকাশ কলা যেন আমাদের ঔপনিষদিক বোধের মন্ত্রধ্বনির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ দীর্ঘায়ত পঙ্‌ক্তি স্তবক পর্যায়ে কথ্যবাক্‌ ভঙ্গিমা অনুপস্থিত নয়।

১. দুর্ভিক্ষ উড়ে এলো প্রলয়ের ফুলকি এলো ছুটে।
টান পড়লো তোমার স্নায়ুতে, দারুণ বান ডাকলো শিরায় শিরায়।
ত্রাসে, বিক্ষেপে, উৎসাহের উচ্ছ্বাসে, আর কঙ্কালের
কান্নায় মিশে গেলো
আমার যৌবনের অন্তিম নিশ্বাস।
মানুষের ছিন্নভিন্ন মাংস তোমার বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলো,
ক্ষুধিতের ক্ষীণ গোঙানি ট্র্যাফিকের শব্দে ডুবে গেলো,
ব্ল্যাক আউটে ঘন-হাওয়া ঘাস নির্মূল হয়ে মুছে গেলো
উদ্বাস্তুর অস্থির পায়ে পায়ে। [কলকাতা]

২. নিবিড় হলো রাত্রি, পাৎলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো, নেকড়ের মতো
অন্ধকার,
দলে-দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়, আততায়ীর ছুরির
মতো শীত।
এরই মধ্যে তোমার যজ্ঞ; উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন
জ্বালাবে আত্মার,
ভস্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিষ্যৎ, আর যাকে
জেনেছো তোমার অতীত;
পবিত্র হও, প্রতীক্ষা করো। [শীতরাত্রির প্রার্থনা]

'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতাটিতে পাঁচ, ছয় ও সাত পঙ্‌ক্তির স্তবক আছে। তবে পাঁচ পঙ্‌ক্তির স্তবকই বেশি।

"শীতরাত্রির প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর" বইতে 'মধ্যতিরিশ' বা 'খণ্ড দৃষ্টি' কেবলই গদ্য কবিতা। ছন্দের কোনো স্বতন্ত্র মহিমায় এরা স্মরণীয় থাকে না। *** এই প্রাত্যহিক গদ্য অতিক্রম করে যখন পৌঁছই 'কোলকাতা' বা 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'র মতো কবিতায়, তখন আবার কানে ভেসে আসে পুরোনো সেই শ্লোকগম্ভীর চলন, আরো সংবৃত, আরো প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে। *** আর অবশেষে এই রীতি পুঞ্জীভূত স্তবের মতো হয়ে উঠল 'মরচে পড়া পেরেকের গান'-এর সেইসব কবিতায়, যা আসলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র সংলাপ।" [ছন্দের বারান্দা / শঙ্খ ঘোষ] প্রায় একই পর্যায়ের ধ্বনি, স্পন্দন, শব্দ ইত্যাদি শেষ পর্যায়ের 'রাত্রি' [একদিন: প্রতিদিন: কবিতায় ব্যবহৃত হলেও তা অনেক অনায়াস ও সাবলীল কথ্যগদ্যের ভঙ্গিতে। যেমন:

ব্যস্ত সে, অঢেল রৌদ্র নিয়েও অস্পষ্ট:
এলোমেলো, ছেঁড়াখোঁড়া, আকৃতিহীন। তার মুহূর্তগুলি
লাসের মতো
বোবা শব্দে ফুটপাতে খসে পড়ে, তার ঘণ্টায় টুকরোগুলোকে
জোড়া দিয়ে দিয়ে আর কিছুই পাওয়া যায় না—

আবার 'কালিদাসকে খোলা চিঠি' কবিতাতে নর্মসখী, সারস্বত, মন্দ্রিত, তম্বুরা, মৃদঙ্গ, উদ্দীপ্ত, নিশ্বসিত, মধুরিমা ইত্যাদি তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে কথ্যভঙ্গির কোমলতা সঞ্চারিত। যেমন:

হয়তো আপনার পত্নীও আপনাকে স্নেহ করতেন?
তিনি গুছিয়ে রাখেন ভূর্জপাতা ও পুঁথিপত্র, আপনার
কামনার ক্ষণে বিমুখ হন না কখনো, কিন্তু আপনি যখন
ঘরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে ববম্‌ববম্‌ ছন্দ আওড়ান,
যখন আপনার চক্ষু লাল ও মুখভঙ্গি অদ্ভুত হয়ে ওঠে,
তখন তিনি সরিয়ে নেন নিজেকে, আস্তে পা ফ্যালেন,
ত্রস্ত থাকেন কাকাতুয়া বা শিশুরা পাছে শব্দ করে।

বলা যেতে পারে 'একদিন: চিরদিন' কাব্যই বুদ্ধদেবের চূড়ান্ত সিদ্ধির রূপ। কথ্যভাষার স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গি এ কাব্যে ভাবে কবির আয়ত্তে এসেছে তা বিশিষ্টতার পর্যায়রূপে পরিগণিত হবার যোগ্য।

এ রীতি বুদ্ধদেবের নিজস্ব রীতি এবং রাবীন্দ্রিক রীতি থেকে মুক্ত। বুদ্ধদেব যে নিজেকে নিরন্তর রূপান্তরিত করেন, এক ভঙ্গি ও উচ্চারণরীতি থেকে ভিন্ন পথের পথিক হন তার স্মরণীয় নিদর্শন হলো 'একদিন: চিরদিন' কাব্যের ওই নামেরই কবিতাটি:

ভোরবেলা ঘুমের মধ্যে বৃষ্টি, বৃষ্টিতে চিঁড়ে ভাজার গন্ধ।
রঙিন মলাটের ব্যোমযানে পটুয়াটোলার গলিতে
এসে নামি। প্রস্রাবখানায় ছায়া কাঁপে দেয়ালে,
মোদো গন্ধে গায়ে কাঁটা দেয়। রাত্রির মোড়কে ঢাকা

বেদানার দানার মতো চুমো—তারায় তারায় প্রকাণ্ড ঘড়ির
পেন্ডুলামের মতো আমার হৃদয়।

'কবিতা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় বেশ কিছুদিন ধরে গদ্য কবিতার চর্চা শুরু হলে কেউ কেউ এমন প্রশ্নও তোলেন, "গদ্য কবিতাও যদি কবিতা হয় তাহলে ছিন্নপত্র, গল্পগুচ্ছ, ঘরে বাইরে ইত্যাদি অসংখ্য গদ্যগ্রন্থের বহু অংশ কেটে নিয়ে পদ্যের মতো করে ছাপালে আরো পঞ্চাশখানা পুনশ্চ কেন তৈরি করা যাবে না? আধুনিক গদ্য কবিতা বিষয়ে তিনি রায় দেন: 'পদ্যের অনুকরণে সাজানো বলেই এই জিনিস কবিতা বলে কাটছে, ঐ অনুকরণটুকু ছাড়লে এর বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকবে না।" [কবিতা সংগ্রহ—১ম খণ্ড / বুদ্ধদেব বসু।] বুদ্ধদেব বসু গদ্য কবিতা লেখেন কেন এমন প্রশ্ন করেছিলেন কবি নরেশ গুহ। বুদ্ধদেব বসু তার উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন— "কিছুদিন আগে বদলেয়ারের গদ্য কবিতা একমাত্র আমার হাতে এলো। ...ছোটো বই, পড়ে উঠতে একঘণ্টার বেশি লাগে না, কিন্তু পড়ে ফেলতে সারাজীবন কেটে যায়। তোমাকে বলবো কী—ঘুমের আগে বইখানা খুলে যে কোনো পাতায় দুটি চারটি লাইন যদি পড়ি, তাহলেই সমস্ত মন এক বেদনা-মধুর শান্তিতে ভরে যায়। *** তাও তো অনুবাদে পড়ছি; মূলে না জানি ভাষাশিল্পের দিক থেকে কত আশ্চর্য। অথচ বোদলেয়ারের অন্যান্য রচনা ছন্দমিলের ধ্রুপদী আদর্শে বাঁধা, সে বিষয়ে তার প্রকর্ষের কথা বলতে তাঁর দেশের বিশেষজ্ঞরা উচ্ছ্বসিত। সেই বোদলেয়ার কেন গদ্য কবিতা লিখেছিলেন? কেন রবীন্দ্রনাথ, 'লিপিকা', 'পুনশ্চ'? নিশ্চয়ই কোনো বাধ্যতা ছিলো তাই; নিশ্চয়ই ওসব কবিতা ও-ভাবে ছাড়া হতেই পারতো না—তাই। অতএব প্রশ্ন করো না 'কেন'—যদিও কোনো বিশেষ রচনা ভালো না লাগলে সেকথা নিশ্চয়ই বলতে পারে।" [কবিতা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড / বুদ্ধদেব বসু]

বাংলা কবিতার ভুবনে বুদ্ধদেব বসুই প্রথম গদ্যছন্দের কবিতা লেখেননি। ১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে প্রথম গদ্য ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সুতরাং গদ্য ছন্দের প্রয়োগের ব্যাপারটি তিরিশের কবিদের বা বিশেষত বুদ্ধদেব বসুর নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের রচনা যে অনেকেরই পছন্দ হয়নি সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে ৩. ১১. ১৯৩৬-এর চিঠিতে জানিয়েছিলেন—"আমাদের দেশের বেশিরভাগ পাঠক ও সমালোচক গদ্যছন্দের মনে-প্রাণে বিরোধী। বুঝতে পারি এটা তাঁদের একটা অন্ধ প্রেজুডিস—ইংরিজি ফ্রি ভার্স কি আরো অত্যাধুনিক উচ্ছৃঙ্খলতা সবই মানবেন, কিন্তু বাংলা গদ্যছন্দকে বাতিল করে দেবেন পিঠ-চাপড়ানো অশ্রদ্ধায়। এ সংখ্যার 'পরিচয়ে' আপনার নতুন কবিতার বইয়ের সমালোচনাচ্ছলে স্পষ্টই তো বলা হয়েছে—গদ্যছন্দটাই রাবিশ, তবে নেহাৎই রবীন্দ্রনাথ বলেই প্রাণখুলে নিন্দে করতে পারলুম না। গদ্যছন্দ কচুরিপানার মতোই উৎপাত, তবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন লেখেন তখন চুপ করে সইতেই হয়।" [বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড] রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রের উত্তরে বুদ্ধদেব বসুকে ৬. ১১. ৩৬-এ সুরুল থেকে লিখেছিলেন—"গদ্যকাব্য সম্পর্কে তর্ক না করে যথেচ্ছ লিখে যাওয়াই ভালো। আজ যারা আপত্তি করছে কাল তারা নকল করবে।" [তদেব] রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর গদ্য কবিতার প্রশংসা করে বলেছিলেন—"কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায়, ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে।" [তদেব]

একথা যথার্থ যে, আজ বাংলা কাব্যসাহিত্যে গদ্যছন্দের যে ক্রমবিস্তার্যমানতা তার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং অবশ্য স্মরণীয়।

দুই

বুদ্ধদেব বসুর রচিত সনেট সংখ্যা বেশি নয়। কবিতা সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে বারোটি সনেট স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি স্বয়ং জানিয়েছেন যে ষোলোটি নতুন সনেট যোগ করা হল। কিন্তু চতুর্থ ও পরিশোধিত সংস্করণে 'প্রেম ও প্রাণ'-এর দশটি সনেট পরিণত হল ছটিতে। এখানে একটি নতুন সনেট 'আর কিছু নাহি সাধ' যুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সনেটগুলি নিম্নোক্তভাবে সজ্জিত। 'সনেটগুচ্ছ' নামে পৃথক বিভাগে 'বিজয়িনী ও পরাজিতা' অংশে ১, ২ সংখ্যক সনেট। 'কোনো অভিনেত্রীর প্রতি' অংশে ২টি সনেট; 'প্রেম ও প্রাণ' অংশে মোট সনেট সংখ্যা ৬; 'আর কিছু নাহি সাধ' এবং 'মোরা তার গান রচি' দুটি পৃথক সনেট।

সনেটে সাধারণভাবে ১৪ মাত্রার পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু ১৮ মাত্রার পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন। তবে এগুলি চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে রচিত। যেমন:

বসন্তের অবসানে / নব ঘন ছেয়েছে গগন,
শান্ত শ্যাম অন্ধকারে / বসুন্ধরা উঠিছে শিহরি

তাঁর সনেটে দৃঢ়বদ্ধতা, ভাবের বন্ধন ও মুক্তির লীলা সমস্তই আবর্তিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘপঙ্‌ক্তি ব্যবহারে সনেটে বিশেষ, দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের সনেটের মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ—

একদা গোধূলি লগ্নে / বহেছিলো বসন্ত বাতাস, ১
স্নেহলিপ্ত ওষ্ঠ তব / ছুঁয়েছিলো বিক্ষিপ্ত অলক; ২
নয়নে কাজল পরি, / চরণে মাখিয়া অলক্তক ২
আমার মুখের পরে / ফেলেছিলে উত্তপ্ত নিশ্বাস। ১

এখানে মিলবিন্যাস পদ্ধতি ১/১ [বাতাস / নিশ্বাস], ২/২ [অলক / অলক্তক]।

'বিজয়িনী ও পরাজিতা' ১, ২; 'আর কিছু নাহি সাধ', 'প্রেম ও প্রাণ', ইত্যাদিতে ষষ্টক অংশে পূর্ববর্তী পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে অষ্টক অংশে ১/৩ [ব্যথার/আবিষ্কার], ২/৫ [রিনিঝিনি/বিজয়িনী, ৪/৪ কাজল/শতদল] মিল পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আবার 'আর কিছু নাহি সাধ' সনেটে ১/২/২/৪ [মুকুট/অঞ্চলে/নভস্তলে/সম্পূট] অষ্টক অংশে ব্যবহৃত হলেও ষটক অংশে ১/৩/৫ [সরোবরে/বসারে/অন্তরে] এবং ২/৪/৬ [প্রাণে/কানে/গানে] ব্যবহৃত হয়েছে। 'আর কিছু নাহি সাধ' সনেটটিতে ২৬ মাত্রার পঙ্‌ক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।—

আর কিছু নাহি সাধ/জানি মোর তরে নহে/জয়মাল্য যশের মুকুট।
বিশ্বের কবিরা যত/জ্বলিছে নক্ষত্র হয়ে/রজনীর সুনীল অঞ্চলে। ৮+৮+১০

'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থে 'অসূর্যস্পশ্যা' ও 'সুদূরিকা' সনেটে যথাক্রমে ২৬ ও ২২ মাত্রার পঙ্‌ক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।

১. শ্যাম মেঘপুঞ্জ যথা/অনাবৃতা ধরিত্রীর/রুক্ষ বক্ষে পরায় বসন,
প্রেমের পবিত্র ব্যথা/আচ্ছাদন করি রাখে/কুমারীর কাম চঞ্চলতা
তেমনি ঢাকিয়া রাখো/তোমার রূপের স্বপ্নে/আমার সমস্ত প্রাণমন।

এখানে মিলবিন্যাস পদ্ধতি নগ্নতা/চঞ্চলতা [১/৩], বসন/প্রাণমন [২/৪]।

২. 'সুদুরিকা' সনেটের পঙ্‌ক্তি ২২ মাত্রার।
চক্ষে যার বহ্নিরাগ / বক্ষে যার সুমধুর / কুসুম সুষমা ৮+৮+৬
অন্তরে লুকায়ে রেখো / সংগোপনে সেই অন্তঃ / পুরচারিনীরে
সৃষ্টির আনন্দ মোহে / রচিয়াছো অন্ধকারে / নবতিলোত্তমা—
সূর্যের দুর্জয় দাহে / এনো না টানিয়া তারে / নির্লজ্জ বাহিরে।

এখানেও মিলবিন্যাস পদ্ধতি সুষমা / তিলোত্তমা [১/৩], পুরচারিনীরে / নির্লজ্জ বাহিরে [২/৪]

বুদ্ধদেব বসুর স্মরণীয় সনেট 'দময়ন্তী' কাব্যের অন্তর্গত 'ইলিশ' ১৮ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত / মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে রচিত 'ইলিশ' সনেটটি ১৪ পঙ্‌ক্তিতে রচিত হলেও এর অষ্টক ৪+৪ দুটি পঙ্‌ক্তির স্তবকে গঠিত। এর মিল বিন্যাস পদ্ধতি বিহ্বল / অচঞ্চল (১/৪), নারিকেলসারি / রাজবাড়ি (২/২); কিন্তু ষষ্টক অংশে কোনো পঙ্‌ক্তি ভাগ নেই এবং মিলবিন্যাস এক জাতীয়।

'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের অধিকাংশই সনেট। এই কাব্যের সনেটে বাক্য ও শব্দ ব্যবহারের জটিল কলাকৌশল থাকলেও সংহতি দৃঢ়বদ্ধ, স্তবক বিভাগ যথাযথ, মিলের শৃঙ্খলা ও লক্ষগোচর। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ সনেটের স্তবক বিভাজনরীতি একটু ভিন্ন। কোনো সনেটের স্তবক বিভাজন রীতি ৪—৪, ৩—৩, ৩—৩ ৪—৪, আবার কোথাও বা ৩—৩. এমনকি ৪—৪, ৪—৪, ৪—৪, ৩—৩. ২ এমন বিভাজনও লক্ষ করা গেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সনেটের নাম উল্লেখ করা চলে। যেমন—

১। স্বাতির প্রতি: ১—৪—৪ : ৩—৩
২। অসহনীয়া —৩—৩ : ৪—৪
৩। অপেক্ষা —৩—৩ : ৪—৪
৪। কর্কটক্রান্তি —৪—৩ : ৩—৪
৫। না লেখা কবিতা প্রতি —৪—৩ : ৩—৪
(৩)
৬। নালেখা কবিতার প্রতি —৪—৩ : ৪—৩
(২)
৭। ঋতুর উত্তরে —৩—৩ : ৩—৩ : ২

'সর্বেশ্বরী' এবং 'মুক্তির মুহূর্ত' চতুর্দশ বা অষ্টাদশ পঙ্‌ক্তির সনেট নয়; যোড়শ পঙ্‌ক্তির সনেট। তবে 'সর্বেশ্বরী' সনেটে ৮+১০ মাত্রার ষোলো পঙ্‌ক্তি; মোট চারটি স্তবক। কিন্তু 'মুক্তির

মুহূর্ত' ষোলো পঙ্‌ক্তির হলেও প্রথম দুটি স্তবক চার পঙ্‌ক্তি করে, শেষ দুটি স্তবক তিন পঙ্‌ক্তির এবং শেষ স্তবকটি দুটি পঙ্‌ক্তির।

সাধারণভাবে চৌদ্দো পঙ্‌ক্তির সনেট রচিত হয়। কিন্তু 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়' ও 'গ্যেটের বাম প্রণয়' কবিতা দুটি রচিত হয়েছে ৪—৪ : ৩—৩ : ৩ : ২ পদ্ধতিতে। 'এক তরুণ কবিকে' লেখা সনেটটি দলবৃত্ত ছন্দে লেখা। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চার মাত্রার দুটি পূর্ণ পর্ব এবং দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব। আবার আমি পঙ্‌ক্তিতে যে সনেট রচিত হয় বুদ্ধদেব তার উদাহরণ দেখালেন 'স্মৃতির প্রতি: ২' এবং 'মরুপথ' কবিতাতে। যেমন—

১। যুদ্ধ বাধে, গৃহী ধায় / দেশান্তরে, সমুদ্রের / তীরে তীরে ভ্রাম্যমাণ; মুহূর্তে হারিয়ে যায় / চিঠি, ছবি, পাণ্ডুলিপি, / শীতল ভাণ্ডার; কিন্তু তবু তোমাকে সে / হারাবে না, ধ্রুবতারা / তোমার নিশান কখনো যাবে না অস্ত / দিগন্তরে; সেই সব / সঞ্চয়ের অন্তঃসার।

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তি ৮+৮+৮ মাত্রার, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ৮+৮+৬ তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ৮+৮+৬, চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ৮+৮+৮।

২। অল্প জল, তৃষ্ণার যথেষ্ট নয়। তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর বীজাণু ছড়িয়ে দেয়/,সিক্ত হাত, কনুইয়ের/লোমকূপে ফলে ওঠে ফল এবং দর্শনাস্নিগ্ধ / কণ্ঠ ঠেলে ফুলে ওঠে / সন্ধ্যার আজান।

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তি ১২+১০, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ৮+৮+১০ এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ৮+৮+৬ মাত্রায় গঠিত।

বুদ্ধদেব বসুর সনেটের আর একটি বিস্ময়কর ও দুর্লভ দিক হল—নয়/বিস্ময়, কারণ/অকারণ, আঙুর/বন্ধুর, বীণা/তুমি না, সমতলে/জলে, সংকেত/খেত, ভ্রাম্যমাণ/নিশান, ভাণ্ডার/অন্তঃসার, ম্রিয়মান/উত্থান, উন্মোচন/যৌবন, পারি না/ঝরনা, পথিক/গতানুগতিক, পাতার/অন্ধকার/, খোলা/আরশোলা, টেবিলে/পেলে, মদিরায়/শিরায়, অনলে/হলে, নীল নয়নার/প্রতিযোগিতার, নিয়তি/প্রগতি, প্রেমিক/নিরিখ, চন্দন/নিঃসরণ ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব মোট ৬৮টি চতুর্দশপদী কবিতা (সনেট) রচনা করেছেন। বন্দীর বন্দনা ২০, পৃথিবীর পথে ৫, কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা ২, ২২শে শ্রাবণ ১, দময়ন্তী ৪, দ্রৌপদীর শাড়ি ১, যে আঁধার আলোর অধিক ৩৫। তাঁর সনেটগুলি নিম্নোক্ত বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত হতে পারে—

১। আত্মকথা—মানুষ, কোনো কবিবন্ধুর প্রতি, স্বর, কবি ঃ তার ক্ষমতার প্রতি, অসহনীয়, ঋতুর উত্তরে, মধ্যসমুদ্রে, স্টিল লাইফ।

২। প্রেম—প্রেম ও প্রাণ ১—১০ বিজয়িনী, পরাজিতা, অসূর্যস্পশ্যা, সুদূরিকা, তবু তোমা ভুলি নাই, তোমারে বেসেছি ভালো, প্রথম চুম্বন, ক্ষমা প্রার্থনা, ধন্যবাদ, স্মৃতির প্রতি, নির্বাসন, অপেক্ষা, প্রেমিকের গান।

৩। ব্যক্তি সমালোচনা—কোনো অভিনেত্রীর প্রতি ১,২।

৪। তত্ত্ব—বিবাহ, মোরা তার গান রচি, উৎসর্গ, রাত তিনটের সনেট ১.২, মরুপথ, কেন, সনাতন সংঘর্ষ, দুই পাখি, নেশা, কর্কটক্রান্তি, আটচল্লিশের শীতের জন্য, এক তরুণ কবিকে।

৫। কবিতর্পণ—রবীন্দ্রনাথের প্রতি, রবীন্দ্রনাথ।

৬। প্রকৃতি—শান্তিনিকেতনে বর্ষা, ইলিশ, ল্যান্ডস্কেপ।

৭। ব্যঙ্গ—কোনো কুকুরের প্রতি।

৮। সারস্বততত্ত্ব—মিল না ছন্দ, না লেখা কবিতার প্রতি।

বুদ্ধদেবের তেইশটি সনেট পেত্রার্কীয় এবং পনেরোটি সনেট শেকস্‌পীয়রীয় রীতিতে রচিত। তবে মিলগ্রন্থন ও গঠনবিন্যাসে পেত্রার্কীয় রীতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তবে বুদ্ধদেবের মধ্যে 'মিশ্র রোম্যান্টিক সনেট' রচনার প্রবণতা বেশি। শেকস্‌পীয়রীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষষ্টক সমন্বয়ে এক জাতীয় মিশ্র সনেট রচনার প্রবণতা বুদ্ধদেবের অনেক সনেটে লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেবের এই জাতীয় মিশ্র সনেটগুলি হল—অসূর্যস্পশ্যা, সুদূরিকা, স্মৃতির প্রতি ১.২.৩, কোনো কুকুরের প্রতি, নির্বাসন, রাত তিনটের সনেট, স্বর, মরুপথ, সনাতন সংকট, মিল ও ছন্দ, প্রেমিকের গান, এক তরুণ কবিকে ইত্যাদি। তাঁর মিশ্র রোম্যান্টিক রীতিতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য সনেট হল 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যের 'নির্বাসন'—

> অরণ্যে, হারিয়ে পথ, চোখে যাকে দ্যাখে না পথিক,
> কানে শোনে প্লাবন, চুম্বন, অবিরাম। বুঝিনি এমন হবে
> বিরাট পরিশ্রম শেষ হলে। বহুকষ্টে গতানুগতিক
> গ্রামের আমের বন পার হয়ে, হিমেল গৌরবে।

বুদ্ধদেব বসু প্রচলিত রীতিপদ্ধতি না মেনে পরীক্ষামূলক বেশ কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে পূর্বোক্ত কাব্যের 'অসহনীয়' কবিতাটির উল্লেখ করা চলে—

> মৃত্যুকে তাকিয়ে দেখা হয়তো বা ইস্তাম্বুলে বস্তির বল্মীকে
> কিন্তু কোনোটাই নয়। কোনোমতে তৈরি থাকে বুটি,
> ধোপার খরচ টানি, পাণ্ডুলিপি নির্দিষ্ট তারিখে—
> এমকি কেউ কেউ বলে নাকি অমুক বাবুটি।

"বুদ্ধদেবের সনেটে বিচিত্র বিষয়নিষ্ঠা থাকলেও তিনি যে মূলত প্রেমেরই কবি তারও সার্থক পরিচয় তাঁর সনেটগুলি। *** বুদ্ধদেবের প্রেমচেতনার এই উজ্জীবন ও রূপান্তর এবং তাঁর জীবন সাধনায় প্রেমদর্শনের কাব্যসুরভিত অভিব্যক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন ধরা পড়েছে তাঁর সনেটগুচ্ছে। বুদ্ধদেবের সমগ্র কবিজীবন বিষয়বস্তু ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্দীপ্ত। সনেট কলাকৃতি পরীক্ষা সনেটের গঠনবিন্যাসে যেমন ক্রিয়াশীল, সনেটের ছন্দভাষা বিষয়েও তেমনি সক্রিয়। *** সনেটের গঠন, মিলবিন্যাস এবং ভাষা ও ছন্দের নব নব পরীক্ষায় বুদ্ধদেবের কবিপ্রতিভা নিয়ত তৎপর। এই পরীক্ষা কখনো ব্যর্থ, কখনো সার্থকতায় মণ্ডিত। তবে সনেটের বিষয়বস্তু ও প্রকরণের এই পরীক্ষা তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী কবি প্রতিভারই স্বাক্ষরবাহী। গতানুগতিক পথ অনুসরণ করে নয়, পরীক্ষার দুর্গম পথেই তিনি সিদ্ধির সোপানে আরোহণ করতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই বিচিত্রমুখী পরীক্ষা বাংলা সনেটের সীমাকে প্রসারিত করে তার জীবনীশক্তিরই উদ্দীপন ঘটিয়েছে।" [বাংলা সাহিত্যে সনেট / উত্তম দাশ]

পুরাকাহিনি এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ও নাটক

আধুনিক মানুষ শুধু সমকালীন স্মৃতি বা উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতার জগতে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। মানবসভ্যতার অভিজ্ঞান তার স্মৃতিসত্তায় বাহিত হয়। মিথ বা পুরাকাহিনিকে মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের উপাদান বলা চলে। সমকালীন জীবনচেতনার সঙ্গে যদি পুরাণচেতনা সমন্বিত হয় তবে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা 'শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে' সমন্বিত হলেই প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব। শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার মিলনের সেতু হল পুরাকাহিনি। সাহিত্যে মিথের ব্যবহার কেন করা হত সে প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে মন্তব্য করেছেন, 'সাহিত্যে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন এ সমাজসত্তার অসঙ্গতি এড়াবার জন্য সেকালে সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকতো'। অনেক কবি পুরাকাহিনির রূপক চেতনার দ্বারা বর্তমান জটিলতার অন্তঃপুরে যেতে চান। "আধুনিক সাহিত্যিকেরা আপতদৃষ্টিতে প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও মিথ ব্যবহারের ভিতর দিয়েই তাঁরা আধুনিক খণ্ডিত জীবনে চিরকালীন মানবমূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে চাইছেন।" [বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার/কমলেশ চট্টোপাধ্যায়] কেউ কেউ মনে করেছেন আধুনিক যান্ত্রিকতা সর্বস্ব, অবক্ষয়ী, অন্তঃসারশূন্য, লোভসর্বস্ব সভ্যতার প্রেক্ষাপটে কবিরা পুরাকাহিনির কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চাইছেন।

"The role of myth in great poetry of the part may throw some light upon the predicament of the poet and the imprisoning estate of poetry in our non-mythological present. The poet of today—and by that I mean the poetic impetus in all of us today—is profoundly inhibited by the dearth of shared consciousness of myth. [Poetry, myth and reality/Philip Wheel Wright.]"

একালের কবিরা কবিতার নির্মাণকলায় যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তার অন্যতম পুরাকাহিনির প্রয়োগ। পুরাকাহিনি প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতায় নবতম মাত্রা সংযোজিত হয়। কবিতা নানামাত্রিক তাৎপর্যে বিভামণ্ডিত হয়ে ওঠে। বিষয় এবং প্রকরণের অনিবার্য মিথক্রিয়ায় কবিতার জন্ম হয় এবং কবিরা সেইজন্যই পুরাকাহিনি আশ্রয় গ্রহণ করে আপন চৈতন্যের রূপনির্মাণ করেন।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল একান্তভাবে সেটি আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হলেও সেখানে পুরাণ-প্রয়োগ কিন্তু আদৌ অনুপস্থিত নয়। উপরন্তু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিকায় পুরাণকাহিনি কবিতায় যুক্ত হয়ে নবতর মূল্যায়ন ঘটিয়েছে। আলোচ্য শতাব্দীর ত্রিশের দশকে পুরাণকাহিনির আধুনিক প্রয়োগ ইংরেজি অথবা আরও ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় কাব্যান্দোলনের ফলশ্রুতি। ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) এবং এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) একালের কবিতার ক্ষেত্রে পুরাণ-ঐতিহ্য প্রয়োগের সূত্রপাত করেন এবং কবিতার নবতর ভাবরূপ প্রদান করেন। তাঁদের এবং আরও

অন্যান্য কবিদের প্রভাবে প্রেরণায় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও পুরাণকাহিনি নবতর ব্যাখ্যায় ও মহিমায় মন্ডিত হয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রসঙ্গত, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, চৈনিক, লাতিন আমেরিকার কবিতাও আলোচ্য। কেন-না, পুরাণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন অঞ্চলের কবিরা নূতনভাবে দেশি ও বিদেশি পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনাকে সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা কবিতা ইউরোপীয়, বিশেষত ইংরেজি কবিতার পুরাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রভাবিত এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা পুরাণ-ঐতিহ্য প্রয়োগের অবিস্মরণীয়তায় ভাস্বর। ইউরোপীয় কবিদের কবিতায় মিথোলজির প্রয়োগ যে প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়, বাংলা কবিতাতেও সেই প্রবণতা উপস্থিত একথা বলা যেতে পারে। “ইয়েটসের কবিতায় অথবা বোদলেয়ার, মালার্মে, এজরা পাউন্ডে আমরা মিথোলজির বা পুরাকাহিনির বিকীর্ণ ব্যবহার দেখেছি তা একদিকে যেমন ব্যক্তিমনের গভীরতম সংকেত ও চিত্রকল্প অন্যদিকে মানুষের সামগ্রিক আত্মার উচ্চারণ, আদিমকালের ও মানসের অন্ধকারে তার মূল প্রসারিত।” (আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব/মঞ্জুভাষ মিত্র।)

‘পূরণ’ শব্দটি সম্ভবত পুরাণ শব্দের মৌলসূত্র সন্ধানে আমাদের সাহায্য করে। যা ঘটে গিয়েছে বা ঘটে গেল তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দূরত্ব মনে মনে ‘পূরণ’ করতে হবে। একদিন এটা কিন্তু সমস্যা ছিল যে কীভাবে সেই স্বর্ণময় অতীতকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। ইয়েটস সেই দূরতম বৈজয়ন্তীকে কাব্যের দেহে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতাও স্মৃতির শরীরটিকে নূতনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণে ঋদ্ধ এবং সম্প্রসারিত করে বিগতকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করল। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় পুরাণ প্রয়োগের ফলে বক্তব্য, চিত্রকল্প, অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তুর খাত পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য এই পুরাণ-ঐতিহ্য প্রাচ্য (মূলত ভারতীয়), পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণের লব্ধফল। ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্যের প্রয়োগ ব্যতীত গ্রেকো-রোমক, ইজিপ্সীয়, কেল্টীয়, স্ক্যান্ডিনেভীয়, মেক্সিকান, চিনা, জাপানি প্রভৃতি পুরাণ-প্রয়োগও অংশত বা সমগ্রত আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার পারস্পরিক সংমিশ্রণও লক্ষ করা যায়। বক্তব্য, চিত্রকল্প এবং অভিজ্ঞতার পরিবর্তন দুজন বিশিষ্ট কবির ভাবনায় ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘মহাশ্বেতা’ কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতা দুটির নাম এক, বিষয়বস্তুও ‘দেবীপুরাণের’ অন্তর্গত। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যেখানে মহাশ্বেতাকে কেন্দ্র করে দিব্যজ্যোতির্বলয় রচয়িতা, বিষ্ণু দে সেখানে মহাশ্বেতাকে মৃন্ময়মূর্তিতে ব্যবহার করেছেন।

১. ‘বক্ষে কাঁপে/কী এক বচনাতীত, তীব্র সংবেদন;/সপ্তসিন্ধুপারে বিচঞ্চল নারিকেল বন/মৃদুলমর্মরে/সহসা সম্পূর্ণ করে/অসমাপ্ত পরিচয় তার/বারংবার নির্মিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখি,/সমস্ত ভুবন জুড়ে, আবার এল কি,/ক্ষণিকা পরমা?’

[মহাশ্বেতা/অর্কেস্ট্রা]

২. ‘নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া/স্তনচূড়া দিলো ক্ষীণ কটিতটে ছায়া/স্বপ্নসারথি, তোরণ

কি যায় দেখা?/অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে/ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে/আজ কি আমাকে ভুলেছো মহাশ্বেতা?' [মহাশ্বেতা/চোরাবালি]

জীবনানন্দের প্রতিভায় অতীত পুরাণকাহিনি মানুষের যৌবরাজ্যে পরিণত। আবার বুদ্ধদেব বসু পুরাণকে চরিত্রায়িত করতে ব্যস্ত। এবং তাঁর পক্ষপাতিত্ব ব্যক্তিগত করে তোলার আগ্রহে।

রবীন্দ্রকাব্যে, নাটকে পুরাণ-প্রয়োগ ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় পুরাণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিতে ও প্রকরণগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, নাটকে পুরাণ-ঐতিহ্য প্রয়োগের অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়ানো। যেমন—রাজা, রক্তকরবী, কচ ও দেবযানী, উর্বশী, কর্ণকুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। 'রক্তকরবী' রূপক সাংকেতিক নাটকে রামায়ণের কাহিনি ইঙ্গিতসঞ্চারী। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ সময়েই চিরায়ত পৌরাণিক অনুষঙ্গকে ব্যক্তি-আশ্রয়ী ভঙ্গিতে আপন প্রতিভার অন্তর্গত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কবিরা পুরাণকে ইচ্ছামতো প্রসারিত ও সংকুচিত করেছেন। পুরাণ শুধুমাত্র কাহিনি কথনের সূত্র না থেকে বিষয়বস্তুর খাত পরিবর্তনের সূত্র হয়ে দেখা দিল। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিরা তাঁদের স্বভাববৈশিষ্ট্যে-উত্তীর্ণ হলেন; অথবা পুরাণের যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটালেন। এ প্রসঙ্গেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ও বিষ্ণু দে-র 'যযাতি' কবিতার উল্লেখ করা চলে। সুধীন্দ্রনাথের 'যযাতি'-তে সুস্থিত, অনুত্তেজিত অভিযোগ এবং ন্যব পৌরাণিক কবিতার জয়কেতন; আর বিষ্ণু দে-র 'যযাতি'-তে দুর্মর, অপ্রতিরোধ্য আশাবাদ।

দুই

বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে-র মতো প্রবলভাবে মিথাশ্রয়ী না হলেও, তাঁর কবিতা, নাটক ও কাব্যনাটকে মিথের ব্যবহার সংলক্ষ। তাঁর কাব্যনাটক 'কালসন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'সংক্রান্তি' এবং 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্য নাটকে যে মন প্রাচ্য ভারতপুরাণের প্রয়োগ, তেমনি গ্রিক পুরাণের প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর 'কলকাতার ইলেকট্রা' কাব্যনাটকে।

বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা' থেকে শুরু করে 'মরচে পড়া পেরেকের গান' পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে পুরাণ-প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়ের পুরাণ-ঐতিহ্য-প্রয়োগেই কবি আপন প্রতিভাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেবের পুরাণ-চেতনা জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, তীব্র ও গভীরভাবে যাপিত জীবনের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত মূর্ত অভিজ্ঞানরূপে তাঁর কাব্যে যেন পুরাণ-প্রয়োগ ঘটেছে। পুরাণোক্ত নায়িকারা (চিত্রাঙ্গদা, পাঞ্চালী প্রভৃতি) অনেকে শরীরী হয়ে ধরা পড়ে তাঁর কাব্যে। দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদার চরিত্রচিত্রণে ও চরিত্রায়নে কবি পুরাণকে ব্যক্তিগত করে তোলার পক্ষপাতী। কিন্তু 'অসম্ভব দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি' বুনে চললেও তিনি পাঠকদের অবচেতনার গভীরে নামতে পারেন না; কিন্তু পাঠক তৃপ্ত হয়। সম্ভবত 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেবের পুরাণ প্রয়োগ কাব্যিক কৌশলে ব্যক্ত; এ কাব্যের কবিতাগুলি পুরাণ-প্রয়োগে দৈব প্রেরণা-সঞ্জাত অথবা জীবনের গভীর তাড়নায় তাড়িত। চৈতন্যের পুনঃপুন আক্রমণে কীভাবে তাড়নাকে বশীভূত করতে হয় তারই নিপুণ চিহ্ন ছড়ানো আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। বিশেষভাবে অর্জুন-দৌপদীর অনুষঙ্গবোধ (শিল্পীর উত্তর) পুরাণ মহিমাকে একালের জীবনজিজ্ঞাসায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'দেবযানীর স্মরণে কচ' (১, ২), 'না লেখা কবিতার প্রতি'

(১)', 'বহুমুখী প্রতিভা', 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'শাপভ্রষ্ট' প্রভৃতির কবিতায় বুদ্ধদেব পুরাণ প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত; অবশ্য 'দ্রৌপদীর শাড়ি'কে এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। 'কবিতা' নামক কবিতায় গ্রিসীয় পুরাণ প্রয়োগ, 'দেবতা-দুই'-তে ভারতীয় পুরাণ প্রয়োগ কবির প্রতিভার পরিচয় দান করে। বুদ্ধদেব রক্তমাংসের নারীকে ভালোবাসেন বলেই পুরাণোক্ত মৈত্রেয়ী, রমা তাঁর লেখনীতে শারীরী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। একালের কবি বুদ্ধদেবের কাছে সীতা, সাবিত্রীর সতীত্ব মূল্যহীন। ('কোনো বন্ধুর প্রতি': 'বন্দীর বন্দনা')। ইবসেনের 'নোরা'র ভূমিকায় বুদ্ধদেবের মৈত্রেয়ী অবতীর্ণা ('মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান': 'বন্দীর বন্দনা'), হোমরের প্রভাবও কবির প্রতিভায় ক্রিয়াশীল ('কবিতা', কঙ্কাবতী)। যৌবন ও জরা সম্পর্কিত চেতনা 'দময়ন্তী' থেকে ক্রমরূপান্তরের পথ বেয়ে 'শীতের প্রার্থনা ও বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থে আরও জটিল হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুরাণকাহিনির প্রয়োগে কবি ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে চেয়েছেন।

বুদ্ধদেবে বসুর সঙ্গে পুরাণ প্রয়োগে বিষ্ণু দে-র মানসগত পার্থক্য লক্ষগোচর। বিষ্ণু দে কাব্যে পুরাণ প্রয়োগ করেন জনগণের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য, আধুনিক কাল ও আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে, বিপরীতপক্ষে বুদ্ধদেব বসু পুরাণকাহিনি, চরিত্র বা পুরাণ অনুষঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জন্য, জনবিচ্ছিন্নতার কারণে।

বুদ্ধদেব বসু মূলত প্রেমের কবি। তাঁর প্রেমের বাসনা ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রেমের শাশ্বত মূল্যবোধ বিশ্বাস হারানোর কথাও আছে। তিনি গ্রিক পুরাণের অরফিউস কাহিনির পরিবেশনার মাধ্যমে আধুনিক প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের 'অমিতার প্রেম' কবিতায়—'মোর প্রাণে নেই সেই প্রেম—যার বলে/গুপ্ত মৃত্যুপুরী হতে এনেছিলো ফিরায়ে প্রিয়ারে/বিরহী প্রেমিক।' 'নতুন পাতা'র 'পুনরুজ্জীবন' কবিতায় বিরহবোধের আবেগ রূপায়িত হয় একটি প্রত্ন মিথ প্রতিমায় 'শূন্য থেকে উঠে আসতো অপরিমেয় স্তম্ভ'। এ যেন তিমিরভেদী স্তম্ভরূপে প্রলয়পয়োধিজল থেকে শিবের উত্থান। ওই কবিতাতেই বিষ্ণুর নাভিপদ্মের পুরাণ-প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে কবি তাঁর প্রেম থেকে যেন প্রেমিকাকে সৃষ্টি করেছেন—'এই অন্ধকার দ্বিখণ্ডিত হলো আমার চোখের সামনে/বেরিয়ে এলো জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম'। 'সমুদ্রস্নান' কবিতায় কবির প্রত্যাশা ব্যক্ত হয় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে নতুন কিছু সৃষ্টি হবে যেমন বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা বিকশিত হয়েছিল—'ফুটে উঠুক, কিছু ফুটে উঠুক/তোমার আর আমার সংস্পর্শে, তোমার আর আমার মাঝখানে/যেমন একদিন পৃথিবী ফুটে উঠেছিল পদ্মের মতো/বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে।' 'ভীরুতা' কবিতায় সমুদ্র-মন্থনের পুরাণকাহিনি কবি ব্যবহার করেন প্রেমের প্রমত্ত আবেগ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়।

বুদ্ধদেবের প্রেমচেতনা ভারত পুরাণকে অবলম্বন করেই প্রতিভাত হয় না, গ্রিকপুরাণের প্রেমের দেবী আফ্রোদিতিও তাঁর মানসিকতায় সক্রিয় থাকে।—'একদিন আমার রক্তের ঢেউ থেকে যে উঠে এসেছিলো শুভ্র আফ্রোদিতের মতো'। বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী'র নায়িকা দেশজ লোককাহিনি জাতা; লোককাহিনি মিথের পর্যায়ে না পড়লেও কবি তার স্তরগত পরিমণ্ডলের মাধ্যমে পুরাণের আবহাওয়া সৃষ্টিতে প্রয়াসী। রূপকথার নায়িকা কঙ্কাবতীকে অবলম্বন করে কবিচিত্তে লোকবৃত্তের তির্যক প্রতিভাস ঘটেছে। 'কঙ্কাবতী'র 'শেষের রাত্রি' কবিতায় সরাসরি

রূপকথার অনুষঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু রূপকথাই নয়, রূপকথার এবং অন্য প্রকরণের লোকবৃত্তেরও অনুষঙ্গ এ কবিতায় লক্ষ করেছেন কোনো একজন লোকতত্ত্ববিদ। বাংলা রূপকথার প্রিয় মোটিফ, লৌকিক সংস্কার, লোকসংস্কার-কেন্দ্রিক বাক্‌প্রতিমা চুল-সাপ অন্ধকার ইত্যাদিও এখানে সংলক্ষ। 'দময়ন্তী'র নাম কবিতা 'দময়ন্তী' এবং 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র নাম কবিতা 'দ্রৌপদীর শাড়ি' নামকরণেই শুধু যে পুরাণের আবহমণ্ডল সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাই নয়; ভাবরূপেও পুরাণকাহিনির প্রতীকী বিন্যাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। এই দময়ন্তী মিথ কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা' পর্যন্ত প্রসারিত এবং সেখানে 'দময়ন্তী ও নল' কবিতার চারটি উপ-পর্যায় আছে। পৌরাণিক নল-দময়ন্তী মিথ প্রয়োগের মাধ্যমে কবি জীবন ও জরা, যৌবন ও প্রেম সম্পর্কে নবতম জীবনভাষ্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবি নিজের ও নিজের কন্যার প্রেমকামনার সমসূত্রে দময়ন্তীর পার্থিব প্রেম কামনার মিথকল্প অনয়ন করেছেন। পুরাণকাহিনির দময়ন্তী যেমন হংসদূতের মুখে প্রিয়তম নাম শুনে নলকে বরণ করেছিল মহেন্দ্র, অগ্নি, যম দেবাদিদেব প্রত্যাখান করে তেমনি কবিরও বিশ্বাস কবিকন্যা অতিমর্ত্যপ্রেমের পরিবর্তে মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে বেছে নেবে। মহাভারতের নানা দময়ন্তীর কাহিনিকে মিথ-কাহিনি না বলে পুরাণের অন্তর্গত একটি প্রেমকাহিনি বলাই উচিত। বুদ্ধদেব তাঁর কবিতায় দময়ন্তীর প্রেমের রোম্যান্টিক ব্যবহার না করে মহাভারতীয় আখ্যানের মধ্যে আদিম তথ্য প্রবহমান মানবজীবনের সত্যরূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তিনি এখানে কাহিনির কোনো যুগধর্মী পরিবর্তন সাধন না করে যুগের মানুষের ভাবনাচিন্তার পরিপূরকরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। "বুদ্ধদেবের 'দময়ন্তী' কবিতাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নল ও দময়ন্তীর বিবাহিত জীবনের ভাগ্যবিপর্যয় ও পুনর্মিলনের কাহিনির কোনো সংকেত তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেননি, কিন্তু দময়ন্তীর অলৌকিকভাবে পতিনির্বাচনের কাহিনির মধ্যে নশ্বর মানুষের আদি তথ্য, আবহমান জীবনধারার একটি রহস্য আবিষ্কার করেছেন। সে রহস্যটি হল এই যে, মানবজীবনের অনিবার্য জরা, বার্ধক্য ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে যুগে যুগে মর্ত্যমানব মানবীর প্রেম দেবতার তথা নিয়তির ছলনা সত্ত্বেও জয়ী হয়। বুদ্ধদেব তাঁর যুগের পটভূমিকায় দময়ন্তীর বিবাহঘটিত মহাভারতীয় উপাখ্যানের ব্যক্তিধর্মী রূপান্তর সাধন করেননি, বরং ওই অলৌকিক বিবাহঘটনার সাংকেতিক রূপ তিনি আক্ষরিকভাবেই তাঁর কবিতায় গ্রহণ করেছেন। সেজন্য তাঁর এই ব্যবহারকে পুরাণের মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ বলা যায় না, কারণ 'যজ্ঞ' ও 'যজ্ঞবেদী'র উল্লেখে যেমন বুদ্ধদেবের অভিলষিত মানবজীবনের অনাদিকালের যৌন-প্রেমের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে—তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বা অবচেতনার অভিঘাতের সমান্তরালভাবে এই কবিতায় লিখিত পুরাণ-কাহিনির স্তর অতিক্রান্ত আদিকালের মানুষের মনোভূমিতে রচিত নশ্বর মানুষের স্বর্গজয়ী প্রেমকাহিনির প্রকাশ ঘটেছে। (বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার/পূর্বোক্ত।) 'দ্রৌপদীর শাড়ি'-তেও ভঙ্গি অত্যন্ত সাবলীল কিন্তু গ্রন্থি সম্ভবত জটিল। মহাভারতীয় ঘটনা অনুযায়ী যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি রেখে পাশাখেলায় পরাজিত হলে দুঃশাসন রাজসভার মধ্যে তাঁর শাড়ি খুলে ফেলে তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে। এবং তখন দ্রৌপদীর শাড়ি অন্তহীন হয়ে তাঁকে রক্ষা করে। এখানে দ্রৌপদী হলেন বিশ্বপ্রকৃতি আর দুঃশাসন হলেন আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণী শক্তির

প্রতীক। দর্পিত বুদ্ধি ও প্রযুক্তির বিশ্লেষণে প্রকৃতির রহস্যজালকে উন্মোচিত করার চেষ্টা হলেও তা দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই অন্তহীন। বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং ও প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমাদের চেতনায় বা ইন্দ্রিয়ে যে সব অভিজ্ঞতা ধরা দেয় অফুরন্ত পুনরাবর্তনেও তা নিত্য নতুন। 'ঘাস গাছ রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়'—এই অসংখ্য রঙে রঙিন দ্রৌপদীর শাড়িকে কোনো বিশ্লেষণী দুঃশাসন বূঢ়হাতে টেনে টেনে কখনো ফুরাতে পারবে না। যে-কোনো বিজ্ঞানের নাম নিয়ে সে যতই উদ্ধত হয়ে উঠুক বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য অব্যাহতই থাকবে। দর্পিত বুদ্ধির হাতুড়ি প্রচণ্ডবেগে বারবার ছুটে আসে, বার বার তাকে ঠেকিয়ে দেয় মানুষের সহজ অনুভূতি, ছোট চাঁদের মতো তার হৃৎপিণ্ড। 'অসম্ভব দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি'—এই রহস্যের উন্মোচন অসম্ভব। মহাভারতের দ্রৌপদীকে যে কিছুতেই বিবস্ত্র করা গেলো না তার অর্থ আমি এই রকমই বুঝেছি।"

বুদ্ধদেব পাশ্চাত্যের মিথব্যবহারকারী সাহিত্যিকদের মতো উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রেম ও সৌন্দর্যরূপিণী দ্রৌপদীকে তথা প্রকৃতিকে বিবস্ত্র করার যত চেষ্টাই করুক না কেন তা সফল হতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুঃশাসনধর্মী বিশ্লেষণ ও তার শক্তিতে পরাভূত করে প্রেম-সৌন্দর্য-স্বপ্ন-শিল্পব্যাকুলতা মানবমনে দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই অন্তহীন। 'স্বর্গবীজ' কবিতায় ভারত-পুরাণের দেবতাদের রেতঃস্খলনের বক্তব্যই প্রতীকায়িত। 'জ্যোতির অমর ঝড়' হল 'দেবতার বৈভবের স্মৃতি'। দেবতার রেতঃস্রোতের লক্ষ্য ছিল উষা, স্বর্গরূপসী উর্বশী; রেতঃ-স্রোতরূপী জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের পতন ঘটে কবিকল্পনায়। 'উদ্বাস্তু' কবিতায় পরাশর-সত্যবতীর মিলন কাহিনির রূপকে লেখকের নিজের আত্মবিশ্লেষণ। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী বহুমানুষের সমক্ষে সংগমে অস্বীকৃত হলে পরাশর মুনি যেন চারপাশে কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি করেন, তেমনি নিঃসঙ্গ লেখক নিজেকে কুয়াশার প্রচ্ছদে আবৃত রাখেন—নিঃসংগতাবাদী লেখকের অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই কী এ স্বীকারোক্তি। 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থে রাধামাধব উপাধ্যায়ে'র 'শেষ উক্ত' কবিতায় অভিমন্যুর রূপকে আধুনিক প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশিত। সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যু যেমন চক্রব্যূহে অসহায় বোধ করেন তেমনি রাধামাধবও—'অভিমন্যুর মতো আমি অসহায়/রঙ্গিনীদের অনতিক্রম্য ব্যূহে/কটাক্ষে তারা যত আলো জ্বেলেছিলো/একে একে সব নিবলো তাঁদেরই ফুঁয়ে।'

অন্যতম মহাভারতীয় চরিত্র অর্জুন 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থে পরিমাণগতভাবে বেশি ব্যবহৃত। অর্জুন মিথ বাংলা কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং রবীন্দ্রনাথ অর্জুনকেন্দ্রিক বেশ কিছু কবিতা যেমন লিখেছেন, তেমনি রবীন্দ্রোত্তর কালে বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে অর্জুন মিথকে কবিতায়, কাব্যনাটকে বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি' কবিতা এবং বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাট্য। 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থের 'অসম্ভবের গান' কতিায় বুদ্ধদেবের যে অর্জুন চিন্তার সূত্রপাত সেই অর্জুন শতাব্দীর টানাপোড়েনে আক্রান্ত, অক্ষমতায় ক্লান্ত। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার অর্জুন যেন মধ্যবিত্ত নায়কে প্রতিরূপক। তাঁর কাছে পৌরাণিক বীর অর্জুন সেইভাবে ফিরে এসেছে যেভাবে জেমস জয়েসের উপন্যাসে পৌরাণিক গ্রিক বীর অডিসিয়াস ফিরে আসে। জয়েসের নায়ক

যেমন বিপর্যস্ত বর্তমানে সতী স্ত্রীকে নিয়ে বেদনার্ত, অর্জুনও তেমনি প্রাক্তন প্রেমিকাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন একক সত্তা—তবুও স্মৃতির আবরণে অবিস্মরণীয় প্রেমের স্বাক্ষরে অর্জুন উপস্থাপিত—"উলুপী দেয় না সাড়া, সুভদ্রা উৎসুক নয় আর / কোথাও মেলে না খোঁজ, এমনকী, চিত্রাঙ্গাদার / লেলিহান যৌবনের / মাঝে মাজে, সময়ের দূর / প্রান্ত থেকে ঝাপসা ঘুমে যেন, হাজার-পাপড়ি-জ্বলা মণিপুর / দ্বারকার অশ্ববেগ, সপ্রতিভ গরিত প্রখর / হাওয়া, স্বতঃপ্রভ মাছের আগুনে স্নিগ্ধ গভীর বাসর / ভেসে উঠে ডুবে যায়, কিছুই না দিয়ে অকস্মাৎ।" অর্জুনের উল্লিখিত চিত্র আমরা পাই 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের 'বহুমুখী প্রতিভা' কবিতায়। এই কবিতায় মিথের অর্জুনের প্রতিরূপকে কবি যেন নিজেকেই উপস্থাপিত করেন। অর্জুনের অবচেতনায় দ্রৌপদীর সঙ্গো স্মৃতির স্নিগ্ধ বাসর, সুভদ্রার সঙ্গো রথে দ্বারকায় ধাবমান চিত্র তাঁকে উজ্জীবিত করলেও অর্জুন এখন নিরাশ্রয়, অনিকেত। বুদ্ধদেব বসুর শিল্পী সত্তা নানা কারণে বিচলিত: দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পার্থের লক্ষ্যভেদের মতো তিনি আবেগ ও প্রেরণার বশে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্যলাভ করলেও ঈপ্সিত সাফল্য লাভের জন্য যে প্রযত্নের প্রয়োজন তা নানা কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট। বিশ শতকীয় সংকট, অবক্ষয়, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধে ভাঙন প্রভৃতির জন্য যে আর্তবেদনা তা অর্জুনের বিশ্লেষণে 'শিল্পীর উত্তর' কবিতায় প্রকাশিত—"যুদ্ধে হয়েছি অজেয় / নির্বিবেক পক্ষপাত মেনে নিয়ে, / যার যূপে প্রথম কৌন্তেয় / বধ্য হলো একলব্য বিকলাঙ্গ; আর যদিও সত্তায় / ক্ষাত্রধর্ম বদ্ধমূল, অস্ত্র ফেলে অমল ব্যথায় / সময়সংকটে যবে অপ্রকৃতি উপচীয়মান / কিন্তু সেই প্রতারক, সমর্থ সজ্ঞান, / সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে / তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্তঋতে / গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ?"

'মরচে পড়া পেরেকের গান'—এর 'রোদনরূপসী' কবিতায় কবি মিথের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। —"কে তুমি, সুন্দরী, যার বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে ভেসে যায় / পদ্ম হয়ে নদীর সচ্ছল স্রোতে অবিরল / কোন প্লুত নীলিমায় লিপ্ত তুমি? কোন পুণ্যজল / তোমার লাবণ্য যার আপনার তরঙ্গে মেশায়? / রোদনরূপসী, তুমি কেন কাঁদো? অশ্রু কেন পদ্ম হয়ে ফোটে?"—দ্রৌপদীর বিবাহ প্রস্তাবের কালে পঞ্চ স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলে পিতা দ্রুপদ তা ধর্মসম্মত নয় বলে প্রত্যাখ্যান করার উপক্রম করলে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের জন্মবৃত্তান্ত শোনান। বর্তমান কবিতায় সেই প্রসঙ্গটুকু বর্ণিত:

যম একবার মহাযজ্ঞে রত হয়ে মানবনিধনে বিরত হলে প্রজাপতির অনুরোধে ইন্দ্র যজ্ঞস্থলে গমন করেন এবং ভাগীরথী নদীর জলে হিরণ্ময় পদ্ম ভেসে যেতে দেখে তার উৎসস্থলে যাত্রা করেন এবং গঙ্গার উৎসমুখে দেখেন যে, এক রোদনরূপসির অশ্রুবিন্দু গঙ্গাবক্ষে পদ্মরূপ ধরে ভেসে যাচ্ছে। তখন ইন্দ্র তাঁকে উল্লিখিত প্রশ্ন করেন। ইন্দ্র পরে অর্জুন রূপে এবং রূপসি দ্রৌপদীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। 'পদ্ম' এখানে কবিতার প্রতীক। 'স্বর্ণপদ্ম' যার অশ্রুনীর থেকে জন্মায়, সেই নারী নিখিলপুরুষের কামনার আধার এবং সে আরাধ্যা হলেও বাস্তবে তাকে লাভ করা অসম্ভব। কবিই তাকে জন্ম দেন। মহাভারতকার এই নারীর পরিচয় ও তার কান্নার কারণ ব্যাখ্যা করেননি। বুদ্ধদেব বসু 'অভাব-বিচ্ছেদবোধ স্বপ্ন-স্মৃতি-হৃদয়স্পন্দন'—কবিতার এইসব

উপকরণ আরোপ করেছেন রোদনরূপসির মধ্যে। এই অর্থেই কবিতায় পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটেছে। পরম রূপসীকে কামনা করলেও কবির বর্তমান জীবন শূলবিদ্ধ শূকরের মতো, কিন্তু অস্তিত্ব প্রয়াসী তিনি। পুরাণকাহিনির সঙ্গে কবির বর্তমান জীবনের যোগ এইখানেরই।" (কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ / মাহবুব সাদিক।)

বুদ্ধদেব মিথচেতনা মূলত ভারতপুরাণ-কেন্দ্রিক; প্রতীচ্য পুরাণ প্রয়োগ তাঁর কাব্যে খুব বেশি নেই। বিষ্ণু দে-র মতো প্রতীচ্য পুরাণ প্রয়োগে তিনি খুব বেশি আকৃষ্ট হননি। প্রতীচ্য পুরাণের মধ্যে, গ্রিকপুরাণের ইকারুস-কাহিনি অন্যান্য অনেক কবির মতো তাঁকেও আকৃষ্ট করে এবং তিনি 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কাব্যগ্রন্থের 'ইকারুস' কবিতাটি রচনা করেন। গ্রিক পুরাণ থেকে জানা যায় যে, ডিডেলাসপুত্র ইকারুস মোমনির্মিত পাখা নিয়ে অনন্ত আকাশের সন্ধানে যাত্রা করলে সূর্যতাপে তার পাখার মোম গলে যায় এবং সে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। ইকারুস কাহিনির প্রতিরূপকে কবির নবতম পুরাণ ব্যাখ্যা এইরকম যে, ইকারুসের নীলিমা নিমগ্নতায় কবির স্বপ্নময়তার প্রকাশ। কিন্তু জীবন যেখানে দৈনন্দিতার তুচ্ছতায় বিবর্ণ, আধুনিক কাল যখন অসহায়তায় মলিন ও ক্লিন্ন, মানুষ যখন অস্তিত্বের সংকটে আত্মদীর্ণ তখন ইকারুসের নীলিমা নিমগ্নতা তো সফল হতে পারে না। বুদ্ধদেবের হাতে তাই পুরাণের নবজন্ম।

তিন

"I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology of our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shalln't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write as a Greek would have alone."

রাজনারায়ণ বসুকে উপরিউক্ত পত্রে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' পুরাণের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছভাষায় প্রকাশ করেছেন। মধুসূদনের আলোচ্য বক্তব্যে তাঁর আধুনিক মানসতার প্রতিফলন ঘটেছে; কেন-না পুরাণকে অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে তিনি আপন সৃজনশীল চৈতন্যকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। বাল্মীকির কাহিনি তাঁর কাছে প্রসঙ্গমাত্র হবে; কিন্তু সেই প্রসঙ্গের পটভূমিতে কবি তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করবেন। ঈশ্বরাবতার রাম অপেক্ষা রাবণ তাঁর কাছে প্রিয় এবং রাবণের প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। বাল্মীকির বক্তব্যকে অনুসরণ না করে কবি মধুসূদন বাল্মীকি-সৃষ্ট পটভূমিতে আপন বক্তব্য উপস্থাপিত করবেন যা নবশিল্পবস্তুর আধার হবে। কবিতায়-নাটকে-কাব্যনাটকে বা গল্পে পুরাণ ব্যবহারের আধুনিক মর্মবাণী একেই বলা চলে। একালে পুরাণ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, ধর্মানুগত্য যা অতিলৌকিক কল্পনার মধ্যযুগীয় মুষ্টিবদ্ধতা থেকে পুরাণা-কাহিনিকে মুক্ত করে সেখানে তাকে আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় স্থাপন করা এবং সেখানে নতুন

বোধ, বিশ্বাস বা যন্ত্রণার অনুভূতিকে সঞ্চার করা। ফলে পুরাণ বা পুরাকাহিনির নবজন্মান্তর বা বুপান্তর ঘটে এবং পুরাণ শিল্পিত হয়ে ওঠে। বাল্মীকির পুরাণ এইভাবেই 'মেঘনাদবধকাব্যে' জন্মান্তরিত হয়েছিল। একেই পুরাণের নবায়িত হয়ে শিল্পিত হয়ে ওঠা বলা চলে। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'য় পুরাণ নতুন ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যে, যথার্থ বুপ দেহসর্বস্ব নয়; এটা আন্তরিক এবং অন্তরের উচ্ছ্বলতাতেই মানুষের যথার্থ পরিচয় নিহিত। মহাভারতের কাহিনীকে প্রাসঙ্গিক পটভূমিবুপে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষ সম্পর্কে এই ভাবনাটি প্রকাশ করতে চাইলেন যে, যুগল জীবনযাত্রায় রমণীর অন্তর্লোকের সৌন্দর্য বা চরিত্র শক্তি প্রধান সহায়।

কবি-সমালোচক-প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুও তাঁর নাট্যকর্মে মুখ্যত পুরাণ-সন্ধানী এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানা ভুবন থেকে পুরাকাহিনি আহরণ করেন। পুরাণ ব্যবহারের আধুনিক ঐতিহ্যে তিনি পশ্চিমি প্রয়োগকার অনুযায়ী হলেও তিনি বহমান ও জায়মান বাংলা ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরি। মধুসূদন যে পুরাণ-চর্চার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথের সৃজিত ভুবন অতিক্রম করে তা আরও আধুনিক হয়ে ওঠে অর্থাৎ নতুন মানবিক দিগন্তের সন্ধান করে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যে পুরাকাহিনি স্থাপিত হয় কখনও সনাতন জীবন পটভূমিতে, কখনও মানুষের সুবিস্তৃত জীবনে কখনও বা তা ধারণ করে সমাজের উত্থান-পতনের মর্মবাণী। যেমন, বুদ্ধদেব বসু রচিত 'কালসন্ধ্যা'; যেখানে তিনি বললেন, "কালসন্ধ্যার কাহিনী অংশ সেখান থেকে (মহাভারতের মৌষল পর্ব) আহৃত। বলা বাহুল্য দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনির ইঙ্গিত আরও বহুদূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।" তিনি পৌরাণিক বিষয়কে আধুনিক জীবনের পটভূমিতে স্থাপন করে তার মধ্যে সঞ্চারিত করেন আধুনক জীবনের দ্বন্দ্ব, বেদনা, যন্ত্রণা, ক্ষোভ, দ্রোহ, সমর্পণ ইত্যাদি। পুরাণকে তিনি কীভাবে ব্যবহার করেছেন তার ব্যাখ্যা আছে 'তপস্বী-তরঙ্গিনীর ভূমিকায়: "এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না।" বুদ্ধদেব বসু আদিম সমাজের উর্বরতামূলক মিথকে এই নাটকে যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গো ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত কাহিনিকে দুটি চরিত্রে মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্ম জটিল ক্ষেত্রে সমুত্তীর্ণ করিয়েছেন। 'প্রথম পার্থ' নাটকে আছে অদৃষ্ট নিপীড়িত, নিয়তিতাড়িত, এক মহাশক্তিধর চরিত্রের বৈরাগ্য ও অভিমান। 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় বিশ্লেষিত হয়েছে এক সাধারণ রমণীর অপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব রোম্যান্টিক চৈতন্য। বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনন্য সাধারণ কবিত্ব শক্তির স্বপ্রকাশে এবং অন্তর্দৃষ্টির স্পর্শে পুরাণকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী করে তুলেছেন। আর এইখানেই বুদ্ধদেব বসুর সৃজনীশক্তির অপূর্বতা।

দূরপ্রসারী পুরাণের গর্ভে নিহিত বক্তব্যকে 'কালসন্ধ্যা' নাটকের মৌল বিষয়বস্তুবুপে গ্রহণ করা হয়েছে। কবি-নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু প্রয়োজন অনুযায়ী ঘটনা পরম্পরায় কল্পনা ও উদ্ভাবনী ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। শৈল্পিক নিপুণতায় পুরাণ-পটভূমি ও কাহিনি সংহত-সংবদ্ধ।

অনন্তকালে যে বক্তব্যের বিকাশ সমালোচ্য কাব্যনাট্যে তা কোথাও পুরাণের স্পর্শে পৌরাণিক হয়ে যায়নি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্তিতে গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যহীন অবস্থায় অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে নিহত হবেন। যদুবংশের রমণীরাও কৌরব রমণীদের মতো লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা হবেন। কৃষ্ণ মৃদুহাস্যে বলেছিলেন, যা অবশ্যম্ভাবী গান্ধারীর শাপে তাই উক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে যে মহাভয়ংকর বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল তার বিশদ বর্ণনা আছে মহাভারতের মৌষলপর্বে। বলরামের দেহত্যাগের পর কৃষ্ণ জরা নামক ব্যাধের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। সন্ত্রস্ত বিপন্ন বিপর্যস্ত দ্বারকাবাসীদের রক্ষা করতে আসেন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন। কিন্তু সফলতা তাঁর অনায়ত্ত রইল। দ্বারকাবাসীদের নিয়ে স্থানান্তরে যাবার কালে পথে দস্যুহস্তে মেয়েরা নিগৃহীতা হলে অর্জুন আপন পরিচয় প্রদান করেন; কিন্তু দস্যুদল তা অগ্রাহ্য করে। অর্জুন গাণ্ডীব ধারণ করলেও জ্যা রোপণে অক্ষম হলেন। কোনো দিব্যাস্ত্র তাঁর স্মরণে এল না। শরচালনায় অক্ষম হলে তিনি ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে দস্যুদলকে আঘাত করতে লাগলেন; কিন্তু তবুও দস্যুদলকে রোধ করা সম্ভব হল না। হতোদ্যম, বিষণ্ণ, ক্লান্ত অর্জুন ব্যাসদেবকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি যা বলেছিলেন তা মহাভারতে আছে। পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত 'কালসন্ধ্যা' নাটকের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: "দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহুদূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান"। প্রবহমান জীবনে জাতক নয়, ব্যক্তি নয়; স্থায়ী গৌরব জীবনের, কেননা তা চিরপ্রবহমান। পক্ষপাতবিহীনভাবে এই জন্ম ও ধ্বংস ক্রিয়া চিরচলমান। কালই হলো বীজ, গর্ভ, ধাত্রী, শ্মশান। মহত্তম প্রতিভাকেও কালদণ্ডে দণ্ডনীয় হতে হবে; সকলেই সীমিত নিয়মের অধীন। অর্জুন যতই বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, দৈবকৃপাপুষ্ট হোন না কেন, তাঁর পরাক্রম, বাহুবল বিনষ্ট হতে বাধ্য। কৃষ্ণ তা জানতেন বলেই গান্ধারীকে বলেছিলেন, ধ্বংসকাণ্ড অবশ্যম্ভাবী। প্রস্থান যখন অবশ্যম্ভাবী তখন আর এক প্রবেশ সূচিত হয়। আর সেইজন্যই ব্যাস নিরাসক্তভাবে উচ্চারণ করেন: 'জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হলো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে—/হয়তো বা আরব্ধ এখনই/যাত্রা করো, বিদায়।'—সভ্যতার উত্থান-পতন, ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব-বিদায় সবই এক নিয়মবন্ধ, ক্ষমাহীন, নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক শৃঙ্খলার অন্তর্গত। মানুষের ইতিহাস এইভাবেই প্রবাহিত হয়। গান্ধারীর অভিশাপ অবশ্যম্ভাবী; তাঁর উক্তি ইতিহাসের অনিবার্য প্রবাহ থেকে অমোঘভাবে উঠে আসে। অভিশাপের ফলেই দ্বারকাপুরী ধ্বংস হবে—এমন কুসংস্কার মনস্ক নন বুদ্ধদেব বসু। আসলে গান্ধারীর সংলাপে উচ্চারিত হয় ইতিহাসের বহুশ্রুত অভিজ্ঞতা—যা অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য, অমোঘ; জীবনের পরিণামকে স্বীকার করে নিতে হয় প্রত্যেককে নতমস্তকে, আত্মসমর্পণ করতে হয় প্রবাহের অমোঘতার কাছে।

'অনাম্নী অঙ্গনা' ও মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত কাব্যনাট্য। কাশীরাজের দুই সুন্দরী কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেছিলেন কুরুরাজ বিচিত্রবীর্য। কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরে নিঃসন্তান অবস্থায় যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। বংশরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার জন্য ঋষি

ব্যাসদেবের সঙ্গে অম্বিকা ও অম্বালিকার মিলনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ, প্রদীপ্ত নয়ন, বিপুলকায় ব্যাসদেবকে দর্শন করে ভয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন বলে তাঁর পুত্র হয় অন্ধ। অম্বালিকা ভয়ে চোখ বন্ধ না করলেও তাঁর চোখ-মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করার জন্য তাঁর গর্ভজাত পুত্র পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হয়। ফলে অম্বিকা পুনরায় ঋতুমতী হলেন তাঁকে পুনরায় ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে বলা হয়। কিন্তু অম্বিকা পূর্বস্মৃতি স্মরণে পুনরায় ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে অসম্মত হন। তিনি ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁর এক রূপবতী দাসীকে প্রেরণ করেন। ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হবার পর সেই দাসী যে মানসিক অবস্থা লাভ করেছিল, তার বিশ্লেষণই আলোচ্য কাব্যনাট্যের বিষয়।

অম্বিকার এই একান্ত পরিচারিকা গ্রামবাসী এক তন্তুবায় যুবার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, সে যুবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান গাইছে। অম্বিকা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সে যদি ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হয় তবে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এবং সে স্বচ্ছন্দে তার প্রেমিক তন্তুবায় তরুণের কাছে চলে যাবে। মিলনের পর রাত্রি শেষে অম্বিকা তার একান্ত পরিচারিকাকে প্রশ্ন করে যে সে ভয় পেয়েছিল কিনা! কিন্তু অনাম্নী অঙ্গনা ভীত তো হয়ইনি; উপরন্তু সে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অপ্রত্যাশিত উত্তর দিয়েছিল: "ভয় নয়, অন্য এক অনুভূতি / বিশাল-কালো-প্রগাঢ় এক সত্তা / এতবড়ো পালঙ্ক ছাপিয়ে উপচে পড়ে / কক্ষ ছাড়িয়ে দূরে চলে যায় / বিস্তীর্ণ রাত্রির মধ্যেও ধরানো যায় না / কোনো পুরুষ, নাকি শুধু ব্যাপ্তি—কে জানে"। পুনরায় অম্বিকা তাকে প্রশ্ন করে, তার চোখ কি তাঁর মতো বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল অথবা অম্বালিকার মতো মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল। অঙ্গনা তার অভিব্যক্তিতে জানায়: "আমার স্মরণ যেন বিপর্যস্ত। বলতে পারবো না / কখন জেগে ছিলাম, কখন স্বপ্নে, কখন তন্দ্রায় / অন্ধকারে / একবার তার দৃষ্টি আমাকে বিঁধলো—ভীষণ উজ্জ্বল / অগ্নিকুণ্ডের মতো চক্ষু।" তার অনুভূতিতে ব্যাসদেব অরণ্যের মতো ছড়িয়ে পড়লেন। আর নীড়ের মধ্যে পাখির মতো তার মুখ হারিয়ে গেল। এমনকি ঋষির গায়ের দুর্গন্ধের কথা উল্লেখ করলে অঙ্গনা জানালো যে তার গন্ধে সে বিবশ হয়ে গিয়েছিল। তার কাছে তন্তুবায় যুবা আর কাঙ্ক্ষিত নয়; এমনকি নতুন কোনো বিত্তবান, স্বর্ণশিল্পীও তার কাঙ্ক্ষিত নয়। অঙ্গনার জীবনে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—তার পুত্র হবে নম্র, শান্ত, মৃদুভাষী, শাস্ত্রজ্ঞ; আসন্ন যুদ্ধেও থাকবে শান্তির সাধক। অঙ্গনা মুক্তি চায় না; সে দাসী হয়েই রাজভবনে থাকতে চায়। সে তার জীবনের সার্থকতা উপভোগ করতে চায়।

আলোচ্য কাব্যনাটকে পুরাণ-প্রসঙ্গে একটি নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। প্রথম পুরুষস্পর্শে তার মধ্যে জাগ্রত হল সমুজ্জ্বল নির্বারিত হল অনাস্বাদিতপূর্ব সৌন্দর্য ও অপরূপ সংসার—যার মধ্যে উদ্‌গত হল সন্তান ধারণের বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত এক সংসার চিত্র। সে তার নিজস্ব মুক্তির জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। সে তার প্রিয়কে 'দূরযাত্রী মহাবিহঙ্গ সুন্দর' রূপে অভিহিত করেছে। নিজেকে অভিহিত করেছে ক্ষুদ্র পাখি রূপে যে সেই মহাবিহঙ্গের পক্ষচালিত বায়ুস্পর্শে মৃত্তিকা ত্যাগ করে উত্তীর্ণ হল উষার আলোয়—নীলিমায়—নিঃশব্দে। এ যেন এক রোম্যান্টিক প্রেমের কবিতা যেখানে পৌরাণিক কাহিনি-কণিকা থেকে জাগ্রত হল নারীর অপরূপ হৃদয়াবেগ ও সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি।

'প্রথম পার্থ' কাব্যনাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রথম পার্থ অর্থাৎ কর্ণ। কর্ণ অর্জুন-জননী কুন্তীর কুমারী বয়সের সন্তান এবং সে পরিত্যক্ত; পরবর্তীকালে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী—এই অদম্য পুরুষকারের প্রতীক কর্ণের জীবনাংশ অবলম্বনে 'প্রথম পার্থ' রচিত। প্রথম দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নাটকের প্রভাব লক্ষগোচর; অবশ্য একে প্রভাব না বলে অনুষঙ্গ বলাই সংগত। কুন্তী গঙ্গাতীরে এসেছেন এই কথা বলতে যে কর্ণ হলেন কুন্তীর পুত্র, সেই প্রথম পার্থ; সুতরাং কুরুক্ষেত্রের ভ্রাতৃযুদ্ধ তার পক্ষে বর্জনীয়। কিন্তু কর্ণ পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান; কেন-না যুদ্ধ তাঁর কাঙ্ক্ষনীয়। কুন্তীর প্রস্থানের পর কর্ণের কাছে দ্রৌপদীর আগমন। তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে কর্ণ যেন যুদ্ধে যোগদান না করেন। যদিও দ্রৌপদীর কাঙ্ক্ষিত বিষয় হল কৌরবপক্ষের ধ্বংস তবুও দ্রৌপদী যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে শঙ্কিত। কিন্তু কর্ণ পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধে লিপ্ত হতে সংকল্পবদ্ধ, প্রতিজ্ঞায় অচল। দ্রৌপদীকে এই কথা জানাবার পর কৃষ্ণের আগমন—তারও ইচ্ছে যুদ্ধ না হোক্, চতুর্দিকে ক্রন্দন রোল উত্থিত না হোক্। কর্ণ নিরপেক্ষ থাকলে কৌরবরা দুর্বল হবে, পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে তাদের পরাক্রম বাড়বে। ফলে যুদ্ধ হবে না, হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কর্ণ কিন্তু যুদ্ধে যোগ দেবেন, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও।

মহাভারতের কর্ণ বীর হলেও খল চরিত্ররূপে অঙ্কিত। তাকে বলা হয়েছে কুমন্ত্রণাদাতা, দুষ্কর্মের হোতা, পাপমতি ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কর্ণ মহান, উদাত্ত, স্বার্থত্যাগী, দানবীর। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, 'কর্ণ চরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর'। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত, রবীন্দ্র সাহিত্যে কর্ণ নিয়তি অদৃষ্ট লাঞ্ছিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত মহান ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রসম্পন্ন অকুতোভয় কর্তব্যনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীর যোদ্ধা। তিনি অধ্যবসায়ী, দুর্জয় বীর ও পৌরুষসম্পন্ন হলেও তাঁকে নীচবংশজাত বলে উপেক্ষা ও ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নানা কাব্যে ও মহাকাব্যে। কর্ণের মর্মান্তিক বেদনা ও অভিমানকে বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য কাব্যনাট্যে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্রয় দান করেছেন। কর্ণের নানাগুণাবলি থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে. এমনকি দ্রৌপদী পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত কটুবাক্য উচ্চারণ করেছে তাও কর্ণকে মর্মন্তুদ বেদনায় বিদ্ধ করেছে। কর্ণের অনেক জ্বালার মধ্যে একটি জ্বালা হল দ্রৌপদীকে না পাওয়ার জ্বালা। কর্ণ দৈবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি মানবিক শক্তির প্রতীক। ফলে তাঁর প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক ও স্বতোৎসারিত। নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর মূল লক্ষ এ সমস্তর পটভূমিকায় কর্ণ চরিত্রের বিশ্লেষণ। আলোচ্য নাটকে পুরাণ কিন্তু আধুনিক জীবনের পটভূমিতে স্থাপিত নয়; ফলে আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব-বেদনার রূপায়ণ সমালোচ্য নাটকের মৌলিক উদ্দেশ্য নয়। স্নেহ, প্রেম, মমতা, ঈর্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির আলোকে কর্ণ চরিত্র বিশ্লেষিত। সমকালীন সমস্যার রূপায়ণ আলোচ্য নাটকে না থাকলেও কর্ণের বেদনার চিরকালীনতা একালকেও স্পর্শ করে যায়; আর এখানেই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যগত সার্থকতা।

'সংক্রান্তি' নাটকেও পুরাণ যথার্থভাবে অনুসৃত। আলোচ্য নাটকের পৌরাণিক পটভূমি মহাভারত। দুর্যোধনের মৃত্যুদৃশ্য মূলত নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয়, যদিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনিও এখানে অনুপস্থিত নয়। ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের বর্ণনা এখানে সঞ্জয়ের বর্ণনায় প্রদত্ত; আলোচ্য নাটকে স্নেহপ্রবণ ধৃতরাষ্ট্রের এবং সত্য ও ধর্মাশ্রয়ী গান্ধারীর দ্বন্দ্ব বেদনা ও মনোবিশ্লেষণ

উদ্‌ঘাটিত। বুদ্ধদেব বসু যে মনোবিশ্লেষণ করেছেন তা মূলত পৌরাণিক চরিত্র অনুসারী। গান্ধারী সত্যাশ্রয়ী ও ধর্মাশ্রয়ী হলেও কিন্তু দুর্যোধনের পতন সহ্য করতে পারেননি। আবার তিনি পুত্র শোকাতুর স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদানে অগ্রসর—এইখানেই গান্ধারী চরিত্রের মহোচ্চতা। "বুদ্ধদেব বসু ধর্ম ঔচিত্য বনাম স্নেহকে এই নাটকের উপজীব্য করেছেন এবং দৃশ্যারম্ভ থেকেই স্নেহে সমর্পিত ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষোভ, ক্রোধ, আর্তনাদ *** গান্ধারীর মনোবেদনাকে তীব্রভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ন্যায়ের সঙ্গে হৃদয়ের আবহমান দ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু। বুদ্ধদেবের পক্ষপাত সম্ভবত হৃদয়ের প্রতি, সেজন্য, ধৃতরাষ্ট্র জাগ্রত করেন করুণা, স্নেহে সমর্পিত গান্ধারীকে মনে হয় মহীয়সী। পুরাণের পটভূমিতে এই বক্তব্যের মাত্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা এই ন্যায়—হৃদয়দ্বন্দ্বে বিক্ষত, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, তারা আবহমান নারীপুরুষের প্রতীক।" [বুদ্ধদেব বসুর নাটক: পুরাণ প্রসঙ্গ / করুণাময় গোস্বামী। উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা।]

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাট্যটিও পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রকে অবলম্বন করে লিখিত; কিন্তু তবুও আধুনিকতায় পূর্ণ। ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি পাওয়া যায় রামায়ণে, মহাভারতে ও দুটি জাতক গ্রন্থে; যদিও কাহিনিগত পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। বিভাণ্ডক মুনি ও শাপগ্রস্তা হরিণীরূপা আদিত্যকন্যা স্বর্ণমুখীর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ যৌবনাবধি পিতা ব্যতীত কাউকে প্রত্যক্ষ করেনি। তপস্যা ও বেদ অধ্যয়নে তার দিন অতিবাহিত হয়েছে। অঙ্গরাজ লোমপাদের আচরণে ব্রাহ্মণরা ক্ষুব্ধ হলে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। অনুতপ্ত লোমপাদ ব্রাহ্মণদের কাছে মার্জনা চাইলে তারা বলেন; ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য বিসর্জন দেওয়াতে পারলে অঙ্গরাজ্য সুজলা সুফলা হবে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ বদ্ধপরিকর ব্রহ্মচারী; রাজা পরমাসুন্দরী বারাঙ্গনাদের তার কাছে প্রেরণ করলে ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে অঙ্গরাজ্যে আগমন করলে অঙ্গরাজ্য সুজলা-সুফলা হল। তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথ-কন্যা শান্তাকে বিবাহ করে এবং শান্তা পুত্রবতী হলে পিতার নির্দেশে আশ্রমে চলে যায়। আলোচ্য পৌরাণিক কাহিনিকে অনাহত রেখে বুদ্ধদেব বসু সামান্য পরিবর্তন করেছেন। এই নাটকে বুদ্ধদেব বসুর ভাবনা হলো—'লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল।'

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটক আধুনিক মানসতায় সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পর যথার্থ শিল্পিত নাট্যকার রূপে তিনি নরনারীর হৃদয়রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার পরিণতি অতিক্রম করে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাট্যে আরও প্রাগ্রসরমান। তিনি নিজস্ব চিন্তা ও মৌলিক কল্পনায় নাটকের কাহিনি বিন্যাস করেছেন। আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব বেদনা, রোম্যান্টিক আবেগ ইত্যাদি রূপায়ণে সিদ্ধহস্ত বুদ্ধদেব নাটকে যা রূপায়িত করলেন, তা একান্তভাবেই আধুনিক যুগের সামগ্রী। কামের প্রভাব নায়ক-নায়িকার জীবনে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, পরিণামে প্রেম ও তারপর পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের যে রূপ প্রকাশ করলেন, তা একান্তভাবে নাট্যকার ভাবিত এবং বিশ শতকীয় ব্যক্তি মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও মুক্তিকামনার স্মারক। বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ নাটকে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের আর্তি রূপায়িত হওয়ার জন্য পৌরাণিক উপাদানেও পটভূমিতে তাঁর নাটকগুলি রচিত হলেও সেগুলি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক নাটক।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য চিন্তা

চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, চরিত সাহিত্য থেকে শুরু করে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রণয়োপাখ্যান সাহিত্য পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বাঙালির সাহিত্য কীর্তি প্রতিফলিত হলেও; সেখানে সাহিত্য-চিন্তার বা সাহিত্যতত্ত্বের ইঙ্গিত মাত্র নেই। মূলত বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ভারতীয় অলংকারতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের মিলিত আদর্শের মানদণ্ডে কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হন এবং উৎকৃষ্ট কাব্য, কাব্যের উদ্দেশ্য, কাব্যে ভাষা-উপমা-চিত্রকল্পের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা সম্পর্কিত ও সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক রচনা থেকেই বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যচিন্তার শুরু। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সমালোচনার বিষয়টিও আমাদের স্মরণে রাখতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনার মূল তত্ত্ব সৌন্দর্য ও মনুষ্যত্ব। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলি সাহিত্যচিন্তার পরিধি প্রসারিত করে। তাঁর সাহিত্যচিন্তার মূলে সক্রিয় ছিল 'সুন্দর কল্যাণ ও আনন্দতত্ত্ব' যা সংস্কৃত 'সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্'-এর তত্ত্ব রূপে অভিহিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে কল্যাণবাদী সমাজবাদী সাহিত্যচিন্তার পৃথক ধারার সূচনা করেন। সৌন্দর্যবাদী সাহিত্যচিন্তাধারা গড়ে তোলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রমথ চৌধুরি প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ।

বাংলা সাহিত্যে তিরিশের দশকে যে কাব্যান্দোলন গড়ে ওঠে তার সার্থক পথিকৃৎ রূপে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যচিন্তা গড়ে ওঠে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে। তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় যে আধুনিক ধারার উদ্ভব ও বিকাশ সেখানে বুদ্ধদেব বসুর সক্রিয় ভূমিকা স্মরণীয়। তাঁর সাহিত্য চিন্তায় মানবিক সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে দৈবশক্তির কথাও আছে। বুদ্ধদেব বসু কবিতা রচনার অন্তরালে প্রেরণার আনুকূল্যে ও স্বীয় শিল্পচেতনার অন্তরালে শক্তির ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন: "রচনাকর্মের মধ্যে একটা অনিবার্যতা আছে। সত্যি বলতে, কবিতা আমরা লিখি না, কোনো-কোনো কবিতা আমাদের দিয়ে নিজেদের লিখিয়ে নেয়। তার রূপ, ছন্দ, গড়ন সমস্ত নিয়েই সে আসে, যাকে বলে ডিক্টেট করে, আমরা সেই হুকুম তামিল করি মাত্র" [নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি। অশ্রুকুমার সিকদারের 'আধুনিক কবিতার দিগবলয়' থেকে পুনরুদ্ধৃত।] বুদ্ধদেব যে অন্তঃপ্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর 'ছন্দ', 'সমুদ্রের প্রতি-জাহাজ থেকে', 'আবির্ভাব', 'শিল্পীর উত্তর' ইত্যাদি কবিতায়। তাঁর সাহিত্যচিন্তার আর একটি সূত্র হল রূপান্তর তত্ত্ব। তাঁর অনেক কবিতায় রূপান্তরের কথা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'রূপান্তর' কবিতাটি যেমন স্মরণ্য, তেমনি স্মরণীয় বুদ্ধদেব বসু কৃত পাঁচ ও উনিশ সংখ্যক তর্জমাকৃত সনেট দুটি, যেখানে তিনি বলেছেন:

১. 'সেই হয় রূপান্তরিত / এতে কিংবা ওতে।'

২. 'মেঘের মূর্তির মতো জঙ্গম জগৎ / রূপান্তর থেকে রূপান্তরে।'

কাব্যের জন্ম হয় মেধা মনন ও চৈতন্যের রূপান্তর প্রক্রিয়ায়। বুদ্ধদেব বসুর শিল্পচেতনাও এই প্রক্রিয়ার পরিপোষক। কবিতার সৃজন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর মত: "প্রথম যেদিন বীজ উড়ে এসে পড়লো, আর তৈরি লেখাটা বেরিয়ে এলো যেদিন: এই দুই বিন্দুর মধ্যে নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন, কবির জীবনে অনেক সমন্বয় ও বিন্যাস, আহরণ ও বর্জন ও সংশ্লেষ—সেগুলিও কবিতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।" তিনি মনে করেন, মহৎ সৃষ্টিক্ষমতা তথা প্রতিভা দৈবক্রমে প্রাপনীয়; অবশ্য সহজতার কথাও সেখানে আছে। যে মানুষ সৃষ্টিশীল হবে সে নিজেকে বিরাম-বিহীনভাবে সৃষ্টি করে চলে। তাঁর মতে, মানুষের কাছে সবই রূপ, রূপক বা প্রতীক হয়ে ওঠে। কবিদের পক্ষে নিঃসঙ্গতার আব্রু প্রয়োজন; তা সজনে বা নির্জনে হতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের মতো কবিতার জন্মরহস্যেও মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসুর মতে: "কবিতা একটি চিন্ময় পদার্থ, তা সৃষ্টি করতে হলে অন্তত কিছুক্ষণের মতো জৈব পদার্থকে অস্বীকার করতে হয় ও ঘোষণা করতে হয় চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক ও বলীয়ান স্বাধীনতা।" তাঁর সাহিত্যচিন্তায় এ তত্ত্ব প্রতিফলিত হয় যে, কবিতা কবির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ বলে কবিতায় কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে। কবিতা একদিকে 'যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরোধী'। কবির পক্ষে 'সম্ভাবনার সীমা অজ্ঞেয়' বলে কবির কাছে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও অনেক সময় অজানা থেকে যায়। তিনি মনে করেন কবিতার একটি অংশ পাঠকের অজানা থাকে বলে তার আনন্দ কখনও নিঃশোষিত হয় না। "আদি কল্পনা ও তৈরি লেখাটার মধ্যে, কোনো অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কারণে, কখনো-কখনো মস্ত ব্যবধান ছড়িয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন, অনেক নতুন বিন্যাস ঘটে কবির জীবনে, অনেক আহরণ ও বর্জন ও সমন্বয়—কিন্তু সেগুলির সঙ্গে অলিখিত ও অপেক্ষমান কবিতাটির সম্পর্ক কী, কেমন করে সেটিকে তা পুষ্টি দেয় ও জন্মের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, সেই প্রক্রিয়াটি ঘটে সচেতন ও অচেতন মনের সীমান্তরেখায়—কবি তার কিছুটামাত্র টের পান, বাকি অংশ অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন থাকে।" [কবিতা ও আমার জীবন / কবিতার শত্রু ও মিত্র।] বুদ্ধদেব বসুর মতে সভ্যতার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় শিল্পকলা 'অকলুষেয়'। "মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে শিল্পকলাই একমাত্র, যার কোনো সামাজিক-সাংসারিক প্রয়োগ নেই, যা আমাদের দীক্ষা দেয় না কোনো বিশ্বাসে বা মতবাদে, শেখায় না আরও বেশি উপায়নৈপুণ্য বা কার্যকারিতা; একটি কবিতা বা ছবি বা সুরবিন্যাসের সম্পূর্ণ মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, সে বা সে তাই শুধু, তার নিজস্ব ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় তার নেই। আর তাই সভ্যতার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় আমরা কোনো দম্ভোক্তি না করেও শিল্পকলাকে অকলুষেয় বলতে পারি—অন্তত সবচেয়ে কম সংক্রমণপ্রবণ।" [একটি খোলা চিঠি। কবিতার শত্রু ও মিত্র।] বুদ্ধদেব বসু শিল্পকলায় শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন। 'শিল্পকলা কোনো বিশেষ অর্থে প্রয়োজনীয়' এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্বোক্ত অংশে তিনি বলেছেন: "শৃঙ্খলা—তা সংসার জীবনে কোথাও যদি নাও থাকে, তবু আছে ছন্দোবদ্ধ কোনো চরণে, কোনো সুগঠিত গদ্য বাক্যে, সুর অথবা রেখার কোনো বিন্যাসে—আছে, এবং থাকতেই হবে—স্বরের সঙ্গে স্বরের ও ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সংগতি, এক অংশের সঙ্গে অন্যসব

অংশের ভারসাম্য ও মৈত্রী, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির সহযোগিতা, ধারণা ও রূপকরণের পূর্ণ সমন্বয়, বাগর্থের অর্ধনারীশ্বর মিলন। সেই একমাত্র স্থান, যেখানে বেসুরোকেও মিলিয়ে দেয়া যায় সুরের মধ্যে, পৃথিবীর সব ছেঁড়া তার থেকে বেরিয়ে আসে মনোলীন এক সিম্ফনি।"

দুই

কবিতার ভাষা সম্পর্কেও বুদ্ধদেব বসুর যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা ছিল: "তখন আমি কবিতার ভাষা নিয়ে ভাবছি—সেই প্রথম আমার মনে হয়েছে সেটা চিন্তার কোনো বিষয় হতে পারে, কেননা চারিদিকে তখন রব উঠেছে কবিতার ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে।" [কবিতা ও আমার জীবন / কবিতার শত্রু ও মিত্র] কবিতাকে তিনি অনন্তকালের ও চলতি মুহূর্তের কবিতারূপে অভিহিত করেছেন। 'কঙ্কাবতী' বই প্রকাশের আয়োজন যখন চলছে তখন পুরানা পল্টনের প্রান্তর, বাতাস, চন্দ্রোদয়, তারার আলো থেকে, ভৌগোলিক অর্থে নয় মনের দিক থেকেও দূরে চলে এলেও সেই পাঁচ বছর আগেকার সুরে সুর মেলাতে কবির কোনো অসুবিধা হয়নি। কবি বুদ্ধদেব এ প্রসঙ্গে বললেন: "এতদিন আমার কবিতা ছিলো চলতি মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে আসা—আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন যা গ্রহণ-করছি, অথবা যে সব আবেগ আমাকে নাড়া দিচ্ছে, আমি সেগুলোকেই আমার উপাদান বলে জেনেছিলাম।" [পূর্বোক্ত] চলতি মুহূর্তের কবিতা আর মনের মধ্যে জমে-থাকা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কবিতা কীভাবে তিনি লিখেছিলেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "চলতি মুহূর্তের কবিতা বলতে কী বুঝি, তার একটা উদাহরণ দিই। 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি সত্যি চিল্কার ধারে বসেই লিখেছিলাম, সত্যি এক সকালবেলায়—আমার জীবনের নিবিড় এক আনন্দের মুহূর্তে। যেন মুহূর্তটিকে হাতে হাতে গ্রেপ্তার করে ফেলেছিলাম, তার সবুজ গন্ধ আর সজলতা সুদ্ধু—তাকে শুকিয়ে যাবার সময় না দিয়ে, নিজেকে অন্য কোনো দিকে ফিরে তাকাবার সময় না দিয়ে। এর উল্টো উপায়ে লেখা হয়েছিলো কয়েক বছর পরে 'ব্যাং' আর 'ইলিশ'। ব্যাং দেখেছিলাম অনেক দিন আগে পুরানা পল্টনে—মাঠে জমে থাকা জলের মধ্যে এক মস্ত দল, উল্লসিত ও নির্ঘোষিত এক অসাধারণ কোরাস; তখন বৃষ্টির পরে জ্বলে উঠেছে রোদ্দুর, আমি বোধহয় কলেজ থেকে ফিরছি। ইলিশ চোখে পড়েছিলো গোয়ালন্দের প্ল্যাটফর্মে— আমি রাত্তির দশটায় স্টিমার থেকে নেমে সবেগে ট্রেনের দিকে ছুটছি—আধো অন্ধকারে স্তূপীকৃত ইলিশ চালান যাবার জন্য পড়ে আছে, কিন্তু সেদিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই আমার। ...'চিল্কায় সকাল'—এ যা কিছু আছে সবই সেই মুহূর্তে দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েছিলো; আর পরের দুটো কবিতার মধ্যে এমন অনেক বিষয় প্রবেশ করেছে যা পুরানা পল্টনে বা গোয়ালন্দে আমি ভাবিনি।" কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ।" তিনি মনে করেন; মানুষের মতো কবিতার বৃদ্ধি ও অবক্ষয় থাকলেও কবিতার মৃত্যু নেই। সে যুগে যুগে নবজন্ম লাভ করে এবং 'কবিতার নবজন্ম তখনই সম্ভব হয় যখন কবিরা ভাষাকে দেয় নতুন প্রাণ ও ধ্বনিস্পন্দন'।

তিন

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য ভাবনার অন্যতম দিক হল শিল্পীর স্বাধীনতা। ১৯৫২ সালে রচিত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' ['সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত] শীর্ষক প্রবন্ধে শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তব্যকে সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে:

১. 'শিল্পকলা, শুধু তত্ত্ব নয় আমার কাছে জীবনের অংশ।'

২. 'শিল্পী তাঁর স্বজাতির কিংবা বিশ্বমানবের মুখপাত্র।'

৩. 'শিল্পীর চাই অনাসক্ত দৃষ্টি।'

৪. 'শিল্পীরও মানবিক দুর্বলতা আছে।'

৫. 'শিল্পীর প্রথম কর্তব্য তাই নিজেকে আবিষ্কার করা।'

৬. 'কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ করে সেই মতেই নৈষ্ঠিকতা বাঁচিয়ে চলা—এটা তাঁর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্য সমস্ত চিন্তার ধারা বর্জন করে তিনি যদি একান্তভাবেই একটিমাত্র মতবাদেই দীক্ষা নেন—সে মতবাদের মূল্য যাই হোক না—তাহলে তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হবার, ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হবার আশঙ্কা থাকে।'

৭. 'জীবনের মূল্যবোধ যখন বিপর্যস্ত, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখা, জাগিয়ে তোলাই তো শিল্পীর কর্তব্য।'

৮. 'শিল্পী যদি একান্তভাবে গোষ্ঠীগত হয়ে পড়েন, যদি তাঁর নিজেরই দৃষ্টি খণ্ডিত হয়, তাহলে জীবনের অবিকল চেতনা কেমন করে আশা করবো তাঁর কাছে? যাকে শিল্পী বলি, তাঁর বুদ্ধি পূর্ণ জাগ্রত, সংবেদনশীলতা চরম; জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অবিরলভাবে বেড়ে ওঠেন তিনি, কোনো একটা জায়গায় এসে আটকে যান না। তাঁর জিজ্ঞাসা সর্বত্র, তাঁর এষণা স্বাধীনভাবে ধাবিত হয় সকল ক্ষেত্রে, আপন প্রকৃতির দাবি অনুসারে চারদিক থেকে তিনি শোষণ করে নেন যেটুকু তাঁর বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। শিল্পীর মন বহুরূপী, তার গতিবিধি অনির্ণেয়, তাঁর ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না।'

কবি পাঠকের সব আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে না পারলেও কবির কামনা আত্মোপলব্ধি এবং চিন্তা-ভাষা-ছন্দ-শব্দ-চিত্রকল্প ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁকে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়। শিল্পী স্বজাতির ও বিশ্বমানবের বলে তাঁর বিশেষ ও নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। শিল্পী যোদ্ধা বলে তাঁর শৌর্য অদৃশ্য, তা শুধু 'অনুভূতির গোচর, ভাবনার অধিগম্য'। তিনি সম্প্রদায়ভুক্ত নন বলেই দলভুক্ত হলেই তাঁর বিকৃতি আসবে। তাঁর মতে, শিল্পীর 'জিজ্ঞাসা সর্বগ', 'এষণা স্বাধীন'। যদি সাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট মতবাদের সীমার মধ্যে গড়ে ওঠে তবে তা বর্ণময় না হয়ে, হয়ে ওঠে সীমাবদ্ধ। সাহিত্যচিন্তায় বুদ্ধদেব বসুর মৌলিক বক্তব্য হল শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার অর্থ শিল্পীসত্তার অবসান। "বুদ্ধদেব বসুর মতে সাহিত্য ঐতিহাসিকতা নীতিবিকারী এবং অনর্থক। অবশ্য শিল্পীর বিষয়বস্তু উপকরণ, রচনা রূপ-নীতি-কলাকৌশল 'কালাদিষ্ট' তাই বলে লেখকেরা ইতিহাসের এক-একটি উপসর্গ বা কালতরঙ্গের এক-একটি বিক্ষেপমাত্র নন। 'শিল্পী নামযোগ্য লেখক মাত্রেরই মন কিছু পরিমাণে দেশকালাতীত' হতেই হবে। যাঁর মন যত মুক্ত তিনিই শেষ

পর্যন্ত তত বড়ো লেখক। তাঁর মতে সমসাময়িকতাকে লেখক অতিক্রম করতে পারলে তা গুণ। মহাকবিদের সমসাময়িকতা দেশকাল ছাড়িয়ে যায়। চলতি ঘটনার উত্তেজনাকে পরিহার করে এর 'উপলব্ধির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, তথ্যকে, ঘটনাকে কোনো এক সমগ্রের অংশরূপে দেখতে হয়"। [বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব / অনুবাদ ও ভূমিকা: আফজালুল বাসার]

চার

তিরিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনাতেই অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যবলয় অতিক্রমণেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাওয়া সম্ভব। ফলত, তরুণ বয়সেই সমকালীন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি এক নতুন সাহিত্যাদর্শ, কাব্যাদর্শ অনুসন্ধানের চেষ্টায় রত হলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যাদর্শ ও কাব্যিক রীতি প্রকরণের ভুবন অতিক্রম করে এক নতুন কাব্যাদর্শ সৃষ্টিতে তিরিশোত্তর কবিরা যে সফল হলেন তার পটভূমিকায় বুদ্ধদেব বসুর অবদান অবিস্মরণীয়। সেই সময় রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'শনিবারের চিঠি' আধুনিক সাহিত্যের বিষয় ও প্রকরণের অতি তীব্র ও অসংযমী সমালোচনা করত: রবীন্দ্রনাথও আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের যৌবন বন্দনা ও যৌন চেতনার আতিশয্য প্রসঙ্গে নানা মতামত ব্যক্ত করেন। বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতির' 'মাসিকী'তে এই সমস্ত রচনার বিরুদ্ধে মতামত জানিয়ে যা লিখেছিলেন সেখানে তাঁর সাহিত্যচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়:

১. "কিন্তু বিশ্বের শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে বাঙলার চিত্তের যোগস্থাপন করতে না পারলে আমাদের জাতীয় জীবন যে কোনো মতেই ফুলে ফলন্ত হয়ে উঠতে পারবে না, একথা রবীন্দ্রনাথ এতবার এতভাবে বলেছেন যে আমাদের পক্ষে আরো কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। ...পশ্চিমের কালচার আমাদের গ্রহণ করতে হবে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সেটাকে প্রজ্ঞার দিক দিয়ে সংযুক্ত করে আপন করে নিতে হবে; নইলে আমরা কখনো জাতি হিসাবে বড় হতে পারবো না। সাহিত্য-সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। পাশ্চাত্য আর্ট ও সাহিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা না জন্মাতে পারলে আমাদের সাহিত্যের কখনও পূর্ণ বিকাশ হতে পারবে না।"

[প্রগতি—আষাঢ় ১৩৩৪, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড]

২. "যুগপ্রবর্তক কে জানি নে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর থেকে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগ যে যে সাহিত্য জগতে এসে গিয়েছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ করতে ইচ্ছে করে না। সাধারণ লোকের কাছে এঁরা অতি আধুনিক বলে পরিচিত। 'অতি-আধুনিক' কথাটির মধ্যে সুস্পষ্ট শ্লেষের ইঙ্গিত আছে। সম্ভবত এঁরা এঁদের উপযুক্ত কালের পূর্বে জন্মেছেন, সেই হিসেবে এঁদের অতি-আধুনিক নাম সার্থক। ...এঁদের রচনায় বিষয়বস্তু, জীবনের অভিজ্ঞতা, আশা ও বেদনা পূর্বতন সাহিত্যিকদের চাইতে একেবারে আলাদা—তাই তাঁদের হাতে পড়ে ভাষাও একটুখানি বেঁকে চুরে তেরছা চলতে শুরু করবে, তাতে দুঃখ করবার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। ভাষাটাকে একটু চেঁছে ছুলে তাঁরা নিজেদের কাজের উপযোগী করে তুলেছেন মাত্র"।

[তদেব]

তরুণ বয়সেই বুদ্ধদেব বসু উপলব্ধি করেছিলেন যে আধুনিক সাহিত্যের বিষয়গত ও রূপগত পরিবর্তন সাধন হয়েছে এবং তার পটভূমিকায় বিরাজিত যুগধর্ম, পাশ্চাত্য প্রভাব, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাত, মূল্যবোধজনিত পরিবর্তন ইত্যাদি। তাঁর বক্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে আধুনিক সাহিত্যের পটপরিবর্তনের পটভূমিকা এবং তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য:

১. "অতি-আধুনিক সাহিত্যকে Post-war সাহিত্য বললে ভুল হয় না। আধুনিক লেখকেরা সকলেই Post-war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। লড়াইয়ের ফলে ইয়োরোপের যে দুরবস্থা হয়েছে ও মানুষের চিন্তাজগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাবধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ...দারিদ্র্যের তাণ্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, আনন্দ, প্রাণ, আয়ু, ইহকাল, পরকাল সব। ক্ষুধা যেখানে রাজা, সেখানে কী-ই বা করতে পারে শুভ্রবেশী পুরোহিত, আর কী-ই বা সুর-সুরাপায়ী কবি! সেই নির্মম রাজার কর জোগানো হলে পরে তবে তো ভগবানকে স্মরণ করার, তবে তো কবির গান শোনার অবকাশ হবে! ...বাহ্যিক অবস্থার এত ওলট পালট হলে চিন্তাজগতেও কিছু না কিছু বিপ্লব আনতে বাধ্য। বর্তমান বাঙালীর চিন্তাধারার বর্ণনা করতে গেলে এককথায় বলা যেতে পারে যে, তাদের সম্পূর্ণ disillusioument এসে গেছে। আমরা মোটের উপর অনেক বেশী rational হয়েছি, খামকা একটা জিনিস খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলতে আর প্রস্তুত নই। অন্ধ ভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই, আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে, ...ভগবান, ভূত ও ভালোবাসা এ তিনটি জিনিষের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।"

[অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড]

২. "আধুনিকের সঙ্গে পূর্বতন সাহিত্যের যে মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার জন্য বর্তমান জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী এ হচ্ছে time spirit যা যুগধর্মের ফল। নইলে আধুনিকরা কেবল নূতন একটা কিছু করবেন বলেই এই সমস্ত unconventional জিনিষের অবতারণা করেননি। মর্মে মর্মে জীবনের প্রতি পলে তাঁরা যা অনুভব করেছেন, তাঁদের সাহিত্যেও তাই প্রকাশ পেয়েছে। ...পৃথিবীর সব লেখকের রচনাতেই তাঁর নিজের দেশের তৎসাময়িক অবস্থাগুলি ফুটে উঠেছে, কিন্তু লেখার সৌন্দর্যের মহিমায় কোনো কোনো রচনা তৎসত্ত্বেও চিরকাল বেঁচে থাকে। ...বর্তমান বাঙ্‌লা লেখকদের রচনায় যদি কোনো সর্বকালেরও সর্বদেশের emotion প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের বঙ্গদেশের atmosphere সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মনে তা সহানুভূতি উদ্বোধিত করতে সক্ষম হবে।" [তদেব]

আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে 'পরিচয়' পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর সাহিত্যচিন্তায় ক্রিয়াশীল ছিল। 'পরিচয়'-এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন: "ততদিনে ইংরেজি সাহিত্যে 'টোয়েন্টিজ'-এর দিন অস্তমান; অল্ডস হক্সলি ও লিটন স্ট্রেচির

ব্যঙ্গ, লরেন্সের সংরাগ, ভার্জিনিয়া উলফের অতিসূক্ষ্ম ভাবনাজাল—এই সবের উপর দিয়ে পোড়ো জমির হিম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পশ্চিমি সাহিত্যের এই নূতন ধারাটিকে ‘পরিচয়’ আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল করে তুলল, সমসাময়িক বিশ্বমনের বাণী শোনালো—বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রে। অন্তত ত্রৈমাসিক অবস্থায় তার পাতায় বৈদেশিক চিন্তার আলোচনায় যে-রকম প্রাচুর্য আর দক্ষতা দেখা গিয়েছিলো, বাংলা ভাষায় তার কোনো তুলনা আমার জানা নেই।” [স্বদেশ ও সংস্কৃতি]

পাঁচ

বুদ্ধদেব বসু শুধু কবি বা সমালোচক বা প্রাবন্ধিক ইত্যাদি নন; তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি আধুনিক কবি ও কবিতার পক্ষে আধুনিকতার বিরুদ্ধ পক্ষের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতাকে অবহেলার বিরুদ্ধে তাঁর প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি স্বয়ং এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: “আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেলো, গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা ভাষার কবিতার বিবর্তনে লিপ্ত আছি। স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলো না; আমি অবিরাম যুদ্ধ করেছি আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে, আমার সমকালীন কবিদের গুণকীর্তনে আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম। আজ যখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছে, যখন আজকের দিনের তরুণের দল আমার প্রিয় কবিদের আমারই কাছে প্রিয়তর করে তুলছেন, তখন আমার নিজেকে মনে হচ্ছে অবসন্ন, আজ এতদিন পরে আমি বিশ্রাম প্রার্থনা করছি।” [সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ]

বুদ্ধদেব তাঁর দীর্ঘজীবনব্যাপী সাধনায় কবিতার ভাব-ভাবনা-প্রকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে নিরন্তর ভেবেছেন। আর সেইখানেই গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের ভুবন। জগতের অভিজ্ঞতা আর সেই অভিজ্ঞতার বয়নই তাঁর অন্তর্জগতের ধর্ম। দুটি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ও ঋদ্ধ বুদ্ধদেব তাঁর সমকালীনতাকে যেমন অঙ্গীকার করেছেন, তেমনি অতিক্রমও করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমকালীন জীবনের মর্মকথাই সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়; এবং মহৎপ্রতিভা সমসাময়িকতাকে চিরকালের দরবারে প্রবাহিত করে দিতে পারেন।

১. “শিল্পীর রচনা সাময়িক প্রসঙ্গকেই অবলম্বন করবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাময়িক যেখানে দেশকাল অতিক্রম করে চিরকালের পটভূমিকায় দীপ্যমান হয়ে ওঠে, সেখানেই আমরা শিল্পকলার মহত্তম পরিচয় পাই।” [রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য]

২. “সেই সাহিত্যই বড়ো সাহিত্য, যা সর্বযুগেই সাময়িক, যাতে প্রতি যুগই ঠিক যেন আপন মর্মকথাটি শুনতে পায়। তাতে বলার চাইতে না বলার অংশ থাকে বেশি, এবং সেই না বলাটুকু প্রতি যুগ তার নিজের অর্থ দিয়ে ভরিয়ে নেয়। এই গুণটাকেই বলা যেতে পারে চিরন্তনতা—সত্যিকার আধুনিকতাও হয়তো তা-ই।” [তদেব]

৩. “বেশিরভাগ লেখক আপন দেশকালের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাঁরা কুশলী শিল্পী হলেও তাঁদের রচনায় এই বিশ্বমানবিক সুরটি লাগে না; আর কোনো-কোনো আপন দেশকালের পরিবেশের শরীরে বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করেন, তাঁরাই বড়ো লেখক, তাঁরাই মহৎ শিল্পী।” [তদেব]

যখন মানবসমাজ, ইতিহাসে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, নৈরাশ্য, সন্ত্রাস ইত্যাদি মুখ্য ভূমিকা লাভ করে তখন শিল্পসাহিত্য যে অসহায় হয়ে পড়ে সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন, যে শিল্প সাহিত্য সামাজিক-সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় অথবা নীতিবোধের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় সে সাহিত্য সুচিরস্থায়ী হতে পারে না। সাহিত্যের সামাজিক-সাংসারিক উদ্দেশ্য না থাকলেও সাহিত্য 'আলস্যজীবীর বিলাসিতা' নয়, এ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন: "শিল্পকলার সম্ভোগ: তাও ভোগ্যবস্তুকে জীর্ণ অথবা নিঃশেষ করে ফ্যালে না; তাকে আমাদের মনের মধ্যে এক নতুন জীবন দান করে। সেটা নিশ্চেষ্ট কোনো সম্ভোগ নয়, একটি অভিজ্ঞতাও—নিছক সুখবোধ নয়, আবিষ্কার। ...তাহলে কেমন করে বলা যায় শিল্পকলা আলস্যজীবীর বিলাসিতা, বা উচ্চাঙ্গের কোনো আমোদ-প্রমোদ? 'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটাও অর্থহীন, কেননা মানুষ ছাড়া কেই বা আছে তার স্রষ্টা বা ভোক্তা—স্পষ্টত মানুষের জন্য শিল্পকলা। স্পষ্টত মানুষের পক্ষে তা প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন ধর্ম ও সমাজনীতি ও বিজ্ঞান তেমনি—কিন্তু ভিন্নভাবে ভিন্নকারণে। নীতিশিক্ষা নয়, জ্ঞানলাভ নয়, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, মানুষের আত্মার পক্ষে, দেহ প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে রচিত তার সামগ্রিক সত্তার পক্ষে—রহস্যময় অবিচ্ছেদী এক প্রয়োজন।" [একটি খোলা চিঠি / কবিতার শত্রু ও মিত্র]

ছয়

বুদ্ধদেব বসু কবিতার বিষয় ও প্রকরণ সম্বন্ধে যেমন ভেবেছেন তেমনি উপন্যাস সম্পর্কেও তাঁর ভাবনাচিন্তা তাঁর সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বেশি। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কিত চিন্তায় তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের ভাবনাও লক্ষগোচর।

তিরিশোত্তর কালপর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় অপেক্ষা ব্যক্তিক প্রকাশ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে সাহিত্যে ব্যক্তিচেতনার প্রাধান্য লক্ষগোচর। ব্যক্তিজীবনের সমান্তরালভাবে সামাজিক জীবন হয়তো উপেক্ষিত হয়নি; কিন্তু কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে, ব্যক্তিমহিমাই প্রচারিত হয়েছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্যক্তিত্ববিলাসী ছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় অনেকখানি প্রকাশিত। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টির জীবন উপস্থাপিত হয়েছে এমন বলা চলে। এই ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে নাগরিক জীবন সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে বৃহত্তর সমাজ তাঁর উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়েছে, এমন ভাবনাও অযৌক্তিক নয়। বলা যেতে পারে, তাঁর দৃষ্টি কলকাতা অথবা ঢাকাকেন্দ্রিক। কেউ কেউ একে হয়তো একেদেশদর্শিতা বলবেন। কিন্তু এই বিশিষ্টতাই তাঁর পক্ষে গৌরবের হয়েছে। কেন-না, নগরজীবনই তাঁর প্রধান উপজীব্য। তাঁর জীবনে হয়তো শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের জীবনাভিজ্ঞতার অভাব ছিল এবং ফলত তিনি সত্যমূল্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন; নকল শৌখিন মজদুর হতে চাননি। '*কল্লোল*'-এর অন্যান্য লেখকের মতো তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ প্রসারিত না হলেও তিনি তাঁর আপন শ্রেণিকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। এ সমস্ত তাঁর আংশিকতা বা সীমাবদ্ধতা হলেও এখানেই তাঁর গৌরব, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

বুদ্ধদেবের উপন্যাস তাঁর কবিসত্তারই প্রকাশ। তিনি তাঁর স্বীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফ

করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহে, বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় পুরুষ বা নায়ক চরিত্রে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রায়শই কবি, লেখক বা অধ্যাপক। তাঁর উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও কেন্দ্রীয়চরিত্র বা নায়কচরিত্র প্রায়ই বৃত্তবন্ধ। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরির মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

"বুদ্ধদেবের নানা উপন্যাস গল্পে ছড়ানো এই যে অসংখ্য নায়কচরিত্র—এদের মধ্যে বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। বস্তুত তাঁর সব নায়কচরিত্রই একটিমাত্র মুখের ছাঁচে গড়ে তোলা। সে মুখ স্বয়ং লেখকের। তাঁর রচনায় বিভিন্ন নায়ক যত কথা বলেছে, তাঁদের প্রায় সকলের কথার মধ্য দিয়ে একজনের কণ্ঠস্বরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে কণ্ঠস্বর, বলা বাহুল্য, লেখক বুদ্ধদেব বসুর।" [বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ]

এই জাতীয় প্রবণতাকে কি স্রষ্টার আত্মলীন অধিকার বিস্তারের চেষ্টা বলা হবে? না, নিজেকে অতিক্রম করে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের স্বাভাবিক প্রকাশের প্রবণতাহীনতা বলা হবে? মনে হয়, একে বলা যেতে পারে আত্মমগ্ন বিষয়ের সংলগ্নতা—যাকে সমালোচক-শিল্পীর প্রতিকৃতি বলা যেতে পারে।

He resorted to an epistolary style and memoirs in order to gauge the inner moods which, to his mind, constitute the tissue of reality. With all his abhorrence of naturalism, he records details around him with a unique alertness. He plunges and lays out at full length, searches for a subjective totality in the light of D.H. Lawrence and Dostoevsky. Tolstoy and Thomas Mann, James Joyee and Rabindranath to acquire, the unflinching vision of a man who is essentially an artist.

[Buddhadeva Bose: Alokeranjan Dasgupta.]

এমন ভাবা সম্ভবত অসংগত নয় যে, তাঁর উপন্যাসে প্লটের প্রাধান্যহীনতার কারণ তাঁর আত্মমগ্নতা। তাঁর কবিত্বশক্তি তাঁর প্লটের প্রাধান্যকে অস্বীকার করায়, তাঁর উপন্যাস উত্তীর্ণ হয় অনুভবের জগতে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের ভাষায় যে-কবিত্বপূর্ণ মননধর্মিতা আছে তা পাঠককে প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা থেকে কাব্যময়তার জগতে নিয়ে যায়। কবিত্বপূর্ণ মননধর্মিতার সঙ্গে মেশে সাংকেতিকতা ও সংগীতধর্মিতা। তিনি বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গকে প্রাধান্য দেন; ঘটনাপেক্ষা মানসিক প্রতিক্রিয়াই তাঁর কাছে অধিকতর মূল্যবান। অবশ্য এমন ভাবনা বুদ্ধদেবের ভাবনাতেই নিহিত ছিল, যার অভিপ্রকাশ আছে তাঁরই 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য' গ্রন্থে।

"বাঙালির জীবনে ঘটনার ক্ষেত্র অনধিক, বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, সেইজন্যেই আমাদের উপন্যাসের ঝোঁক প্রথম থেকেই হওয়া উচিত ছিল মনস্তত্ত্বের দিকে, কেন-না জীবনের পারিপার্শ্বিক যতই সংকীর্ণ হোক, মানুষের মনের রহস্যের কোনোদিন কোনোখানে সীমা নেই। সুমিত আকারে, সুন্দর গড়নে, আমাদের নিজস্ব উপাদান নিয়েই বাংলা উপন্যাস অগ্রসর হতে পারত, ব্যাপ্তিতে আমাদের যা অভাব, তার পরিপূরণ হতে পারত ঐকান্তিকতায়। কিন্তু স্কট, জর্জ এলিয়টের প্রয়োজনায় তা হতে পারেনি; নিজের মনের মধ্যে না তাকিয়ে আমরা চোখ রেখেছি বাইরের দিকে; আমাদের জীবনে উপকরণের ক্ষীণতা নিয়ে আক্ষেপ করেছি, উপন্যাসকে ঘটনাবৈচিত্র্যে জমকালো করে তুলতে গিয়ে অদ্ভুতকে আশ্চর্য বলে এবং অবিশ্বাস্যকে অভিনব

বলে ভুল করেছি। এর ফলে আমাদের সাহিত্যশক্তির অপব্যয় হয়েছে প্রচুর, আজও হচ্ছে না তা নয়।”

ঘটনাপ্রাধান্যকে অস্বীকার করে মনস্তত্ত্বের দিকে আগ্রহী বলে মনের জগতে প্রস্থান বুদ্ধদেবের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অভিজ্ঞতা যেমন নাগরিক জগতে সীমিত, তেমনি তাঁর প্রকাশও মনের কারখানা-ঘরে আবদ্ধ। বুদ্ধদেবের ঔপন্যাসিক সত্তা আসলে লেখক বুদ্ধদেব ও কবি বুদ্ধদেবের সমীকৃত ফল। আর এই সমীকৃত ফলেই বুদ্ধদেবের ঔপন্যাসিক সিদ্ধি এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর সমকালীন লেখকদের তুলনায় একদিকে যেমন স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি বিচ্ছিন্নও বটে। উপন্যাসের বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম কারণ তাঁর ভাষাভঙ্গি, চিন্তার প্রবহমানতা, আত্মলীন ভাববিভোরতা ও তার প্রকাশের যোগ্য সাযুজ্য সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের উক্তিটি স্মরণ্য:

“পাথুরে শক্ত জমির ওপর কাহিনির ইমারত গড়া কদাচ তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, যিনি ভগীরথ এক অন্তঃসলিলা স্রোতধারার, মনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণবিবর্তনই ছিল যাঁর লক্ষ্য, ...অনেক কিছু প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরং ভালোবাসতেন ভিতরের দিকে চোখ ফিরিয়ে সেখানে অন্তর্লীন যে মহাবিশ্ব তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে, তার রহস্য উন্মোচিত করতে। এ জন্যে আলাদা একটা বাক্‌ভঙ্গি, বস্তুত আলাদা একটা গদ্যরীতিই সৃষ্টি করতে হয়েছিল তাঁকে, প্রকাশের একটি ভাষা যা জটিল অথচ, স্বচ্ছন্দ প্রবহমান সাবলীল।”

[সঙ্গা, নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব: সন্তোষকুমার ঘোষ। / নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৭৪]

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষাভঙ্গি; মাঝে মাঝে মনে হয়, তাঁর উপন্যাসের গদ্যরীতি যেন আধুনিক গদ্যকবিতার ভাযারীতি। বুদ্ধদেব বসু ঔপন্যাসিক রূপে স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন হলেও তিনি অনন্য। তিনি বাংলা উপন্যাসে প্রকরণগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে বক্তব্যগত অভিনবত্বেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি কল্লোলীয়দের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও, তাঁর উপন্যাসেই পাণ্ডুরতা, অস্থিরতা, বিহ্বলতা, যৌবনের আবেগজনিত প্রাবল্য থাকলেও শেষপর্যন্ত তিনি নানা অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত এবং পরিণত জীবনভাবনায় সমৃদ্ধ ও মননশীলতায় দীপ্যমান।

সাত

কবিতায় অলংকার প্রযুক্ত হবে কিনা সে সম্পর্কেও বুদ্ধদেব বসুর তত্ত্ব তাঁর সাহিত্যচিন্তার ইঙ্গিত বহন করে।

১. “তথাকথিত অলংকারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেও মহৎ কবিতা সম্ভব হতে পারে, এবং ভালো কবিতায় যখনই এদের ব্যবহার হয় তখনই এরা অলংকারমাত্র থাকে না, অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কবিতাকে আমরা একটি অখণ্ড সত্তা বলে ধারণা করি; তাতে আদর্শ অনুসারে, এমন কিছুই থাকবে না যা তার হয়ে ওঠার পক্ষেই প্রয়োজন ছিল না, শুধু শোভা বৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়েছে। শোভিত বা শোভমান হওয়া কবিতার কাজ, এ কথা স্বীকার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।” [কালিদাসের মেঘদূত, ভূমিকা / বুদ্ধদেব বসু]

২. "চিরাচরিত সমালোচনা শাস্ত্রে উপমা একটি অলংকার রূপে এবং বিশেষভাবে কাব্যের অলংকার রূপে গণ্য। গদ্য রচনায়—এমনকি কাব্যেও—উপমার বহুলত অনেকে দূষ্য বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু কিছুই তার নিজের কারণে মান্য অথবা দূষণীয় নয়, কৌশলমাত্রেই ব্যবহারনির্ভর। তাছাড়া, উপমা জিনিসটাকে সূক্ষ্ম বিচারে ঠিক অলংকারও বলা যায় না কেননা সেটা বিস্তারিত বিশেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। যেটা অলংকার, সেটা থাকলেও চলে, না-থাকলেও চলে—যেমন কবিতার মিল। কিন্তু বিশেষণ ছাড়া ভাষা হয় না, এবং উপমা বাদ দিলে ভাষার প্রকাশশক্তি এতটা খর্ব হয়ে পড়ে যে উপমাকেও ভাষার অপরিহার্য অঙ্গরূপেই বিবেচনা করা যেতে পারে।" [রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য / বুদ্ধদেব বসু]

৩. "উপমাতেই কবিত্ব। কথাটা বলেছিলেন জীবনানন্দ দাশ, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে হবে। ...এর আগে পর্যন্ত আমরা জেনেছিলাম— ...যে কবিতা রচনার বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটি হলো উপমা, বলা যেতে পারে কৌশল, বা সংস্কৃত মতে অলংকার। আর অলংকার শব্দের আক্ষরিক অর্থ যেহেতু কেউ আমাদের বলে দেননি, তাই আমরা ভাবতুম যে উপমা একটা আবরণমাত্র; থাকলেও চলে না-থাকলেও ক্ষতি নেই; আর কার্যত এমন অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার সঙ্গে ততদিনে আমাদের চেনা হয়ে গেছে, যার মধ্যে—যাকে ব্যাকরণের ভাষায় উপমা বলে, তার নাম গন্ধ নেই। তাই চমকে উঠেছিলুম একথা শুনে যে 'উপমাতেই কবিত্ব'। ...আমি মানতে বাধ্য যে গত তিরিশ বছর ধরে আমি দিনে দিনে বুঝেছি যে জীবনানন্দ খুব একটা খাঁটি কথা বলেছিলেন। কোনো নতুন কবির কবিতা যখন পড়েছি, বা কোনো পুরোনো কবিকে হৃদয়ঙ্গম করেছি নতুন করে—তখনই দেখতে পেয়েছি যে কবিতার যা প্রাণসঞ্চার করে—যে বিশেষ গুণটির জন্য কয়েকটি শব্দের পারম্পর্য গদ্যের সমতল ছেড়ে কবিতার আকাশে পাখা মেলতে পারে, তা গতানুগতিক অর্থে ছন্দ বা মিল নয়, বা কোনো মহান চিন্তাও নয়—গভীরতম অর্থে তা উপায়।"

[সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ / বুদ্ধদেব বসু]

ঋগ্‌বেদে প্রাপ্ত 'অরংকৃতা' শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় অলংকৃত নামে পরিচিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকারের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতকে আলংকারিক দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' বলেছিলেন, অলংকার কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক ধর্ম। সপ্তম শতকের আলংকারিক ভামহও মনে করেছেন, কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগে। বামনও মনে করেছেন, কাব্যের সৌন্দর্যই হচ্ছে অলংকার। কবিতায় অলংকার থাকবে কিনা এ সম্পর্কে নানা বিতর্ক থাকলেও বিশ শতকের শেষে এসেও দেখা গেল কবিরা তাঁদের কবিতা থেকে অলংকার একেবারে বর্জন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও অলংকারের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চিন্তাকে পরিস্ফুট করার জন্য অলংকারের ভূমিকা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত একমাত্র কবি যিনি কাব্যে অলংকারের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তবুও তিরিশোত্তর কবিরা তাঁদের কবিতায় অলংকারের রূপের, বৈভবের, বিভার ভুবন সৃষ্টি করেছেন!

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় অনুপ্রাস (শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস), ধ্বন্যুক্তি,

বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস, সন্দেহ, স্বভাবোক্তি, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, অন্যাসক্ত, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি প্রায় সমস্ত অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে উপমা ও রূপক অলংকারেই তাঁর কবিপ্রতিভার দ্যুতি সমধিক।

আট

বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিতর্কের সূচনাকালে বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি' ১৩৩৪-এ 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তা তাঁর সাহিত্যচিন্তার, তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে নির্দেশিত হতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু রসাতলের বাসিন্দাদের 'পাঁকের পোকা' রূপে অভিহিত করলেও এবং তাদের জীবনযাত্রার রূপায়ণ আধুনিক সাহিত্যিকদের লক্ষ্য হলেও তাঁর ওইসব মানুষের হৃদয়াবেগ বা অন্তর্গত মহিমার কথাই বলতে চেয়েছেন; শুধুমাত্র লালসা, হীনতা, ক্লেদাক্ততাপূর্ণ জীবনাচরণের পরিচয় প্রদানই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

১. "অত্যন্ত নীচ ও পতিত যাঁরা—তাদের সহস্র কুশ্রীতা অতিক্রম করেও যে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দরের জন্য অভিলাষ ব্যাকুল হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটাই অনেক আধুনিক লেখকই নানাভাবে বলতে চাইছেন। সকল অধঃপতন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমস্ত অত্যাচার সত্ত্বেও যে তারা মানুষ, একথা স্বীকার করবার মত উদারতা তাঁদের আছে।" [বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড]

২. "কথাটা হচ্ছে এই যে, কোনো চরিত্রকে আমি যেভাবে কল্পনা করবো, তার অনুষঙ্গ রচনা করবো সেই কল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। এটা আর্টের অত্যন্ত গোড়ার কথা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জীবনরীতি, বিভিন্ন চিন্তাধারা, ভাষার বিভিন্ন ভঙ্গি।...এঁরা কেউই কুশ্রীতার জন্যেই কুশ্রীতার চিত্র আঁকেন না। দৈবমুহূর্ত ঝলসে ওঠে এঁদেরও পাত্রপাত্রীদের জীবনে।" [আর্টে রিয়ালিজম্‌, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড]

নয়

জনৈক আলোচক বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যচিন্তায় পাঠককেন্দ্রিকতার কথাও ভেবেছেন। "বুদ্ধদেব বসুর পাঠককেন্দ্রিক সাহিত্যচিন্তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, 'সত্য বলে অনুভব করানোই কবির কাজ'। আমাদের দেশে 'পাঠক সাধারণের প্রতারিত হবার ক্ষমতা এখনো অপরিসীম' উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে এদেশের সাধারণ পাঠকদের অবস্থা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'পাঠক হতে হলে নিজের উপর দায়িত্ব নেবার শক্তি চাই'। তার মতে সাহিত্য সহৃদয় পাঠকের মনে বীজ ফেলে, শেকড় ছড়ায়, নতুন ভাবনাও ফলিয়ে তুলতে পারে। শিল্পী পাঠককে তাঁর সহকারী করে নেন। শিল্পীর 'আভাস-উপমা-গুঞ্জরণ-বর্ণ-হিল্লোল'-এর অর্থকে পাঠক পূর্ণ করে নেন। ক্লাসিক রচনার পাঠক থাকেন সব দেশে-কালে। তার মতে 'নাস্তিক হয়েও গীতাঞ্জলির দ্বারা মুগ্ধ হওয়া সম্ভব, জাতিভেদ বা জন্মান্তর না মেনেও ভাগবদ্‌গীতাকে সত্য বলে স্বীকার করা যায়।" [বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব, ভূমিকা / আফজালুল বাসার]

দশ

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যচিন্তায় র‍্যাঁবো থেকে শুরু করে এলিয়ট পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কবির ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তার অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়। রোম্যান্টিক ধারার প্রায় সমস্ত কবির মতো বুদ্ধদেবও কবিতা রচনায় প্রেরণার পক্ষপাতী। তিনি স্বয়ং নিজেকে 'প্রেরণার পক্ষপাতী। তিনি স্বয়ং নিজেকে 'প্রেরণার প্রভাবাধীন' বলেছেন। বোদলেয়ার বিশ্বাস করতেন প্রেরণায়; আমাদের রবীন্দ্রনাথ তো কল্পনা-প্রেরণার কাছে আভূমি প্রণত। রিলকে বা রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেব বসুও কবিতা রচনায় প্রেরণার কথা অস্বীকার করেননি। বোদলেয়ারের কাব্যভাবনায় চৈতন্যের যে অমোঘ স্পর্শ ছিল বুদ্ধদেব বসু তাকেও স্বীকার করেছেন। বোদলেয়ার থেকে মালোর্মে পর্যন্ত কবিদের ন্যায় বুদ্ধদেবও 'কাব্যশিল্পের সার্বভৌমত্বের ঘোষক।' রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবের উপলব্ধিতে ছিল কবিতা লেখা 'একটা ব্যাপার, যাহার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।' 'কবিতা যেহেতু প্রকৃতি ও চৈতন্যের মল্লযুদ্ধের পরিণাম, সেই জন্য কবিও অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রপীড়িত'—শেলির মতে সেই ক্ষান্তিহীন দ্বন্দ্বের কথা বুদ্ধদেবও জানতেন। তবে বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যচিন্তায় রবীন্দ্রনাথই শেষ পর্যন্ত মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। "নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যে কাণ্ডারীর মুখে কবি কোনো কথা বলতে পারেননি, এখানে অন্য একরূপে তিনি কবিরই মুখের ভাষা কেড়ে নিচ্ছেন; তাতে দান করছেন এমন এক বৃহত্তর অর্থ, যা কবির ধারণাতীত ছিল; হয়ে উঠেছেন—শুধু নিঃশব্দ নিয়ামিকা নন, ব্যগ্র ও উদ্যমপূর্ণ সহকর্মিণী, মানসুন্দরী বা বিদেশিনীর মতো ইনি দেহিনী নন, কোনো মানবিক পটভূমিকায় এঁর প্রতিষ্ঠা নেই; ইনি একেবারেই অন্তরঙ্গা, অথচ ইনি চঞ্চল, পলাতক, পরিচালক ও সর্বেশ্বরী। কবি তাঁকে যে ক্ষমতা আরোপ করেছেন তারই নাম সৃষ্টিশীলতা; তিনিই ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার উৎস।" [কবি রবীন্দ্রনাথ/ বুদ্ধদেব।] বুদ্ধদেব যখন বলেন তিনি 'প্রেরণার প্রভাবাধীন' অথবা রবীন্দ্র-কথিত জীবনদেবতাকে 'সর্বেশ্বরী' রূপে অভিহিত করেন তখন তাঁর সাহিত্যচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী অস্তিত্বই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রেমভাবনা

রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীর সাধনাই ছিল রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রমণ; অবশ্য কেউ কেউ রবীন্দ্র-প্রভাব স্বীকরণে স্বীয় প্রতিভার মুক্তি অন্বেষণেও সচেষ্ট ছিলেন। 'উত্তররৈবিক কবিযশঃ প্রার্থীর পক্ষে সূর্যাবর্তের আবহ' যে স্বাস্থ্যকর নয়—একথা উপলব্ধি করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। একালের কবিরা 'রাবীন্দ্রিক ভাবলোকবাসী' প্রেমচেতনা থেকেও স্বাতন্ত্র্য প্রত্যাশী ছিলেন। বাংলা কবিতায় প্রেমচেতনা দেহবাদ বির্নির্মুক্ত নয়। চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব পদাবলি পর্যন্ত দেহ চেতনার প্রকাশে সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা অতীন্দ্রিয়বাদ, সেখানে প্রেমচেতনা শুদ্ধ এবং দেহবিমুখ। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় ভাবনার পটভূমিকায় ছিল ঔপনিষদিক মানসিকতা এবং ব্রাহ্মধর্মের শুচিতার প্রভাব। রবীন্দ্রোত্তর কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাস্তবের ঘনিষ্ঠ অনুপস্থিতি, সংরাগের তীব্রতাহীনতা, মানবশরীরের অনিবার্য উপেক্ষা। রবীন্দ্র-কাব্যভুবনে নারীর শরীর হয়তো আছে, দেহচেতনার আবেগাক্রান্ত উচ্চারণও হয়তো সেখানে উপস্থিত, কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতায় উপস্থিত নারী শরীরী রক্তমাংসের নায়িকা অপেক্ষা অনেকখানি ভাবলোকবাসিনী, অতীন্দ্রিয় এবং দেহাতীত। তাঁর রোম্যান্টিক নায়িকারা সাজসজ্জায় কালিদাসের কালের যতখানি সমীপবর্তী ততখানি একালের নয়।

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুই প্রথমতম কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় ইন্দ্রিয়ঘনতার অনুপস্থিতির অভিযোগ আনয়ন করেন এবং তাঁর কবিতায় মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ নারীর পরিবর্তে নন্দনবাসিনীর দেহলালিত্যের প্রকাশ লক্ষ করেন।

একালের কবিদের প্রেমচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনাগত পার্থক্যের কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জগতের পরিবর্তমানতা। প্রথম মহাযুদ্ধ দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করার ফলে পুরাতন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস বিচূর্ণিত ও পরিবর্তিত হওয়ায় কবির মনোভূমিতেও এসেছে এক বিশাল পরিবর্তন। তরুণ বয়সেই বুদ্ধদেব বসু সহ অন্যান্য কবিরা অতীন্দ্রিয় প্রেমচেতনায় বিশ্বাস হারিয়েছেন। তা ছাড়া পাশ্চাত্য আধুনিক কবিদের প্রভাব, মার্কসীয় সাম্যবাদ, ফ্রয়েডের অবচেতন তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক ভারতের আর্থ-সমাজ ও রাজনীতি যখন বিরূপতার অভিঘাতে আক্রান্ত তখন প্রেমের পটভূমিকায় দেহের আসক্তি বড়ো হয়ে উঠল অতীন্দ্রিয় ভাববাদী চেতনা অপেক্ষা। কবিতায় প্রেম আর দেহবাসনাহীন থাকল না, সুস্থ দেহবাদী যৌনচেতনা কবিতার ভুবনে স্থান করে নিল। প্রেমের আভ্যন্তর রহস্য পরীক্ষার জন্য এগিয়ে এল ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব ইত্যাদি। নারীর দেহসৌন্দর্যের আকর্ষণ কবির কাছে রইল না আর রহস্য অবগুণ্ঠনের দ্যোতক, সে হল একান্ত শরীরী। একথা বলা সম্ভবত অযৌক্তিক নয় যে, ডি. এইচ্. লরেন্স ও অল্ডাস হাক্সলি বাংলা প্রেমের কবিতাকে প্রভাবিত করেছেন এবং লরেন্স অনিবার্যভাবে বুদ্ধদেব বসুকে।

বুদ্ধদেব বসুর আজীবন কাব্যসাধনায় চিরন্তন মানবিক বৃত্তি প্রেমের বিচিত্র অবলোকন লক্ষ

করা যায়। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'শীতের প্রার্থনাঃ বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৯৩০ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর কাব্য সাধনায় প্রেম নানা বৈচিত্র্যে সমুস্থাপিত। অবশ্য শেষ পর্যায়ে প্রেমের প্রাধান্য কমতির দিকে। বুদ্ধদেব বসুর কাছে প্রেম মানবিক চিত্তবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রেমের অন্যতম প্রেরণা যৌনলিপ্সা তাঁর কাব্যে সগৌরব স্বীকৃতিতে সমাসীন। পরিণামে তিনি সুকুমার প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়ে দেহোত্তীর্ণতায় উত্তীর্ণ হতে চান। তাঁর পূর্বসূরিদের কবিতায় প্রেমের প্রকাশ থাকলেও তিনিই প্রথম প্রেমের কবিতায় বাসনার আরক্ত সংরাগের অলজ্জ অকুণ্ঠ প্রকাশ ঘটালেন। 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' কবির 'বাসনার বক্ষোমাঝে' 'ক্ষুধিত যৌবন'—এর ক্রন্দনকে কবি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর কবিতায় যৌবনের উচ্ছ্বসিত তটভূমিতে কামনার বহ্নি, আরক্তিম বাসনার নিষ্কুণ্ঠ প্রকাশ। প্রেমের মর্মমূলে অবিচ্ছেদ্য কামনার অনিঃশেষ লীলাবৈচিত্র্য তাঁর মতো সম্ভবত অন্য কেউ প্রত্যক্ষ করেননি।— 'একমাত্র কামনা অমর / এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা।' নারী তাঁর কাছে মর্ত্যকামনার মূর্তি (মোহমুক্ত) হলেও তিনি প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দি থাকতে না চেয়ে অসঙ্গ বাসনার কামনা থেকে আলোক পিয়াসীও বটে। মানবীয় প্রবৃত্তির জৈববাসনা ও কামনার দংশন অনুভব করলেও তিনি সুন্দরের ধ্যানরত ও অমৃত-পিপাসায় আকুল। জীবনের সঙ্গে আদিম জৈবতা ও অমঙ্গলচেতনা যে জড়িত একথা অনেক আধুনিক কবির মতো বুদ্ধদেবও স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি শরীরী সংরাগ থেকে যে উত্তীর্ণ হতে চান তার পর্যায়টি প্রকাশিত হয়েছে 'প্রেম ও প্রাণ' নামক ছটি সনেটে। কামনা সর্বস্ব প্রেমহীন মানুষ তাঁর কাম্য নয়—মানুষের হৃদয়ের অন্তিম সার্থকতা প্রেমে—'ওগো প্রেম, মানুষের হৃদয়ের শেষ সার্থকতা / মনীষায় লভ্য জ্ঞান—তুমি তার চরম সীমানা।' 'প্রেমিক' কবিতায় আধুনিক কবির প্রেমসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। তিনি নারীকে দেখেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে—নারী তাঁর কাছে 'কুৎসিত কঙ্কাল', 'মৃত পীত বর্ণ তার', 'খড়ির মত শুষ্ক অস্থিশ্রেণী'। অথচ সেই নারীকেই একান্ত করে চাইলেন, 'আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব'। বাংলার লোকনায়িকা কঙ্কাবতী তাঁর কাছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নারীর রূপসৌন্দর্যের মিশ্রণে আধুনিক হয়ে উঠেছে, প্রেমের সমস্ত মায়াজাল কবির কাছে উন্মোচিত—একালের বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব প্রেমের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল নিঃশেষ করে দিয়েছে। প্রেমের চিরন্তনতা সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটেছে বলে কবির কাছে ক্ষণিক প্রেমই চিরন্তনের সমতুল্য (ক্ষণিকা)। আসলে বুদ্ধদেবের অন্তর্মানস রূপ তাপসও দেহাতীত প্রেমের পূজারি। তিনি দেহচেতন সম্ভোগবাসনায় উদ্‌বেলিত, আবার দেহাশ্রিত সম্ভোগবাসনা থেকে মুক্তিপিয়াসী—বুদ্ধদেবের এটাই হল প্রেমমনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব।

'বন্দীর বন্দনার' পর 'একটি কথা' ও 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান সূচিত এবং তিনি দেহকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন। 'একটি কথা'র প্রায় সব কবিতাই প্রেমের কবিতা। সহজ স্বাভাবিক আবেগে এ কবিতার প্রেমাবেগ শান্তমধুর। তবুও এখানে বাসনার উপস্থিতি দুর্লক্ষ নয়—তিনি সেই মেয়েরই প্রতি দেহকণা ভালোবাসেন যার নয়নে কামনা, অধরে অমৃত, আঁখিকোণে বাসনার গুঞ্জরণ আর করতলে করাঙ্গুলিতে বহমান

ভালোবাসা। 'নবযৌবনের সৌরভরভসে' কবি 'উতলা উন্মনা।' কবিকে মুগ্ধ করে 'আবেশে অবশ তার দুটি পদতল / কামনা কোমল'।

বুদ্ধদেবের প্রেম বিষয়ক কবিতায় জীবনানন্দের মতো ইতিহাস বোধ বা বিষ্ণু দে-র মতো রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেনি। তিনি প্রেমের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অনুভূতির রূপকার। বুদ্ধদেব বসুর নায়িকারা জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে-র নায়িকাদের মতো নাম-ব্যবহারে বেশ মানবিক। যেমন, অপর্ণা, অমিতা, রমা, মৈত্রেয়ী, কঙ্কাবতী ইত্যাদি। তাঁর নায়িকারা জৈবতায় চঞ্চল, গতিময় ও স্পন্দমান; আর তা বোঝাবার জন্য তিনি নায়িকাদের চুল, ঠোঁট, দাঁত, স্তন, জিভ, কালো তিল ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কবিতায় ব্যবহার করেন। নায়িকার শরীরের বর্ণনা তাঁর কবিতায় ইন্দ্রিয় ঘনত্বের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। যেমন—'শাদা গালে লাল গোলাপ', 'প্রবাল ঠোঁট', 'বুকের রেখায় চাঁদের কণা', 'ছোট শাদা দাঁত আলোর মতন', 'কালো বিদ্যুৎ জ্বলে চক্ষে', 'ফুরফুরে ঠোঁট', 'ফুটফুটে নরম বুক' ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় চুলের নানা চিত্রকল্প ঘুরে ফিরে আসে। এ ব্যাপারে তিনি সম্ভবত বোদলেয়ার-অনুগামী। তাঁর চুল সম্পর্কিত বক্তব্য নিম্নরূপ—শুকনো চুল, খশখশে চুল, ঘনকালো গুচ্ছ গুচ্ছ চুল, এক মাথা চুল। চুলের কথা ঘুরে ফিরে আসে 'চুল', 'আরশি', 'একটি স্বপ্ন', 'রূপকথা', 'শেষের রাত্রি' ইত্যাদি কবিতায়। আবার তাঁর নায়িকাদের চুল লাল, রেশমি, নরম ইত্যাদি। 'নতুন পাতা' কাব্যে প্রেমের সংবেদনশীলতার রূপায়ণ—এখানে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, মিলনের আবেগ উত্তালতা, সাময়িক বিচ্ছেদবেদনা ইত্যাদি রূপায়িত। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে সম্ভোগবাসনা চরিতার্থতার জন্য কবির আকাঙ্ক্ষিত স্ত্রী বা স্ত্রীলোক, রতিবাসনা, কামনা ও প্রেম ইত্যাদির রূপায়ণ ঘটেছে। 'জন্ম' কবিতায় প্রেম ও মিলনের মধ্যে নবসৃষ্টির ইঙ্গিত। 'সমুদ্রস্নান' কবিতাতেও উভয়ের মিলনে নতুন প্রত্যাশা। 'নতুন পাতা'র শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রেমের কবিতা সম্ভবত 'চিল্কায় সকাল'। এ কবিতায় দূর নম্রতার উচ্চারণ, প্রেমিক হৃদয় শান্ত আনন্দে, নম্র ভালোবাসায় প্রেমিকার দিকে তাকিয়েছে। 'ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা' কবিতাটিও এক ইঙ্গিতবাহী।

প্রেমের রোম্যান্টিক আবেগ অনেকখানি সংহত হয়েছে 'দময়ন্তী' কাব্যে। এখানে বক্তব্যধর্মিতার পরিবর্তে মননধর্মিতাই প্রবল। পুরাণ প্রয়োগের দ্বারা এখানে কবির সমকালীন অভিজ্ঞতা চিরকালীনতার সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছে। একাব্যে বুদ্ধদেব প্রেম ও যৌবন সম্পর্কে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত। এ কাব্যের প্রেমভাবনার সঙ্গে যৌবনভাবনা অন্বিত হয়ে কবির প্রেমমনস্তত্ত্বকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। জীবন-জরা, যৌবন-প্রেম একাব্যে অপরূপ জীবনভাষ্য রচনা করেছে। আবার একই সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে আধুনিক মানুষের অন্তঃসারশূন্যতাও অনুপস্থিত নয়। 'দময়ন্তীর' 'এখন বিকেল', 'জলপাহাড়ে কুয়াশা' ইত্যাদি কবিতায় প্রেমিক যুগলের ভ্রাম্যমাণ চিত্র; বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রেম যেন প্রতিযোগী—শীতের বিশীর্ণ জরার মধ্যে কবি প্রেমিকার নয়নে প্রত্যক্ষ করেন 'অন্তহীন মায়া'। আলোচ্য কাব্যের 'সাগরদোলা' কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার কথা আছে। আবার সমান্তরালভাবে আছে অনিবার্য বিরহ-ব্যাকুলতা—'কত উদ্ধত সূর্যের বাণে তুমি আর আমি গিয়েছি ছিঁড়ে / কত যে দিনের চুম্বন টেনে নিয়েছি মুছে।'

'দ্রৌপদীর শাড়ি' কাব্যে প্রেমের কবিতা সংখ্যায় অল্প। পূর্ববর্তী কাব্যে যে প্রেম ছিল ক্ষণিক অথচ চিরন্তনত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত সেই সুর এখানেও বহমান, 'কোনো মৃতার প্রতি' কবিতায় ক্ষণিকত্ব চিরন্তনত্বের মর্যাদায় সমাসীন। 'অতলান্তা' কবিতাতেও সেই ভাবনার প্রকাশ—'একবার যাকে পেয়েছি সে মোর চিরন্তনী / তাই তো আমার হৃদয়ে ঝলকে স্বপ্নমণি / তাই অনিদ্রা আজও শোনে কোন পদধ্বনি /দুঃখসুখের ক্ষুদ্র সীমার অন্তরালে / অতলান্তাকে হারাতে পারি না, পারি না।' এই যে দেহাতিরিক্ত চিরন্তন প্রেমের কথা এখানে ধ্বনিত তা যেন ভারতীয় চিন্তার উত্তরাধিকার ঐতিহ্য। বুদ্ধদেবের কবিতায় কাম ও প্রেম একই বৃন্তে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 'ঝরা ফুলের গান' কবিতায় ক্ষণিকা কাম্য; আবার চিরন্তনীতে কবি হৃদয় আন্দোলিত। 'দোলপূর্ণিমায়' বুদ্ধিপ্রধান মনোবৈজ্ঞানিক প্রেমবিশ্লেষণের উপর প্রেমদেবতা অতনুকে আহ্বান জানানো হয়েছে। 'স্বয়ংবরা' কবিতায় শরীরী সংরাগ নিয়ে মিলনের রাতে প্রেমিকার স্বয়ংবরা হওয়ার বক্তব্যের মধ্যে আছে প্রেমস্মৃতির মুখরতা। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের প্রেম চেতনায় এল শরীরী সংরাগের সঙ্গে আবেগ জড়িত হওয়ার মননধর্মিতা; আবেগ ও স্মৃতি। প্রেমের দেউল শুধু দেহে নয়, মনেও বটে—'কবি মশাই' কবিতা 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যের কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে ধরে আছে। প্রেমের জন্ম তারপর শরীরের নিবিড় মিলনেচ্ছা। এখানে নারী আর তার লাবণ্যময় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে গড়ে ওঠে প্রেমের কবিতা। 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যে অর্জুন যেন কবিস্বভাবের প্রতীক। বার্ধক্যের মলিনতায় ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্যে মনের গহনতা থেকে উত্থিত হয় প্রেমের আকাঙ্ক্ষা—

স্বপ্নে ওঠে রোল—কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে।

এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা 'বর্ষার দিনে' কবির বহুমাত্রিক সংবেদনা এখানে প্রেমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এখানে মধ্যবিত্তের তুচ্ছ অগৌরবের শাশ্বত প্রেমাকাঙ্ক্ষা রূপায়িত—বিরূপ বিশ্ব, বৈরী পরিপার্শ্ব, সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা টানাপোড়েন, গ্লানি-হতাশার মধ্যে প্রেমই একমাত্র বিষয় যা জীবনে গাঢ় স্বপ্ন সঞ্চার করে দিতে পারে—বুদ্ধদেবের প্রেমভাবনার মূল তত্ত্বও এটি।

চিরন্তনীর অলক্ষ্য অভিসার
পার হয়ে এসে তুচ্ছের বঞ্চনা
বলে কানে কানে 'আমার অঙ্গীকার
ভুলবো না আমি কোনো দিন ভুলবো না'।

'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যপর্যায়ে কবি প্রেমের প্রতি তাকিয়েছেন প্রৌঢ় বয়সের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। প্রথম পর্বের অতিরেক, উচ্ছ্বাস, দ্বিতীয় পর্যায়ের মিথ অন্বিত প্রেমভাবনা এখানে অনুপস্থিত। প্রেমের কবিতার জটিলতা অপেক্ষা এখানে সহজতা সংলক্ষ। অবশ্য এখানে প্রেমের আলোড়ন আছে, যদিও যৌবনের বদনামও দিনের অবসান ঘটেছে। 'আটচল্লিশের শীতের জন্য', 'রাত তিনটের সনেট', 'প্রেমিকের গান', 'সমর্পণ', 'সনাতন সংঘর্ষ' ইত্যাদি

কবিতায় প্রেমস্মৃতি, বার্ধক্যের প্রেমতৃষ্ণা, অতীন্দ্রিয় প্রেমের প্রতি পক্ষপাত ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। 'দেবযানীর স্মরণে কচ' এই পৌরাণিক প্রতিরূপকের কবিতায় কবির আলোচ্য পর্বের প্রেম, চেতনা প্রকাশিত। এ কবিতায় আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেমের ট্র্যাজেডির সঙ্গে পুরাণ-ঘটনার সমীকরণ ঘটানো হয়েছে। 'দেবযানীর স্মরণে কচ' ট্রিলাজিতে প্রেমস্মৃতি, বেদনার প্রাবল্যে মানবিক আর্তি, বেদনাজনিত ট্র্যাজিক আনন্দ, সীমাবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনে অপ্রাপণীয় প্রেমকামনা ইত্যাদি মৌল সুর রূপে অভিব্যক্ত। 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কাব্যেও প্রেমেই কেন্দ্রীয় বিষয়। একাব্যেরও মূল সুর প্রেমের স্মৃতি। নাম কবিতায় প্রেম ও মিলনের ইন্দ্রিয়ঘন স্মৃতির এমন অবিস্মরণীয় স্তবক আছে যা বাংলা কবিতায় দুর্লভ বলা চলে।

—পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে যেমন রৌদ্রকণা, তেমনি তার কঙ্কনের রশ্মি
শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুটি কান যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু,
বুকের দুটি মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বিদগ্ধ ও বর্তুল।

প্রেমিকার দৃষ্টিবিকিরণে কবির বার্ধক্যও আলোকিত হয়। প্রেমিকার সঙ্গে মিলনরাত্রিই যেন অনন্তত্বের আভাস বয়ে আনে সীমাবদ্ধতার মধ্যে—

মনে পড়ে এক রাত্রি—অমনি দাঁতের দাগে
আপেল উজ্জ্বলতর, নিশ্বাসে মদের পাত্র হয়ে আছে লাল,
নিঃসঙ্গ মোমের তলে অন্ধকারে গাত্ররূপ গলে যায় ধীরে—
বিন্দু বিন্দু আদরে আরক্ত করো।

এই মানবিক স্পর্শময় আরক্ত প্রেম তাই বুদ্ধদেবের কাম্য। কবির কাছে নারী হল হ্রদ—যেখানে দিনের কর্মক্লান্তির শেষে নারীরূপী হ্রদের শান্তিতে অবগাহন করা যায়—

সেই হ্রদ নারী: আছে সান্ত্বনার প্রস্তুতভাণ্ডার
হৃদয়ের উদ্বেল নিস্রাবে সিক্ত অঙ্গের অতলে।

কবি মনে করেন, কাম ও প্রেমের অতৃপ্তিবোধ থেকেই কল্পনার জন্ম; আর তা থেকেই শিল্পের জন্ম। ভারতীয় জীবনসাধনায় কাম অস্বীকৃত নয়। কাম হল আদিশক্তি। 'একদিন চিরদিন' কাব্যে অবিমিশ্র প্রেমের কবিতার পরিবর্তে আছে বহুমাত্রিক প্রেমের কবিতা। এক অদ্ভুত প্রেমিক; 'একদিন: চিরদিন' কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি, প্রেম ও মৃত্যু যেন একাকার হয়ে গেছে। 'একদিন: প্রতিদিন' কবিতায় কবি এখন লুব্ধ—'তাঁর হাড়ে অমর কাম শান্তিহীন'। 'স্বাগত বিদায়' কাব্যের প্রেম কবিতায় কবির প্রেমমনস্তত্ত্ব পুনরাবৃত্তিতে পূর্ণ। বার্ধক্যে শরীরী প্রেমের সংরাগ বঞ্চিত কবির চিত্তে শুধুই স্মৃতি, 'প্রায় ভুলে যাওয়া সমর্থ অতীত'। এ কাব্যের 'সন্ধিলগ্ন' কবিতায় কবি প্রেমের সামগ্রিক সংবেদনার বোধকে প্রকাশ করেন। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'স্বাগত বিদায়' পর্যন্ত দেহবন্ধ অথচ দেহউত্তরিত প্রেমের দ্বন্দ্বজর্জর পথ পরিক্রমা, তাই যেন বিচিত্র প্রেমসংবেদনায় 'সন্ধিলগ্ন' কবিতাতে চিরন্তনত্বের ভাস্বরদীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে রইল—

মেয়েটি সম্পূর্ণ কিন্তু, সবেমাত্র সক্রিয় যৌবনে
কান্তিময়ী, অতি সুকুমার

অতি মৃদু আঙ্গুলে ও স্তনস্পর্শে,
অতি নম্র কটির ভাঙ্গিতে
মূর্চ্ছাবিষ্ট জীবনলিপ্সুকে দেয় অবশিষ্ট আবশ্যিক প্রাণশক্তি,
ঢেলে দেয় চুম্বনে নিমগ্ন তার ওষ্ঠাধরে
স্বীয় স্নিগ্ধ দেহের নির্যাস,
দুগ্ধ, মদ, মধু—
যাতে সে, নিঃশ্বাসে ভরে কোনো আদি-
জননীর আগ্নেয় করুণা
হতে পারে জড়ের শাসনমুক্ত মানবসন্তান
হতে পারে ব্যক্ত, পরিণত—

বুদ্ধদেব বসু: সমাজচেতনা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা

"যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি এ কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল গোপনে চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে। আমি বলছি, একাজও শিল্পকাজ; শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুনছে, সেই তার সৃষ্টি; আমি তার থেকে যদি কিছু আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারই। আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে সব রেখাপাত করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্প কাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা যা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়। ...কবির কাব্যে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তা দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে।"

['ঘরে-বাইরে' উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত একটি পত্রের অংশ বিশেষ।]

যে-কোনো কবি-সাহিত্যিক তাঁর কালের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেন। শিল্পকর্মে কালধর্মের রূপায়ণ ঘটবেই। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবিদের ন্যায় সমকালীন অভিজ্ঞতায় স্নাত। সমকালকে অস্বীকার না করে, স্বীকার করে তিনি মানবজীবনের চিরন্তন মূল্যবোধের সন্ধান করেন। তবে তাঁর কাব্যকবিতা যে একান্তভাবেই সমাজসম্পৃক্ত এমন বলা যাবে না যদিও সেখানে সমসাময়িক বাস্তবজীবন, বাস্তবসমাজ দর্শন ইত্যাদি অনুপস্থিত নেই। কবিতায় বা সৃজনশীল অন্যান্য রচনায় সমাজসচেতনতা কতখানি থাকবে সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হতে পারে—

(১) "বর্তমানই লেখকের উপজীব্য; ভবিষ্যতে যদি কোনো আলো তিনি ফেলতে পারেন. সে আলো পড়বে বর্তমান প্রসঙ্গে প্রতিহত হয়েই; নিজের কালকে তিনি যদি ভালোরকম বুঝে থাকেন তাহলেই তাঁর লেখায় হয়তো ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত ধরা পড়বে। শেষ বিচারে মানতেই হবে যে লেখকের ধর্মই সমকালীনতা।"

[লেখার ইস্কুল, ১৯৩৮, কালের পুতুল]

(২) "বড়ো লেখকেরা সকলেই একদিক থেকে যেমন চিরন্তন, তেমনি অন্য দিক থেকে সমকালীন স্বীয় সময়ের আদর্শ অনুসারে আধুনিক, এমনকি—topical। সমকালীনতা লেখকদের একটা মস্ত গুণ। বর্তমান যুগকে, সমসাময়িক পাঠককে লক্ষ্য করেই মহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম লেখকের উদ্যম, মহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম সব লেখকই পাঠকের এবং অধিক পাঠকের প্রত্যাশী। কেবল নিজের বন্ধুদের মধ্যে রচনার প্রচার আবদ্ধ থাক, সত্যি বলতে কোনো লেখকই এটা চান না।" [তদেব]

(৩) "শিল্পীর রচনা সাময়িক প্রসঙ্গকেই অবলম্বন করবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাময়িক যেখানে দেশকাল অতিক্রম করে চিরকালের পটভূমিকায় দীপ্যমান হয়ে ওঠে, সেখানেই আমরা শিল্পকলার মহত্তম পরিচয় পাই।"

[গল্পগুচ্ছ: রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, ১৯৫৫]

(৪) "সেই সাহিত্যই বড় সাহিত্য, যা সর্বযুগেই সাময়িক যাতে প্রতি যুগ ঠিক যেন আপন মর্মকথাটি শুনতে পায়। তাতে বলার চাইতে না-বলার অংশ থাকে বেশি এবং সেই না-বলাটুকু প্রতিযুগ তার নিজের অর্থ দিয়ে ভরিয়ে নেয়। এই গুণটাকেই বলা যেতে পারে চিরন্তনতা—সত্যিকার আধুনিকতাও হয়তো তা-ই।" [তদেব]

(৫) "বেশিরভাগ লেখক আপন দেশকালের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাঁরা কুশলী শিল্প হলেও তাঁদের রচনায় এই বিশ্বমানবিক সুরটি লাগে না। আর কোনো কোনো লেখক আপন দেশকালের পরিবেশের শরীরে বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করেন, তাঁরাই বড়ো লেখক, তাঁরাই মহৎ শিল্পী।" [তদেব]

(৬) "সাহিত্য যখন সমাজতত্ত্বশিক্ষার উপকরণমাত্রে পর্যবসিত হয়, যখন পণ্ডিতেরা তার গা খুঁটে খুঁটে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করেন, ...তখনই সাহিত্য সম্ভোগের জীবিত লোক থেকে তার নির্বাসন হয় স্বতঃসিদ্ধ। গল্প উপন্যাসের মধ্যে বেশিরভাগেরই ক্ষণিক জীবনলীলার অবসান এই ঐতিহাসিক শ্মশানভূমিতেই ঘটে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো এমন রচনা আমরা দেখতে পাই যা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রেই যার মূল্য আবদ্ধ নয়, জীবিত পাঠকশ্রেণীর প্রাণের মধ্যে যা প্রাণবন্ত, যা কাছে এসে বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকায়, যাকে আমরা খুব সহজেই আপন বলে অনুভব করি...আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অচেতন অভিজ্ঞতার ভগ্নাংশরাশিকে বেছে, গুছিয়ে সম্পূর্ণ করে মনে সচেতন স্তরে তুলে ধরে।" [তদেব]

(৭) "মানুষের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে শিল্পকলা একমাত্র, যার কোনো সামাজিক সাংসারিক প্রয়োগ নেই, যা আমাদের দীক্ষা দেয় না কোনো বিশ্ব বা মতবাদে, শেখায় না করো আরো বেশি উপায়নৈপুণ্য বা কার্যকারিতা। ...আর তাই অন্য কোনো বিভাগের তুলনায় ...শিল্পকলাকে অকলুষেয় বলতে পারি—অন্তত সবচেয়ে কম সংক্রমণপ্রবণ। একদিক থেকে যেটা নিষ্ফলতা অন্যদিক থেকে সেটাই তার গৌরব।" [কবিতার শত্রু ও মিত্র ১৯৭৪]

বুদ্ধদেব বসুর উক্ত বক্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মনে করেন, সাহিত্যে সমকালচেতনা কাজ করে এবং সমকাল শুধু সমকালত্বে না থেকে চিরকালীনত্বে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তিনি সাহিত্যের প্রচারধর্মিতাকে বা প্রচার সর্বস্বতাকে একমাত্র সত্য বলে মনে করতেন না, কেন-না, তাঁর কাব্যসাহিত্যে সমাজচেতনা একমাত্র না হলেও অন্যতম উপাদান। বুদ্ধদেব সমকালীন অনেক কবি সামাজিক দায়বদ্ধতাকে, সামাজিক কল্যাণকামনাকে, রাজনৈতিক ভাবনাকে কাব্যের উপাদান করলেও, বুদ্ধদেব সেই পথের পথিক হননি। অবশ্য তিনি যে গজদন্তমিনারবাসী ছিলেন তাও নয় এবং সমকালীন বৈশ্বিক এ জাতীয় জীবনের বিষয়ও তাঁর কাব্যে ছায়াপাত করেছে। তাঁর 'বন্দীর বন্দনা' মূলত প্রেমের কাব্য হলেও এবং সমাজচেতনা আলোচ্য কাব্যে প্রত্যক্ষ গোচর না হলেও তাঁর কাছে ধরাতল পাণ্ডু এবং ধরনির অঙ্গন অপবিত্র বলে মনে হয়েছে। বস্তুতে আর মানুষে পৃথিবী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিপ্রেম রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীতে নানা প্রতিকূলতা লক্ষ

করেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্ব সংকট স্বপ্ন তাঁর কাব্যে ছায়াপাত করেছে। পৃথিবীর দুঃখকষ্ট বেদনা যে সহ্য করতেই হবে এমন কথা 'পুরানা পল্টনে' প্রকাশিত। 'নতুন পাতা' কাব্যের 'বিচ্ছেদের দিন' কবিতায় কবি লক্ষ করেছেন 'মানুষে মানুষে নেকড়ের মতো কামড়াকামড়ি' আর 'অন্ধকার সূর্যস্পর্শহীন পৃথিবী'। মানুষের লোভ, হিংসা, জিঘাংসা ইত্যাদি তাঁর কবিতায় আছে, মানুষ যে কেবল লোভের জন্যই হত্যা করে—এমন কথা নতুন পাতার 'রুদ্রের আবির্ভাব' কবিতায় আছে। সমাজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সভ্যতার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা ইত্যাদি তাঁর কবিতায় থাকলেও এমনকি তিনি একথা ভাবলেও—'আমাদের যদি হাত থাকতো, পৃথিবী হতো আলাদা'—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিন্তু মন্তব্য করেছেন—"তাঁর রচনাবলীতে বর্তমানের অনেক সমস্যা যদিও উপস্থিত, তবু আধুনিক সমাজের ব্যাধি ও বিকার তাঁর অনুকম্পায় বঞ্চিত। উপরন্তু তাঁর সহজ বিচারে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বাঙালি সমাজ যেমন হাস্যকর, বাংলার প্রগতিবিলাসীরা তেমনি অপ্রকৃতিস্থ।" একথা সম্ভবত তিনি বলেছিলেন 'নতুন পাতায়' আধুনিক বাঙালির পাশ্চাত্য রীতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর কটাক্ষ লক্ষ করে।

'নতুন পাতা' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রকাশিত হলেও এর কবিতাগুলি ১৯৩৩-৩৪-এর পটভূমিকায় রচিত।

১৯৩৩-এ হিটলার ও নাৎসিরা ক্ষমতা দখল করলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে মারণযজ্ঞ শুরু হয়। সংবাদপত্র সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করা হয়, কমিউনিস্ট ও ইহুদি-নিধন মানবসভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক কালিমা লেপন করে। বিজ্ঞানী চিন্তাবিদরা হয় স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হন; অথবা নিজবাসভূমে পরবাসী হন। চিন্তার রাজ্যে বহু প্রগতিশীল মতাবলম্বী গ্রন্থ ভস্মীভূত ও বাজেয়াপ্ত হয়। সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ ফ্যাসিস্ত বর্বরোচিত কার্যকলাপে ভীত সন্ত্রস্ত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় রঁমা, রোঁলা, ম্যাক্সিম গোর্কি, আরি বারবুস প্রমুখের আহ্বানে সমগ্র বিশ্বের চেতনাসম্পন্ন কবি-শিল্পী- সাহিত্যিক-সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীর দল ১৯৩৫-এর ২১ জুন প্যারিসে প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্পী সাহিত্যিকদের কণ্ঠ থেকে বজ্রগর্ভ ধিক্কারবাণী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদের মোকাবিলা করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং International Association of writers for the Defence of Culture গঠিত হয়। এই সম্মেলনে আঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফরস্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হাক্সলি, জন স্ট্রাচির মতো অনেক অ-কমিউনিস্টও যোগদান করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই সংকটচেতনা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহমণ্ডলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ১৯৩৬-এর এপ্রিলে লখনউ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন থেকে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি বিশিষ্ট উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দ্রের নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয় ১৯৩৬-এর ১০ এপ্রিল। 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' সংগঠনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কেন-না, এই সংগঠনটি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ফ্যাসিস্ত বিরোধী ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিধ্বনির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল বিদেশে। "প্রগতি লেখক সংঘকে

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে; লন্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠায়। সে আলোচনায় যারা যোগ দেয়, তারা সবাই যে লেখক তা নয়; আজও প্রগতি লেখক আন্দোলনে লেখক আর পাঠকের প্রায় সমান স্থান রয়েছে বললে হয়তো ভুল হবে না। মুলকরাও আনন্দ, সাজ্জাদ জহির, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ্ এবং আরও কয়েকজন মিলে যে আলোচনা চলে, তারই জের এদেশে টেনে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তেহার প্রকাশ হয়।" [প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ: স্বদেশ জিজ্ঞাসা/হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।] ওই ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল—"যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধি উদবুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসংগতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।" 'প্রগতি লেখক সংঘের" যে সম্ভাবনা লন্ডনে উপ্ত হয়েছিল, তাই ১৯৩৬, এর এপ্রিলে লখনউতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' নামে রূপ পরিগ্রহ করল। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার সফলতার পটভূমিকায় ছিল ইউরোপ প্রত্যাগত কয়েকজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সহযোগিতা--"প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সচেতন প্রচেষ্টায়। এঁদের উদার মানবিক দৃষ্টিই সেদিন এই সংগঠনের মধ্যে টেনে এনেছিল বহু অমার্কসবাদী অথচ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদবুদ্ধ খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীকে।" [মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (প্রথম খণ্ড)/ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত] প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারে জীবনের মৌলিক সমস্যার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অযৌক্তিক, প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্মকে প্রত্যাখ্যান করে সৃষ্টিশীল, প্রগতিশীল ধ্যানধারণাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত করার কথা বলা হয়—

"We believe that the new literature of India must deal with the basic problems of our existence to day—the problems of huger and poverty, social backwardness and political subjection. All that drags us down to passivity, inaction and unreason we reject as reactionary. All that arouses in us the critical spirit, which examines institutions and customs in the light of reason which helps us to act, to organise ourselves, to transform, we accept as progressive." [Manifesto Reprinted Marxist Cultural Movement in India. Chronicles and Documents. Vol I. / Compiled and Edited by Sudhi Pradhan.] প্রগতি লেখক সংঘ যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রোঁমা রোঁলা, আর বারব্যুস এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল; তেমনি জাতীয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমচন্দ, প্রমথ চৌধুরি, নন্দলাল বসু প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। সর্বভারতীয় সম্মেলনে কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা গঠিত হতে শুরু করে এবং ১৯৩৬-এর এপ্রিল মাসে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নেতৃত্বে 'নিখিলভারত প্রগতি লেখক সংঘের' বাংলাদেশে একটি সাংগঠনিক কমিটি

গঠিত হয়।১৯৩৬-এর ২৫ জুন কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ম্যাক্সিম গোর্কির স্মরণ অনুষ্ঠানে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ' জন্ম লাভ করে। সংঘের প্রথম সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক হন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। প্রগতি লেখক সংঘ সম্পর্কিত নানা খবরাখবর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মারফত 'পরিচয়' পত্রিকার সভায় আনীত হত। 'পরিচয়' পত্রিকা তখন আন্দোলনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'বাংলায় তখন পরিচয়ই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রগতি আন্দোলনের মুখপত্র'। অবশ্য এ তথ্যও সঠিক যে, প্রগতি লেখকদের মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে পরিচয়গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৯৩৭-এ সংঘের পক্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সম্পাদনায় 'প্রগতি' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। উক্ত সংকলনে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতাও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬-এর জুন মাসে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত সংঘের সূচনাপর্বে সংঘের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৩৭-এ 'প্রগতি' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। 'প্রগতি' সংকলনে ধূর্জটিপ্রসাদ, সুধীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুও স্থান পেয়েছিলেন। এই সংকলনে তাঁর 'অনুরাধা নাটকের প্রস্তাবনা' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা স্থানলাভ করে। ১৯৩৮ সালের ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে যে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় তার মধ্যে ছিলেন মুলক্‌রাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, পণ্ডিত সুদর্শন। বুদ্ধদেব বসু এইসময় নানা প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন এবং ১৯৪১-এর ৪ আগস্ট ইয়ুথ কালচারাল ইন্‌স্টিটিউট-এব একটি সভায় 'সোভিয়েত শিক্ষা ও সংস্কৃতি' সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯৩৮-এর সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসুর পঠিত ভাষণটি ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। এ প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাশ তাঁর 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে জানিয়েছেন—"প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতা অধিবেশন বাংলার প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনে যেমন নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে তেমনি আলোচিত ও পঠিত বিষয়গুলিও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মতাদর্শগত বিতর্ককে উসকে দেয়। সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বুদ্ধদেব বসুর পঠিত ভাষণটি ছিল এমনই একটি বিতর্কিত বিষয়। প্রগতিলেখক সংঘের কলকাতা অধিবেশনের অব্যবহিত পরে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় অগ্রণী মাসিক পত্রিকা। বাংলা ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা হচ্ছে এই অগ্রণী। অগ্রণীর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রগতি লেখক সংঘের অধিবেশনে পঠিত বুদ্ধদেব বসুর রচনাটিকে আক্রমণ করেই সম্ভবত শুরু হয় বাংলার মার্কসবাদীদের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম মতাদর্শগত সংগ্রাম। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচনায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে চরম হতাশা প্রকাশ করেও মধ্যবিত্তের উপর শেষ পর্যন্ত আস্থা স্থাপন করে যে বক্তব্য উপস্থিত করেন, সরোজকুমার দত্ত 'ছিন্ন করো ছদ্মবেশ' নামক নিবন্ধে বক্তব্যের সেই অসংগতিকেই মূলত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছিলেন।"

১৯৪১-এর ২২ জুন নাৎসি বাহিনীর দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে একমাসের মধ্যেই ২১ জুলাই, ১৯৪১-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য সোভিয়েত দিবস পালনের যে আয়োজন করা হয় সেই উপলক্ষ্যে 'সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বাংলার মনীষীবৃন্দের সহানুভূতি' শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখক-শিল্পী, ও মনীষীদের যে আবেদন প্রকাশিত হয়, সেখানে বুদ্ধদেব বসু অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এমনকি সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের সাংগঠনিক কমিটির নামের তালিকায় বুদ্ধদেব বসুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৪২-এর ৮ মার্চ ঢাকার সূত্রাপুরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন আহুত হয়। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য রেলওয়ে কলোনি থেকে একদল রেলশ্রমিক তরুণ লেখক সোমেন চন্দের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করে আসতে থাকে। পথে শোভাযাত্রাটি ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সোমেন চন্দকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের প্রগতিশীল দল ও সংগঠনগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ১৯৪২-এর ২৩ মার্চ সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। উক্ত বিবৃতিতে প্রমথ চৌধুরি, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রমুখের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুও স্বাক্ষর করেছিলেন। সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত প্রগতিশীল লেখক শিল্পীর দল ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সম্মেলনের যে ঘোষণাপত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেন সেখানেও বুদ্ধদেব বসুর স্বাক্ষর ছিল। ২৯ মার্চ ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখকশিল্পী সম্মেলনের প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব বসু সভাস্থলে একটি কালোপযোগী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। শহিদ সোমেন চন্দকে নিবেদিত ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রথম কাব্য সংকলন 'প্রাচীর'-এ বুদ্ধদেব বসুর 'প্রতিবাদ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়—"কবি যাঁরা শিল্পী যাঁরা/জ্ঞানী যাঁরা/অরাজক অন্ধকারে একমাত্র/আলোর ইশারা/অত্যাচারে অপমানে নির্বাসনে/রক্তচক্ষু শাসনে ত্রাসনে/তাঁদের বিনাশ এর পৈশাচিক ব্রত/...পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে/আজ হোক উদ্দীপিত আমার কবিতা।" এই কবিতায় বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য এই যে, ফ্যাসিবাদের ব্রত হচ্ছে সভ্যতার ধ্বংসসাধন। তাই কবি ফ্যাসিবাদী পশুবৃত্তির প্রতিবাদে আপন কবিতার উদ্দীপন জাগরণ কামনা করেছেন। 'প্রাচীর' কাব্যসংকলন প্রকাশের পর বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৯)। সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—"সম্প্রতি ছাত্রসমাজ একই সঙ্গে নিহতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও হত্যাকারীর প্রতি তাঁদের ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'প্রাচীর' নামক কবিতার সংগ্রহটি সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে। এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অত্যন্ত শোভন হয়েছে, কারণ 'প্রাচীর' বইটিতে বাংলার অনেক কবি তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যে মনোভাব সংস্কৃতি ও প্রগতির শত্রু।" ১৯৪২-এর ১৯-২০ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মূল সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। উক্ত সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন—"মনুষ্যত্বের মহান প্রেরণাই আজ আমাদের এখানে একত্র করেছে। আজ আমাদের সবার কথা শুধু এই:

দিকে দিকে সকল কারাগারের দরোজা খুলে যাক—অত্যাচারের কারাগার, অশিক্ষার কারাগার, দারিদ্র্যের কারাগার, জাত্যভিমানের কারাগার—সব দেয়াল ভেঙে পড়ুক, উদার মুক্তির প্রাণপূর্ণ আনন্দে মানুষের জীবন সার্থক হোক।"

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' তরফে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর লিখিত 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম্' নামক গ্রন্থও ছিল। সুস্নাত দাশের 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়—"ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার পুস্তিকার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা হল—বুদ্ধদেব বসু রচিত 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম'। এটিরও অন্য এক তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, রাজনীতির শতযোজন দূরে যাঁর অবস্থান, বিশুদ্ধ সাহিত্যের যিনি উপাসক, সেই উন্নাসিক ও অভিজাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু কীভাবে নিঃসঙ্গতার গজদন্তমিনার থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও নেমে এসে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ঐতিহাসিক এক আন্দোলনে সফল হয়েছিলেন এই রচনাটি তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।"

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিল না। বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু ভালো যা-কিছু খাঁটি তা রচনাচর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি। এ-ব্যাপারে যেমন, প্রবল আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করেছি এবং আজ পর্যন্ত করি, তেমন আর কিছুতেই করি না এ-কথা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। ভালো লিখবো, আরো ভালো লিখবো—আমার সমস্ত জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি এই ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। ...একদিকে জার্মানি ইটালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ; অন্যদিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সাধনা। এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়োরকমের একটা অর্থ মনে ধরা ছিলো। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমব্লি হলের বক্তৃতা নয়, মাছ ও পাঁউরুটির বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবনযাপন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে-অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হয়ে জ্বলে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে। ...লোভ জিনিসটা অতি কুৎসিত এবং কবি কুৎসিতকে সইতে পারেন না। তাই আজ পৃথিবী ভরে লোভ যখন তার বীভৎসতম মূর্তিতে প্রকট তখন আমরা কবিরা, শিল্পীরা স্বভাবতই, নিজের প্রকৃতির অদম্য টানেই, ওই বীভৎসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো—এর মধ্যে রাজনীতির কোনো গূঢ়তত্ত্ব নেই, আমাদের মনুষ্যত্বের কবি চরিত্রের এটা ন্যূনতম দাবি। বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। জার্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে একে বিতাড়িত হতে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ষণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত হতে লাগলো, তখন ঘৃণায় শিহরিত হয়ে এ-কথাই ভাবলুম যে দু'দিন পরে এইরকম কোনো পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তাহলে

আমরা যারা কবি শিল্পী বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো, এই দুর্গত-পরাধীন দেশেও চিন্তার ও আত্মপ্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটুকুও আর থাকবে না, শুধু যে আমাদের জীবিকা কিংবা জীবন যাবে তা নয়, যা কিছু আমাদের কাছে মূল্যবান, যে-সব জিনিস আছে বলে আমরা বাঁচতে চাই এবং যা না থাকলে আমাদের জীবনের কোনো মানে থাকবে না সব একেবারে ছারখার হয়ে যাবে। স্প্যানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা। তারপর সেদিন যুদ্ধ বাঁধলো। বর্বরতার শেষ সূক্ষ্ম মুখোস খসে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইল না। জলে স্থলে আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধা হত্যা নয়, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌঁচেছে। আজ এ-কথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। ...এরই নাম ফ্যাসিজম্। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসিজম্-এর ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। ...ফ্যাসিজম্ শুধু এক রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়, ফ্যাসিজম্ একটা মনোভাব। ...আমি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সাধনার মহিমায় আমি মুগ্ধ; তাই আমি শান্তি চাই, প্রীতি চাই, মুক্তি চাই, যাতে এই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি অর্জন করতে পারে। যা চাচ্ছি তা শিগগির হয়তো হবে না, সহজেও হবে না, কিন্তু সেইজন্যই তো আরো উদ্যোগ আরো নিষ্ঠা আরো সাহস দরকার, আগে থেকেই হার মানলে চলবে না, ভীরু হলে চলবে না, নৈরাশ্যের আবছায়ায় নিজের কাপুরুষতা লুকিয়ে রাখলে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি আমার নিজেরই এ-কথা আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করি।" [পরিচয় / ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যা (১৯৭৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত।]

ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের প্রভাবে পড়ে বুদ্ধদেব জীবনে সম্ভবত একবারই শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন। ২২ শ্রাবণ পুস্তিকার কবিতাগুলিতে তাঁর এই স্বল্পস্থায়ী সমাজসচেতন মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ১৯৪২-এ লেখা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি তাঁর ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাবের অন্যতম প্রকাশ। প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে জড়িত হওয়ার ফলে সমকালীন যে পরিমণ্ডল তাঁকে বিচলিত করেছিল, তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি এ কবিতাকে অত্যন্ত স্পষ্ট অনলংকৃত ভাষায় প্রকাশিত। "প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত ছিলেন, অন্তত প্রথম দিকে এটা শুধু সামাজিকতা কিংবা বন্ধুত্বের খাতিরে বলে মনে হয় না; তখনকার রচিত কবিতাবলিতেও এই তৎকালীন মানসিক পরিমণ্ডলের অনিবার্য ছাপ পড়েছিল"। [ছিলে না বনের মৃগ: নরেশ গুহ/বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গে/সম্পাদনা: আনন্দ রায়] এই প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি উল্লেখ্য যেখানে তিনি দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—

অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাইতো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

এই উচ্চারণ সম্পূর্ণত প্রগতিবাদী দর্শনসম্মত। কবিকে সরাসরি জীবনের জয় হবে বলে স্বাস্থ্যকর ঘোষণা করতে হবে—এই ছিল তখনকার আধুনিক নান্দনিক মনোভাব।

"'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়লে দেখা যাবে যে, তিনি সমাজ ও মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীর রূপ অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজ, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বসম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। মনুষ্যত্ববোধের মহান প্রেরণা থেকেই তাঁর একালের কবিতা রসসঞ্চয় করেছে। 'সভ্যতার সংকটে' কোনো মানবতাবাদী কবিই যে নিরাসক্ত ও উদাসীন থাকতে পারেন না, আলোচ্য কবিতাটি তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। আসলে 'প্রত্যেকটি যুগ' তার কবি বা কবিসমূহের মধ্যে স্বর খুঁজে পায়। 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' পুস্তিকায় এমন প্রত্যয়ের ঘোষণাও আছে, যাতে বুদ্ধদেব বসুকে 'সমাজতান্ত্রিক প্রগতিবাদী' আখ্যা দেওয়া যায়।

মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় ও ফ্যাসিবাদের উত্থানে যখন সমগ্র ইয়োরোপ মুহ্যমান, বুদ্ধদেব বসু তখন ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়ে কবিতায় আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। এই পর্বের কবিতায় কবির সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাধারণার অভিপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। মহাযুদ্ধের অভিঘাতে বিশ্বমানবতার অপমান, বিশ্বব্যাপী পাপাচার ও হিংসার উত্থানে যে একদিন ধ্বংস হবে—এমন প্রবল আশাবাদও প্রকাশিত হয়েছে সমকালে রচিত 'যামিনী রায়কে' কবিতায়। ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনার প্রকাশই 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় বক্তব্যধর্মী চিত্রকল্পে প্রকাশিত। জন্তুর নামান্তর ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী মনোবৃত্তিতে বিচলিত কবি মানবিকতা ও মানবিক সংকটে পতিত মানবসভ্যতার মুক্তির সম্ভাবনা দেখলেন রবীন্দ্রজীবনদর্শনে। এ মুক্তি শুধু ব্যক্তি আমির মুক্তি নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার মুক্তি যে রবীন্দ্রদর্শনে নিহিত—তাও পরোক্ষ প্রকাশিত।

পরবর্তীকালে নানা ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে সরে এসেছিলেন। এরজন্য শুধুমাত্র তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব ও কমিউনিজম বিরোধীতাকে দায়ী করা কতখানি যুক্তিসংগত তা বিবেচনার বিষয়। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব বসু যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিলেন সেইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক পরিচয় প্রকাশিত।" [প্রগতিসাহিত্য, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিতাঃ আধুনিক কবিতার স্বরূপ চেতনা চিত্রকল্প এবং অন্যান্য/ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়]

বুদ্ধদেব বসু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সরব হলেও এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সংঘে যোগদান করলেও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিবাদী বা মার্কসবাদী ছিলেন না। মনুষ্যত্ববোধের মহান প্রেরণা তাঁকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ফলত তিনি ছিলেন মানবতন্ত্রী। সভ্যতার সংকটে কোনো কবির ন্যায় তিনি উদাসীন থাকতে পারেননি এবং তার ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রবন্ধ 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' লেখেন। তবে একথা সত্য যে সমসাময়িক সমাজ তাঁর কাব্যে

অনুপস্থিত নয় বলে তাঁর সমাজচেতনা যে জাগ্রত ছিল এমন বলা যাবে। কবিতার শিল্পগুণ তাঁর লক্ষ ছিল—তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। রাজনীতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি উদাসীন বুদ্ধদেবও মানবসভ্যতার অস্তিত্বের সংকেট ঝলসে উঠেছেন:

মূঢ় যারা, ক্রূর যারা
হিংস্র লোভে অকুণ্ঠ লুণ্ঠনকারী, তারাই তো জয়ী।

(কোনো কবি বন্ধুর প্রতি/দময়ন্তী)

'দ্রৌপদীর শাড়ির' কয়েকটি কবিতা তাঁর সমাজ সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

১. চেক দেশের মানবিক সংকট—

তার চেকদেশ
পিষ্ট হলো হিটলারের বুটের তলায়।

(বিদেশিনী)

২. রাজনীতি ও রাজনীতিবিদ্‌দের অন্তঃসারশূন্যতা:

জেলায় জেলায়
বক্তৃতা, চীৎকার,
চিড়ে গুড় বিতরণ—
দশ টাকা নোটের ছড়াছড়ি
সব ব্যর্থ করে
তোমার পার্টির হার হলো। (বন্ধু)

৩. নিরন্ন উদ্‌বাস্তুর বেদনা অস্তিত্বের সমান্তরাল কলকাতার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বময় জীবন বৈচিত্র্য:

কোনোরকম ভাব নেই চোখে মুখে,
না কষ্ট, না প্রার্থনা, না প্রতিবাদ।
এমনি নিশ্চল চোখে তাকিয়ে, নির্বোধ মুখে তাকিয়ে
কোনো মানুষ কোনো মানুষের স্ত্রী, কোনো
সন্তানের মা।

(উদ্বাস্তু)

৪. এরোপ্লেনের বিধ্বংসী ক্ষমতায় বেদনাহত কবিচিত্ত—মানবতাবাদী কবির ধিক্কার:

যে উন্মত্ত মাৎসর্ব তোমারে
সাজায়েছে নরমেধ যজ্ঞ উপচারে
প্রধান ঋত্বিক
তারে ধিক্—তারে শত ধিক।

(এরোপ্লেন/শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর)

৫. যুদ্ধে রক্তপাতে দীর্ণ বাংলার বুকে অমৃত অন্বেষণকারী:

অন্ধকার যুগসন্ধিকালে
দীর্ঘায়িত মৃত্যুর মশালে
রক্তের ইন্ধন ঢালে
পূর্ব ও পশ্চিম।
জ্বালায় পিশাচ আলো নগরের নির্বাপিত দীপে,
আকাশে, সমুদ্রে, দ্বীপে
শিল্পে, কর্মে, প্রেমে। (উপলব্ধি—ঐ)

যখন উদ্ধত পিশাচ শক্তি, উন্মত্ততা, সর্বগ্রাসী লোভ মানবিক সংকটের জন্ম দেয়, মানবিক সভ্যতার ধ্বংসসাধনে উন্মত্ত হয় তখন কবির মর্মমূলে অনুভূত হয় বাংলাদেশের শ্যামলিম রূপের মহিমা:

৬. যদিও মাতাল শক্তি লিপ্ত আজ ধ্বংসের তাণ্ডবে,
তবু জানি তারি জয় হবে—
সে আদিম শ্যামল শান্তির
আজ যারা দলে দলে
পৃথিবী কাঁপায়ে চলে
বৈশ্যতার জারজ ক্ষত্রিয়—
তারা তো জানে না
হে বাংলা, আমার বাংলা
কী যে অনির্বচনীয়
হৃদয়-মন্থন করা তোমার অমিয়।

বুদ্ধদেবের কবিতায় সমাজচেতনা প্রাসঙ্গিকভাবে অনেক কবিতাতেই আসেনি। তিনি সভ্যতা ও সমাজের সংকটকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু মূল-মানবিক প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। কলকাতার নাগরিক জীবনের প্রতি কবির মমত্ববোধ আছে সেই সূত্রে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, হত্যা হানাহানিতে কবি বিচলিত হন; আর এ উপলক্ষ্যে প্রকাশ ঘটে কবির 'কলকাতা' কবিতায়:

দুর্ভিক্ষ উড়ে এলো। প্রলয়ের ফুলকি এলো ছুটে।
টান পড়ল তোমার স্নায়ুতে, দারুণ বাণ ডাকলো শিরায়
ত্রাসে বিক্ষেপে, উৎসাহের উচ্ছ্বাসে, আর কঙ্কালের কাছে মিশে গেলো।
আমার যৌবনের অন্তিম নিঃশ্বাস।
মানুষের ছিন্নভিন্ন মাংস তোমার বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলো,
ক্ষুধিতের ক্ষীণ গোঙানি ট্র্যাফিকের শব্দে ডুবে গেলো,

ব্ল্যাক আউটে ঘন হাওয়া ঘাস নির্মূল হয়ে মুছে গেছে
উদ্বাস্তুর অস্থির পায়ে পায়ে।
মড়কের সংগ্রাম, হৃদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যের অন্ধকার
ভেদ, বিচ্ছেদ, ফাঁকরের মতো তর্ক, দাঁতে দাঁত ঘষা মতবাদ
বাংলার বিদীর্ণ বুকের উপর ফুটে উঠলো, ঝরে পড়লো
আমার শেষ গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া।

এ জাতীয় কবিতা যিনি লেখেন তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা নেই বললে সত্যের অপলাপ হয় তবে 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থে সমাজচেতনার তেমন অভিপ্রকাশ নেই। এখানে সামাজিক অসংগতিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশিত। মন্দিরের পান্ডাদের হাতে দেবতার বর্তমান অবস্থা 'রাত তিনটের সনেট ১' কবিতায় প্রকাশিত: উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী

ব্যতিব্যস্ত পান্ডাদের জনগণমন, চামর, পাহারা,
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।

'একদিন: চিরদিন' কাব্যের 'দোকানিরা' কবিতায় বণিক সভ্যতার প্রতিভূ, বাণিজ্যের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ লক্ষ করেন:

এই দোকানগুলো দেখতে আমার ভালো লাগে।
এখানে খেলা করে অমর লোভ, সনাতন দম্ভ, অভাবের
সঙ্গে প্রয়োজনের যুদ্ধ চলে, মহিলারা লজ্জা ভুলে
নিজেদের স্তন আর বাহুর ডৌল নিরীক্ষণ করেন;
কাচের জানালায় প্রতিহত হয়ে কত ইচ্ছা মাছির মত মরে যায়।
আর দোকানিরা—তাদেরও আমি লক্ষ্য করি: তাদের
চাটুকারী ভঙ্গি, তাদের গৃধ্নু ও সতর্ক চোখ, আর সেই
সঙ্গে তাদের অপেক্ষার ধৈর্য।

কয়েকটি কবিতায় উচ্চবিত্ত, সামাজিক ক্ষমতাসম্পন্ন চরিত্রের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'এলাদি' কবিতাটি স্মরণীয় সেখানে নিম্নবিত্ত ঠিকা-ঝি হরিমতী ক্রমশ অর্থনৈতিক দুরবস্থার শেষ সিঁড়িতে দাঁড়াচ্ছে।

কোনো কবি সমকালকে এড়িয়ে কাব্য লিখতে পারেন না। কেন-না, সমকালিক অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় চেতনার আলোকে শিখা প্রজ্বলিত করে। তবে শুধু সমকালকে প্রদীপিত করলেই কবিতা যে সমাজসচেতনতামূলক হয়ে উঠবে এমন নয়। বুদ্ধদেব বসু অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি সম্পন্ন কবি বলে কবিতার শুদ্ধতার সঙ্গে একালের অভিজ্ঞতা জারিত করেন। তিনি প্রেমের কবি, আত্মরতিপরায়ণ, শুদ্ধতার কবিতা লিখলেও তাঁর কবিতায় সমাজ, সমকালীনচেতনা এবং ইতিহাসচেতনা অনুপস্থিত নয়। বহির্বাস্তব থেকে তাঁর চোখ ফেরানো নেই। তবে কবিতাকে সামাজিক শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে চাননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) প্রায় এগারো বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটি তাঁর কাছে প্রিয় ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: "রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও আমি পড়িনি তখনও অথবা লেখকের নাম লক্ষ করে পড়িনি, কিন্তু কোনো এক সময়ে—বেশিদিন পরেও হয়তো নয়—আমার বয়স বোধহয় তখন এগারো চলছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটি আমার কাছে স্পষ্ট এবং প্রিয় হয়ে উঠলো।" (আমার ছেলেবেলা)। এই সময় তাঁর পাঠ্যতালিকায় যুক্ত হয়েছে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত চয়নিকা। প্রথম চয়নিকা পড়ার স্মৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন: "এক শীতের সকালে আমরা তখন ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছি—আমার এক অনাত্মীয় ঘরে ঢুকে আমাকে বললেন, 'এই যে তোমার বই'। গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে বের করে দিলেন এক কপি 'চয়নিকা'। ...লেখক-শ্রীরবীন্দ্রনাথ, সম্পাদকের নাম শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বই হাতে পাবার পর আমি হারিয়ে ফেললাম হেম নবীন মধুসূদনকে, এর আগে যত বয়স্ক পাঠ্য বাংলা কবিতা আমি পড়েছিলাম, তার অধিকাংশ আমার মন থেকে ঝরে পড়ে গেলো।" (তদেব) পরবর্তীকালে লিখিত অন্য কোনোখানে উপন্যাসেও 'চয়নিকা' পাঠের স্মৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে: "স্বর্গ, স্বপ্ন। প্রথম ঘুমভাঙা ভোরবেলার না-জাগা-না-ঘুমের স্বপ্ন, স্বপ্ন দিন ভরে, রাত্রে, স্বপ্ন ভেঙে স্বপ্ন। আজি এ প্রভাতে রবির কর—রবি মানে সূর্য? না; রবীন্দ্রনাথ। আর কর? নিশ্চয়ই হাত। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঁকড়ে ধরেছেন মুঠোর মধ্যে, উড়ে চলেছেন আকাশে তাকে নিয়ে, ঝাঁপ দিয়েছেন পাথারে, আঁধার পাথারতলে পাতালে; আবার চলেছেন পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে সপ্তস্বর্গ-পুরে।" বুদ্ধদেব বসুর 'আমার বন্ধু' আত্মজৈবনিক উপন্যাসে চয়নিকা-র পাঠ্যের স্বীকারোক্তি আছে: "চয়নিকা হয়ে উঠলো আমার কাছে একটা অফুরন্ত খনি; এত-ঐশ্বর্য একসঙ্গে পেয়ে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। সেই যে রবীন্দ্রমোহে পড়লাম, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নিতে অনেক, অনেকদিন কেটে গেলো। এখনো কি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পেরেছি? সন্দেহ হয়।" রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' আর 'ছিন্নপত্র' পড়ার স্মৃতি বুদ্ধদেব বসু 'আমার ছেলেবেলা'য় বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের গদ্যবই আমি প্রথম পড়ি 'ডাকঘর' আর 'ছিন্নপত্র'—...'ডাকঘরে'র দৃশ্যপট আমাকে বেশ ভাবিয়েছিল, মনে পড়ে, নীল পাহাড়, লাল রঙের রাস্তা, ঝর্ণার জল—এসব আমার কল্পনায় থাকলেও চোখের পক্ষে অচেনা ছিলো...। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র' ভূগোল শনাক্ত করতে আমার একটি দিনও দেরি হয় নি—।"

১৯২৬-এ বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন। উদীয়মান কবিরূপে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি প্রশস্তি পদ্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেটি স্বয়ং পাঠ না করে সুধীশ ঘটককে পড়বার ভার দিয়েছিলেন। 'আমার ছেলেবেলা'-য় প্রথমবার রবীন্দ্রনাথকে দেখার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। ১৯২৮-এ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাভবনের সভায় বুদ্ধদেব উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এই সভার বিবরণী রূপে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য

সমালোচনা' প্রবন্ধ দুটির সমালোচনা করেন 'প্রগতি' পত্রিকায়। উক্ত সমালোচনায় তিনি লিখেছিলেন: "সেই সভায় আধুনিক সাহিত্যের পক্ষ থেকে যা যা বলা হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সযত্নে বর্জন করা হবে—এরূপ পক্ষপাতিত্ব আমরা কবিগুরুর কাছে প্রত্যাশা করি না।" [উৎস: কল্লোলের কাল: জীবেন্দ্র সিংহ রায়]

১৯২৮-এর আগস্টে বুদ্ধদেব বসুর 'যে দিন ফুটলো কমল' প্রকাশিত হয়। উক্ত উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে ১৯৩৩-এর ২৬ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে লেখেন: "পড়তে পড়তে খটকা লেগেছে পদে পদে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি।" কিন্তু এ সমস্ত কথা বলার পরও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লিখলেন: "এই ত্রুটি সত্ত্বেও তোমার সমস্ত বইটার গৌরব আমি স্বীকার করতে পেরেছি। এতে তোমার প্রতিভার একটি স্বকীয় বিশেষত্ব পাওয়া যায়। তোমার এই গল্পটি বাইরে থেকে নানা উপকরণে সাজানো জিনিষ নয়, এ ভিতর থেকে আপন ভাবপ্রাচুর্যে জেগে ওঠা। আয়োজনের বহুলতায় এর সম্পূর্ণতা বাধাগ্রস্ত হয়নি। ...ভালো লেগেছে এই সহজ কথাটি ছাড়া আর কিছু বলবার কথা নেই।" ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব বসুকে উপরিউক্ত চিঠি লেখার আগে ১৯৩১-এর 'বিচিত্রায়' 'নবীন কবি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রথম ব্যক্ত করেন: "কিছুকাল পূর্বে একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়েছিলুম তখন বুদ্ধদেব বসুর লেখা একখানি কবিতা আমার হাতে পড়ে। সেই সময় তাঁর কিশোর বয়স। মনে আছে লেখাটি পড়ে আমার কোনো একজন সঙ্গীকে বলেছিলুম, এই কবিতার ছন্দ ভাষাও ভাবগ্রন্থনের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে কেবল কবিত্বশক্তি নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে, একদিন প্রকাশ পাবে। ...বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলবার অধিকার আমার নেই। ...দৈবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রথম যে পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে আমার মনের মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল যে, বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে তিনি সম্মান লাভ করবেন। ...কবিতাগুলিতে সংগত স্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী। ...যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হল এ যেন একটি দ্বীপ। ...দ্বীপটি সুন্দর ...কিন্তু নিভৃত। হয়তো ক্রমে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ ...কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ফরমান চলে না।"

দিলীপ রায় প্রেরিত বুদ্ধদেব বসুর তিনটি কবিতা—'বন্দীর বন্দনা', 'কোনো বন্ধুর প্রতি', 'কালস্রোত'– পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করে নিবন্ধ লিখলে 'শনিবারের চিঠি' সেই প্রসঙ্গে খুশি হয়নি। বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যথেষ্ট প্রেরণা দেন। তিনি স্বয়ং ওই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখেছেন এবং বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপও হয়েছিল। ১৯৩১-এর ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপকুমার রায়কে, বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে লেখেন: "বুদ্ধদেবের সংশোধন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। এরা সবাই অক্ষরমাত্রিক ধ্বনিমাত্রিক প্রভৃতি কতকগুলো নাম বানিয়ে কানের প্রভুত্ব নষ্ট করার চেষ্টায় আছে। এ সম্বন্ধে আগামী 'পরিচয়'—এ বিস্তারিত করে লেখার ইচ্ছা রইল।"

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রতিভা বসুর বিবাহ হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। বুদ্ধদেব বসু সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। প্রতিভা বসুর 'জীবনের

জলছবি'—তে তার সুন্দর বর্ণনা আছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন এবং পত্রিকার জন্য একটি কবিতাও প্রার্থনা করেন ৩০.৯.৩৫ তারিখের পত্রে। রবীন্দ্রনাথ ৩.১০.৩৫-এর দীর্ঘ চিঠিতে বুদ্ধদেবকে লেখেন: "তোমাদের কবিতা পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারি দল বাঁধা লেখার মতো হয়নি।" ১৯৩৫-এ বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস 'বাসরঘর' এবং হালকা প্রবন্ধের সংগ্রহ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' তাঁর ভালো লাগেনি এ কথা স্পষ্ট করে বললেন ২৫.১০.১৯৩৫ এবং ৩০.১০.১৯৩৫-এর চিঠিতে।

১. "কল্যাণীয়েষু,

কিছুদিন আগে তোমার 'বাসরঘর' বইখানি পৌঁছেছে আমার টেবিলে। ...তোমার বইখানি নিঃসংশয়ে ভালো লাগল, তাই অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি। গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে। ...চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু তারা জটিলতা বিস্তার করবার অবকাশ পায়নি। ...প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ বইখানি প্রেমের রসনচৌকিতে দুই বাঁশির সম্মিলিত ডুয়েট ...এই তোমার গল্প না বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে।" ইতি ২৫ অক্টোবর, ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন, "বাসরঘর গল্পটিতে ওর (বুদ্ধদেবের) গদ্যরীতির অনেকখানি পরিবর্তন লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হয়েছি।"

২. "তোমার 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' পড়ে মনে হোলো লেখাগুলিতে আলোর ঝলকানি ভালো করে লাগেনি। ...নিজের মতামত প্রকাশ করা সহজ, কেননা সে প্রকাশ নয় ব্যাখ্যা, কিন্তু নিজের মেজাজ, ভালো মন্দ লাগা জৈব পদার্থ, তার সহযোগে নিজেকে ব্যক্ত করবার রসই তার রস।" ৩০ অক্টোবর, ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসার জন্য বুদ্ধদেবকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ১৯৩৮-এর ইস্টারের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলেন। শান্তিনিকেতন ভ্রমণের স্মৃতিচারণ আছে বুদ্ধদেবের 'সব পেয়েছির দেশ' গ্রন্থে। ১৯৩৮-এর আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্যপরিচয় নামক সংকলন গ্রন্থ (শ্রাবণ, ১৩৪৫) প্রকাশিত হলে 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা গ্রন্থটির সমালোচনা করেন বুদ্ধদেব বসু। প্রায় একুশ পাতার দীর্ঘ সমালোচনা এটি। "...বেরোলো বিশ্বভারতী থেকে 'বাংলা কাব্য পরিচয়' আমাদের জন্য গভীরতর নৈরাশ্য নিয়ে, এমন একটি নিশ্চরিত্র সংগ্রহ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক।"

এই সমালোচনটি 'আধুনিক কবিদের ক্ষোভের সামগ্রিক প্রকাশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।' উক্ত সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন: " 'বাংলা কাব্য পরিচয়' ঠিক যে কোন্ জাতের বই সেটা আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে বইটির ভিত্তি ঐতিহাসিক, কেন-না বাংলা কবিতার প্রাচীন যুগ থেকে একেবারে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ গ্রন্থে স্বীকৃত। ...স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন সংকলন কর্তা, তখন বইটি সার্থকনামা হবে, অর্থাৎ এতে সমগ্র বাংলা কাব্যের যথার্থ পরিচয় আমরা নিশ্চয়ই পাবো। আদিরসবর্জনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে

ভারতচন্দ্রের; বাংলার এই প্রধান কাব্যশিল্পী এ গ্রন্থে যেন থেকেও নেই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত—চতুর সুরসিক, ঈশ্বর গুপ্ত, তাঁর সম্বন্ধে কবিগুরুর কার্পণ্য কেন? মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য থেকে বিস্তৃত রকম উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই থাকা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের সমকালের কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেন এই তিনজনই উল্লেখযোগ্য। ...সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে আজকের দিনে আমরা একজন প্রথম শ্রেণির কৃতি কবি বলে মানতে বাধ্য। আর বিষ্ণু দে-র কবিতায় শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম সচেতনতা, ধ্বনিবিন্যাসের এমন চতুরালি ও সর্বোপরি গঠনের এমন দৃঢ়তা আছে যে যাঁদের তাঁর কবিতা ভালো লাগে না তাঁরাও অকপট হলে তাঁর কবিপ্রতিভা স্বীকার করবেনই। বিষ্ণু দে 'বাংলা কাব্য পরিচয়ে' অনুপস্থিত। এ থেকে আমরা এই বুঝব যে বিষ্ণু দে-র কবিতা রবীন্দ্রনাথের একেবারেই ভালো লাগে না, এবং তাঁর লেখার মধ্যে তিনি কিছুই খুঁজে পায়নি।" জীবনানন্দ দাশের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি 'কিছু কেটে ছেঁটে সংকলনে গ্রহণ করায় বুদ্ধদেব বসু তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'মর্মান্তিক অবিচার করেছেন'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু 'নির্বাচনের ভিত্তি'র ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন: "বাংলা কাব্য পরিচয়ে'র উদ্দেশ্য ও পরিধি অত্যন্ত অস্পষ্ট; নির্বাচনের ভিত্তি কী, সে বিষয়ে নির্বাচনকর্তা ভূমিকায় কোনো ইঙ্গিত দেননি, এবং গ্রন্থপাঠের ফলে সে সম্বন্ধে একমাত্র অনুমান এই হয় যে রবীন্দ্রনাথের সময়ে ও তারপরে যে-কোনো ব্যক্তি ছাপার অক্ষরে দু-চারটে পদ্য প্রকাশ করেছে তাকেই সম্পূর্ণ খেয়ালখুশি মতো গ্রহণ কি বর্জন করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচনের কোনো ভিত্তিই নেই।" বুদ্ধদেব বসু যে এমন সমালোচনা করলেন তার কারণ 'সমস্তটাই ভালো এমন একটি বাংলা কাব্য সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমাদের প্রত্যাশা'।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে মুগ্ধতা বুদ্ধদেব বসুর ছিল যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি কবিতার রসে দীক্ষালাভ করার কালে সেই রবীন্দ্রনাথকে দূরে কেন সরিয়ে রাখলেন তাঁর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ১৯৩৫-এ লেখা একটি প্রবন্ধে: "কয়েকটা বছর ইংরিজি কাব্যের বিরাটতরো পরিধি আর নিবিড়তরো বাসনায় মগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের পাতা ওলটাতে ভুলে রইলাম। কাগজে বাঁধাই কবিতার বইগুলো হারিয়ে যেতে লাগলো। সেই সময় বাংলা সাহিত্যে নতুন এক উৎসাহের প্রথম সঞ্চার—আজকাল আধুনিক সাহিত্য বলতে যা বুঝি, তা সেই সময়ে ডালপালা মেলতে আরম্ভ করেছে। বলা বাহুল্য আমি সেই নতুন উৎসাহের সঙ্গে ছড়িয়ে গেলুম: তার একটা নির্ভুল লক্ষণ ছিল রবীন্দ্র-বিমুখতা। আমার মনে সে প্রতিক্রিয়া এসেছিল দুদিক থেকে: একদিকে ইংরেজি কাব্যের বিশাল কল্লোল, যার কাছে রবীন্দ্রনাথকে তখন আমার মনে হয়েছিল শিশুর আধো আধো কথা; অন্যদিকে মোহিতলালের সদ্য প্রকাশিত 'বিস্মরণী'র নিবিড় সংহত শক্তি। প্রথম যৌবনের উত্তাপে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে খুব একটা কড়া গোছের মত কিছুদিন প্রচার করেছিলাম।" অবশ্য রবীন্দ্র-বিরোধী তরুণ কবিকুল ক্রমশ উপলব্ধি করেছিলেন যে 'রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা করা নিছক হাস্যকর'। কেন-না 'বিরোধিতার মুহূর্তেও রবীন্দ্র প্রেরণা তাঁদের চেতনায় কাজ করে চলছিল।' বুদ্ধদেব বসু এর কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন: "প্রয়োজন ছিল সেই মূঢ়তার। যাকে খুব বেশি ভালোবাসি, তার একটু দূরে না গেলে

তাকে ঠিক বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে যাতে মর্মের মধ্যে পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারি, সেইজন্যই কিছুদিন তাঁকে ভুলে থাকবার প্রয়োজন ছিল।"

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৩০.৯.৩৫-এ 'কবিতা' পত্রিকাসহ একখানি চিঠি পাঠান। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে ৩.১০.৩৫-এ শান্তিনিকেতন থেকে বুদ্ধদেব বসুকে লেখেন:

"তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারি দল—বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে।" উক্ত পত্রে তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নীলিমা' কবিতাটির প্রশংসা করেছেন; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার প্রতি পক্ষপাত জন্মানোর কথা বলেছেন এবং জীবনানন্দ দাশের 'চিত্ররূপময়' কবিতাটি যে তাঁকে আনন্দ দিয়েছে তা স্বীকার করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'বাসরঘর' উপন্যাস পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন ২৯.১০.৩৫-এর চিঠিতে: " 'বাসরঘর' সম্বন্ধে আপনার চিঠি পেয়ে সার্থক মানছি লেখকজন্ম।"

১৯৩৮-এর ২৪, ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালনার জন্য গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য: আধুনিক লেখকের অবস্থা' ভাষণে বলেন, "রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এবং পারিপার্শ্বিক এক শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে দেশের একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যধারার অধিকারী হয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলন—আমরা যাকে বলি ব্রাহ্মধর্ম—তিনি তারই প্রবল অনুপ্রেরণা বা উন্মাদনা লাভ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত যা আমাদের এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিখরে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করল।" বুদ্ধদেব বসুর ভাষণটি ছিল লিখিত ও ইংরেজি ভাষায় লেখা। সেখানে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন: ....."Tagore inheritor of a definite tradition, at peace with himself and his world, stimulated by the Hindu-reformation movement, known as Brahmoism, is the peak and final afforescence of our bourgeois culture....

"It seems that the great genius of Tagore absorbed and nearly exhausted the creative and progressive impulses of our bourgeoise culture. For, the writers that followed, whether in prose or in verse followed him blindly, and there was an end of the matter. They adhered to the same set of conventions, but conventions, we repeat, might be useful only so long as they are more or less vitally related to contemporary society. The age that had produced Tagore was long over, and the post-Tagoreans living in a much later age, fell easy victims to literary conventions which were not true to the realities of the day."....

বুদ্ধদেব বসুর এই সমালোচনায় মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (৩০.১২.১৯৩৮) লেখেন: .... "কাল তোমার আর একখানা চিঠি পেলুম। বুদ্ধদেবের সমালোচনা পূর্বেই পড়েছি—সে তোমাকে তাদের দলের বেদীতে বরণ করবার উৎসাহ প্রকাশ করেছে। দরকার ছিল—কেন-না সম্প্রতি সে ঘোষণা করছে আমার সময় চলে গিয়েছে। এখন ভগ্নাবশেষের উপর তাদের সৃষ্টি রচনার জন্যে রাজমিস্ত্রির কাজে তোমাকে পেয়েছে বলে তারা আশ্বস্ত। আজ

আমার একমাত্র এই সান্ত্বনা, আমি যাঁদের দলে পেয়েছি—অর্থাৎ যাঁদের সময় আমার মতোই চলে গিয়েছে তাঁদের নাম মুছবে না—আর সম্প্রতি যাঁরা খালি ঘরে ঢুকে পড়েছেন, যথা—কাজ নেই কথাটা শেষ করে।"... [চিঠিপত্র-১১শ খণ্ড]

অমিয় চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব জেনে বুদ্ধদেব বসু সমগ্র ভাষণটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন এবং নিম্নোক্ত চিঠিটি (২৯.৫.৩৯) লেখেন:

শ্রীচরণেষু,

...পত্রিকাটি আমি নিয়মিত দেখিনে; লোকমুখে শুনলুম ঐ পত্রিকায় একটি খবর বেরিয়েছে যে, আমি নাকি এক বক্তৃতায় বলেছি বাংলা সাহিত্যের অধঃপাতের জন্য রবীন্দ্রনাথই দায়ী। কথাটা এতই হাস্যকর যে এর প্রতিবাদ করাও বৃথা—কাগজের রিপোর্টারদের কলমে যে-কোনো উক্তি কতটা মারাত্মক রকম বিকৃত হতে পারে এ-অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। তা ছাড়া ...কিছুদিন যাবৎ মস্ত হেডলাইন সহযোগে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা চালাচ্ছে—ওরা যে-রকম অভদ্রভাবে আমাকে ভদ্রসমাজে উপস্থিত করে তা দেখলে আমার লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে করে। যাই-ই হোক্ করিমগঞ্জের সাহিত্যসভায় আমি যে প্রবন্ধটি পড়েছিলুম তার একটি কপি এইসঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি—শ্রীহট্ট শহরে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলুম তা এই প্রবন্ধেরই সারাংশ। আমার একান্ত অনুরোধ এই আপনি দয়া করে লেখাটির উপর একবার চোখ বুলোবেন—আধুনিক সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমি এতে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। শ্রীহট্টে আমি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলুম, 'রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করা খুবই শক্ত,' বোধহয় সে-কথাই এমন বিকৃত হয়ে রটেছে।

আপনার চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।।

বুদ্ধদেব বসু

করিমগঞ্জের একটি সাহিত্যসভাতে (১৯৩৯) বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন তা 'সাহিত্যিক প্রগতি' নামে প্রকাশিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রভক্তির আধিক্য এত বেশি যে বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্র-বিরোধী রূপে চিহ্নিত করা অনুচিত। কেন-না, ইতিমধ্যে কোনো কোনো মহলে বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্র-বিরোধীরূপে চিহ্নিত করার আয়োজন শুরু হয়েছিল।

করিমগঞ্জের সাহিত্যসভাতে বুদ্ধদেব বসু প্রদত্ত বক্তৃতাটি করিমগঞ্জের পত্রিকা 'পল্লীবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাহিত্যিক প্রগতি' নামে। উক্ত বক্তৃতায় বুদ্ধদেব বসু যা বলেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল: "...ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলা দেশেই প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিনে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও যৌবন। এই মধ্যবিত্ত এখন সমস্ত বিষয়েই অগ্রণী, দেশের ভবিষ্যতের তাঁরাই নিয়ন্তা। চারিদিকেই তখন আশা ও উৎসাহের আন্দোলন, একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের ফিউডল সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটছে। সেই নবজন্মে ধাত্রীর কাজ যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা আজ আমাদের সকলেরই বরেণ্য, এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁদের মধ্যে অপ্রধান নন। তাঁদেরই কীর্তি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলো।

এই কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি নিঃসংশয় বিশ্বাস পাওয়া যায়, যার পটভূমিকায় আধুনিকদের নাস্তিকতা আজ এমন উগ্র হয়ে ফুটেছে। তাঁর সময়ে, তাঁর সমাজে, তাঁর শ্রেণীতে

তিনি আন্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন, না-হওয়া অসম্ভব ছিলো, শিল্পী হিসেবে এটা তাঁর সৌভাগ্য। যে-কোনো জীবন্ত বিশ্বাস শিল্পীর পরম সহায়ক। মানুষের ও ঈশ্বরের চোখে কবির যে একটি বিশেষ সার্থকতা আছে, এ বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও রবীন্দ্রনাথকে সন্দিহান হতে হয়নি। তাঁর গীতিকবিতার সানন্দ স্বতঃস্ফূর্ততা আজও তাই এমন আশ্চর্য। ...আধুনিক বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথই সৃষ্টি করলেন। তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ আধুনিককালে হয়তো সার্থক নয়, যে-কোনো আদর্শেই একটা সময়ে ভাঙন ধরে। কিন্তু কোনো আদর্শ কি রীতি কি নীতির চাইতে অনেক বড়ো জিনিষ তিনি আমাদের দিয়েছেন; আমাদের মাতৃভাষাই তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। আজ আমরা যারা লিখছি এবং আমাদের পরে যারা লিখবে, চিরকালের বাঙালি লেখক এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী। ...রবীন্দ্রনাথের পরে এবং রবীন্দ্রনাথেরই জন্য বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিকের দিক ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। কোনো ভাষা কতদূর পরিণত, অনুৎকৃষ্ট লেখকের রচনা দিয়েই বোধ হয় তার বিচার ভালো হয়। আমাদের ভাষা যে তৈরি হয়েছে তার প্রমাণ এই যে আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লেখকও শব্দ ব্যবহারের কৌশল জানে বলে মনে হয়। এ কুশলতা তাঁদের নিজস্ব নয়, তা ভাষারই রক্তে মাংসে নিহিত।"

বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় রবীন্দ্ররচনাবলির প্রথম খণ্ডের যে সমালোচনা করেছিলেন সেখানে তাঁর রবীন্দ্রনাথে সমর্পিত মানসিকতার প্রতিবিম্বন ঘটে। উক্ত সমলোচনায় তিনি লিখেছিলেন: "রবীন্দ্রনাথ যে সেই বিরল মানবদের একজন, মহাকবি আখ্যা যাঁদের সম্বন্ধে সত্যই প্রযোজ্য, আজ আর তা নিয়ে কোনো তর্ক নেই। বস্তুত, গত কুড়ি বছর ধরেই এই সত্যটি বাঙালি সমাজে প্রতিভাত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মহিমায় কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি মহৎ তাঁর সমগ্রতায়। ...তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ রীতিকে ও বিষয়বস্তুতে স্বতন্ত্র; নিজের কৃতিত্ব কখন তাঁকে সম্মোহিত করেনি বলে 'ক্ষণিকা'র পর 'বলাকা' পর 'লিপিকা', 'লিপিকা'র পর 'পুনশ্চ', অন্যদিকে 'গল্পগুচ্ছে'র পর 'ঘরে বাইরে' ও 'ঘরে বাইরে'র পর 'পয়লা নম্বর' সম্ভব হয়েছে। ...যাট বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, সাহিত্যের অজস্র রূপ ও রীতি, ভঙ্গি ও সুর তিনি সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভাবন করেছেন আঙ্গিকের অফুরন্ত কলাকৌশল, যা অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্য আজ ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে বিশ্বের সাহিত্য-এলাকায় নিজস্ব মর্যাদার দাবী রাখে।" এই বন্দনা যেমন আছে তেমনি আছে রবীন্দ্ররচনাবলি-র তৃতীয় খণ্ডের চোখের বালি-র পরিণাম সম্পর্কিত নির্মম সমালোচনা "বস্তুত বিনোদিনীর এই তুচ্ছ পরিণাম আমাদের মন কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না, কেবলই মনে হয়। এ মিথ্যা, এ ফাঁকি। শেষ পরিচ্ছেদটি গল্পের অভ্যন্তরীণ উপাদান থেকে অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠেনি; এটি উপর থেকে বসানো হয়েছে।" এ সমালোচনা আরও দীর্ঘ এবং রবীন্দ্রনাথ সেই সমালোচনা পাঠ করে ২০ জুন ১৯৪০-এর চিঠিতে বুদ্ধদেবকে লিখলেন: "তোমাদের কবিতায় চোখের বালির সমালোচনার শেষ অংশে যে মন্তব্য দিয়েছ তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। চোখের বালি বেরবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত।" ১৯৪১-এর মে মাসে বুদ্ধদেব সপরিবারে শান্তিনিকেতনে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এই তাঁর দ্বিতীয়বার ও শেষবার যাওয়া। এর সমস্ত বিবরণ আছে 'সব পেয়েছির দেশ' বইতে।

১৯৬১-এর ৯ মার্চ বুদ্ধদেব বসু কলকাতার অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার পূর্ণাঙ্গ বয়ান প্রকাশিত হয়েছিল প্যারিসের 'টু সিটিজ' নামক পত্রিকার হেমন্ত সংখ্যায়। এখানে প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'Western Influence on Rabindranath'। এই প্রবন্ধটি কলকাতায় তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং দেশ, যুগান্তর, শনিবারের চিঠি ইত্যাদি পত্রিকায় বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে তীব্র শাণিত ভাষায় আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ ও চিঠি প্রকাশিত হয়। অবশেষে বুদ্ধদেব উক্ত প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী' নামে লেখেন এবং পরে 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়। আসলে 'টু সিটিজ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রথম বাক্যটি ছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের; কিন্তু বাক্যটিতে উদ্ধৃতি চিহ্ন না থাকায় যত বিপত্তি দেখা যায়। ১৯৬১-তে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতা প্রদান করেন, সেগুলি পরবর্তীকালে Tagore; Potrait of a poet নামে প্রকাশিত হয়।

যদি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে-বিপক্ষে বুদ্ধদেব বসুর লেখার একটি তালিকা করা যায় তাহলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে লেখার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে লেখার ভার ও ধার তাঁর অনেক বেশি। তাঁর সমগ্র রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে কয়েকটি মন্তব্য সংগ্রহ করা যেতে পারে:

ক. The age of Rabindranath is over [আমাদের কবিতাভবন, বুদ্ধদেব বসু, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত]

খ. তাঁর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের) কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হল তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। [সাহিত্যচর্চা]

গ. নিজের কথাটা নিজের মতো করে বলবে—এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হল। [পূর্বোক্ত]

ঘ. রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্যপথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। [পূর্বোক্ত]

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য-ক্রমান্বয়ে সাজালে দেখা যায়:

ক. আমার কাছে—প্রত্যেক আধুনিক বাঙালি লেখকের কাছে কিন্তু বিশেষ, করে আমার কাছে আপনি দেবতার মতো। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি। [রবীন্দ্রনাথকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, ৩০.৯.৩৩ বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড]

খ. আমরা সকলে আমাদের সম্মিলিত কাব্যপ্রচেষ্টা অপার শ্রদ্ধার সহিত আপনাকেই নিবেদন করতে চাই। বাঙালি লেখকের পক্ষে আপনি যে বরণীয় এ শুধু একটা কথার কথা নয়; অন্তরে, চিন্তায় কর্মে আপনাকে বরণ না করলে যে চলে না এ যে কত সত্য তা শুধু আমরাই জানি যারা বাংলা লেখাবার চেষ্টা করি। [ঐ, ১৪.৮.৪০ পূর্বোক্ত]

গ. রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই। [আধুনিক বাংলার কবিতার ভূমিকা, ১৯৯৮]

ঘ. Rabindranath is our Chaucer and Shakespeare our Dryden,...He has created language, both prose and verse. He has created a new form of the

prose play ; has written an philosophy, education, politics, science ; on prosody, music and the peasantry ; on every question of the day. His verse and prose, his fiction, drama and song, his poetry and his humour are mutually linked and dependent; one is beautiful with the others aid, his greatness is the greatness of the whole...Rabindranath is the world's most complete writer. [An acre of Green Grass, Cal, 1982]

ঙ. The soil is rich, the waters are sweet, and the seed of Rabindranath cannot have been cast vain [Ibid]

চ. তিনি গদ্যশিল্পে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং বিশ্ব সাহিত্যেও গরীয়ান। ...গদ্যশিল্পের এমন ঐশ্বর্য, এমন বিচিত্র বৈভব আর কার রচনায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। একজন কবির বিষয়ে এই কথাটা খুব আশ্চর্য শোনায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অপরিমেয়রূপে প্রতিভাবান ছিলেন সেটা তো তাঁর অপরাধ নয়। [সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৭৭]

'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'হস্তে লীলাকমলমলকে' শ্লোকটি তুলে লিখেছিলেন, "এই শ্লোক শ্রুতিমোহন দৃষ্টিনন্দন, এবং সেই কারণেই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এতে যা বলা আছে তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, বিস্ময়ের আঘাত নেই এতে, নেই মূর্ত ও অমূর্তের কোনো সম্বন্ধ স্থাপন, যার ফলে কবিতা শুধু অধিকৃত হবার বিষয় থাকে না আর, আবিষ্কৃত হবার দাবি জানায়।" এরপর তিনি 'তোমায় সাজাব যতনে কুসুমরতনে' সংগীতটির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "এই পর্যন্ত কালিদাস লিখতে পারতেন, যোগ করতে পারতেন আর কয়েকটি ললিত উপকরণ, কিন্তু তাঁর রচনার সেখানেই সমাপ্তি ঘটত না, যা দৃশ্য ও স্পর্শ বস্তু নয় তার দ্বারা সখীকে সাজাবার কল্পনা কখনোই তাঁর মনে আসত না। 'সখীরে সাজাব সখার প্রেমে / অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে'—এই সব কথা, যা না থাকলে বাংলা এটিকে কবিতা বলেই ভাবতুম না আমরা, কালিদাসে পর লেশমাত্র আভাস নেই।" এমনকি এমন কথাও বলেছেন, "একটিমাত্র মুহূর্তে বৈষ্ণব কবি বা রবীন্দ্রনাথ যা পেয়েছেন, শতোত্তর মন্দাক্রান্তা শ্লোক তাতে বিফল হলো।"

তবে সংস্কৃত কাব্যালোচনা বা অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটা বিরোধ অন্তত এই ছিল যে, তিনি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা উদবুদ্ধ হয়ে রামায়ণ—মহাভারতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন এবং মেঘদূত অনুবাদে প্রদত্ত হয়েছিলেন। সেইজন্য সম্ভবত ভারত আত্মাকে তাঁর আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে তাঁর একটা মৌলিক বিরোধ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিপক্ষে লেখা বুদ্ধদেব বসুর আরও অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব, এবং সেখানে দেখা যাবে বিপক্ষ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই বুদ্ধদেবের লেখা বেশি। অথচ তিনি 'রবীন্দ্র-বিরোধী' বা 'রবীন্দ্র-বিদ্রোহী' রূপে অভিহিত এবং সমালোচিত হলেন। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে পাওয়ার জন্য এবং বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁকে 'রবীন্দ্র-বিরোধী' বা 'রবীন্দ্র-বিদ্রোহী' রূপে চিহ্নিত বা অভিহিত না করে 'রবীন্দ্র-বিলাসী', 'রবীন্দ্র-বিশ্লেষণী' কবিরূপে অভিহিত করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে

ছত্রিশটি চিঠি লিখেছিলেন; বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন উনচল্লিশটি চিঠি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'কল্যাণীয়েষু' রূপে সম্বোধন করতেন, বুদ্ধদেব বসু লিখতেন 'শ্রীচরণেষু'। চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন 'শুভাকাঙ্ক্ষী' বা 'আশীর্বাদক'। সমস্ত চিঠির সমাপ্তিতে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন। এর পরও বুদ্ধদেব বসুকে 'রবীন্দ্রবিরোধী' বলা সংগত কিনা তা ভেবে দেখতে হয়। বুদ্ধদেব বসু দেশেবিদেশে একাধিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, কবিতা-প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক তাঁর গ্রন্থগুলি যথাক্রমে: সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১), রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য (১৯৫৫), Tagore: Potrait of a Poet (১৯৬২), সঙ্গ: নিসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)। তিনি স্বয়ং যেমন লিখেছেন, অন্যকে দিয়ে তেমনি লিখিয়ে নিয়েছেন। 'কবিতা' পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, 'গুরুদেবের শ্রীচরণে'। রবীন্দ্রনাথ যে 'সুসম্পন্ন', 'সুবিচারিত' ও 'বিস্ময়জনক' বলেছেন তাঁর কৃতিত্ব বুদ্ধদেব বসুর প্রাপ্য। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় ছাব্বিশটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে সমালোচনা, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়সহ প্রায় পঁয়ষট্টিটি রচনা তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিরিশ পরবর্তী বাংলা কবিতার কোনো কবি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এত শ্রম করেছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর স্মৃতি বর্ণিত আছে বুদ্ধদেবের 'আমাদের কবিতাভবন' গ্রন্থে: "মেঘলা ছিলো সেই দিন, বৃষ্টিহীন; আমার মন সকাল থেকে উন্মন। রিপন কলেজের জন্য বেরিয়েও অন্য টানে চলে এলাম চিৎপুর পাড়ায়—বেলা তখন এগারোটা হবে হয়তো। আঙিনায় ভিড় জমেনি তখনও, তাই পারলাম অনায়াসে তেতলায় উঠে আসতে; ...ঘরে বারান্দায় অনেক লোক ছড়ানো-ছিটানো, আমার চেনা মুখ অনেক; কিন্তু কারো চোখেই কোনো ভাষা নেই, কারো মুখে কোনো কথা ফুটছে না, ...ধীরে কাটছে মিনিটের পর নিঃশব্দ মিনিটের নিশ্চিতের অপেক্ষায়; হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে অমিয় চক্রবর্তী; চোখের কোণ মুছে তিনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নেই'। ...কিছুক্ষণ পরে—বেলা দুপুর পেরিয়ে গেছে তখন—ভেসে এলো নেপথ্য থেকে চাপা একটা আর্তনাদ—একটাই মাত্র—জানি না সেটা ভক্ত সেবক নীলমণির কিনা—অনেকে তাঁদের হাতঘড়িতে চোখ ফেললেন, চারদিকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো। সেই কক্ষ এখন উন্মুক্ত যেখানে তিনি শয়ান; আবৃত দেহের একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে, বৃহৎ পদযুগল, আর অন্য প্রান্তে উন্নত নাসায় উদার ললাটে শোভমান তাঁর মহান মস্তক—শুধু শ্মশ্রুতে ও কেশগুচ্ছে আর ঘনত্ব নেই, বোধহয় চিকিৎসার কারণে ছাঁটা হয়েছিলো। আমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে একে একে ঢুকছি এক দরজা দিয়ে, বেরিয়ে আসছি প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে অন্য দরজায়।" এই বর্ণনার সঙ্গে 'তিথিডোর' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণদিবসের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়: "মেঘলা হয়ে এলো দিন, চৌরঙ্গিতে আসতে আসতে বৃষ্টি নামল। কিন্তু এসপ্লানেডে এসে বাস দাঁড়ালো যখন, আবার জ্বলজ্বলে রোদ; আর সেই ভিজে নরম আলোয় স্বাতী দেখলো ভিড়ের এক আশ্চর্য আলোড়ন, এসপ্লানেডের পক্ষেও আশ্চর্য। স্যুটপরা আপিসচাকুরে, কালোকোর্তা উকিল, ছাতাহাতে আধবুড়ো বাবুরা, ছিপছিপে ছোকরা কেরানি, ইংরেজ, চিনি, মান্দ্রাজি, পাদ্রি, পার্শি ...সব দিক থেকে আসা-যাওয়া করছে সকলে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ঠিক যেন জানে না, একটু যেন দিশেহারা; আপিশ ছুটি হলেই সোজা বাড়ি

ফিরতে হবে; এই মুখস্থ কথাটা অনেকেই যেন ভুলে গেছে। দেখতে যতই ছিন্নভিন্ন হোক, কলকাতার ভিড় কখনোই লক্ষ্যহীন নয়; প্রত্যেকে জানে কোথায় যাচ্ছে আর কেন যাচ্ছে; কিন্তু সেই লক্ষ্য, লক্ষ্যের নিশ্চয়তা আজ হারিয়ে ফেলেছে সবাই—আর সেইজন্যই আশ্চর্য, অদ্ভুত এই ভিড়।"

১৯৪৪-এ বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র মেমোরিয়েল কমিটির কাজকর্মের সমলোচনা করে লিখেছিলেন: "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আমরা লিখেছিলাম যে বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্য একটি পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের নামে স্থাপিত হওয়া উচিত। ...ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিবিধ সাহিত্য পুরস্কারের প্রবর্তন হয়েছে, অথচ যে বাংলাদেশ সাহিত্যবিষয়ে চির-অগ্রণী, যে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সেই দেশের ও সেই ভাষার সাহিত্যের জন্য আজ পর্যন্তও একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা হলো না।" একথা বলেছিলেন তিনি 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র ১৩৫১-তে সম্পাদকীয়তে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা করতেন বুদ্ধদেব বসু। এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায় ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে। সাধারণত বাংলা কাগজে সমালোচনা অত্যন্ত ফিকে হয়—তোমার লেখার মধ্যে বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকটাই ফাঁকি বলে মনে হয় না। তোমার প্রবন্ধে আমার প্রশংসার কথা পেলুম সেটা নিঃসন্দেহ আমার পক্ষে উপভোগের বিষয়। কিন্তু এর মূল্য হচ্ছে তোমার রচনা মূল্যে।" 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যাটি রবীন্দ্রসংখ্যা রূপে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীত হয়ে ১৪.৫.১৯৪১-এ বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন:

"কল্যাণীয়েষু

আমাকে অবলম্বন করে এবারকার কবিতা পত্রিকায় সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তেমন সুসম্পন্ন ও সুবিচারিত প্রবন্ধ ইতিপূর্বে কোনো বাংলা পত্রিকায় আমি দেখিনি, এ আমার পক্ষে বিস্ময়জনক।

[৩১ বৈশাখ ১৩৪৮] শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ।"

বুদ্ধদেব বসু ৩.১১.৩৬ তারিখে গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: "গদ্যছন্দ সম্বন্ধে এখনো কোনো প্রামাণ্য আলোচনা হয়নি, হওয়া নিতান্ত দরকার। সে আলোচনা করবার একমাত্র অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশের বেশিরভাগ পাঠক ও সমালোচক গদ্যছন্দের মনে প্রাণে বিরোধী। বুঝতে পারি এটা তাঁদের অন্ধ প্রেজুডিস—ইংরিজি ফ্রি ভর্স কি আরো অত্যাধুনিক উচ্ছৃঙ্খলতা সবই মানবেন, কিন্তু বাংলা গদ্যছন্দকে বাতিল করে দেবেন পিঠ চাপড়ানো অশ্রদ্ধায়। এ সংখ্যার 'পরিচয়ে' আপনার নতুন কবিতার বইয়ের সমালোচনাচ্ছলে স্পষ্টই তো বলা হয়েছে—গদ্যছন্দ জিনিসটাই রাবিশ, তবে নেহাৎই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বলেই প্রাণ খুলে নিন্দে করতে পারলুম না, গদ্যছন্দে কচুরিপানার মতোই উৎপাত, তবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন লেখেন তখন চুপ করে সইতে হয়।" রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন ৬.১১.১৯৩৬-এর একটি চিঠিতে: "গদ্যকাব্য সম্পর্কে তর্ক না করে যথেচ্ছা লিখে যাওয়াই ভালো। আজ যারা আপত্তি করচে কাল তারা নকল করবে। এলিয়ট প্রমুখ কবি নির্মল নিছন্দ কবিতা লিখে চলেছেন।" রবীন্দ্রনাথ কবি জীবনের অন্তিম পর্বে কাব্যে গদ্যছন্দের যে প্রবর্তনা

করলেন বুদ্ধদেব প্রথমাবধি তার সপক্ষে ছিলেন এবং এবং অনেক প্রবন্ধও লিখেছেন। কিন্তু এই নতুন রীতিকে অনেকে উপলব্ধি করতে পারেননি; আবার ব্যর্থ অনুকরণেও রত হয়েছিলেন। 'পরিচয়'-এর ১৩৪৩ কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল অন্যদের সঙ্গে সহমত হয়ে গদ্যকবিতার নামে যে সব লেখা হচ্ছে সেই 'জঞ্জালস্তূপের জন্য' আপত্তি জানান। বুদ্ধদেব বসু ১৩৪৩-এর চৈত্র সংখ্যার 'কবিতা' পত্রিকায় এর প্রত্যুত্তর প্রদান করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে চিঠিটি লেখেন।

বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য' (১৯৫৫), 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩), 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬)-এই ত্রয়ী গ্রন্থে সমালোচনার নতুন মানদণ্ডে স্থিরীকৃত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বুদ্ধদেব বসুর স্মরণীয় মন্তব্যগুলি উদ্ধার করলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে:

১. "রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই জাতের লেখক, সমগ্রভাবে না দেখলে যাঁকে চেনাই যাবে না। তিনি যে একজন মহাকবি, বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, এ নিয়ে বাংলাদেশে আজকের দিনে আর তর্ক নেই।" [রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য]

২. "রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হবার দ্বিতীয় বিপদ তাঁর সর্বমুখিতা। সর্বতোভাবে কবি—আবার সেই সঙ্গে এমন কী আছে যা তিনি নন, সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কোন উপাধি আছে যা তাঁর প্রাপ্য নয়? নাট্যকার, গীতকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, পথ-ভ্রমণ-কথোপকথনে কারুশিল্পী—এমনকি গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক।" [তদেব]

৩. "রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে মানবজীবনের সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।" [তদেব]

৪. "বারবার তিনি নবজাত, প্রায় সত্তর বছর পরে আবার তাঁর এক নতুন জন্ম। আবার হার মানতে হলো তাঁর কাছে, সেই আনন্দে তাঁকে প্রণাম জানালুম।" [তদেব]

৫. "বাংলা সাহিত্যে এই অঘটন ঘটলো যে আমাদের ভাষার যিনি কবিগুরু এবং যাঁর সমকক্ষ কবি আবহমান ভারতে আর নেই, তিনিই আমাদের গদ্যরীতির স্রষ্টা।"

[সঙ্গ: নিসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ]

৬. "তিনি গদ্যশিল্পে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং বিশ্বসাহিত্যেও গরীয়ান।" [তদেব]

৭. "রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন যা হয়েছে সেই নতুন সম্ভব হয়েছে তারই জন্যে; এবং বাংলা ভাষায় যতদিন পর্যন্ত কবিতা লেখা হবে, তিনিই ভাষার আদি উৎস বলে স্বীকৃত হবেন।"

[তদেব]

৮. "তিনি সেই স্থায়ী ও সুন্দর রূপকল্প, যার মধ্যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাগুলি গৃহীত হলো, যেন পূর্বসূরিদের বহুমুখী প্রচেষ্টার শেষ ফল তিনি, যেন তাঁকে সম্ভব করে তোলার জন্যই সেই যুগের বহুমুখী পরিশ্রম। এমনি, আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ।" [তদেব]

৯. "রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে ভোগ করা যায়; ...বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড কুলোয় না তাকে।" [সাহিত্যচর্চা]

১০. "আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি।" [তদেব]

বুদ্ধদেব বসুর বহু কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ যেন সংগোপনে ছায়া ফেলে যান। বুদ্ধদেবের 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' যেন রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাকে স্মরণ করায়। বৃপান্তর, কার্তিকের কবিতা ইত্যাদিতে রবীন্দ্র-ভাবনার অনুষঙ্গ লক্ষ্যগোচর। বার্ধক্য ও যৌবনের প্রতি তুলনা বিষয়ক যে সমস্ত কবিতা 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থে আছে সেখানেও রবীন্দ্র-ভাবনার ইঙ্গিত থেকে যায় 'ভাবাসঙ্গো ও প্রকাশরীতিতে'।

১. "রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর থেকে বহুদূরে অবস্থিত বুদ্ধদেবের পৃথিবী,—ইন্দ্রিয়বেদনপূর্ণ বস্তুকঠিন জন্তুপ্রতিমায় পরিকীর্ণ; তবু রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরপুরুষ বুদ্ধদেব—তাঁর অগণিত রোমান্টিকতায় অথবা পরিণতির আধ্যাত্মিকতায়।" [কবির চোখে কবি / সুতপা ভট্টাচার্য]

২. "রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করে বুদ্ধদেব সেখানে নতুন হয়ে উঠেছেন। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে বুদ্ধদেবই বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক শিল্পাদর্শের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন আজীবন। তাঁর ব্যাপক ও গভীর রবীন্দ্রচর্চা রবীন্দ্র-প্রীতির আর এক নিদর্শন। এমনকি কবিতায় যখন তিনি রাবীন্দ্রিক আদর্শের থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছেন, সে মুহূর্তেও রবীন্দ্র-অন্বেষায় তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথকে মর্মমূলে ধারণ করে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার এক অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী কবি বুদ্ধদেব।"

[রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা / পিনাকেশ সরকার]

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডে পরিশিষ্টাংশে বর্জিত কবিতাবলি অধ্যায়ে ২২ শ্রাবণে' 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' (১. প্রাণে মোর আনো তব বাণী। ২. একে একে খসে পড়ে। ৩. যায় না এমন দিন যেদিন তোমারে) কবিতাটি আছে। 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থেও 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি কবিতা আছে। তবে 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' (রচনা ২১ এপ্রিল ১৯৫৫) কবিতার ভাবনার সঙ্গো '২২ শ্রাবণ' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির দুস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। '২২ শ্রাবণ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির রচনাকাল ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯। উক্ত কবিতাটি লেখার মাত্র একবছর আগে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ঘটেছে। চারিদিক মহাযুদ্ধের ভয়ংকর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন—মানবসভ্যতার সেই দারুণ দুর্দিনে অনুজ কবি বুদ্ধদেব স্মরণ করলেন অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথকে। মানব সভ্যতার নিদারুণ অবক্ষয়ের দিনে, মহাযুদ্ধের ভয়ংকর বিধ্বংসী দিনগুলিতে, ফ্যাসিবাদের পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই কবির মনে উদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিঃসীম সাহসী ভূমিকা। তাই তাঁর দৃষ্টিতে তিনি বন্ধু ও প্রিয়তম। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা কবির চিত্তদেশে আমূলভাবে প্রোথিত বলে রবীন্দ্রনাথের উজ্জীবনী গায়ত্রীমন্ত্রে চিরবিশ্বাসী, চিরদীক্ষিত বলে বুদ্ধদেবের পক্ষে নারকীয় পরিবেশে বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়েছে। নবজীবনের আশ্বাসে উদয়শিখরে যে মাভৈঃ বাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আজীবন উচ্চারিত বুদ্ধদেবীয় মানসিকতা তার অমৃতনিস্যন্দী বাণীতে চির অভিস্নাত বলে বুদ্ধদেব দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাসের সঙ্গো প্রাণিত হয়ে উচ্চারণ করলেন:

অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাইতো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

বুদ্ধদেবের এ বক্তব্যের সারসত্য হল, তিনি মানবিক সংকটে পতিত মানবসভ্যতার মুক্তির সম্ভাবনা দেখলে রবীন্দ্রজীবনদর্শনে। এ মুক্তি শুধু ব্যক্তি আমির মুক্তি নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার মুক্তি যে রবীন্দ্রদর্শনে নিহিত, তাও পরোক্ষে প্রকাশিত।

বুদ্ধদেব মূলত রোম্যান্টিক কবি; তবুও মাঝে মাজে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন সমাজসচেতন পরিমণ্ডলে—যেখানে তাঁর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবি, শিল্পী, যেখানে তাঁর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবি, শিল্পী ধ্যানী মরমি সত্তাপেক্ষা দেশপ্রেমিক, সমাজসচেতন, মানবতাবাদী সত্তা অনেক বড়ো। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর কাছে আশ্রয় হয়ে যান—জীবনব্যাপী আশ্রয়—'আমার প্রথম প্রেম, সর্বশেষ প্রেম তাও তুমি'। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় উচ্চারিত বুদ্ধদেবের যে রবীন্দ্র-দীক্ষামন্ত্র—যা তাঁকে প্রাণের মহিমায় পূর্ণ করেছে তা কিন্তু শুধু সমকালীনতার ফসল নয়; কেন-না 'বন্দীর বন্দনা' রচনার যুগে রবীন্দ্র-বিরোধিতার কালেও বুদ্ধদেব লিখেছিলেন:

রবীন্দ্রঠাকুর শুধু আজি হতে শতবর্ষ পরে
কবি রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন ঋতু
সকল লোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. কবির চোখে কবি / সুতপা ভট্টচার্য।
২. রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা / পিনাকেশ সরকার।
৩. উত্তরসূরিদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ / পিনাকী ভাদুড়ী।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত বাংলা কাব্যপরিচয় / ভূমিকা ও তথ্যসংকলন: সুমিতা চক্রবর্তী।
৫. বুদ্ধদেব বসুর জীবন / সমীর সেনগুপ্ত।
৬. রবীন্দ্রোত্তর কবিতা: অন্তরঙ্গ পাঠের আলোকে / ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটো গল্পঃ কবিতা ও কাহিনির দোলাচল

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম কবিব্যক্তিত্ব, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু বেশ কিছু গল্পও রচনা করেছেন; তাঁর গল্প-সংকলন, স্বনির্বাচিত গল্প এবং জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ গল্প বাদ দিলে তাঁর গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় বাইশ। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর বারোখণ্ডের রচনা সংগ্রহে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ খণ্ডে গল্পগুলি সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' সংকলনে মোট গল্প আট; 'রজনী হলো উতলা' একটি বড়ো গল্প। দ্বিতীয় খণ্ডে 'রেখাচিত্র' গল্প সংকলনে আটটি গল্প, এবং 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' শীর্ষক একটি সংকলনে চারটি গল্প আছে। এখানে পরিচ্ছেদ ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতি পরিচ্ছেদে একটি করে গল্প; প্রত্যেক গল্পের পৃথক নামকরণ। চতুর্থ খণ্ডে 'অদৃশ্য শত্রু'তে সাতটি গল্প। পঞ্চম খণ্ডে 'মিসেস গুপ্ত' গল্প সংকলনে সাতটি এবং 'ঘরেতে ভ্রমর এলো'-তে আটটি গল্প আছে। ষষ্ঠ খণ্ডে 'খাতার শেষ পাতা' সংকলনে গল্প সংখ্যা দশ এবং 'পদ্মার ঢেউ', 'টান' ও 'ঝুঁট' নামে আরও তিনটি গল্প আছে। অষ্টম খণ্ডে 'গল্পগুচ্ছে' দশটি গল্প আছে। দ্বাদশ খণ্ডে 'প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্পে' সাতটি গল্প আছে।

'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প'-এর রচনাকাল ১৩৩৪-১৩৩৬। প্রথম প্রকাশ খ্রি: ১৯৩০। ওই সময় তিনি লিখছেন 'সাড়া' উপন্যাস এবং 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থ। এই গল্পগ্রন্থের আটটি গল্পই ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, কল্লোল, উত্তরা ও প্রগতিতে প্রকাশিত। গল্পগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৩০। এই পর্বের গল্পের চরিত্রগুলি সমস্তই উচ্চবিত্ত, ইংরেজি শিক্ষিত; আধুনিক-আধুনিকার মেলামেশার কাহিনি গল্পগুলির বিষয়বস্তু। সবকটি গল্পই প্রেমের গল্প। 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং জানিয়েছেন—"১৩৩৪ থেকে ৩৬ সালের মধ্যে আমার যে সমস্ত গল্প বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে এক মেজাজ ও স্টাইলের আটটি গল্প একত্র করে এই বই তৈরি হলো। এই গল্পগুলো যে শুধু দপ্তরির সুতো দিয়ে একত্র বাঁধা নয়; এদের মধ্যে যে বিষয়গত ও ভাবগত অন্তরঙ্গ মিল রয়েছে; তা বুদ্ধিমান পাঠককে বলে দিতে হয় না। 'প্রথম ও শেষ' ও 'যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন' ভারতবর্ষে, 'তথৈব' বিচিত্রায়, 'অভিনয়, অভিনয় নয়' ও 'ছেলেমানুষি' কল্লোলে, 'বোন' উত্তরায় এবং 'পুরাণের পুনর্জন্ম' প্রগতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পুরাণের পুনর্জন্ম' রচনার একটু ইতিহাস আছে। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে যখন আমি ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত 'প্রগতি' চালাতে আরম্ভ করলাম, তখন আমাদের সেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মহৎ চেষ্টায় একজন সদ্য ইউরোপ ফেরত হার্ভাডের এম. এ ও লন্ডনের পি. এইচ. ডি-র কাছ থেকে অনেক উৎসাহ ও সাহায্য পাই; তিনি আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীপ্রভু গুহঠাকুরতা। 'প্রগতি'র পেট ভরাবার জন্যে নানারকম নতুন খোরাক উদ্ভাবন করতে প্রভুবাবু ছিলেন অসাধারণ; পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটাবার প্রস্তাব তাঁর অনেক আইডিয়ার একটিমাত্র। ...আমাদের প্ল্যান হল বিংশ শতাব্দীতে পৌরাণিক চরিত্রের পুনরাবির্ভাব ও পৌরাণিক ঘটনায় পুনরাভিনয় করানো;

...আমাদের প্রথম মনোনয়ন পড়লো উর্মিলার উপর; কারণ অবিশ্যি রবি ঠাকুরের প্রবন্ধ। বাল্মীকি থেকে একেবারে দূরে সরে না গিয়ে প্লটটাকে যতদূর আধুনিক করা যায়, আমি আর প্রভুবাবু বসে ঠিক করলাম। ...গল্পটি নিজের নামে প্রকাশ করতে আমার একটু কুণ্ঠা হলো। ...তাই বিপ্রদাস মিত্র ছদ্মনামে 'পুরাণের পুনর্জন্ম' প্রগতিতে দেখা দিলো। বিপ্রদাস মিত্রর আশা এবং ইচ্ছে ছিলো, রাম, সীতা, ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সফল নায়ক-নায়িকার গা থেকে কবিত্ব এবং দেবত্বের বস্ত্র হরণ করে বাংলা ভাষার একমাত্র বিরাট Satire রচনা করা; কিন্তু মাস গেলো, বছর গেলো, বিপ্রদাস মিত্র আর লিখলেন না। আর একজন লেখক প্রগতিতেই লক্ষ্মণের পুনর্জন্ম ঘটালেন, কিন্তু বিপ্রদাস মিত্র আর লিখলেন না।" [১] বুদ্ধদেব বসু আর একজন লেখক বলতে বিষ্ণু দে-কে বুঝিয়েছেন। 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' সংকলনের এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৮-এর সংখ্যার। সমালোচনা করেছিলেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। উক্ত সমালোচনায় তিনি 'পুরাণের পুনর্জন্মের' উর্মিলা গল্পটিকে 'নতুন রীতিতে লেখা' গল্প বলেছিলেন। "গল্পের উর্মিলা আধুনিক জগতে বিচরণ করে যে নিরবচ্ছিন্ন ও নৈরাশ্যময় উপেক্ষার ভার প্রতিনিয়ত বহন করেছেন তা লেখায় অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।" [২] আলোচ্য গল্প সংকলনের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের আমদানি করলেও গল্পকার বুদ্ধদেব বসু যে রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করেছেন এমন বলা যাবে না। 'প্রথম ও শেষ' গল্পটিকে রবীন্দ্র-প্রভাবের নিদর্শন বলা যেতে পারে। লেখক রবীন্দ্রনাথকে বা রোমান্টিসিজমকে অতিক্রম করতে গিয়ে চাইলেও তা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলকাহিনি অংশ গৌণ হয়ে গেছে। 'প্রথম ও শেষ' গল্পে নারী-হৃদয়ের প্রেমপ্রতীক্ষার বেদনা ঝংকৃত। লেখকের অনন্য-সাধারণ নির্মাণ ক্ষমতা নায়িকার প্রেম-প্রতীক্ষায় যে ট্র্যাজিক নির্মমতা সঞ্চার করেছে তা অতুলনীয়। "গল্পটি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হতে হয়, কিন্তু এর ওপর রবীন্দ্র-প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর ভাষার বিন্যাসে, এর জল, নদী, বর্ষার বর্ণনায়, এর পরিত্যক্ত পুরাতন বাড়ির রহস্য-গভীর চিত্রাঙ্কনে, সর্বত্র রবীন্দ্র-প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের কলম তুলে নিয়ে লেখক রচনা করেছেন এই গল্পটি। এটা কোন অগৌরবের কথা নয় বরং গৌরবেরই, কেন-না লেখক রবীন্দ্র-প্রভাবকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে আপন বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা সমুজ্জ্বল করেছেন।" [৩] বুদ্ধদেববসুর গল্পে রিয়ালিজম্ অপেক্ষা রোমান্টিসিজম্ অনেক বেশি। আলোচ্য গল্পসমূহেও তা অনুপস্থিত নয়। আলোচ্য গল্প সংকলনের গল্পগুলি রবীন্দ্র-প্রভাবিত রোমান্টিক ও বুদ্ধদেবের নিজস্ব ঢং-এ রোম্যান্টিক হলেও "একটি জিনিস এই গল্পগুলিতে বড়োই কর্কশ হয়ে উঠেছে, সে হচ্ছে লেখকের বিষম নারীবিদ্বেষ। বুদ্ধদেবের নারী কামের কাছে মূঢ়, শক্তিহীন। বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে পতঙ্গের মতো এরা পোড়ে না, কামের সামান্য স্পর্শেই এরা হয় ধরাশায়ী। স্পর্শও নয়, এদের দ্বিধা-সংকোচ জয় করতে প্রয়োজন মাত্র সামান্য একটি ইঙ্গিত, সামান্য একটু অভিনয়। নারীর এ দৃশ্য দেখে লেখক যে মর্মাহত হয়েছেন তা নয় বরং তাঁর শ্লেষ ভীষণ নির্মম হয়ে উঠেছে।" [৪] অবশ্য বুদ্ধদেব বসুর গল্প সম্পর্কে এটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তাঁর প্রতিভায় বাংলা গল্পের অভিনব জন্মান্তর। ভাষায় এবং লেখবার রীতি-পদ্ধতিতে তাঁর অসামান্য শিল্প

ক্ষমতা সংলক্ষ্য। তাঁর জানা আছে গল্পের সূচনা আর সমাপ্তি। ঘটনাবস্তু কোনোখানে প্রত্যাহৃত হবে, চরিত্র কোন্ ছন্দের তালে এগোবে—এসমস্তই তাঁর জানা।

'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' সংকলনের গল্পগুলিতে চরিত্রের আয়োজনও বিশাল। অনেক প্রধান-অপ্রধান চরিত্রের আয়োজনও বিশাল। অনেক প্রধান-অপ্রধান চরিত্রের ভিড়ে গল্প হারিয়ে যায়।

১. প্রথম ও শেষ—লীনা, নীলা।

২. যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন—গল্পকার স্বয়ং উত্তম পুরুষে, ভদ্রলোক ১ ও ২, ম্যানেজার, অভিলাষ, অভিলাষের বন্ধু, অভিলাষের মা-বাবা-দাদা-বউদি, ছোটো বোনেরা।

৩. তথৈব—পরিতোষ, শ্রীহর্ষ, ইলা, অতসী, সুরথ, সাহেব (শ্রীহর্ষের অক্সফোর্ডের সঙ্গী)।

৪. অভিনয় –প্রতুল, বিজন, বিনু ও তার স্বামী।

৫. অভিনয় নয়—প্রতুল, বিজন, রমা, সুধীর।

৬. ছেলেমানুষি—শংকরচন্দ্র মিত্র, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭. বোন—ডলু, খুকু, পারুল, কমল, লিলি, প্রিটি, অমলা।

৮. পুরাণের পুনর্জন্ম—ঊর্মিলা, সীতা, রাম, দশরথ, জনক সিং, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুমন্ত।

'রজনী হলো উতলা' গল্পে শুধুমাত্র লেখক ও নীলিমা চরিত্র।

উল্লিখিত চরিত্রগুলি মূলত রোম্যান্টিক। 'প্রথম ও শেষ' গল্পে প্রেম সম্পর্কে লীনার রোম্যান্টিক ধারণা ব্যক্ত। অভিজাত পুরুষকে দেখা মাত্রই সে হৃদয় সমর্পণ করে অথচ তার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে সে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে। 'তথৈব' গল্পের নায়ক শ্রীহর্ষ রবীন্দ্র-ভাবনায় ভাবিত না হলেও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ না করে পারে না—"রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই খ্যাপার মতো সে [অতসী] যতই না কেন তার পানে হাত বাড়িয়ে কাঁদুক, কখনো নাগাল পাবে না"। তবে 'প্রথম ও শেষ' গল্পে বুদ্ধদেব বসু ফরাসি বিপ্লবকে মানব সভ্যতার প্রথম শত্রুরূপে কেন নির্দেশ করলেন তা বোধগম্য হল না—"তারপর এলো মানুষের সভ্যতার প্রথম শত্রু—ফরাসি বিদ্রোহ। উন্মত্ত বর্বর জনসংঘ গিলোটিনের নিচে—শুধু ষোড়শ লুইকে নয়, মানুষের শত-শতাব্দীর দুরূহ সাধনালব্ধ সৌন্দর্যচর্চাকে জবাই করলে।" মনে হয়, বুদ্ধদেব মানুষের পেটের ক্ষুধাকে বড়ো করে না দেখে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসের দিককেই বড়ো করে দেখেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্ব মুখ্য ছিল। অবশ্য কলাকৈবল্যবাদী বুদ্ধদেবের ভাবনা যে এইরকমই হবে—এটাই স্বাভাবিক। 'অভিনয় নয়' গল্পে নারী ও প্রেম সম্পর্কে প্রতুলের ধারণা অসংগত ও অযথার্থ বলা যেতে পারে—"হাজার হোক মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ। জল যে পাত্রে রাখো, তারই আকৃতি ও রং ধরবে।" 'বোন' গল্পে অমলার জৈব বাসনা-কামনা উৎসারিত। বুদ্ধদেব বসু যতই রবীন্দ্র বিরোধিতা করুন না কেন এ সমস্ত অংশে রবীন্দ্রনাথ মনে হয় সচেতনভাবে উপস্থিত। 'রজনী হলো উতলা' একটি রোম্যান্টিক গল্প। এ গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি বর্ণনা ও তার পটভূমিকায় নারীর দেহরূপ বর্ণনা, জৈবকামনার বাঙ্ময় প্রকাশ—১. "ওদিকে হয়তো রঙের হোলিখেলা চলছে—কিন্তু আমাদের দিকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে এলো—নিখিল গগনব্যাপী এক নিষ্ঠুর নিশাচর পাখির ডানার মতো।

২. যে বয়সে একটুখানি শাড়ির আঁচল দেখলেই বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, একটু চুড়ির রিনিঝিনি শোনবার জন্য মনটা যেন তৃষিত হয়ে থাকে।"

৩. "প্রজাপতির ডানার মতো কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কী কমনীয় হয়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কী মনোরম, অশোকগুচ্ছের মতো নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ—কী সে উত্তেজনা, কী সর্বনাশা সেই সুখ, তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা।"

'রজনী হলো উতলা' গল্পটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হলে গল্পটিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তার বিবরণ পাওয়া যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে। তবে এ গ্রন্থের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আন্দোলন করেছিলেন সজনীকান্ত দাস। 'রজনী হলো উতলা' গল্পে অশ্লীলতা কিন্তু এসেছে স্বাভাবিকভাবেই—একে অশ্লীলতা বলা যাবে কিনা তা বিতর্কিত "এইসব বর্ণনা গল্পে এসেছে কামাতুরতা ও সম্ভোগ উভয় প্রসঙ্গেই। বেশ কিছু গল্পে লেখকরা কামাতুরতার আবহাওয়া রচনা বিস্তৃত আয়োজন করে, ধীরে ধীরে মানুষের আদি স্বভাবের দিকে পাঠকের মনকে টেনেছেন—তাতে কাহিনীর সুরটি বাঁধা হয়েছে শারীরিক জগৎকে কেন্দ্র করে। সেই সব ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে দেহের বর্ণনা।"[৫] বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার আয়োজনের সঙ্গে কবিজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাসেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। "বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হলো উতলা' গল্পে প্রতি রজনীর অন্ধকারে অজ্ঞাতনাম্নীর সঙ্গে সম্ভোগলীলার শেষে তার পরিচয় জানবার ভীষণ আগ্রহ হয়েছে নায়কের। কিন্তু নিজের শরীরটাকে উজাড় করে দিয়েও পরিচয়ের আলোকে নায়িকা ধরা দেয়নি। তার পরিণামে নায়িকার নাম রূপকে অবলম্বন করে যে প্রেমের জাগরণ সম্ভব ছিল তা হয়নি। রাত্রির কামকেলির ফল হল নায়কের দৈহিক ও স্নায়বিক অসুস্থতা। মনে হয়, নায়ক দেহের বন্দিদশা থেকে খুঁজেছে মনের আকাশকে, অন্ধকার থেকে খুঁজেছে আলোকে, সম্ভোগ থেকে খুঁজেছে প্রেমকে। আর সেখানে ব্যর্থ হলেও নতুন নায়িকা নীলিমাকে সে অন্ধকারে রাখতে চায়নি—'আমি নীলিমার হাত ধরে সেই অন্ধকারের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম'। এখানে উত্তরণের ইঙ্গিত কি নেই"।[৬] বুদ্ধদেবের আলোচ্য পর্যায়ের গল্পে মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি কারণের জন্য সাংকেতিকতা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে আলোচনামূলক ও প্রবন্ধাত্মক রীতি। এ প্রসঙ্গে 'রজনী হলো উতলা' এবং 'অভিনয়' ও 'অভিনয় নয়' গল্পের উল্লেখ করা চলে। "বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হলো উতলা'য় আলো অন্ধকারের জীবন প্রসঙ্গে এই সাংকেতিকতার নিদর্শন আছে। দ্বিতীয়ত তাঁরা জীবন ও আত্মার সেই মূলগত রহস্য ধরতে গিয়ে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। মানুষের বাহ্য আচার-আচরণ ক্রিয়া-কর্মের অন্তরালে যে নিঃসঙ্গ গভীর অতলান্ত মনোজগৎ আছে তা এঁরা কখনো-কখনো তীক্ষ্ণাগ্রে ভাষা ও সূক্ষ্মতাধর্মী বিশ্লেষণ ভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই মনঃ সমীক্ষণের প্রয়াস কতকটা অনিবার্যভাবেই বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয়' ও 'অভিনয় নয়' গল্পে একটা আলোচনামূলক ও প্রবন্ধাত্মক রীতি এনে ফেলেছে।"[৭]

'রেখাচিত্র' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে চরিত্রের আয়োজন কমার মুখে।

১. রেখাচিত্র—লেখক, রমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী, ভগ্নী ও তাঁর পুত্রকন্যারা এবং মঞ্জুশ্রী।

২. ছায়াচিত্র—লেখক স্বয়ং, হরিপদ, নীরজা সেন।

৩. জ্বর—রমাকান্ত, সুধা, সতীশ রায়, রামগতি, হরিপদ সরকার, দ্বিজেন হেমন্ত।

৪. আত্মহত্যা—সুপ্রকাশ সরকার, সুমিতা দেবী, মা, বাবা।

৫. গৃহ—লেখক, রমেশ, লীলা।

৬. মেজাজ—লেখক, ভদ্রলোক, বউদি, টুকু, মা।

৭. রাত বারোটার পরে—অসিত, নীলিমা, নরেন।

'রেখাচিত্র' গল্প সংকলন গ্রন্থটি ব্যতীত 'এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে' গল্পগ্রন্থটি এই পর্বে স্মরণীয়। 'সাড়া' উপন্যাসটিও এই পর্বের রচনা। তাঁর উপন্যাসের মূল সুর প্রেম। মানব-মানবীর আকর্ষণ ও ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান ও মুখ্য অনিষ্ট—এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তাঁর উপন্যাস যেমন তেমনি গল্পও রচিত। এই যুগের গল্পে ব্যর্থপ্রেম প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। যেমন—'আত্মহত্যা' গল্পটি। প্লট প্রধান গল্প বুদ্ধদেব যে লিখতে চাইতেন না তার প্রমাণ 'জ্বর' গল্পটি। 'রাত বারোটার পরে' গল্পে লেখকের গল্প সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশিত—"গল্প লিখিয়া সুখ আছে। অন্তত গল্প লিখিবার সময় গল্পের পাত্রপাত্রী ও ঘটনাগুলির উপর যে নিরংকুশ আধিপত্য পাওয়া যায়, তাহা রাজত্ব লাভের মতোই যেমন উপভোগ্য, তেমনি বিপজ্জনক।" এ গল্পে নারীবর্ণনাও অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়—"ঢালু দুটি কাঁধ, আনত খোঁপায় ঘাড় ঢাকিয়া গিয়াছে—তাহারই নিচে শাড়ির আঁচলটাও একটু দেখা যায় হলদে রঙের। হঠাৎ হলুদ রঙের আঁচলটুকু নিচে ডুবিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে লতার মতো দুখানি বাহু মাথার উপর উঠিয়া আসিল, প্রদীপের শিখার মতো কয়েকটি আঙুল খোঁপার কাঁটাগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিল; তারপর প্রকাণ্ড খোঁপাটা ধুপ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল—সমস্ত পিঠ কালো এলো চুলে ভরিয়া গেছে, অসিত মনে মনে তাহা দেখিতে পাইল। " এই পর্বের রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত নন। 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' গল্পের অতনুকে যখন 'কুয়াশার মতো' দখলে রাখতে চাইছিল সাবিত্রী, তখন অতনুর কীরকম লাগছিল তা বোঝাবার জন্য বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিতে হয়—'রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে ওর ঘুম ভাঙেনি, হৃদয় জাগেনি।' আবার সাবিত্রী যখন বলে—'তোমার latest-কে একবার দেখবার ইচ্ছে ছিল, অতনু। ...ভয় নেই তোমার আমি ছোটো মেয়েদের কাঁচা মাংস খাইনে'—তখন কি রবীন্দ্রনাথের কোনো চরিত্রের প্রতিধ্বনি শোনা যায় না? 'দুঃখ' গল্পে রূপের ট্র্যাজেডি—'সে যদি কুৎসিত ও কদাকার হতো তাহলে সে স্বচ্ছন্দে বাড়ি ফিরে যেতো।'

'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' গল্পের মূল বিষয়বস্তু হল তির্যকভঙ্গিতে তৎকালীন সমাজ পরিবেশন। এখানে দক্ষিণ কলকাতার উচ্চবিত্ত চরিত্ররা ঘোরাফেরা করে, প্রেমে আবিষ্ট হয়, সম্পর্কে গড়ে তোলে, ভাঙে। অসত্যভাষণ, চতুরতা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। গল্পের একটি চরিত্র যখন বলে—'১৯২৬ সন থেকে যে মার্জিত উচ্ছৃঙ্খলতা দেশের কালচার্ড মহলের ফ্যাশান হয়েছে, তা আমাকে কখনোই আকর্ষণ করেনি।'—তখন তাকে তির্যক, ব্যঙ্গাত্মক, বিদ্রূপ ভাষণ বলেই ধরে নিতে হয়। গল্পের বিষয়বস্তুর অনুক্রমে ও বক্তব্যের পারম্পর্যে নারী ও পুরুষের বর্ণনা সংগতভাবেই এসে যায়।

১. নারীর বর্ণনা:

"ওর মতো ঝকঝকে মাজা-ঘষা, হালকা ফিনফিনে শরীর আর কোন্ মেয়ের? ওর মতো ভুরু কুঁচকোতে, ঠোঁট বাঁকাতে, ঘাড়-ঝাকুনি দিতে আর কোন্ মেয়ে জানে? ওর চলাফেরা বিলিতি ছন্দে বাঁধা; প্রতি পদক্ষেপে ওর দোলা;—তাতে ওর শরীরের নারীত্ব পরিস্ফুটতর হয়ে পথচর পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটায়। একটু উঁচু করে শাড়ী পরার ফ্যাশন ও-ই তো প্রবর্তন করে—এবং বাঙালী মেয়েদের মধ্যে ওই প্রথম চুল শিঙ্গল করে—এই সাবিত্রী বোস।"

[অতনু মিত্র আর সাবিত্রী বোস—আর বুলু।]

২. পুরুষের বর্ণনা:

"মাজা গায়ের রং; ফর্শা বললে তার বর্ণনা হয় মাত্র, ব্যঞ্জনা হয় না। গ্রীক দেবতার মতো নাক; বড়ো, গভীর কালো চোখ—আলস্যে কল্পনায় টলটলে দুই চোখ, লম্বা, সরু পালকগুলি বেড়ার মতো তাদের ঘিরে আছে। টসটসে ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হয়ে থেকে ঝকঝকে দাঁতের একটু আভাস দেয়; শানের মতো পালিশ করা কপাল—তাকে ললাট ফলক বললে কবিত্ব হয় না; সিল্কের মত পাতলা, নরম চুল।" [পূর্বোক্ত]

১৩৩৯-এ 'পরিচয়' মাঘ সংখ্যায় 'এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে' বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে, বইটি 'সন্দিগ্ধচিত্তে গৃহীত হবে'। কেন-না, "এতে অবিবাহিত বাঙালি যুবক যুবতীদের যে অবাধ মেলামেশা ও প্রেমালাপের ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে পাঠককে হতভম্ব হতে হবে।"[৮] একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বইটির অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের উপকরণের দিকে নজর দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—"বইটির একটি প্রশংসনীয় জিনিস তার অন্তির্নিহিত ব্যঙ্গের উপকরণ। এটাও মানতে হবে যে, যে আধুনিক রীতিতে ইউরোপীয় সাহিত্যে ঘটনা সন্নিবেশের বদলে চিত্তের আবর্তময় গতিকে অধিকতর প্রকট করা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় সে রীতির পরিকল্পনায় বুদ্ধদেববাবু অগ্রণী ও ওস্তাদ।" তবে আলোচ্য গল্পটিতে ব্যঙ্গের উপকরণ থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে ওঠে না। কেন না 'নারীসান্নিধ্যের মাখন খেতে' অভ্যস্ত অতনু মিত্র শেষ পর্যন্ত বাঙালি সমাজে অতুলনীয়া ব্যারিস্টার কন্যা সাবিত্রী বোসকে পরিত্যাগ করে পনেরো বছরের কালো মেয়ে বুলুর কাছে আত্মসমর্পণ করে! এ গল্পে গল্পকারের কোনো জীবনদর্শন নেই। অগভীর জীবনদৃষ্টি, প্লটহীনতা ইত্যাদির জন্য গল্পটি দুর্বল সৃষ্টি রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

'অদৃশ্য শত্রু' সংকলনের 'প্রশ্ন' গল্পটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অসুস্থ ছেলের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। গল্পটির উদ্ভাবনকৌশল, গঠনক্রিয়া কিছু না থাকলেও গল্পটি কিশোর মনের পঠনের বৈচিত্র্যে ভিন্নতর রস সঞ্চার করে। সানুর টেবিলে সাজানো 'বাঁধানো সন্দেশ, চলতি বছরের মৌচাক, আবোল-তাবোল, কাগজের মলাটে ছবি ভরা সংক্ষিপ্ত টেম্পেস্ট, অ্যালিসইন্, ওয়ারাল্যান্ড, মলাটহীন, মলিন পত্র একখানা সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' ইত্যাদি যেন গল্পকারের কৈশোরকালের পঠনস্পৃহার প্রতি ইঙ্গিত দান করে। 'রেখাচিত্র', 'ছায়াচিত্র' ইত্যাদি গল্পে বুদ্ধদেব ভাষার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করেছেন। প্লটের কাঠামো, চরিত্র বর্ণনা, মানবজীবনের গভীরতম সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা ও তার বৈচিত্র্য এই সমস্ত গল্পে অনুপস্থিত। এ যেন রেখার সাহায্যে আঁকা হাল্‌কা চালের ছবি—হৃদয়স্পর্শী নয়। এই যে রেখাচিত্র জাতীয় রচনা তার ব্যবহারও যে

সর্বত্র ফলপ্রসূ হয়েছে এমন বলা যাবে না। যেমন, 'ছায়াচিত্র' গল্পে অনেক খুঁটিনাটির সমাবেশ ঘটলেও প্রেমার্ত যুবকের কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এ গল্পে নেই। 'রেখাচিত্র' গল্পে বাস্তবের কঠোর আঘাতে তরুণ যৌবনের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি, প্রাত্যহিকতার কুশাঙ্কুরবিদ্ধ দিনযাত্রায় সংসারের কর্কশতা হৃদয়ের সৌন্দর্য-মাধুর্য বিনষ্ট করে দিলেও জীবনের অনিবার্য নিয়তি যদি বেদনাম্লান হয় তাহলে স্বপ্ন স্বপ্নই থাক। এই পর্বের 'জ্বর' গল্পটিতে অসংলগ্ন ও অস্বাভাবিক চিন্তার আবর্তনে তাড়িত এমন এক চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, যার জ্বর আসা ও জ্বর ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। মানব চরিত্রের স্বার্থপরতার দিকটি এখানে বেশ ভালোভাবে উন্মোচিত। সুধার দুর্ঘটনার সংবাদে রমাকান্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। মানবচরিত্রের স্বার্থপরতার দিকটি আলোচ্য গল্পে উন্মোচিত হলেও গল্পটি অন্য কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তা হল জ্বর আসার বিবরণ—'নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া সে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। চেয়ারটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, তাহার সমস্ত শরীর সংকুচিত হইয়া উঠিল। দৈবাৎ আয়নায় একবার নিজের ছায়া দেখিল—চোখ দুইটা ভয়ানক লাল হইয়াছে। ...সুধার নগ্ন বাহুদটির সুস্নিগ্ধ শীতলতা তাহার সর্বাঙ্গে যেন চাবুক মারিল। ভাতের আস্বাদ সে ভুলিয়া গিয়াছে; ঠাণ্ডা জলের কথা মনে করিতেই তাহার জ্বর যেন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।' বাংলা সাহিত্যে জ্বর আসার এবং ছেড়ে যাওয়ার এমন বর্ণনা দুর্লভ বলে অত্যুক্তি হয় না। আলোচ্য গল্প সংকলনে 'দুঃখ' গল্পটিকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। ১৩৩৯-এর 'পরিচয়' বৈশাখ সংখ্যায় সুধীরকুমার রায়চৌধুরি এ প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে বলেছেন—"দুঃখ গল্পটি এই বইয়ে না ছাপিলেই ভালো হইত। এই গল্পটির treatment আলাদা; যদিও দুঃখবস্তু ইহার মধ্যে কোথাও রূপ ধরে নাই। ...মূক-বধির কন্যার সিক্তবস্ত্রে বাড়ি ফিরিবার লজ্জায় মাথা খুঁড়িয়া কপাল রক্তাক্ত করা অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক।" 'মধ্যস্থ' গল্পে অনুতোষ ও লীলার দাম্পত্য কলহ এবং তার অনুপুঙ্খ বিবরণ এবং অবশেষে অনুতোষের ক্ষমা প্রার্থনা। গল্পটি সাধারণ কাহিনিতে বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় পরিব্যক্ত। 'বর্ষার সুর' গল্পে গল্প ও কবিতা সম্পর্কে লেখকের মানসিকতা ব্যক্ত---'গল্প হচ্ছে এমন জিনিস, যা আপনি ইচ্ছে করলে লিখতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে নাও লিখতে পারেন; কিন্তু কবিতা হয় আপনাকে লিখতেই হয়, না হয় আপনি আদৌ লেখেন না, লিখতে পারেনই না।'

'মিসেস গুপ্ত' গল্প সংকলনে সংকলিত সাতটি গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'এমিলিয়ার প্রেম' এবং 'তুলসী গন্ধ'। এই গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত সাতটি গল্পের রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪ এবং প্রকাশকাল ১৯৩৪। 'তুলসী গন্ধ' গল্পটি বুদ্ধদেব বসুর স্বনির্বাচিত গল্পসংকলনে স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, লরেন্সের 'ওডার অব ক্রিস্যানিহমাম' গল্পের সঙ্গে আলোচ্য গল্পটির সাদৃশ্য আছে। 'তুলসী-গন্ধ' গল্পটি যেন ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি সময়ের বর্ণনা। দুপুরে ঢাকার পথে স্ত্রী কমলা পূর্বস্মৃতি তাড়িত হয়ে হারিয়ে যাওয়া অতীতকে টেনে আনে বর্তমানে। তার মনে ভেসে ওঠে প্রেমিকের বাড়ি, তুলসী গন্ধের স্মৃতি। অপর্যাপ্ত বর্ণনা থাকলেও তা আকৃতিময়তার সংহতি লাভ করে না। বুদ্ধদেবের গল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক যা বলেন তা বোধহয় 'তুলসীগন্ধ' গল্পটি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতে পারে—"বুদ্ধদেবের গলপ রচনার একমাত্র গুণ এক অখণ্ড ভাব পরিমণ্ডল রচনার সৌযম্যে।

তাঁর চরিত্রগুলি একটিও বাস্তব নয়—অর্থাৎ নিখাদ বস্তু নেই তাতে এমন কিছু, ভাব এবং কথা ছেঁকে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে। নিজের সহজ যৌনবাসনা, যার কোনো কোনো স্তরে morbidity-ও অনুপস্থিত নেই—এবং তার সঙ্গে নিজের অখণ্ড কবিমনকে একান্তভাবে জড়িয়ে (যে মন প্রকাশে এবং প্রকরণে কেবল পরিপাটিই নয়—পারিপাট্য বিলাসী, অর্থাৎ যথার্থ বিলাসী জনের মতো নিখুঁত পারিপাট্যময় সৌন্দর্য সাধনায় স্বতন্ত্র)। আর সবার ওপরে নিজের স্ব-নিহিত ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাকে ছড়িয়ে দিয়ে গল্পগুলো জমাট বেঁধেছে। ফলে শিল্পীর রচনাজগৎ বস্তুময় নয়; বস্তুবিশ্বকে ঘিরে তাঁর মদির কল্পনা আশার ও স্বপ্নের যে দেউল রচনা করেছে—সেখানেই বুদ্ধদেবের গল্পের জগৎ গড়ে উঠেছে। কবি হিসেবে তিনি রোম্যান্টিক, অত্যন্ত স্পর্শকাতর পরিমাণে রুচিমান! অনেকটা এই কারণেও বহির্জগৎ থেকে তাঁর ব্যক্তিমন কেবল বিমুখ নয়—প্রতাড়িতও কিনা সেকথাও ভেবে দেখবার মতো। ফলে যেখানে দৈন্য, যেখানে পৃথুলতা সেখানে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ব্যাহত হয়। তাই বিষয়বস্তুর অসুন্দর স্থূলতা, জীবনচিন্তায় দারিদ্র্যের শুষ্কতা বা অশিক্ষা ও রুগ্নতার পীড়াকর চিত্র বুদ্ধদেবকে স্বাভাবিক কারণেই বিমুখ করেছে।"[৯] সমালোচকের আলোচ্য বিশ্লেষণমুখী বক্তব্য থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হল—বুদ্ধদেব মূলত রোম্যান্টিক এবং তাঁর গল্পের পরিমণ্ডল মূলত কাব্যিক পরিমণ্ডল। তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য হল মদির কল্পনাবেশের জগৎ, বস্তুবিশ্ব নিরপেক্ষ রোম্যান্টিক স্পর্শকাতর এক কল্পনার জগৎ। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, বিশ শতকে এই জাতীয় গল্প কি কাম্য! অথচ বুদ্ধদেব বসু সেই একই প্রেরণায় তাড়িত হয়ে গল্প লিখে চলেছেন। 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পটি সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পটি 'অসূর্যস্পশ্যা' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে 'ওথেলো' নামে সংযোজিত হয়। পরবর্তীকালে গল্পটি পরিমার্জিত হয়ে 'এমিলিয়ার প্রেম' নামে 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে সংযোজিত হয়। গল্পের আঙ্গিকে ও কাঠামোতে বিশেষ পরিবর্তন না থাকলেও সম্প্রসারণে ও বক্তব্যে 'ওথেলো' গল্পটির যে রূপান্তর ঘটেছে, 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পে তা লক্ষ্যগোচর। গল্পটি সম্বন্ধে দুই সমালোচকের দুটি মন্তব্য গল্পের চরিত্র নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট—

১. "এমিলিয়ার প্রেম গল্পে নাগরিক প্রণয়লীলারই রূপায়ণ হয়তো গল্পটির ভাবপ্রেরণায় ব্রাউনিঙের 'পরফিরিয়ার প্রেমিক কবিতার প্রভাব বিদ্যামান, কিন্তু এমিলিয়ার প্রেম প্রেমসম্ভোগের কাব্যমাত্রই নয়, গল্পটি অভিজাত নগর জীবনের একটি বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র। ...এ গল্পের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্যান্য উৎকৃষ্ট রচনার মতো এ গল্পও বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টি। তাঁর লেখায় ভিলেনকে চোখে আঙুল দিয়ে ভিলেন বলে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। হিতকথা কখন শিল্প কথাকে ছাপিয়ে সঙিন উঁচু করে আত্মপ্রকাশ করে না। কিন্তু সহৃদয় পাঠকচিত্তে বিশুদ্ধ শিল্পের যে আবেদন ক্ষেত্র আছে সেখানে এ জাতীয় সৃষ্টির প্রতিবেদন অব্যর্থ। এমিলিয়ার প্রেম শুধু সার্থক ছোটোগল্প হিসেবেই নয়, সুখবাদী মিথুনলীলা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের শিল্পদৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবেও অনবদ্য।"[১০]

২. "বুদ্ধদেবের নায়ক-নায়িকারা বালিগঞ্জের নয়—তাঁর মনোলোকর বাসিন্দা, যে মন স্ব-লীন রোমান্টিক স্বপ্নাবেশে স্পর্শকাতর। গল্পের সেই পরিমণ্ডলের সঙ্গে কথা ভঙ্গি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, যে সার্বিক সৌষম্যের ফলে কোনো কিছুতেই চমকে যেতে হয় না। একটি

চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পটির দেহাসঙ্গ বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ...একনিষ্ঠ প্রেমের গহনে নিহিত যৌন অন্ধতা ও তজ্জনিত অসূয়া বুদ্ধির এক চরম অভিপ্রয়াস অঙ্কিত হয়েছে গল্পটিতে। চিত্রশিল্পী ভাস্কর আর এককালের আগুন এমিলিয়ার দেহবিলগ্ন অন্ধ প্রেমের ছবি আঁকা হয়েছে। ...সকল ছাড়া নিঃসঙ্গ দ্বৈততায় সমাচ্ছন্ন তাদের আসঙ্গলিপ্সা দেহের গহনে মর্মান্তিক শিহরণ জাগিয়ে যায় নিভৃত কথায়, ব্যবহারে—সম্ভোগে। কিন্তু ভাস্করের উত্তপ্ত, সদা-উন্মুখ অন্ধ তৃষ্ণা তীব্র হোঁচট খেল একদিন অসহ্য ঈর্ষা আর সন্দেহের উপলখণ্ডে। ...জীবনের গোপন ও গ্লানিকর প্রবৃত্তিকে প্রকাশ্য নগ্নতায় অনাবৃত করার নৈতিক অভিযোগে বুদ্ধদেব এখানে চরম অভিযুক্ত হতে পারেন,—...কিন্তু তা ছেড়ে দিলেও যৌন প্রবৃত্তি ও অসূয়াবৃত্তির গোপনীয়তার প্রয়োজন স্বীকার করে নিলেও, একথা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না যে, গল্পটির সর্বাঙ্গ ঘিরে কাব্যিক পরিমণ্ডলের এক অখণ্ড সৌরভ ছড়িয়ে আছে, নগ্নতাকে যা উগ্র বিভীষিকাকে যা প্রত্যক্ষভাবে বীভৎস হয়ে উঠতে দেয়নি। কাব্যিকতা কেবল ভাষা বা বাচনভঙ্গির নয়—সমগ্র শৈলীর, যার পেছনে বুদ্ধদেব তাঁর রোমান্টিকতা পিপাসু কবিমনকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন। ...শিল্পী যেন সমস্ত বাস্তব প্রখরতাকে ছেঁকে নিয়ে রেখে গেছেন এক অর্ধসত্য, অর্ধস্বপ্নিল কবিতাস্বাদনের স্পন্দিত অনুভব। এইটুকুই বুদ্ধদেবের সকল সার্থক গল্পের প্রাণ, কথাবস্তু নয়—কবিতার সন্তর্পণ অনুভব।"[১১]

বুদ্ধদেবের 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' গল্প সংকলনের অন্তর্গত গল্পগুলির (মোট ৪টি) রচনাকাল ১৯৩৩—৩৪; প্রকাশকাল ১৯৩৫। 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' গল্পের নায়ক জীবিকার নির্মম পেষণে তাঁর কাব্যানুভূতির সূত্রটিকে বার বার হারিয়ে ফেলেছে। বাস্তবজগতের হৃদয়হীন দাবির কাছে শিল্পীপ্রাণের শোচনীয় আত্মবলির নিদর্শনরূপে গল্পটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর গল্পগুলিতে যৌবনোচিত বর্ণাঢ্যতা; প্রেমের গাঢ়তা অনেক ক্ষীণ; যে সমস্ত গল্পে প্রেমের কথা আছে, সেখানেও জীবনসংলগ্নতা অপেক্ষা, কথাসাহিত্যের সীমান্ত সংলগ্নতা অপেক্ষা কাব্যগত সীমান্তসংলগ্নতা অনেক বেশি। এই পর্বে রচিত ছোটোগল্পে জীবন্ত বর্তমান অপেক্ষা প্রেমের প্রধান অবলম্বন হল অতীতচারিতা। যেমন, 'প্রথমা' গল্পে তরুণী নাতনীকে দেখে বৃদ্ধ ভূপেশবাবু অনেককাল আগে মৃতা ও বিস্মৃতা প্রথমা স্ত্রীকে অন্তরে ফিরে পেলেন। 'একটি কি দুটি পাখি' গল্পে অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি প্রৌঢ় বয়সে আবার প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন। তবে তাঁর প্রেম শরীরী নয়; গল্পকার বুদ্ধদেব বসু তখন যে আর নরনারীর দেহতাপ লালিত যৌনপ্রেম চান না তার প্রমাণ পাওয়া যায় অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জির বন্ধুর সংলাপে—"আসলে আমরা ভালোবাসাকেই ভালোবাসি, এই উপলক্ষ্যগুলি কিছু না।"

বুদ্ধদেবের 'পদ্মার ঢেউ', 'টান', 'ঝুট' প্রভৃতিতে (রচনা সংগ্রহের ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত) জনজীবনকে ধরার চেষ্টা থাকলেও গল্পকার এখানে মধ্যবিত্ত জীবনের বাইরে যেতে পারেননি। পদ্মা রাস্তার ভিখারি হলেও ভালো ইংরেজি জানে, সিগারেট খায়; পদ্মাকে সবাই চায়—"পাড়ার মেয়েদের চোখে সে ছিল আমাদের সবাকার রক্ষিতা—আহা, যেই রূপের ছিরি তার আবার অত দেমাক—মিন্সেগুলো যেন কী; কেতুর কাছে সে ছিল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, বেণুর কাছে জগতের সর্বাপেক্ষা মনীষী মহিলা; আর আমাদের সবার কাছেই সে ছিল—পদ্মার

ঢেউ।" 'টান' গল্পের নায়ক পার্থ কবি, বেকার যুবক। প্রেমের ব্যর্থতা তার জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। 'ঝুঁট' গল্পের নায়ক অজয় সাংসারিক হীনতা আর মানসিক দারিদ্র্য দেখে প্রেমিকা অরুণাকে নিয়ে 'প্রাণের সন্ধানে মুক্তির আনন্দের নেশায়' বেরিয়ে পড়তে চায়। বুদ্ধদেবের আর একটি স্মরণীয় গল্প—অবশ্যই প্রেমের গল্প—'আমরা তিনজন'। গল্পের পটভূমিতে অবশ্যই বিরাজিত ঢাকার পুরানা পল্টন। গল্পটিতে বার বার ঘুরেফিরে আসে স্মৃতি বিজড়িত বাক্য—গল্পটির একটা অংশ হল লেখকের হারিয়ে যাওয়া যৌবনের জন্য বিলাপ, নায়িকার মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি যেন নিজের যৌবনকেই বিদায় দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব মানবিক প্রেমের রিরংসার চিত্রাঙ্কন করলেও তিনি ত্যাগে ও আত্মনিবেদনে মধুর সুন্দর প্রেমের চিত্রাঙ্কনেও যে দক্ষ আলোচ্য 'আমরা তিনজন' গল্পটি তার প্রমাণ! রোম্যান্টিক ভাববাদের আনন্দলোকে তাঁর বিচরণই যথার্থ। 'আমরা তিনজন' গল্পটি "কিশোর মনের বয়ঃসন্ধির গল্প। প্রেম যখন আত্মরতিতেও পৌছয়নি, স্বপ্নরতিতেই মশগুল হয়ে আছে, সংগমতৃষার চেয়ে আসঙ্গলিপ্সাই যখন বড়ো, তখনকার চেতনলোকে নারীর প্রথম আবির্ভাবের কাহিনি। ...অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক কাহিনি। কিন্তু নবকৈশোরের প্রথম নারীচেতনা নিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর গল্প বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। টাইফয়েড মূর্ছিত প্রায় মেয়েটির অস্ফুট অস্পষ্ট প্রলাপবচনও কিশোরত্রয়ের মর্মের মণিকোঠায় অপূর্ব সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছে। সেবার ফাঁকে ফাঁকে একটু অবসর পেলেই তারা সেই কথা কটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—যেন তিনজন কৃপণ পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণিমুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে বন্ধ ঘরে। মণিমুক্তোই বটে! কৈশোরের অম্লান স্বপ্ন পরবর্তী জীবনে মহার্ঘতম সম্পদ হয়ে দেখা দেয়। গল্পশেষে বক্তা বলছে—'আর আমি, এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশশো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একটু সৌরভ'। এই স্বপ্ন, এই সৌরভের পূর্ণ মর্যাদা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে বর্তমান।" এই পর্যায়ের গল্প তিনটিতে আমরা পেয়ে যাই কয়েকটি অনন্য চিত্রকল্প গল্পের মূল বক্তব্য প্রকাশে যাদের ভূমিকা স্মরণীয়—১. "পায়ের উপর যে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে, তার মতো সুন্দর সমস্ত পদ্মা নয়; দারুণ বেগে আসতে থাকে—অথচ দুলে-দুলে, নেচে-নেচে। চলার যেন একটি ছন্দ আছে তারপর হঠাৎ—কূলে এসে ঘা লাগে—ঢেউ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, রোদে লেগে রূপোর ছুরির মতো ঝক্‌ঝক্ করে—জলের ছিটে হয়তো পাড়ের দর্শকের পায়ে এসে লাগে—ওদিকে কূল থেকে খানিকটা মাটি হয় তো ধপ্ করে খসে পড়ে। মাটি ঢেউকে রোধ করে, ঢেউ মাটিকে ভাঙে।"

[পদ্মার ঢেউ]

২. "ফুলের গন্ধে আর মদের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় আবছা, অনেক রাতে ওঠা চাঁদের আলো ঘরে ঢুকে অপরাধ করেছে বলে ক্ষমা চাচ্ছে যেন। ...সে রাতে কত স্বপ্নের ছবিই আমরা বুনেছিলাম। সমস্ত ভবিষ্যৎটা ছবির মত সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিলো আমাদের চোখের সুমুখে। কত স্বপ্ন! তাতে নিশীথের তারার কম্পন, তাতে পুষ্পের সৌরভের সুধা, তাতে মদিরার চুম্বনের নেশা।"... [পদ্মার ঢেউ]

৩. "ছোট জানালা দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো পদ্মাদিঘীর নীল জল ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। কৃষ্ণা একটু দূরে শুয়ে; ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি নে, ওর ঐ এলিয়ে দেয়া দেহটি যেন রক্তমাংসে গড়া নয়, যেন ঐ চাঁদের আলোরই একটি চিলতে, জোছনার জালে বোনা একটা স্বপ্ন।"

[টান]

৪. "সে অরুণাকে চায়—ভোরের কুসুম যেমন ভোরের আলোকে চায়; জোয়ারের জল যেমন পূর্ণিমার চাঁদকে।" [ঝুট্]

৫. "এ আর ভালো লাগে না, অরুণা—সংসারের এই হীনতা, মানুষের মনের এই দারিদ্র্য, হৃদয়ের এই কার্পণ্য থাকবে না—একটা মস্তবড় প্রাণ—অবাধ, অগাধ, অসীম—ঐ আকাশটার মতই। চলো কোথাও বেড়িয়ে পড়ি—সেই প্রাণের সন্ধানে, মুক্তির আনন্দের নেশায়।"

৬. "হাল্কা, গেরুয়া রঙে ছোপানো লাল পেড়ে শাড়িটি পরা, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে বিকেলের পড়ন্ত রোদের চিলতে এসে সোনালি ফিতের মতো পড়েছে, জোড় করা হাত দুটির ওপর মাথা রেখে নতদৃষ্টিতে আমার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে দেখে মনে হল, ওর চারদিকে একটি ভারি সুন্দর নির্লিপ্ততা আছে, একটি মধুর উদাসীনতা। ও যেন কিছুই চায় না, ওকে যেন কিছুই দেয়া যায় না। যেন বড়ো দুঃখী, বড়ো একা—যেন আকাশের অতগুলো তারার মধ্যে শুকতারা একা, বেদনার এক ফোঁটা অশ্রুর মত টলমল করছে। অত বেশি সুন্দর বলেই ওরা একা, অমন অপরূপ বলেই দুঃখী।" [ঝুট্]

৭. "কালকে অমবস্যার রাত্রিটিকে হঠাৎ যেন নতুন করে' চোখে লাগলো মাঠ, ঘাট, গাছ, নদী, ঘর-বাড়ি সব এক অকূল কালোয় মিলিয়ে গেছে কিছুই চেনা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আকাশও কালো, কিন্তু সে কালোরই কী জ্যোতি, অরুণা—চোখ ঝলসে যায়! মেঘের কালো নয়, ছায়ার কালো নয়—এ যেন আকাশের নিজস্ব রং, ইন্দ্রধনুর সাত রং মিলিয়ে কোন্ শিল্পী যেন একে রচনা করেছে। সেই কালোর কোলেই তো তারার জন্ম—অগণন, অতুলন সব তারার! দেখে দেখে মনে হল, এই অন্ধকার যেন তোমারই স্নেহের মতো।" [ঝুট্]

বুদ্ধদেব বসুর 'মৃত্যুর আগে জাগরণ', 'অনুদ্ধারণীয়', 'প্রেমপত্র' ইত্যাদি গল্পও তাঁর কবিমানসেরই ফসল; গল্পকারের গল্প নয়। এই তিনটি গল্পই 'প্রেমপত্রও অন্যান্য গল্প সংকলনের' অন্তর্ভুক্ত। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গল্পের মতে সমালোচ্য গল্প তিনটিও শিল্পহীনতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারে। তবে একথাও অংশত সত্য যে, বুদ্ধদেব শুধুমাত্র রোম্যান্টিক ভাববিলাসী কাল্পনিক জগতের গল্পই লেখেননি। তিনি মাঝে চলতি সময়ের প্রতিও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। 'হতাশা', 'মাস্টারমশাই' ইত্যাদি গল্প। 'সুখের ঘর' গল্পে দরিদ্র মানুষের প্রাণধারণের আর দিনযাপনের গ্লানি; 'হতাশা' গল্পে—বেকার যুবকের কাহিনি; 'মাস্টারমশাই' গল্পে সমকালীন বাংলাদেশের কলেজীয় শিক্ষার ফাঁকি ও প্রবঞ্চনা উদ্‌ঘাটিত।

বুদ্ধদেব বসুর 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৫) সংকলনে মোট বারোটি গল্প আছে। গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৪৪-৪৬। স্বনির্বাচিত গল্পের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং জানিয়েছেন—"গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৪৪-৪৬। গত যুদ্ধের শেষ দু-বছরের মধ্যে এর অধিকাংশ গল্প লেখা হয়েছিল,

একটি বা দুটি গল্প তারপরে।...যে সময়ে লেখা হয়েছিল তার প্রভাব এই গল্পগুলিতে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে যুদ্ধকালীন বাংলার, ভারতের, হয়তো জগতের আবহাওয়া।" 'হাওয়া বদল' গল্পে যুদ্ধকালীন বাংলদেশে ব্যাবসা করে বড়োলোক হওয়ার কাহিনি, 'ওস্তাদজি' গল্প সমকালীন রুচি পরিবর্তনের কাহিনি—ধ্রুপদী সংগীত থেকে লঘু সংগীতের প্রতি প্রবণতা; 'লজ্জা' গল্পে চাকুরে স্বামী স্ত্রীর ক্ষুদ্র ঘরে স্বামীর বন্ধুর আবির্ভাব ও তজ্জনিত স্থানগত অসুবিধার কাহিনি; 'সুন্দরের জন্ম' গল্পে সাধারণ জিনিসকে কেন্দ্র করে যুদ্ধকালীন গুজব; 'একটি লাল গোলাপ' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলাদেশে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কাহিনি।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, উপন্যাস, গল্প বিশ্লেষণ করলে যে উপজীব্য বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যায় তা হল প্রেম। মানব-মানবীর আকর্ষণ ও ভাববৈচিত্র্যের সন্ধানই তাঁর প্রায় অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। তাঁর জীবনদর্শনের মূল অন্বিষ্টই হল প্রেম। এই প্রেম নানাভাবে তাঁর গল্পে পরীক্ষিত। তিনি প্রেমকে অগভীর চপল মূর্তিতে দেখেছেন তাঁর 'চোর! চোর!' 'প্রেমের বিচিত্র গতি', 'অভিনয় নয়' ইত্যাদি ছোটোগল্পে। আবার প্রেম সম্পর্কে দুটি ধারাও তাঁর ছোটোগল্পে সংলক্ষ; একদিকে আছে যৌন-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্লেষণ, অন্যদিকে কাছে প্রেমের ব্যর্থতা। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব কামকে জীবনের অপরিহার্য সঙ্গীরূপে কল্পনা করেছেন এবং তার ফলে যে বিকারজাত দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রকাশ 'বোন' জাতীয় গল্পে। অবশ্য পরবর্তীকলে প্রেম সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ধারণা গভীরতা অর্জন করেছে। প্রেম দেহের ভিত্তি হলেও তা সম্পূর্ণ দেহাবদ্ধ নয়; যে আনন্দ জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে তারই মানবিক আনন্দের নাম—একথা তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের গল্পে। তিনি তাঁর জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে প্রেম ও শিল্পকলাকে অবিভাজ্য বলে মনে করতেন। বুদ্ধদেব বসুর কাল বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সামাজিক ও আর্থিক কেন্দ্র থেকে বিচ্যুতির কাল, অথচ সৃষ্টিশীলতা ও মনীষার গর্বে সে সজাগ। কখনো-কখনো সে নিজেকে ঐতিহ্য বিযুক্ত মনে করেছে। ফলত বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুও এ সমস্যা—সংকট থেকে মুক্ত নন। ফলে তাঁর ছোটোগল্পে এই সমস্যার প্রকাশ থাকলেও শিল্পরূপের দিক থেকে তা খুব দীপ্তিমান নয়। তাঁর গল্পে কবিত্বের প্রকাশ বড়ো বেশি। কাব্য ও ছোটো-গল্পের ভেদরেখা কি তিনি ঘোচাতে চেয়েছিলেন না কবি ও গল্পকারের সমন্বয় সাধন করতে পারেননি। কাহিনিপ্রধান গল্প লিখলেও-তাঁর গল্পাংশ বুননের অভাবে অনুজ্জ্বল। বুদ্ধদেবের কোনো গল্পই কবিত্বের স্পর্শমুক্ত নয়। কবি হিসেবে বুদ্ধদেব সফল তাঁর পরিশ্রমশীলতা, শব্দানুসন্ধান ও শব্দানুশীলনের জন্য; কিন্তু গল্পকার হিসেবে অসফল তাঁর অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য। তাঁর গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই আবেগহীন, প্রাণহীন; আবার কোথাও বা বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষিত চরিত্রমাত্র। কিন্তু যেখোনে তাঁর গল্প কল্পনা, অভিজ্ঞতা, আবেগ ও কবিত্ব যুক্ত হয়েছে সেখানে তিনি কৃতী গল্পকার—গল্পকার বুদ্ধদেব সফলতা ও অসফলতার প্রকাশ; তবুও বাংলা ছোটোগল্পের ক্রমিক উন্মোচনের ইতিহাসে তাঁকে মনে রাখতেই হবে।

(ক) তথ্যসূত্র

১. বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ / গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৭৩।
২. তদেব।
৩. তদেব।
৪. তদেব।
৫. কল্লোলের কাল / জীবেন্দ্রসিংহ রায়।
৬. তদেব।
৭. তদেব।
৮. বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার / ভূদেব চৌধুরি।
৯. আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী / জগদীশ ভট্টাচার্য।
১০. পূর্বোক্ত / ভূদেব চৌধুরি।
১১. পূর্বোক্ত / জগদীশ ভট্টাচার্য।

(খ) তথ্যগ্রন্থ

১. কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ / রবিন পাল।
২. বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায় / রণেন্দ্রনাথ দেব।
৩. বুদ্ধদেব বসু: মননে অন্বেষণে / তরুণ মুখোপাধ্যায়।
৪. বুদ্ধদেব বসু / ভুঁইয়া ইকবাল।

উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু

"একথা বললে নেহাৎ সত্য কথাই বলা হয় যে আজকের দিনে বাঙালি লেখকের সমস্ত প্রতিবেশই প্রতিকূল। আমাদের লেখকরা সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো না কোনো স্তর থেকে উদ্ভূত, কিন্তু এই শ্রেণীর সৃষ্টিশীল প্রেরণা আজ প্রায় নিঃশেষিত, জীর্ণ ব্যবস্থার ভগ্নাস্তূপের উপর একদিন যাঁরা নতুন সমাজ নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরা ও তাঁদের প্রবর্তিত ব্যবস্থা আজ ধ্বংসোন্মুখ। যাঁরা একদিন এসেছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মুক্তির বাণী নিয়ে, আজ তাঁরা প্রাণপণে নিজেদের মুনাফা রাখতে ব্যস্ত। দেশের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব আজ তাঁরা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেন। অন্যপক্ষে সর্বব্যাপী নিরক্ষরতায় জনসাধারণ আকণ্ঠ মগ্ন।...

সামাজিক সংকট সম্বন্ধে আধুনিক বাঙালি লেখকের চৈতন্যোদয় না হয়ে উপায় ছিলো না। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজে তিনি প্রত্যাখ্যাত, জনগণ তাঁর নাগালের বাইরে, এদিকে পৃথিবীর ঘটনাচক্রও তাঁর অস্তিত্ব লুপ্ত করতে উদ্যত—এ অবস্থায় তাঁর মনে আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। লোভ নিষ্ঠুরতা দ্বারা শাসিত এই জগতে তাঁর মতো শিল্পজীবির কোনোখানেই স্থান আছে কিনা, এই সন্দেহ ক্রমশ স্ফীত হয়ে তাঁকে হতাশ করে তোলে। এ অবস্থায় নৈরাশ্য ও বিদ্রূপ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে আমরা আর কী পেতে পারি?

শিল্পীর পক্ষে সজ্ঞানে শিল্পোৎকর্ষ বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়; তিনি যদি ইচ্ছে করেন কি চেষ্টাও করেন, তবু, এবং যেটুকু তিনি শিল্পী, নেমে আসতে তিনি পারেন না। এর অন্তরায় তাঁর রূপকারী বিবেক ও দীর্ঘ দিনের শিক্ষাদীক্ষা ও রচনার অভিজ্ঞতা। স্বীয় ভাগ্যগুণে ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে একটি উৎকৃষ্ট রচনা হয়তো তিনি লিখতে পারেন, কিন্তু এমন কোনো উল্টো প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা নিজের কারুনৈপুণ্য বিস্মৃত হয়ে তিনি যাত্রার পালা লিখতে পারেন।"

[সুরমা উপত্যকা প্রগতি লেখক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি বুদ্ধদেব বসুর অভিভাষণ]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কালের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিত্বমূলক লেখক; কেন-না তাঁর রচনায় একালের যুগবৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাধিক মাত্রায় প্রকাশিত। তিনি কলাকৈবল্যবাদের নীতিতে আস্থাশীল হলেও বুদ্ধি প্রসূত সূক্ষ্ম অথচ শাণিত ব্যঙ্গ প্রয়োগে, নাগরিক অস্তিত্বে সীমিত রোম্যান্টিক সংবেদনশীলতা, অনুভূতিব্যঞ্জক রচনারীতিতে ভাষার আধুনিকীকরণে, নানা বিষয়বস্তুর অবতারণায় ও রাজনীতি বিমুখতায় এ যুগের নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিল্পের প্রতি তাঁর অন্য নিষ্ঠা দুর্লভ এবং শিল্পচর্চাকে তিনি জীবনের ধ্যানজ্ঞান বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, শিল্পেতেই শিল্পের শেষ; তার কোনো সামাজিক নৈতিক বা আত্মিক উদ্দেশ্য নেই। জীবনকে উপেক্ষা করে তিনি শিল্পকেই একমাত্র অবলম্বিত বলে জেনেছিলেন। জীবন সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু না করে তিনি শিল্পের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত ছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে তিনি তাঁর পরিসরে এক নিটোল

সৌন্দর্যের জগৎ রচনা করেছেন। তাঁর সফলতা করায়ত্ত হয়েছে মূলত তাঁর ভাষার জন্য। বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেব বসুর অসাধারণ দখল থাকার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অতিক্রম করতে সফল হয়েছেন। ইংরেজি ভাষার অনুকরণে নানা প্রয়োগ-পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বাংলা বাক্যগঠন রীতিকে নমনীয় করে তুলেছেন। ভাষার সুষম ধ্বনিবিন্যাসের দিকে তাঁর সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। সংস্কৃত প্রত্যয়যোগে অনেক নতুন শব্দ রচনা করে তার ধ্বনি-বৈষম্য না ঘটিয়ে দেশজ শব্দের সঙ্গো তার ব্যবহার করে তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কাছাকাছি। তাঁর ভাষার ধ্বনি মাধুর্য, গভীর অর্থবহ শব্দ ব্যবহার, অলংকার প্রয়োগ ইত্যাদি তাঁর রোম্যান্টিক মানসগঠনের পরিচয় প্রদান করে।

ভাষার উপর আধিপত্য থাকার ফলে তিনি উপন্যাসে রূপকল্পপ্রধান গদ্যরীতির প্রবক্তা। চরিত্রের বিভিন্ন অনুভবকে রূপায়িত করার ক্ষমতা তাঁর করধৃত বলে তিনি রূপকল্প ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত। তিনি নায়ক-নায়িকার অনুভূতি পারম্পর্যকে যতখানি রূপায়িত করতে চেয়েছেন, ততখানি রূপায়িত করতে চাননি তাঁদের মানস কথনকে। তিনি শব্দবিন্যাসের জাদুকে সাহিত্য বলে মনে করতেন; কেন-না, তিনি ছিলেন বোদ্‌লেয়ার, মালার্মে ও পল ভ্যালেরির অনুরাগী পাঠক। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরচনার উদাহরণ উল্লিখিত বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়। যেমন:

১. "তাহার শরীরে রাত্রির স্পর্শ, তাহার চেতনায় বিশ্বের চুম্বন; হাওয়ার উষ্ণতা তাহার রক্তে, তারার আবর্তন হৃৎপিণ্ডে। ঐ চুল তো আকাশের অন্ধকার, ঐ সাদা শাড়ী তো ছায়াপথ—আর সে, সে-ই তো ঐ আকাশ, এই রাত্রি, আর হাওয়ার এই অসম্ভব উদ্দামতা, চিত্ত তার রুদ্ধ, সত্তা লুপ্ত, অন্তহীন মুহূর্ত, চিরন্তন জীবন।" [সাড়া]

২. 'আকাশ গান করে তার কানে কানে, পৃথিবীটাই রেলগাড়ি, ষ্টেশন নেই, কেবল চলছে, দিনে রাত্রে কখনো থামে না গান। আমরা শুনি না, কেউ শোনে না, আমি শুনি শুধু, আর শুনি যদি, সব সময় শুনি না কেন?" [তিথিডোর]

বুদ্ধদেবের ভাষাসম্পদ ও রোম্যান্টিক মনোধর্মিতার জন্য তিনি পরিপূর্ণ কাহিনি রচনা করতে পারেননি অথবা চাননি। আসলে কাহিনিকে ভারাক্রান্ত করতে তাঁর প্রবল অনিচ্ছা। তিনি মনে করেন উপন্যাসে অনেক ঘটনা, নাটকীয়তা ইত্যাদির পরিবর্তে থাকবে কাহিনির রেখাঙ্কন মাত্র। অবশ্য পরবর্তীকালে এ চিন্তার সামগ্রিক পরিবর্তন না ঘটলেও আংশিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং শেষ পর্যায়ের বেশ কিছু উপন্যাসে ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে সংযোগসূত্র লক্ষ করা যায়। 'তিথিডোর' যথেষ্ট ঘটনাবহুল উপন্যাস, এখানে অনেক দৃশ্য আছে এবং মনে হয় দৃশ্য বাহুল্যের জন্যই উপন্যাসটি পাঠকের কাছে আদৃত।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে বিস্ময়-আবেগ-অনুভূতি বিষণ্ণতা, অনির্দেশ্য কামনা ইত্যাদি রোম্যান্টিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লক্ষগোচর। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'-তেই এই মানসিকতার প্রকাশ। আবার 'অকর্মণ্য' উপন্যাসের নায়ক শশাঙ্ক বলে: 'ব্রাউনিং-এর সঙ্গো সারাজীবন যাপন করলেও সে কাব্য প্রতিদিন বিচিত্রতর সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সমুদ্রের

সঙ্গে ওই প্রথম শুভদৃষ্টির মোহ একবার কাটিয়ে উঠলে তারপর তার মতো ক্লান্তিকর, নিরানন্দ অসহ্য কিছু নেই"।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের নগরপ্রীতির প্রাধান্য; অবশ্য এর জন্য দায়ী তাঁর মনোভঙ্গি। পল্লিগ্রামের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই; শহরের ড্রয়িং রুম তাঁকে বেশি আকর্ষণ করে। রোম্যান্টিক মানস পক্ষবিস্তার করতে চায়; বুদ্ধদেব কিন্তু মানস বিচরণের বিপুল প্রকাশ না পেয়ে প্রেমের মধ্যেই তাঁর বাসনা বিকাশে সচেষ্ট। বুদ্ধদেবের প্রেম ভাবনা দেহজ হলেও দেহাতিক্রামী। বুদ্ধদেবের প্রথম জীবনের উপন্যাসে কাহিনি পরিপূর্ণ নয়, তার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দুর্লক্ষ। শেষ জীবনের উপন্যাসে কাহিনিগত সম্পূর্ণতা থাকলেও ভাবগত অসম্পূর্ণতা অনুপস্থিত নয়।

এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘোরানোতে অন্যান্য অনেক লেখক অপেক্ষা স্মরণীয়। বাংলা উপন্যাসের তিনি খাত বদল করলেন, যে সমাজ আগতপ্রায় অথচ তখনও আসেনি এমন সমাজ তিনি উপন্যাসে আনয়ন করলেন। সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্যের পরিবর্তে তাঁর উপন্যাসে ধনতান্ত্রিক আভিজাত্যের বর্ণনা; ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ রূপচ্ছবি বাংলা উপন্যাসে তাঁরই অবদান।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'র রচনাকাল ১৯২৮-২৯; প্রকাশ ১৯৩০। প্রথম উপন্যাসেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। অনেক সমালোচকের মতে, 'সাড়া' তাঁর প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আলোচ্য উপন্যাসটিকে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি বলা চলে; এখানে কোনো নতুন অধ্যায় সূচিত হয়নি। উপন্যাসটি সাধু ভাষায় লিখিত হলেও লেখকের ভাষার উপর আধিপত্য স্বপ্রকাশিত। অবশ্য রবীন্দ্র-প্রভাব অনুপস্থিত এমন বলা যাবে না। প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মানসিক অবস্থা প্রকাশের পদ্ধতি রবীন্দ্রানুসারী।

উপন্যাসের নায়ক সাগরের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে নোয়াখালিতে। সাগর, মলিনা ব্যোমকেশের একমাত্র সন্তান। সাগরের 'পৃথিবীর সবটুকু মায়ের গন্ধে ভরা'। তার শৈশব সঙ্গিনা লক্ষ্মী। মায়ের অকাল মৃত্যুর পর ম্যাট্রিক পাস করে সাগর কলকাতার কলেজে পড়তে যায়। হোস্টেলে সে পায় তার নতুন বন্ধু সত্যবানকে—যার আচার-আচরণ অসাধারণত্বের পর্যায়ে পড়ে। "আজন্ম সঙ্গীহীন গৃহের নির্জনতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ায় জনতার প্রতি যে একটি বিমুখতা সাগরের মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সত্যবানের সংস্পর্শে তাহা একটু একটু করিয়া কাটিতে লাগিল।" পত্রলেখার সঙ্গে তার পরিচয় হয় সত্যবানের সৌজন্যে। পত্রলেখার সৌন্দর্য ও প্রেমনিবেদনে যখন সে অভিভূত তখন "একখণ্ড সুনীল সুকোমল মেঘ তাহাকে বেষ্টন করিয়া সৌরভ বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার চারিদিকে যেন সহসা কোন নীল, নীলকুহেলিকা কী এক উন্মাদনার জাল বুনিয়া চলিয়াছিল",—সে সময় সে অকস্মাৎ জানতে পারল পত্রলেখার সৌন্দর্যচর্চা ও মধুর ব্যবহার তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবার সুপরিকল্পিত আয়োজন। এই রূঢ় আঘাতে সে সচেতন হয়ে কলকাতা পরিত্যাগ করে পিতার কাছে চলে আসে।

কাহিনির দ্বিতীয়ার্ধে সাগর ঢাকায় এবং পিতার তত্ত্বাবধানে মণিমালার সঙ্গে তার বিবাহ

হয়েছে। সে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেও মণিমালার তাড়নায় সে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছে। সাগর পুনরায় কলকাতায় এসে চাকুরি ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছে এবং তার জীবনে পুনরায় রং-রসের প্রত্যাগমন ঘটেছে। তার জীবনে প্রেমের অভাবজনিত যে শীর্ণতা ছিল তা বাল্যসখী লক্ষ্মীর সঙ্গে আকস্মিক মিলনে পূর্ণতা পেয়েছে। গল্পের প্রায় অন্তিমে নিশীথ রাত্রে সাগর ছাদে পায়চারি করতে করতে আত্মবিস্মৃত অবস্থায় পড়ে যায় এবং তার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। সাগরের আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে, মনে হয়, বুদ্ধদেব বসুর রোম্যান্টিক মৃত্যু অভীপ্সার প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক সাগরকে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিরূপ বলে মনে হয়। রুচিশিক্ষা ও মানসিকতার দিক থেকে সাগর যেন স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু। 'সাড়া' উপন্যাসটি মনে হয় আত্মজীবনীমূলক। নায়ক সাগরের বাল্যকাল, শিক্ষাদীক্ষা, পৈতৃক বাসভবন ইত্যাদির সঙ্গে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসুর আপন জীবনের আংশিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ মনে হয় সাগরের বাল্য জীবনের বর্ণনা। সাগর যেন এক স্বপ্নাতুর রোম্যান্টিক বালক; সে তার দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন এবং সে জানে তার জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানের জন্য সে অন্যের উপর নির্ভরশীল। অথচ সে সুদূরের পিয়াসী। বুদ্ধদেবের রোম্যান্টিক আকুতি যেন সাগরের মধ্যে বিবৃত। 'সাড়া' উপন্যাসের স্বল্প কলেবরে ঘটনাক্রম অনেক; ফলে উপন্যাসটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়ে যেন রেখাচিত্রে পর্যবসিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব নায়ক চরিত্রের মানসিকতা উদ্‌ঘাটনে যতখানি তৎপর অন্যান্য চরিত্রকে পাঠকের গোচরে আনয়নের জন্য ততখানি তৎপর নন। অন্যান্য চরিত্রগুলি যেন অনেকখানি ভাসা ভাসা। অবশ্য নায়কের মানসপটও যে সামগ্রিকতায় উদ্ভাসিত এমন বলা যাবে না। নায়কের যাত্রা অনির্দেশ্যের দিকে, কোনো মানুষের সঙ্গে তার সাযুজ্য খুঁজে পায় না। রোম্যান্টিক আকুলতা ব্যতীত সাগর চরিত্রে অন্য কিছু নেই। বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামের কোনো অভিজ্ঞতা তার চরিত্রে অনুপস্থিত। 'সাড়া' অনেকাংশে লিরিকধর্মী বলে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য সেখানে দুর্লভ। কাহিনির গঠন কৌশলে অভিনবত্ব অনুপস্থিত, তবে গল্পের আখ্যানভাগ নিপুণভাবে সজ্জিত। অন্যান্য চরিত্রগুলি অপেক্ষা মণিমালা অনেকখানি বাস্তব ও স্পষ্ট। তবে 'সাড়া' উপন্যাসের সম্পদ তার ব্যঞ্জনধর্মী উপমালোকিত রীতি: "এখানে ওখানে নৌকার আলোগুলি জলের নিচে বহুদূর পর্যন্ত লাল সাপের মতো আঁকাবাঁকা ছায়া পাঠাইয়া দিয়া যদি না জ্বলিত, তাহা হইলে উহাকে নদী বলিয়া চেনা যাইত কিনা সন্দেহ"। আলোচ্য উপন্যাসের প্রেমতত্ত্ব ভাবনির্ভর, অদেহী। অবশ্য এখান থেকেই বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভাবনার সূচনা। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কুড়ি-একুশ বছর বয়সে লেখা 'সাড়া' উপন্যাসটি বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালের অনেক উপন্যাসের নান্দীপাঠ।

'যবনিকা পতন' (১৯৩২) উপন্যাসে যুগের সাধারণ ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। প্রেমের যে ধারা যৌন জীবনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয় আলোচ্য উপন্যাসে সেই ধারাই রূপায়িত। সাহিত্যিক মৃগাঙ্কর বন্ধু অমিয় উচ্ছৃঙ্খল এবং মদ্যপায়ী। বিপথগামী বন্ধুর সম্পর্কে বিতৃষ্ণা

পোষণ করলেও সে তাকে ত্যাগ করতে পারে না। সুগায়িকা তরুণী গায়িকা অঞ্জলি মৃগাঙ্কর রচনার অনুরাগিনী; কিন্তু অমিয় তাকে আকর্ষণ করে। অথচ অমিয়র বিকারগ্রস্ত মন তা গ্রহণ করতে পারে না। ইলার অনাবিল প্রেমও অমিয়র কাছে অস্বীকৃত। অবশেষে অমিয় অঞ্জলি বসুর জীবনে চরম বিপর্যয় ঘটায় এবং নেশাগ্রস্ত অমিয়র হাতে মৃগাঙ্কর মৃত্যু ঘটে।

আলোচ্য উপন্যাসের বেশ কয়েকটি দৃশ্য উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কানায় পূর্ণ এবং পাঠকের নীতিবোধে আঘাত করে। সমালোচকের মতে: ''যবনিকা পতনের' তথাকথিত অশ্লীল দৃশ্যাবলী সত্য উচ্চারণের দুঃসাহস থেকে উদ্ভূত। সমগ্র কাহিনীর পরিমণ্ডলে রেখে বিচার করলে দেখা যাবে সে সময়কার সমাজজীবনের জমে ওঠা গ্লানিকে আঘাত করাই ছিল বুদ্ধদেবের লক্ষ্য। ...'যবনিকা পতনে'র ত্রুটি হচ্ছে সামঞ্জস্যের অভাব, জীবনের গ্লানিকর দিকটির বর্ণনা অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে আনন্দিত দিকটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। রচনাটির শিল্পরূপ এই কারণে দুর্বল।" [বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়: রণেন্দ্রনাথ দেব]

বুদ্ধদেব বসুর যে সমস্ত উপন্যাসে প্রেম কাব্যময় অনুভূতির সঙ্গে জড়িত তার মধ্যে 'যেদিন ফুটলো কমল' (১৯৩৩) সর্বশ্রেষ্ঠ। ''যেদিন ফুটলো কমল'-এ শ্রীলতা-পার্থপ্রতিমের সম্পর্কটি যেরূপ সহপাঠিত্ব, রুচি সাম্য ও চরিত্রগত বাধা-সংকোচের ভিতর দিয়া প্রেমের পর্যায়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা মূলত: মনস্তত্ত্ব মূলক সমস্যা; কিন্তু কতকটা পুস্তকটির কাব্যময় প্রতিবেশের জন্য ও তাহাদের ভালবাসা আত্মসচেতনভাবে বাড়িয়া ওঠায় সমস্ত ব্যাপারটি যেন কাব্যেরই একটা অধ্যায়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

আলোচ্য উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু মানুষের সম্পর্ক কীভাবে ঘনিষ্ঠ হয় তার একটি পথরেখা নির্ণয় করতে চেয়েছেন: ''দুজন মানুষের পরস্পরের কাছে আসবার দুটো পথ আছে; এক হৃদয়ের দিক থেকে—আর দুজন মানুষ মিলিত হতে পারে বুদ্ধিতে—রুচির ঐক্যে, কোনো উদ্দেশ্যের সমতায়।" উপন্যাসের ভাষা বেশ কাব্যিক: ''গোধূলি রঙিন হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ মদের মতো, তার মধ্যে সে কবিতা পড়ছে, রঙিন মদের মতো কবিতা—এর বেশি আনন্দ আর কী থাকতে পারে পার্থপ্রতিমের পক্ষে?" তবে পার্থপ্রতিম শুধুই রোম্যান্টিক নয়; তার বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। কেন-না, শ্রীলতার সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাবকে সে মেনে নিতে পারেনি। তার বাধা এসেছে নিজের ভেতর থেকে: ''ধনীকন্যা শ্রীলতাকে সে স্ত্রীরূপে ভাবতে কুণ্ঠিত, কারণ টাকা, এটুকু সে বুঝতে শিখেছিলো, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা মস্ত ব্যবধান, একটা অদৃশ্য দেয়াল, যা অনিবার্য রূপে বাধা দেবে কোনো সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কস্থাপনে।" আবার সে নিজেকে গরিব বলে ভাবতে পারে না; কেন-না গরিব কথাটার মধ্যে একটা হীনতা একটা অসহ্য অপমান আছে। এমনকি প্রথম গ্রীষ্মে শ্রীলতাকে এড়াবার জন্য ছোটোনাগপুরের অরণ্যে পলায়ন করে। অবশেষে সামাজিক পদমর্যাদার প্রাচীর ভেঙে পড়ে। উপন্যাসের পরিণতি হয় মিলনান্তক। পার্থপ্রতিম আত্মকেন্দ্রিকতার স্তর উত্তীর্ণ হয়। উপন্যাসে বাস্তবতার উপাদান কম এবং কাহিনি বয়নেও অসংগতি দৃশ্যগোচর। কাব্যিকতা উপন্যাসের স্বভাবধর্ম বিনষ্ট করলেও বাস্তবতার ক্ষীর্ণসূত্র উপন্যাসে লক্ষ্যগোচর। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে: ''যেদিন ফুটলো কমল"—এই প্রথম কতকটা পাকা হাতের পরিচয় মিলে; উপন্যাসের গঠনও বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল

চিন্তাধারায় কেন্দ্র সংহতির পরিচয় দেয়। লেখক এলোমেলো চরিত্রসৃষ্টি ও reflection বর্জন করিয়া একটি নিবিড় অনুভূতিপূর্ণ প্রেমকাহিনীর পরিণতির দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছেন—নায়ক-নায়িকার চরিত্রেও কাব্য-প্রতিবেশ হইতে স্বতন্ত্র একটা ব্যক্তিত্ব আছে।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]

১৯৩৩-এ প্রকাশিত 'হে বিজয়ী বীর' উপন্যাসে প্রেমের যে ট্র্যাজেডি অঙ্কিত তা বাইরের চক্রান্তজাত। আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমন কিছু নতুন নয়; প্রেমের চিরন্তন ত্রিভুজকেন্দ্রিক কাহিনি। তবে ঘটনাবিন্যাস প্রশংসার দাবি রাখে। উপন্যাসের নায়ক রঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। অন্নহারা বিধবা হিরণ্ময়ীকে অর্থ সাহায্য করতে গিয়ে তাঁর কন্যা অতসীর সঙ্গে রঞ্জনের আলাপ হয়। রঞ্জনের অযাচিত সাহায্য অতসী প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে, অতসীর তেজস্বিতা ও সম্ভ্রমবোধ রঞ্জনাকে মুগ্ধ করে। সরোজের সঙ্গে অতসীর সম্পর্ক ও তার নীরব প্রেম রঞ্জনাকে ঈর্ষাতুর করে। অবশেষে অতসীর তীব্র বিমুখতা কীভাবে রঞ্জনের প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হয় ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু তার বিশ্লেষণ করেছেন একজন নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায়। রঞ্জন ও অতসী যখন মিলনের দ্বারপ্রান্তে সেই সময় আবির্ভূত হয় আধুনিকা মিলি যে অত্যন্ত সরবতার সঙ্গে রঞ্জনের প্রতি তার প্রেম ঘোষণা করে। রঞ্জনের মা মিলিকে সমর্থন করে এবং রঞ্জন মায়ের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিলিকে বিবাহ করে। অতসী এ আঘাত সহ্য করতে না পেরে ট্রেনের তলায় মৃত্যুপথের যাত্রী হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে মিলির আবির্ভাব ও মৃণালিনীর ঈর্ষা গল্পে একজাতীয় জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অতসী চরিত্র বেশ সফলতার সঙ্গে অঙ্কিত। তবে আলোচ্য উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য নায়িকা অতসীর কাছে নায়ক রঞ্জন বেশ নিষ্প্রভ। বুদ্ধদেবের অন্যান্য নায়কের মতো রঞ্জন উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, কবি; তবে সে স্বার্থপর, সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং মাতৃনির্ভরশীল। অতসী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রগত কাঠিন্য, আত্মমর্যাদাবোধ, বুদ্ধিমত্তা, প্রখর ব্যক্তিত্ব, রুচিশীলতা এবং দারিদ্র্যজয়ী অনমনীয় মনোভাব।

"ধূসর গোধূলি (১৯৩৩) বুদ্ধদেবের প্রথম বয়সের রচনা হইলেও উহার মধ্যে পরিণত চরিত্র ও আবহ পরিকল্পনার আশ্চর্য নিদর্শন আছে। অপর্ণার অপার্থিব ব্যঞ্জনাময়, আত্মাসুরভিত সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাই তাহা কল্পনার দিক দিয়া বাস্তবিকই অপূর্ব। এইরূপ দেহস্থূলতাহীন, ইঙ্গিত ভাস্বর, স্বল্পতম প্রচেষ্টার আধারে বিবৃত সৌন্দর্যসার নিখুঁত পরিমিতিবোধ ও যথাযোগ্য কর্মকুশলতার সাহায্যে আমাদের অনুভব সংবেদ্য করা হইয়াছে।"

[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

আলোচ্য উপন্যাসের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে নীলকণ্ঠের দ্বারা। নীলকণ্ঠ কবি এবং ব্যর্থ প্রেমিক; তার ব্যর্থপ্রেমের পটভূমিতে আছে অপর একটি ব্যর্থ প্রেমের উপাখ্যান। অধ্যাপক পিতার সন্তান নীলকণ্ঠের খুড়তুতো বোন অপরূপ সুন্দরী অপর্ণাকে ভালোবেসেছিল তারই পিতার প্রিয় ছাত্র কল্যাণকুমার—যে ছিল দীর্ঘকায়, প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ ও কর্মময়তায় সদাঅস্থির। নীলকণ্ঠ ভালোবেসেছিল কল্যাণের বোন মায়াকে। কল্যাণকুমার ও অপর্ণার বিবাহ হলেও নানা ঘটনাক্রমে শেষ পর্যন্ত অপর্ণার অপমৃত্যু হয় এবং এই প্রেমের ব্যর্থতা পরোক্ষভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করলো মায়া ও নীলকণ্ঠের প্রেমকে।

আলোচ্য উপন্যাসে বাস্তববাদী কাঠামো একেবারে বর্জিত না হলেও বাস্তববাদের মানদণ্ডের কাহিনি বিচারে সমস্যা দেখা দেয়। কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বুদ্ধদেব বসু মানব প্রকৃতির গভীরে অবতরণে আগ্রহী। সমালোচকের মতে: "উপক্রমণিকার প্রতিশ্রুতি মূল গ্রন্থে বিপর্যস্ত হইয়াছে। দাম্পত্য সম্পর্কে ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত ব্যবহারে সে প্রায় ছায়ার ন্যায় ধূসর ও অনির্দেশ্য। এই স্পর্শ ভীরু রমণীয় ফুলটি ঔপন্যাসিক কল্পনার সুদূর উচ্চশাখায় চিত্তাকর্ষক লাগিয়াছে। কিন্তু বাস্তব জগতের সংঘাতময় পরিবেশে তাহার সৌন্দর্য অপেক্ষা অসহায় নিষ্ক্রিয়তাই অধিক ফুটিয়াছে। এই সুকুমার কল্পনা-স্বপ্ন বস্তু-অবয়বের সংহতি লাভ করে নাই।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

আলোচ্য উপন্যাসের কল্যাণকুমার এক আশ্চর্য অশান্ত চরিত্র। তার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ডতায় সকলে স্তম্ভিত। কল্যাণকুমারের চরিত্রের এক একটি অধ্যায় যেন বিস্ফোরণের মতোই আকস্মিক। "কল্যাণকুমারই গ্রন্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও সক্রিয় চরিত্র। উপন্যাসের সমস্ত কিছু আলোড়ন তাহারই ব্যক্তিসত্তার অতি-সম্প্রসারণ-সঞ্জাত। তাহার খামখেয়ালি মেজাজও অশান্ত, আত্মপ্রসারণশীল প্রকৃতি যে দ্রুত পরিবর্তন পরম্পরার সোপানকারী অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্র কেন্দ্রাশ্রয়ী রূপে প্রতিভাত হয় না। তাহার প্রেম, বিলাতযাত্রা, আচরণের উৎকেন্দ্রিকতা, স্ত্রীর প্রতি অসুস্থ সন্দেহপরায়ণতা ও শেষ পর্যন্ত উন্মাদ রোগে পরিণত—এই সমস্ত বিপর্যয় স্তরগুলি যেন আকস্মিক ও কারণশৃঙ্খলাহীন বলিয়া মনে হয়। বিশেষত, অপর্ণার প্রতি তাহার প্রণয়োন্মেষ যেন তাহার সাধারণ খেয়ালিমনোভাব ও অশান্ত কামনার অব্যবস্থিত চিত্ততার আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সে অপর্ণাকে চাহিয়াছে যেন একটা নতুন ব্যঞ্জন আস্বাদন বা নতুন বই বা আসবাব বা পোষাক কেনার মত—ইহার মধ্যে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য আছে কিন্তু আকর্ষণের গভীরতা নাই।" [বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা] নীলকণ্ঠও উপন্যাসে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যে বলেছেন: "নীলকণ্ঠ ভূমিকায় যেরূপ প্রগাঢ় প্রজ্ঞাঘন জীবনসমীক্ষার পরিচয় দিয়াছে, উপন্যাস মধ্যে সেরূপ সক্রিয়তা দেখায় নাই। সে অপর্ণার মায়াময় সৌন্দর্যের যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছে, জীবননৈকট্যে তাহার কোনো আভাস দেয় নাই। সে বরাবর অপরিণত বুদ্ধি বালকই রহিয়া গেল। অপর্ণা ও কল্যাণের প্রেমের উন্মেষ ও নিবিড়তা যে তাহার গ্রন্থজগতে সীমাবদ্ধ, বাস্তবতাবোধহীন মনে কোন গভীর রেখাপাত করিয়াছে বা উহার রহস্য তাহার বোধগম্য হইয়াছে এরূপ কোন নিদর্শন নাই।" নীলকণ্ঠ উপন্যাসে উপেক্ষিত, স্বাতন্ত্র্যহীন; ব্যর্থ প্রেমিকরূপেও তার ব্যক্তিত্ব উপন্যাসে দীপ্ত নয়।

'সূর্যমুখী' (১৯৩৪) উপন্যাসে লেখক শিল্পতত্ত্বকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। তাঁর তত্ত্ব হল প্রেমের সঙ্গে শিল্পকলার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। শিল্পী প্রাণসূর্যকে ভালোবাসে বলে সে সূর্যমুখী। মিহির একজন কবি, তাঁর মা হৈমন্তী আপন স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, সংসার ভার লাঘবের জন্য জোর করে তার সঙ্গে মৃণালের বিয়ে দিলেন। কিন্তু জৈব আকর্ষণ যে প্রেম নয়, তা মৃণাল বুঝতে পারেনি। আকর্ষণের বন্ধনের ফলে মৃণালের প্রতি মিহির বিমুখ হল। এমন সময় কবি ও পত্রিকার পরিচালিকা তাপসীর আবির্ভাব হল। তাপসী তাকে মানসিক তৃপ্তি দিল। দীর্ঘ

যন্ত্রণার পর মিহির ভাবলো সে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে আসন্ন প্রসবা মৃণালের মৃত্যু হল। এই সময় অপরাধের চেতনায় মিহির যখন ক্লিষ্ট তখন তাপসী তাকে বলল: "প্রার্থনা করো সূর্যের কাছে, সূর্য তোমার মধ্যে জ্বলে উঠুক।" মিহির ও তাপসী মিলনে হৈমন্তী বৃষ্ট, কবি প্রাণের উত্তাপে সঞ্জীবিত হল।

যে সমস্ত উপন্যাসে বুদ্ধদেবের সুরে গভীরতার স্পর্শ আছে তাদের মধ্যে 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৯৩৪) অন্যতম। আলোচ্য উপন্যাসে বিগত প্রেমকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনি বিবৃত। এ উপন্যাসেও কাব্যের পরিমণ্ডল আরও সুপ্রকাশিত। রেবার নারী হৃদয় প্রেমের অপমৃত্যুকে চূড়ান্ত বলে মানতে চায় না; কিন্তু পলাশ জানে জীবনে কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়াটা চূড়ান্ত। কাহিনির শেষে রেবার ছাত্রী কিশোরী প্রতিমাকে এনে এবং পলাশের প্রতি তার আকর্ষণের কথা বলে ঔপন্যাসিক কাহিনির গাম্ভীর্যকে অনেকখানি খর্ব করেছেন। "মৃত্যুর পরে নবজন্ম: এই নিয়ে জীবনগতি—এই সস্তা রাবীন্দ্রিক তত্ত্বে রবীন্দ্রোত্তর লেখকের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু মানুষের একদিনের ভালবাসা শত সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছা সত্ত্বেও আর একদিন কেন ফিরিয়ে আনা যায় না এর মধ্যে একটি আধুনিক যুগ প্রশ্ন বিবৃত হয়েছে।"

[বাংলা উপন্যাসের ধারা / অচ্যুত গোস্বামী]

বুদ্ধদেব বসুর 'লালমেঘ' (১৯৩৪) উপন্যাসটি প্রায় রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চে'র প্রতিরূপ। 'লালমেঘে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র পুরুষ অবিনাশ। 'লালমেঘ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চে'র প্রভাব থাকলেও দুটি উপন্যাসের পরিণতি কিন্তু একরকম নয়। 'মালঞ্চে' নীরজার মৃত্যু হলেও 'লালমেঘে'র শোভনা প্রাণ ফিরে পেয়েছে, অবিনাশ তাকে নিয়ে ডিহিরিতে বেড়াতে গেছে। শোভনা জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু অবিনাশের জন্য রয়ে গেল আমৃত্যু বহনীয় ব্যর্থতার ভার; কেন-না সন্ধ্যামণির ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনি বুদ্ধদেবের অন্যান্য উপন্যাসের কাহিনি অপেক্ষা কিছুটা স্বাতন্ত্র্যধর্মী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অবিনাশ শোভনাকে বিবাহ করলে আনন্দিত শোভনা তার সমস্ত সত্তা সমর্পণ করেছে অবিনাশকে। কিন্তু শোভনার দীর্ঘস্থায়ী অসুখের জন্য তাকে সেবা করতে আসে অবিনাশের বিমাতার বোনঝি সন্ধ্যামণি। রোগিনীর সেবার ফাঁকে সন্ধ্যামণি অবিনাশকে ভালোবেসে ফেলে। ফলে শোভনার মনে বিচলিতচিত্ততার ভাব আসে। এই পর্যন্ত 'মালঞ্চে'র সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও পরিণতিতে সাদৃশ্য নেই। তবুও 'মালঞ্চে'র সঙ্গে 'লালমেঘে'র সাদৃশ্য কারও চোখ এড়ায় না। এমনকি ভাষাভঙ্গিতেও 'মালঞ্চে'র সঙ্গে 'লালমেঘে'র আশ্চর্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

১. "বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এলো দেহে, চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল; বললে, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।' হঠাৎ ঢিলে-সেমিজ পরা পাণ্ডবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" [মালঞ্চ]

২. "শোভনা হঠাৎ বালিশ থেকে মাথা তোলবার চেষ্টা করলো, পাতলা সেমিজের নিচে যেন কেঁপে উঠল তার কঙ্কাল। 'তুই বসে আছিস কেন এখানে, যা চলে যা, মরতে দে

আমাকে। ওরে ডাইনি, তুই ওৎ পেতে বসে আছিস—কিন্তু সইবে না, সইবে না, কাঁটা হয়ে ফুটবে, পুড়ে মরবি—এই আমি শাপ দিলুম।”

বুদ্ধদেব বসু 'মালঞ্চ' উপন্যাসের ঘটনাধারাকে অন্য খাতে কেন প্রবাহিত করে 'লালমেঘ' উপন্যাস লিখলেন তার কারণ সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব বক্তব্যে প্রকাশিত হয়ে যায়: “মালঞ্চ দুঃসহরকম নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। যেহেতু তিনি কারোরই মানসক্রিয়া উদ্‌ঘাটন করেননি, তাই কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো পরিস্ফুট ভাবে, ভাবখানা দাঁড়িয়ে গেছে যেন মুমূর্ষু নীরজাই অপরাধী, আদিত্য আর সরলাই অনুকম্পার পাত্র।...

নীরজার যদি কোনো অপরাধ থাকে, সে অন্য কিছু নয়, তার স্বাস্থ্যহীনতা। আদিত্যের সঙ্গে তার দশ বছরের বিবাহিত জীবন উভয়তই পরিপূর্ণরূপে সুখের ছিলো, সেখানে কখনো সংশয়ের একটু ছায়াও পড়েছে এমন কোনো আভাস লেখক দেননি।... নীরজার স্বপক্ষে আরো বলবার এই যে তার ঈর্ষা নেহাতই অধিকার বোধ প্রসূত নয়, স্বামীকে সে সত্য করেই ভালোবাসে। এই ঈর্ষার একটি তীব্র জ্বলন্ত রূপ আছে। সাহিত্যে যা যথার্থই প্রকাশযোগ্য, কিন্তু নীরজার ঈর্ষা পর্যন্ত উজ্জ্বল নয়, তাও যেন শুধুই তার অন্তরের কার্পণ্যের প্রকাশ।... অন্তিম দৃশ্যটিতে ট্র্যাজেডির তীব্রতা, করুণ রসের স্নিগ্ধতাও নেই, পাঠকের মন কোনো দিক থেকেই বিক্ষোভ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায় না।”

বুদ্ধদেব বসু এ সমস্ত থেকে বাংলা উপন্যাসকে মুক্তি প্রদানের জন্য 'লালমেঘ' উপন্যাসের পরিণতিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করলেন।

১৯৪২-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম উপন্যাস 'কালো হাওয়া' সম্পর্কে সমালোচকদের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য:

১. “কালো-হাওয়া'য় বুদ্ধদেবের বাস্তব প্রবণতা কাব্যাবেশবর্জন যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। মনে হয় বুদ্ধদেব এতদিনে কাব্য হইতে উপন্যাসকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন ও খাঁটি ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত আলোচনা পদ্ধতি ও জীবনঅভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। ভাষার আতিশয্যবর্জিত সংযম, মানস ঘাতপ্রতিঘাতের দৃঢ় সুস্পষ্ট উপলব্ধি, বিশ্লেষণের সাবলীল নৈপুণ্য, ঘটনা প্রবাহের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ—এই সমস্ত দিক দিয়াই পরিণতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।” [বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা /শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

২. “সকল রসের উৎস, আসলে বা জীবনেরই উৎস, সেই প্রেম সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর ধারণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'কালো হাওয়া' উপন্যাস।... 'কালো হাওয়া' বুদ্ধদেবের পরিণততম উপন্যাস। 'কালো হাওয়া'র প্রতিটি কবিতা এত স্পষ্ট ও সজীব যে মনে হয় কোনো সদ্যদৃষ্ট প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে একটি রচিত।”

[বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায় / রণেন্দ্রনাথ দেব]

'কালো হাওয়া' উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৪২ হলেও রচনাকাল ১৯৩৯-৪০। প্রায় একই সময়ে লিখিত 'দময়ন্তী' কবিতাতে যৌবনের অমরত্ব বিষয়ে কবির বক্তব্য আলোচ্য উপন্যাসে যেন প্রতিবিম্বিত হয়। সমালোচ্য উপন্যাসের মূল বিষয় প্রাণ-অপ্রাণ এবং মানবিক ও অমানবিক শক্তির সংঘাত। পঞ্চাশোর্ধ নায়ক অরিন্দম প্রাণধর্ম ও অমেয় জীবনীশক্তির প্রতীক। আর অপরদিকে

অরুণ ও মহামায়া যথাক্রমে প্রাণের শত্রু ও বিকারগ্রস্ততার প্রতীক। অরিন্দমের সকল প্রাণশক্তি অরুণের মধ্যে বিকৃত কামাচারে পরিণত। আলোচ্য উপন্যাসে পরিবার বৃত্তের, আদর্শগত বিরোধ, পারস্পরিক প্রীতি বিমুখতা ইত্যাদি অরিন্দম, হৈমন্তী, মিনি, বুলু, অরুণ, উজ্জ্বলা চরিত্রবৃত্তে বেশ সুরূপায়িত। তবে সমগ্র পরিবারে মহামায়ার সর্বনাশী প্রভাব এক ভয়াবহ শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে 'বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা ও বাস্তববোধের অভাবের' যে অভিযোগ আনীত হয়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালো হাওয়া' উপন্যাসে তার অনুপস্থিতি লক্ষ করেছেন। তবে "চরিত্র সৃষ্টি কিংবা উপাখ্যান সাজানো কিংবা সংলাপ ও কবিতা সৃষ্টি, যে-কোনো দিক দিয়ে বিচার করা যাক 'কালো হাওয়া' বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।"

'নির্জন স্বাক্ষর' (১৯৫১) কবি-সাহিত্যিকদের প্রেরণারহস্য রহস্যবিষয়ক উপন্যাস হলেও, এখানে গভীর অনুভূতি বিরাজিত থাকলেও "ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র পরিণতি বিষয়ে উচ্চাঙ্গের শিল্পদক্ষতা" অনুপস্থিত, একথা বলেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় আলোচ্য উপন্যাসে জীবনচেতনা অনেক বেশি।

প্রৌঢ় সোমেন দত্ত সাহিত্যিক রূপে তালকানা; চরিত্রটি পরাজয়ের গ্লানি বহনকারী ও নিঃসঙ্গ। এক দুঃস্থ নারীর সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে স্ত্রীপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় সে বিবেকদংশিত। শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি আত্মহত্যা করে। উপন্যাসটি মানসকথন ও ইম্প্রেসনিস্ট রীতিতে রচিত হলেও নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অভাব পরিলক্ষিত হয়। "মূলত 'নির্জন স্বাক্ষর' উপন্যাসে প্রেম নামক এক পয়সা শক্তির নিকট পরাজিত এক মানুষেরই আলেখ্য রচনার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। ...যুগযন্ত্রণা ও আধুনিক ব্যক্তি মানুষের সংকটেরই এক কাহিনি 'নির্জন স্বাক্ষর'। ঘটনাবাহুল্য নেই, ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্ধান সত্যের প্রতিভাত রচনাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ...চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির উপযুক্ত প্রয়োগও লক্ষ্যযোগ্য, বস্তুত বিপন্ন বিস্ময়ে অভিভূত ও আত্মশীল একটি পুরুষের প্রেমেরই বেদনাদীর্ণ আখ্যান 'নির্জন স্বাক্ষর', প্রেমের স্বীকৃতিতে সংকুচিত একটি চিত্তের আরক্ত ইতিহাস এই উপন্যাসখানি। প্রবল জীবনচেতনার দ্বারা প্রদীপ্ত যে চরিত্র, সেই সোমেনের আত্মহনন প্রতিবাদেরই প্রতিফলন ঘটেছে এই রচনাটিতে। তাই লেখক বুদ্ধদেব বসুরও সন্ধিৎসু মনেরই এক প্রতিরূপ এই উপন্যাসখানি।" [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপাখ্যান/মুহম্মদ রেজাউল হক]

'নির্জন স্বাক্ষর' উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষের সমস্যা ও সংকটের আলেখ্য চিত্রিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের জীবন জটিল, যন্ত্রণাদগ্ধ ও সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। মূল্যবোধের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে মানুষের যে ইতিহাস ছিল জটিল তা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সমস্যাসংকুল পরিবেশে হয়ে ওঠে জটিলতর। মূল্যবোধের পরিবর্তনে হতাশাগ্রস্ত মানুষ তার অবিনাশী অস্তিত্ব সম্পর্কে সংকটাপন্ন; যুগজীবনের এই পরিপ্রেক্ষিতকে বুদ্ধদেব বসু 'নির্জন স্বাক্ষর' উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন।

'মৌলিনাথ' (১৯৫২) উপন্যাসেও বুদ্ধদেব শিল্পসাহিত্য বিষয়ক তত্ত্ব উপস্থাপনে প্রয়াসী। তিনি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'কবিতা' পত্রিকায় 'কবি ও তার সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "এ

যুগের দাবী এই যে শিল্পীকে সে মুক্তি দিয়েছে। কোনো রাজা বা পুরোহিতকে খুশি করবার দরকার নেই। যাকে খুশি করা দরকার সে নামহীন ও অদৃশ্য, তাকে আমরা পাবলিক বলি।" 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য: "শিল্পীর প্রথম কর্তব্য তাই নিজেকে আবিষ্কার করা, আর তার জন্য নিজের অনেক গভীরে নামতে হয় তাকে, পৌঁছতে হয় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সেই গহনে, যেখানে পাথর কাদা আবর্জনার স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতা, ...আর এই আত্মআবিষ্কার, আত্মপ্রকাশের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াটি যতক্ষণ চলতে থাকে—জীবন ভরেই চলা উচিত—ততক্ষণ বাইরের কোন শাসন শিল্পীর উপর প্রযোজ্য নয়, ...এইভাবে, তাঁর কর্মের বাধ্যতাই তাঁকে মুক্তি এনে দেয়, সৃষ্টি কর্মের সুকঠিন শর্ত থেকেই এর উদ্ভব।"

শিল্পীর জীবন প্রেমের অভাবে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 'মৌলিনাথ' উপন্যাসের নায়ক চরিত্র মৌলিনাথ তার নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র ও কবি মৌলিনাথকে দুই বোন চিত্রা ও গীতা ভালোবাসলেও মৌলিনাথ তাতে সাড়া দেয়নি। অধ্যাপনার জীবন পরিত্যাগ করে পুরোপুরি সাহিত্যিক বৃত্তি গ্রহণ করলেও, যা তার মনোমতো ছিল, তার জীবনের শূন্যতা পূর্ণ হল না। তার বিশ্বাস ছিল 'অন্যান্য মানুষের চাইতে শিল্পীর প্রাণ শক্তি অনেক প্রবল। বাঁচার কোনো পরদা চড়ানো বৃহত্তর রূপেরই নাম শিল্পরচনা।' মৌলিনাথের কাছে একমাত্র লক্ষ্য লেখা—"দু-চারখানা ভালো বই লিখে নাম করে, সেই নাম সুদে খাটাতে চেষ্টা করেনি সে, তারই জোরে প্রতিষ্ঠা খোঁজেনি জীবনের অন্যান্য বিভাগে। ...আর তার এই স্বাধীনতা-স্বাবলম্বিতা-একান্তভাবে শুধু আমি হবার ক্ষুরধার স্বাধীনতা তার—এটা বজায় রাখার জন্য কিছু ত্যাগও তাকে করতে হয়েছে, অত্যাচারও সইতে হয়েছে কিছু। এটা বজায় রাখার জন্য তাকে অন্ধকারে নামতে হয়েছে কখনো-কখনো...।" মৌলিনাথ কিন্তু শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠতার মূল্য পায়নি। গীতা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল যে সে অনেক কীর্তি রাখলেও তার সমস্ত আশা-ইচ্ছা কথাতেই পর্যবসিত হবে। সে নিজেকে একদিন হারিয়ে ফেলবে।

মৌলিনাথের জীবনে শুধু প্রেমেরই অভাব নয়। সে শিল্পকলাকে অস্বাভাবিক মূল্য দান করলেও তাকে জীবনবিচ্ছিন্ন রূপে কল্পনা করেছে। শেষ পর্যন্ত সে এক অখ্যাত সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে জীবনের অভাব পূর্ণ করে। প্রসারিত জীবনে ছড়িয়ে দিতে না পারার জন্য মৌলিনাথের জীবন এতকাল ব্যর্থ হয়েছে। মৌলিনাথের জীবন সাহিত্য-শিল্পকলার আর একটি তত্ত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা হল শিল্পকলা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না এবং এ বিশ্বে তার স্বাধীন সত্তা নেই। মৌলিনাথ কাহিনি নিরপেক্ষ রচনা নয়; অবশ্য কাহিনি সর্বস্বতাই আলোচ্য উপন্যাসের সব নয়। চরিত্রগত প্রতিক্রিয়ার পরিণাম বর্ণনাই আলোচ্য উপন্যাসের মুখ্য বিশিষ্টতা। স্বয়ং লেখক জানিয়েছেন: "মৌলিনাথ-এ আমি এমন একজন মানুষকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছি, যিনি তার সমগ্র জীবনব্যাপী বিরাট মূল্যে ও ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে একজন পূর্ণাঙ্গ শিল্পীতে রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন।" আলোচ্য উপন্যাসটি একজন সাহিত্যিকের আত্মকথার বাহন; এখানে নেতিবাদী মনোভঙ্গি থেকে উত্তরণের প্রয়াস লক্ষ্যগোচর। 'মৌলিনাথ' উপন্যাসেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের বুদ্ধদেব বসুর মানস পরিবর্তনের পরিচয় ব্যক্ত। আত্মমুখী ভাবপ্রবণ চেতনাপ্রবাহে সমর্পিত একটি চিত্তের বিশিষ্ট রূপায়ণ 'মৌলিনাথ' উপন্যাসটি। ...চল্লিশের

দশকের শেষ পর্যায়ে বুদ্ধদেব চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির আশ্রয়ে তাঁর অননুকরণীয় ভাষা ভঙ্গিতে মানবমনের দ্রুত সঞ্চরণশীল ভাবনা বা আত্মকথনের প্রতিফলন সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন, সেই তিনিই পঞ্চাশের দশকে উপন্যাসে কাহিনির দাবিকে অনেকাংশে অস্বীকার করে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে পালাবদলের সংকেত দান করলেন। ...বুদ্ধদেব 'মৌলিনাথ'-এ দ্রুত সঞ্চারী চিন্তাস্রোতে অতীতচারিতার মধ্যে বা বর্তমানের বিবৃতিমূলকতার আশ্রয়ে তার অভিজ্ঞতার ইতিহাস করেছেন ব্যক্ত, ঘটনাকেও অতি ঘনিষ্ঠ এক অবয়বে করেছেন উচ্চারণ। মূলত উপন্যাসের অবয়বে চিন্তা প্রবাহের মাধ্যমে কবিতার স্পর্শ ও নৈকট্য লাভ করেছে তাঁর গদ্য, উপন্যাসের ভাষারীতি।"

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস/মুহম্মদ রেজাউল হক]

আলোচ্য উপন্যাসে প্রকৃতিবাদী জীবনতৃষ্ণার প্রকাশও অনুপস্থিত নয়। উপন্যাসটি একজন শিল্পীর জীবনালেখ্য; শিল্পী সাধারণের মতো জীবনযাপন করলেও জীবনকে বিশেষভাবে রূপায়িত করেন এবং সেই জীবন থেকে মুক্তি প্রয়াসীও বটে।

অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বুদ্ধদেব বসু যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন সেখানে যৌবনের উচ্ছ্বাস, প্রেমের বর্ণিল বিভঙ্গ ইত্যাদি অনুপস্থিত। কিন্তু এ বক্তব্য যথার্থ নয়। যৌবনের রক্তিম রূপ হয়তো এ পর্যায়ে অনুপস্থিত; কিন্তু পরিণত শিল্পদৃষ্টিতে তা অনেক স্থিরতা লাভ করেছে এবং 'শেষ পাণ্ডুলিপি' (১৯৫৬) উপন্যাসে প্রেমের প্রাবল্য পুনরায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে বীরেশ্বরের অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের সংকটকে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক বীরেশ্বরের ছিল সহজ স্বাভাবিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বোহেমীয় জীবনের প্রতি আকর্ষণ। প্রফুল্ল ও অর্চনার সুখের সংসার ভেঙে দেওয়ার দুর্বার স্পৃহায় সে ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বীরেশ্বর, প্রফুল্ল ও অর্চনার শেষ মোটর ভ্রমণে অর্চনা দুর্ঘটনায় মারা যায়। বীরেশ্বরও শেষ অবধি আত্মহত্যা করে।

আলোচ্য উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে আছে আর একটি উপাখ্যান, আর তা হল বীরেশ্বরের মানসিক হাসপাতালে অবস্থানের উপাখ্যান; যদিও এর সঙ্গে মূলকাহিনির তেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ করা যায় না। মনে হয়, বীরেশ্বরের প্রখর ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বই তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। বীরেশ্বর আলোচ্য উপন্যাসে এক প্রতিবাদী প্রবল পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর। তার সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মর্তব্য: "সমস্ত উপন্যাসটি তার দীপ্ত প্রতিবাদে জ্বল-জ্বল করে উঠেছে—সাধারণ যাকে বলি, রোজ যাদের চোখে দেখি রাস্তায়-ঘাটে, তাদের সঙ্গে তার তফাত এই প্রদীপ্ত বিস্ফোরণে, যা সব ফাটিয়ে দিয়ে ফুলঝুরির মতো ঝিলিক মেরে গেলো।"

'শেষ পাণ্ডুলিপি' উপন্যাসে আর একবার বুদ্ধদেবীয় গদ্য গতিময়তা ও সৌন্দর্যে কবিতার সমান্তরাল হয়ে ওঠে: "অবিশ্বাস্য এক রাত্রি। কলকাতার রাস্তা চাঁদের আলোয় গলে গেছে, ধাবমান গাড়ির দুপাশে বয়ে যাচ্ছে নদীর মতো। কখনো ঝকঝকে রূপালি, কখনো মেঘের ছায়ায় ইস্পাত রঙের।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে নাগরিক মানুষের ব্যক্তিত্বের সংকট, বুদ্ধিজীবী মানুষের জটিলতা 'শেষ পাণ্ডুলিপি' উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু রূপায়িত করলেন। সাহিত্য-শিল্পের স্বাভাবিক ভূমি কাকে অস্বীকার করার যে প্রবণতা যুগের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছিল বীরেশ্বরের মন্তব্যে তারই প্রকাশ লক্ষ্যগোচর। আর উপন্যাসের তত্ত্ব হল, জীবনের সুস্থ স্বাভাবিকতাকে পরিহার করে জৈবিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে জীবনের বাস্তবতা সন্ধানের চেষ্টা হঠকারিতার নামান্তর মাত্র। ১৯৫৮-তে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'শোণপাংশু' উপন্যাসটি, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "একটি কৃত্রিম আদর্শ-ভিত্তিক, নানা জটিল বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাহিনী। ...জীবনের যে রূপ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও কোনো গভীর তাৎপর্যবাহী নয়।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা] আলোচ্য উপন্যাসে এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে যেখানে অতিনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রাও কর্তৃপক্ষের নিয়মকানুনের শাসনে শিক্ষকরা বিকৃত মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছে। সুভদ্রাদেবী, নিত্যানন্দ মজুমদার, বেণীমাধব, লোকেন, মালতী, অভিজিৎ ইত্যাদি চবিত্রগুলি নানা চোরাবালিতে বিপর্যস্ত। চরিত্রগুলো যেন ঘটনা নিয়ন্ত্রিত। আলোচ্য উপন্যাসে যেন রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকের ছায়া লক্ষ করা যায়।

'শোণপাংশু' উপন্যাসটিকে শুধুই খণ্ডচিত্রের রূপায়ণ বললে চলবে না। "শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানসিক সংকট ও সংঘর্ষের কাহিনিকে রূপায়িত করেছেন লেখক। মুক্তিগ্রাম নামক একটি মফস্‌সল এলাকায় আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে স্বাধীনতা উত্তরকালে পরিশীলিত পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল প্রয়াসের মধ্যেও হীনমন্যতা, পরশ্রীকাতরতা যে কত নিম্ন-মনোবৃত্তির পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারে তারও প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য রচনায়।" [দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস] আলোচ্য উপন্যাসে লেখক-মানসের পরিবর্তনধর্মিতার ইঙ্গিত আছে। বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশে বুদ্ধদেব বসুর অবদান আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ের বাংলা উপন্যাসের পরিবর্তনমুখী প্রেক্ষিত তাঁর উপন্যাসে প্রতিভাত হলেও যুদ্ধ পরবর্তী জীবনের জটিল প্রকাশ তাঁর উপন্যাসে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরোক্ষ অভিঘাত, ভারতভাগ ও স্বাধীনতা অর্জন, বাংলাদেশের শরণার্থী আগমন, অর্থনৈতিক- সাংস্কৃতিক-সামাজিক বিপর্যয় ইত্যাদি তেমনভাবে তাঁর উপন্যাসে আসেনি। অবশ্য অন্তরঙ্গ জীবনের বিষণ্ণতাবোধ, একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি যে তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত এমন বলা যাবে না। আলোচ্য পর্বের অর্থাৎ ষাটের দশকে রচিত বেশ কয়েকটি উপন্যাসে [পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), রাত ভরে বৃষ্টি (১৯৬৭)] বুদ্ধদেব বসুর শিল্প দৃষ্টির পটভূমিকা ব্যাপকতা অর্জন করলেও তা কতখানি জীবন সংলগ্ন তা বিতর্কের। কবিসত্তা ও সমাজসত্তার যে দ্বন্দ্ব তা বুদ্ধদেব বসু অতিক্রম করতে পারেননি। ফলত তিনি বাংলার একক ও নিঃসঙ্গ প্রতিনিধি। আসলে বুদ্ধদেব বসু পশ্চিমের সাহিত্যে নিজেকে প্রতিফলিত দেখেছেন বলে তাঁর মধ্যে নিঃসঙ্গ সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। বুদ্ধদেব স্বয়ং বলেছেন: "পশ্চিমের গতিশীল তীব্রতার প্রতি আমার আকর্ষণ যেমন দুর্বার, তেমনি আমি রবীন্দ্রনাথের শান্তরসে মুগ্ধ না হয়ে

পারি না। এই দ্বন্দ্ব আমার নিত্যসহরে, এবং আমি মাঝে মাঝে যেসব ভাবনাবেদনা প্রকাশ করার চেষ্টা করি, তারাও এই বেদনার দ্বারা সংক্রমিত।" বৃহত্তর সামাজিক জীবন ও মানুষ তাঁর রচনায় অনুপস্থিত হলেও তিনি কালের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেবের ভূমিকা সম্পর্কে দুটি মতামত যথেষ্ট স্মরণীয় বলে মনে হয়।

১. "কবি হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর পরিশ্রমশীলতা, অনুসন্ধান ও শব্দানুভূতি যেমন তাঁর উপন্যাসে দীপ্তি বিকাশের হেতু হয়েছে তেমনি একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর বহু গল্প নীরক্ত, প্রকৃত আবেগহীন, ভারি এবং শ্লথ। তাঁর অধিকাংশ চরিত্রকে তাই মনে হয় প্রাণবন্ত ও সজীব নয়, বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষিত চরিত্রের খসড়া মাত্র। তাঁর ধীশক্তি তাঁর অনুভূতিশীর্ণতাকে সর্বত্র আচ্ছাদন করতে পারেনি। ...তাঁর কোনো কোনো উপন্যাস জীবনের প্রতি শিশুসুলভ উচ্ছলপ্রবণতার লক্ষ্য দেয়, পরিণত অভিজ্ঞতার দানে আমাদের তৃপ্ত করে না।"

[বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়/রণেন্দ্রনাথ দেব]

২. "বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস রচনার জগৎ সীমিত; জীবন-অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, তবুও জীবন উন্মোচনে তাঁর দৃষ্টি বিশ্লেষণাত্মক ও গভীর। তাই অধিকাংশ তিনি নিজেই নায়ক বিদগ্ধ, রুচিবান ও বিদ্রূপী। 'সাড়া', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'তিথিডোর'—এ যে জীবন, সমাজ মানুষ, তার ভুবন—সে ভুবনে যত আলো আছে, তার চেয়ে বেশি আছে অন্ধকার, সামাজিক ভূমিকা পালনে অক্ষমতা আছে—প্রকৃত সত্য আধুনিক যন্ত্রণাক্ষুব্ধ ও জটিল জীবনের মুখোমুখি হওয়ার অভিলাষী বুদ্ধদেব বসু; কিন্তু এ জীবন তো সহ্য করা যায় না—অসহ্য, কষ্টকর, দুঃখময়—কারণ এই সমাজের তিনি একজন হয়েও সামাজিক পরিবর্তনে উৎসাহী নন—একা, একান্তই একা তিনি।" [ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু/আবুল হাসানাত। উত্তরাধিকার: বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪]

জটিল বাস্তবের নগ্নরূপ, বৃহত্তর সামাজিক মানুষের পরিচয় ইত্যাদি বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে অনুপস্থিত থাকলেও ব্যক্তির মানসিকতার আলো ছায়া তাঁর উপন্যাসে বিপুলভাবে অঙ্কিত। বুদ্ধদেবকে একেবারে সমাজচেতনাবিহীন ঔপন্যাসিক বলা অনুচিত; কেন-না, তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা সমাজের নীচুতলার না হলেও, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত হলেও তাদের যে মানসচরিত্রগত জটিলতা তা সমকালীন দেশ-কাল ও সমাজগত। তিনি হয়তো উপন্যাসে খণ্ডিত ও আংশিক সত্যের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন; আর সেই রূপায়ণে তাঁর সততা প্রশ্নাতীত। ব্যক্তি মানুষকে তিনি বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে উপস্থাপিত করেন তার প্রেম-হতাশা-বিষণ্ণতা ইত্যাদির পটভূমিকায়। মানবমনের গহন-গভীরে আলোক নিক্ষেপ করে যে মানুষকে তিনি উদ্ভাসিত করেন তার ব্যাখ্যা রূপে বুদ্ধদেব বসু বাংলা উপন্যাসের ভুবনে একক ও অনন্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর': বিলীয়মান জীবনের বর্ণময় অন্তরাগ

কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অনুবাদক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় পুরুষ। তিরিশের যুগের যৌবনের স্পর্ধিত আবেগকে অবলম্বন করে তিনি উপন্যাসের ভুবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে স্তিমিত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে তাঁর জীবনদর্শন অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাঁর চিন্তা শক্তি ও কবিদৃষ্টি অনেক স্বচ্ছতা লাভ করে। তিরিশের যুগের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই তাঁর পথচলা শুরু হয়েছিল। তখন চারিদিকে জীবনযন্ত্রণার বেদনাময় প্রকাশ, বৈশ্যযুগের আধিপত্য বিস্তারের কাল, জীবনযাপনের ক্লিন্ন তিক্ত ইতিহাস তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর 'আমার যৌবন' গ্রন্থে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক প্রেক্ষাপটের স্মরণীয় আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে: "অনুকূল ছিল না সময়টা—কারো পক্ষেই নয়, সদ্য যারা উপার্জনে সচেষ্ট তাদের পক্ষে রীতিমতো বৈরী। জগৎ জুড়ে ব্যবসা মন্দ চলছে, ভারতবর্ষে গান্ধীজীর উপবাস, ঢাকা চাটগাঁর সন্ত্রাসবাদ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। আর অবশ্য বিবর্ধমান বেকারবাহিনী, বেসরকারী আপিসগুলোতে ছাঁটাই—বাঙালির বিপুল বাঞ্ছিত সরকারী কর্মেও কুঞ্চিত হলো মাসান্তিক বেতন, যেন বৃটিশ দম্ভের শৈথিল্যপ্রাপ্তির ইঙ্গিত জানিয়ে"। এই রকম এক অদ্ভুত প্রতিবেশে ব্যক্তিমানুষ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ক্রমপরিবর্তিত হচ্ছিল। মানবমহিমার ক্রমবিলুপ্তি ইতিহাসের পাতায় ধরা পড়ছিল। আবার সময়ের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েই মানুষকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে রত হতে হয়েছে। আবার এরই মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে চলেছে। এইরকম এক দমবন্ধকরা পরিবেশে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসুকে অন্যতর অভিজ্ঞতার শরিক হতে হয়েছিল, যার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থেই: "কখনো আশা, কখনো অবসাদ, কখনো দম আটকানোর অনুভূতি, কখনো আবার ক্ষণিকের জন্য স্বস্তিবোধ—এইসব নিয়ে আসে যায় আমার দিনগুলি সংগ্রামে ভরা, আমার সাহিত্যিক বৃত্তি ছাড়া অন্যসব বিষয়ে অনিশ্চয়তায় ভরা।"

বুদ্ধদেব বসু বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তিরিশের যুগের কালপ্রবাহের শরিকরূপে 'কল্লোল-পন্থী' রূপেই স্মরণীয়। তিনি একজন স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক হলেও তাঁর পরিচয় 'কল্লোল' দলীয় রূপে তাঁর নিজেরই উক্তিতে চিহ্নিত হয়েছে এবং কেউ কেউ তাঁকে 'কল্লোলের কথাকোবিদ' রূপে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর নিজের উক্তিতেই: "I now wander that we of the Kallol-clan, then so young and tentative, should have been taken so seriously; and I conclude that our first efforts despite youthful excess, did renewal a new world, ..."[An acre of green grass.]

অবশ্য আলোচ্য পর্বে সাহিত্যের সব শাখাতেই বুদ্ধদেব বসুর লেখনী চালিত হলেও তিনি মূলত ঔপন্যাসিক রূপেই তখন পরিচিত। এবং তাতেই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি। তাঁর উপন্যাসে কল্লোলীয় পর্বের বিশিষ্টতা থাকলেও বুদ্ধদেব বসুর স্বকীয়তা তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল।

স্বকীয়তার গৌরবের পরিচয়েই উপন্যাসের জগতে তাঁর আবির্ভাব কবি প্রতিভার কবচকুণ্ডল ধারণ করে। তাই কবির লেখনীতে উপন্যাসের অবয়বে কাব্যগুণ, জীবনের জটিলতার স্তরে স্তরে গভীর সংবেদনশীলতার অনুপুঙ্খ প্রকাশ; আর তার সঙ্গে আছে যৌবনের উদ্ধত প্রেমের দুরন্ত দুর্বার প্রকাশ। তবে সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে আলোচ্য পর্বের উপন্যাসে প্রেমই মৌলচেতনা। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস সাড়া (১৯৩০), ধূসর গোধূলি (১৯৩৩), বাসরঘর (১৯৩৫) ইত্যাদি উপন্যাসে কবিচেতনার সঙ্গে প্রেমচেতনা অনেক স্পষ্ট। প্রেমের জাগতিক রূপপ্রকাশের সঙ্গে তিনি দেহগত ধর্মকে, ইন্দ্রিয় বাসনাকে অস্বীকার করেননি। অবশ্য আলোচ্য পর্বে বাংলা সাহিত্যে ফ্রয়েড ও হ্যাভলাক এলিসের মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্যিকের ন্যায় বুদ্ধদেব বসুও উক্ত মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু বুদ্ধদেব উক্ত বৃত্তেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি; এর সমান্তরালভাবে ভিন্নধর্মী প্রবণতাও তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়। তিরিশোত্তর কালপর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় প্রকাশের থেকে ব্যক্তিক প্রকাশ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে সাহিত্যে ব্যক্তি চেতনার প্রাধান্য লক্ষগোচর। ব্যক্তিজীবনের সমান্তরালভাবে সামাজিক জীবন হয়তো উপেক্ষিত হয়নি; কিন্তু কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে ব্যক্তিমহিমাই প্রচারিত হয়েছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্যক্তিত্ববিলাসী ছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় অনেকখানি প্রকাশিত। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টির জীবন ও উপস্থাপিত হয়েছে এমন বলা চলে। এই ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে নাগরিক জীবন সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে বৃহত্তর সমাজ তাঁর উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়েছে, এমন ভাবনাও অযৌক্তিক নয়। বলা যেতে পারে, তাঁর দৃষ্টি কলকাতা অথবা ঢাকা কেন্দ্রিক। কেউ কেউ একে হয়তো একদেশদর্শিতা বলবেন। কিন্তু এই বিশিষ্টতাই তাঁর পক্ষে গৌরবের হয়েছে। কেন?না, তাঁর নগর জীবনই প্রধান উপজীব্য। তাঁর জীবনে হয়তো শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের জীবনাভিজ্ঞতার অভাব ছিল এবং ফলত তিনি সত্যমূল্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন; নকল সৌখিন মজদুর হতে চাননি। কল্লোলের অন্যান্য লেখকের মতো তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ প্রসারিত না হলেও তিনি তাঁর আপন শ্রেণিকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। এ সমস্ত তাঁর আংশিকতা বা সীমাবদ্ধতা হলেও এখানেই তাঁর গৌরব, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

বুদ্ধদেবের উপন্যাস তাঁর কবিসত্তারই প্রকাশ। তিনি তাঁর স্বীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহে, বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় পুরুষ বা নায়ক চরিত্রে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রায়শই কবি, লেখক বা অধ্যাপক। তাঁর উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক চরিত্র প্রায়ই বৃত্তবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরির মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: "বুদ্ধদেবের নানা উপন্যাস গল্পে ছড়ানো এই যে অসংখ্য নায়ক চরিত্র—এদের মধ্যে বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। বস্তুত তাঁর সব নায়ক চরিত্রই একটি মাত্র মুখের ছাঁচে গড়ে তোলা। সে মুখ স্বয়ং লেখকের। তাঁর রচনায় বিভিন্ন নায়ক যত কথা বলেছে, তাঁদের প্রায় সকলের কথার মধ্য দিয়ে একজনের কণ্ঠস্বরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে কণ্ঠস্বর, বলা বাহুল্য, লেখক বুদ্ধদেব বসুর।" [বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ]। এই জাতীয় প্রবণতাকে কি স্রষ্টার

আত্মলীন অধিকার বিস্তারের চেষ্টা বলা হবে? না, নিজেকে অতিক্রম করে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের স্বাভাবিক প্রকাশের প্রবণতাহীনতা বলা হবে? মনে হয়, একে বলা যেতে পারে আত্মমগ্ন বিষয়ের সংলগ্নতা—যাকে সমালোচক শিল্পীর প্রতিকৃতি বলা যেতে পারে। ''He reserted to an epistolary style and memoirs in order to gauge the inner moads in which, to his mind, constitute the tissue of reality. With all his abhorrence of naturalism, he records details around him with a unique aterness. He plangs and lay out at full length, serches for a subjective totality in the light of D.H. Lawrence and Dostoevsky, Tolstoy and Thomas Mann, James Joyce and Rabindranath to acquire, unflinching vission of a man who is essentially an artist." [Buddhadeva Bose : Alokeranjan Dasgupta.] এমন ভাবা সম্ভবত অসংগত নয় যে, তাঁর উপন্যাসে প্লটের প্রাধান্যহীনতার কারণ তাঁর আত্মমগ্নতা। তাঁর কবিত্বশক্তি তাঁর প্লটের প্রাধান্যকে অস্বীকার করায়, তাঁর উপন্যাস উত্তীর্ণ হয় অনুভবের জগতে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের ভাষায় যে কবিত্বপূর্ণ মননধর্মিতা আছে তা পাঠককে প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা থেকে কাব্যময়তার জগতে নিয়ে যায়। কবিত্বপূর্ণ মননধর্মিতার সঙ্গে মিশে সাংকেতিকতা ও সংগীতধর্মিতা। তিনি বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গকে প্রাধান্য দেন; ঘটনাপেক্ষা মানসিক প্রতিক্রিয়াই তাঁর কাছে অধিকতর মূল্যবান। অবশ্য এমন ভাবনা বুদ্ধদেবের ভাবনাতেই নিহিত ছিল, যার অভিপ্রকাশ আছে তাঁরই 'রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য' গ্রন্থে: "বাঙালির জীবনে ঘটনার ক্ষেত্র অনধিক, বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, সেইজন্যেই আমাদের উপন্যাসের ঝোঁক প্রথম থেকেই হওয়া উচিত ছিলো মনস্তত্ত্বের দিকে, কেননা জীবনের পারিপার্শ্বিক যতই সংকীর্ণ হোক, মানুষের মনের রহস্যের কোনোদিন কোনোখানে সীমা নেই। সুমিত আকারে, সুন্দর গড়নে, আমাদের নিজস্ব উপাদান নিয়েই বাংলা উপন্যাস অগ্রসর হতে পারতো, ব্যাপ্তিতে আমাদের যা অভাব, তার পরিপূরণ হতে পারতো ঐকান্তিকতায়। কিন্তু স্কট, জর্জ এলিয়টের প্ররোচনায় তা হতে পারে নি; নিজের মনের মধ্যে না তাকিয়ে আমরা চোখ রেখেছি বাইরের দিকে; আমাদের জীবনে উপকরণের ক্ষীণতা নিয়ে আক্ষেপ করেছি, উপন্যাসকে ঘটনাবৈচিত্র্যে জমকালো করে তুলতে গিয়ে অদ্ভুতকে আশ্চর্য বলে এবং অবিশ্বাস্যকে অভিনব বলে ভুল করছি। এর ফলে আমাদের সাহিত্যশক্তির অপব্যয় হয়েছে প্রচুর, আজও হচ্ছে না তা নয়।"

ঘটনা প্রাধান্যকে অস্বীকার করে মনস্তত্ত্বের দিকে আগ্রহী বলে মনের জগতে প্রস্থান বুদ্ধদেবের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অভিজ্ঞতা যেমন নাগরিক জগতে সীমিত, তেমনি তাঁর প্রকাশও মনের কারখানা ঘরে আবদ্ধ। বুদ্ধদেবের ঔপন্যাসিক সত্তা আসলে লেখক বুদ্ধদেব ও কবি বুদ্ধদেবের সমীকৃত ফল। আর এই সমীকৃত ফলেই বুদ্ধদেবের ঔপন্যাসিক সিদ্ধি এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর সমকালীন লেখকদের তুলনায় একদিকে যেমন স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি বিচ্ছিন্নও বটে। উপন্যাসে বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম কারণ তাঁর ভাষাভঙ্গি, চিন্তার প্রবহমানতা, আত্মলীন ভাববিভোরতা, ও তার প্রকাশের যোগ্য সাযুজ্য সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের উক্তিটি স্মরণ্য: "পাথুরে শক্ত জমির ওপর কাহিনীর ইমারত গড়া কদাচ তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, যিনি ভগীরথ এক অন্তঃসলিলা স্রোতধারার, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণ বিবর্তনই ছিল যাঁর লক্ষ্য, ...

অনেক কিছু প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরং ভালবাসতেন ভিতরের দিকে চোখ ফিরিয়ে সেখানে অন্তর্লীন যে মহাবিশ্ব তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে, তার রহস্য উন্মোচিত করতে। এজন্যে আলাদা একটা বাগভঙ্গি, বস্তুত আলাদা একটা গদ্যরীতিই সৃষ্টি করতে হয়েছিল তাঁকে প্রকাশের একটি ভাষা যা জটিল অথচ, স্বচ্ছন্দ প্রবহমান সাবলীল"। [সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা ও বুদ্ধদেব: সন্তোষকুমার ঘোষ। / নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৭৪] বুদ্ধদেবের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষাভঙ্গি; মাঝে মাঝে মনে হয়, তাঁর উপন্যাসের গদ্যরীতি যেন আধুনিক গদ্যকবিতার ভাষারীতি। বুদ্ধদেব বসু ঔপন্যাসিক রূপে স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন হলেও তিনি অনন্য। তিনি বাংলা উপন্যাসে প্রকরণগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে বক্তব্যগত অভিনবত্বেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি কল্লোলীয়দের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও, তাঁর উপন্যাসে পাণ্ডুরতা, অস্থিরতা, বিহ্বলতা, যৌবনের আবেগজনিত প্রাবল্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি নানা অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত এবং পরিণত জীবনভাবনায় সমৃদ্ধ ও মননশীলতায় দীপ্যমান। তাঁর 'কালো হাওয়া' (১৯৪২) উপন্যাসে তিনি তিরিশের কাল অতিক্রমকারী এবং 'কালো হাওয়া' উপন্যাসে তাঁর প্রথম পালাবদলের সূচনা। 'সাড়া' থেকে 'কালো হাওয়া' পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে স্বকীয়তায় হয়ে উঠেছে অনন্য। সেখানে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অনেক স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ কালপর্বে রচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি এক নতুন ভাবজগতে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন। সুকুমার সেন বুদ্ধদেবের এই পর্বের উপন্যাসকে তাঁর নিজেরই 'আত্মবিস্তার' রূপে অভিহিত করেছেন। এই পর্বে তাঁর রচিত তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), শেষ পাণ্ডুলিপি (১৯৫৬), শোণপাংশু (১৯৫৯) উপন্যাসগুলি অধিকাংশই আত্মস্মৃতিমূলক মনে হয়। অবশ্য এই আত্মপরিচয়ের প্রকাশ প্রথম পর্বে সংলক্ষ হলেও দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় পর্বের বুদ্ধিদীপ্ত রচনাগুলিতে লেখক-মানসের সমৃদ্ধ অনুকরণীয় প্রকাশ লক্ষ্যগোচর।

'তিথিডোর' বুদ্ধদেব বসুর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস একথা বলেছেন যেমন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ''Buddhadeva's next novel, considered his best and most powerfull, is Tithidor (The Lunar Tie/1949). ...This portrait comprises intimate imuniatures of family life, its domestic delights and controlled dramatic moments." [Buddhadeva Bose: Alokeranjan Dasgupta.] এটি একটি স্নিগ্ধ মধুর প্রেমের কাহিনিকাব্য, কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের আলেখ্য। "কলকাতার ছা-পোষা মধ্যবিত্ত জীবনের যা কিছু গৌরব, তার যা কিছু সততা সমস্তের আশ্চর্য পরিবারকেন্দ্রিক চিত্র তিথিডোর। উপন্যাসটির প্রধান পাত্রপাত্রীদের বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে যে সমগ্র রচনাটি যে ব্যক্তির পরম স্নেহের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তিনি রাজেনবাবু, নায়িকার পিতা। নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতার প্রতি বিভূতিভূষণের ন্যায় বুদ্ধদেববাবুরও পক্ষপাত আছে; তার শিল্পসার্থক মূর্তি গঠিত হয়েছে রাজেনবাবুর পরিবারকে ঘিরে। স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে ছন্দ পতনের মতো হারীত এবং বিজন বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাস বিষয়ক চিন্তার দৌর্বল্যের

নিদর্শন এ-কথা মেনে নিয়েও, এই উপন্যাসকে, যে স্নিগ্ধ দিনগুলি আর একটু পরেই বাংলা দেশ হারিয়ে ফেলল তার শেষ অকৃত্রিম চিহ্ন হিসাবে আমরা মনে রাখব। বিজন এবং বিজনের ব্যবসায়ের গুরুদেব মজুমদার তৎকালীন বাংলাদেশের আসন্ন পতনের পূর্বাভাস।" [বাংলা উপন্যাসের কালান্তরঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়] সত্যেন ও স্বাতীর ভাববিভোরতার আধুনিক আখ্যান—যা গদ্যে রচিত। আবার চল্লিশ দশকের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের হারিয়ে যাওয়া দলিলও বটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিবেশে পরিবর্তিত মূল্যবোধের পটভূমিকায় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা, প্রাচীন-নবীনের জীবনভাবনা এর প্রতিছত্রে স্পন্দিত। "তিথিডোর এক হারিয়ে যাওয়া জগৎ, বিস্মৃত ভুবন, ফেলে-আসা জীবন। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবসম্মত রসঘন আলেখ্য। তিথিডোর অবশ্যই স্নেহশীল রাজেনবাবু, বিষণ্ন শান্তশ্রী মণ্ডিত শ্বেতা, আত্মসমর্পিত শাশ্বতী, উষ্ম হারীত, প্রেমঘন সত্যেন, ভালোবাসার রজনীগন্ধা স্বাতীর জীবন ; হায় যে জীবন হারিয়ে গেছে, পাওয়া যাবে না ফিরে, পাওয়া যায় না, মায়া-মায়া, ছায়া-ছায়া; কাঁপা-কাঁপা স্মৃতি নিয়ে স্মৃতির দুয়ারে করাঘাত করে, বিদায় বন্ধু, বিদায়..." [ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু : আবুল হাসানাত। উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা]

'তিথিডোর' উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসুর পরিবর্তনধর্মিতার পরিচয় প্রকাশিত হলেও আলোচ্য উপন্যাসে নরনারীর প্রেমই মুখ্য চালিকাশক্তি। সত্যেনও স্বাতীর প্রেমে তারই অভিপ্রকাশ। তবুও লেখক মানসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবও কার্যকরী হয়ে উঠেছিল। তারও রূপ এখানে অনুপস্থিত নয়। সমাজসচেতন বুদ্ধদেব জীবনের বহিরঙ্গ রূপকে একেবারে অস্বীকার করেননি; যদিও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হল অন্তরঙ্গ রূপ। তিথিডোর সমকালীন জীবনপরিবেশেরও আলেখ্য; সমকালীন জীবনপরিধির দ্বন্দ্বাকুলতা বুদ্ধদেবকে স্পর্শ করেছিল। সন্তোষকুমার ঘোষ উপন্যাসের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেনঃ "বৃহৎ উপন্যাস কখনও কখনও আপনকালের দলিল হয়, তবেই বৃহত্ত্ব ছাড়িয়ে মহত্ত্বের মর্যাদা পায়, তিথিডোর তিরিশের শেষ আর চল্লিশের সুরুর কলকাতার পরিশীলিত একটি বিশেষ সমাজ-মানসের দলিল।"

'তিথিডোর' বুদ্ধদেব বসুর বৃহৎ উপন্যাস এবং সম্ভবত তিনি আলোচ্য উপন্যাসে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। 'তিথিডোর'-এ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তা হল একটি নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ। উপন্যাসটিকে নগর ও শহরতলির জীবনবাস্তবতার রূপায়ণ বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় উপন্যাসটি দলিলধর্মী হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কিন্তু নির্মোহ, নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক নন; তিনি অনেকখানি ব্যক্তিগত মোহ ও আবেগতাড়িত। আলোচ্য উপন্যাসে ঘটনার জটিলতা, তীব্রতা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই; যা আছে তা হল বর্ণনার আধিক্য। অবশ্য এ বর্ণনা জীবনের ওঠা-পড়ার বর্ণনা নয়। এ হল নাগরিক পরিবারের জীবন, আচার-আচরণ ও উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা। তবে অন্য সমস্ত বর্ণনা অপেক্ষা বাইশে শ্রাবণের বর্ণনাটি সমালোচকের ভাষায় শ্রেষ্ঠতম বর্ণনাঃ

''The solid mass in Tithidor is the clilmatic 14-page description of baise Sravan, the day of Tagore's death, in a unique way. It is the description of an event which draws the characters into an inescapable vortex. The description of funeral procession give the novel the quality of a literary epic. The last

two pages, remarkable for their Joycean stream of consciousness express primeval sphere, a perennial pattern of life. Here is an untranslatable excerpt, conspicuous for its aposiopesis and pitty style." [Buddhadeva Bose : Alokeranjan Dasgupta.]

উপন্যাসে অঙ্কিত মধ্যবিত্ত পরিবারটি স্নেহ-প্রেম-মমতায় পরিপূর্ণ; তবে সংকট যে একেবারে আসেনি এমন নয়। নানা কারণে, সংকটে নিস্তরঙ্গ জীবনের শান্ত প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হলেও মোটামুটিভাবে জীবন স্নিগ্ধ, মনোরম ও মধুর। উপন্যাসে অঙ্কিত পরিবারটি কলকাতায় নাগরিক জীবনযাপন করলেও মনের দিক থেকে মফস্‌সলধর্মী। মনে হয়, বুদ্ধদেব বসু কোনো এক মফস্‌সল পরিবারকে যেন কলকাতায় স্থানান্তরিত করেছেন। 'তিথিডোর'—উপন্যাসে উপস্থাপিত জীবন সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখ্য: "কলকাতার ছাপোষা জীবনের যা কিছু গৌরব, তার যা কিছু সততা সমস্তের আশ্চর্য পরিবারকেন্দ্রিক চিত্র তিথিডোর। ...এই উপন্যাসকে, যে স্নিগ্ধ দিনগুলি আর একটু পরেই বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলল, তার শেষ অকৃত্রিম চিহ্ন হিসাবে আমরা মনে রাখব"। বুদ্ধদেব বসু ছাপোষা, মধ্যবিত্ত, পরিবারকেন্দ্রিক জীবনের বিবরণ প্রদান করেছেন পাত্রপাত্রীদের চেহারা, আচরণ, গৃহসজ্জা, উৎসব, আচার-আচরণ, খাদ্যপ্রস্তুত, আসবাবপত্রের বর্ণনার মাধ্যমে। বর্ণনা কাব্যিক বলে উপন্যাসের জীবনকে রূপকথা বলে মনে হয়। কনিষ্ঠা কন্যা স্বাতীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে মাতৃহীন পরিবার জীবনের পিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাতীর জন্য যে সমস্ত জিনিস কেনা হয়, ঔপন্যাসিকের ভাষায় সেগুলি যথাক্রমে: 'সুন্দর সবুজের ওপর সোনালী বুটির শাড়ি, সাটিনের ব্লাউজ, ছোট পাৎলা বাক্সে চিকচিকে কাগজের তলায় জ্যামিতির ত্রিভুজের মতো ভাঁজ করা হলদে, গোলাপি, ফিকে নীল রুমাল।' গৃহসজ্জার জন্য ও অভ্যাগতদের জন্য আনা হল: 'ফুল, নতুন চায়ের পেয়ালা, চকচকে চামচ, ঘাস রঙের পেস্তা বসানো শাদা শাদা ফোলা ফোলা ঠাণ্ডা নরম সন্দেশ'। বাড়িতে বসে জমজমাট গানের আসর। স্বাতী পরে 'সবুজ সিল্কের শাড়ি, সাটিনের ব্লাউজ'। শাশ্বতী ছোটো বোনের চুল জোর করে ধরে উল্টে দেয় ঘাড়ের ওপর, কপালে দেয় চন্দনের ফোঁটা। পিতা কোনো শনিবার মেয়েদের নিয়ে সিনেমায় যান, কোনো শনিবার সান্ধ্য-ভ্রমণে বার হন। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে চা পান করেন; কোনো সন্ধ্যায় পরিবারের কোনো বন্ধু-বান্ধবকে চা চক্রে নিমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে চায়ের সঙ্গে আমন্ত্রিতদের দেওয়া হয় 'চিংড়ির কাটলেট, চিড়ে ভাজা, শিঙ্গারা'। সিনেমা দেখতে গিয়ে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা পান করে 'নল ডোবানো গ্লাসে' ঠান্ডা পানীয়। মেট্রোর দোতলায় সিনেমা দেখতে গিয়ে শ্বাতী মুগ্ধ হয় : "চেয়ারটা কতো আরামের, পিঠে কত নরম, হাঁটু রাখার জায়গা কতো বেশি। কার্পেট মোড়া গদি, সোনালী সিলিং, দেয়ালে ছবি।" এ উপন্যাসে আছে 'সরু প্যাঁচালো কম আলোর গলি' চিনা পাড়ায় খাবার খেতে যাওয়ার কথা, জার্মান-ইহুদিদের 'কাউফমান'—এ কফি খাওয়া। কখনও বা তাদের নিমন্ত্রণ থাকে বন্ধুর বাড়িতে যেখানে "মস্ত বারান্দায় রেস্তোরাঁর মতো ছোটোখাটো টেবিল ঘিরে চেয়ার, খাবার সাজানো থালা, চা, কফি, আইসক্রীম" ইত্যাদি।

'তিথিডোর' উপন্যাসের পরিবারটি কিন্তু সম্পূর্ণত নাগরিকমনস্ক নয়; পরিবারটি হয়তো নানা আধুনিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত—কিন্তু মফস্‌সলধর্মী জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে

পরিবারটি। রাজেনবাবু বসার ঘরে বসে চা না খেয়ে ছাদে পাটি পেতে চা খেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এক কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে অন্যকন্যারা স্বামীসন্তানসহ পিতৃগৃহে আগমন করে। বিয়েবাড়িতে 'ভিড়, হৈ চৈ, অফুরন্ত রান্না' ইত্যাদি। বিয়ের পরে নতুন জামাইয়ের (১) প্রাতঃরাশের বর্ণনা, (২) মধ্যাহ্নভোজনের বর্ণনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নগর ও শহরতলির জীবনবাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে।

(১) 'মস্ত রূপোর ট্রেতে চা—শুধু কি চা, মাখন, ডিমের পোচ, সোনা রঙের মোটা মোটা মর্তমান কলা, আবার ফুলো লুচি, ঝিরি ঝিরি আলুভাজা, সন্দেশ, পান্তুয়া, সরভাজা।'

(২) 'মস্তো রূপোর থালায় বাটি চেপে গোল করা ফুলের মতো ভাত, আর থালাটি ঘিরে হারের লহরের মতো ঝকমকে কাঁসার ছোট বড় বাটি।'

সেখানে আছে—'শুক্তো', 'ছোলার ডালের ছেঁচকি', 'মাছের চপ', 'শাদা শাদা লাউয়ের তরকারি', 'সর্ষে নারকোল ও চিংড়ির তরকারি', 'উচ্ছে দিয়ে রাঁধা মৌরলা মাছ' ইত্যাদি।

আবার শ্বশুরবাড়ি ময়মনসিংহ থেকে শ্বেতা আসে বাপের বাড়িতে পুজোর ছুটি কাটাতে; সেখানে থাকে 'হোল্ডলে বাঁধা মস্ত বিছানা', 'এক বান্ডিল পুজোর কাপড়', 'বিস্কুটের টিনে টিনে ভরা ক্ষীরের আর নারকোলের রকমারি খাবার'। শ্বেতার জন্য আনা হয়—'ডিম সন্দেশ', 'শোনপাপড়ি', 'কলে ঠাণ্ডা দই'। বাজার থেকে কিনে আনা হয়—'তেলওলা আড়মাছ', 'বাঁধাকপি', 'কাঁকড়া' ইত্যাদি। শ্বেতা স্বয়ং 'কাঁকড়ায় মশলা' মাখায়। তারপর আরও বিশ্বস্ত বর্ণনা—'ডালের টগবগে ডেকচিটা হাতা দিয়ে ঘুঁটে একেবারেই তিনটে আলু তুলে' 'এক আঙুল দিয়ে একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরীক্ষা করে' দুটোকে 'জ্বলন্ত জলে' অন্যটিকে বাটিতে রেখে 'ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে আঙুল সইয়ে সইয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেললো নিমিষে, তারপর ধোঁয়া ওটা সুগন্ধি একটি আলু চায়ের প্লেটে নুন গোল মরিচ সুদ্ধ সাজিয়ে' দেয় ছোট বোনের সামনে। এ সমস্ত ছাড়া জীবনবাস্তবতার বর্ণনা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত অংশে:

১. 'মস্ত দেহ, চর্বির ভাঁজ দুপাশের গালে।'

২. ঘামতে ঘামতে হাঁপাতে হাঁপাতে নাজেহাল হয়।'

[প্রমবেশের বর্ণনা]

৩. 'বাঁধাকপি', 'ফুলকপি', 'মুরগি', 'হগ সাহেবের বাজারের সবসেরা মটন, সঙ্গে টাটকা সবুজ মটরশুঁটি আর আপেলের মতো বড়ো বড়ো টুকটুকে লাল টম্যাটো।'

[শ্বেতার পিতা রাজেনবাবু ও স্বামী প্রমথেশ কর্তৃক বাজার থেকে আনীত দ্রব্যাদি]

৪. 'জামাইবাবুর সঙ্গে ঘনঘন গোপন পরামর্শ' করে কিনে আনা 'কোনো নাটকের কি সিনেমার এক গোছা টিকিট'। 'দুই ট্যাক্সি বোঝাই হয়ে বাড়িশুদ্ধ হৈ হৈ করে শ্যামবাজার থিয়েটার'। 'মেট্রো সিনেমা হল'। 'কলকাতার তখন তাজ্জবতম লাইট হাউস'।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জন্মদিন, বিয়ে অথবা বৈকালিক চায়ের আসরের অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করা। 'তিথিডোর' উপন্যাসেও আছে স্বাতীর বিবাহ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ। যেমন—

১. 'মেরাপ বাঁধা শামিয়ানা খাটানো মস্ত ছাদ, ব্ল্যাক আউট আর শীতের জন্য টেনিস লনের মতো মোটা নীল পরদা ঘেরা।' [বিবাহে আমন্ত্রিতদের খাবার ব্যবস্থা]

২. 'সাদা ফরাসের উপর হলদে, কার্পেট' 'ঘোর লাল মখমলের তাকিয়া', 'প্রায় কালচে গোলাপের দুটো তোড়া।' [বরাসনের বর্ণনা]

৩. 'লেমনেড, চা, প্লেটভরা পান, আর সিগারেট।' [বরযাত্রীদের অপ্যায়ন]

৪. 'ছোট বড় খুরিতে ঘেরা মাটির লাল থালা।' শাক থেকে রসমালাই পর্যন্ত আমিষ নিরামিষ চাটনি মিষ্টি মিলিয়ে আঠারো রকম খাবার'। 'সুগন্ধি কেওরা জল।' 'আলাদা একটি ছোট থালায় লবঙ্গ বেঁধা একটি পান পর্যন্ত সঙ্গে, পান যারা খায় না...একটু সুপুরি, মৌরি আর আস্ত একটা বড় এলাচ।' 'ভেটকি মাছের ফ্রাই', 'শাক', 'ছোলার ডালের ছেঁচকি', 'মটর শুটির কচুরি', 'সর্ষে দিয়ে ভাপানো চিংড়ি', 'পেস্তা বাদাম দেওয়া পোলাও', 'মাংস', 'বেসনে ভাজা চাকতি বেগুন', 'মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা রুইমাছ', 'মুগের ডাল', 'সন্দেশ', 'পাঁপর', 'রসমালাই', 'রসগোল্লা'...ইত্যাদি।

[আমন্ত্রিতদের জন্য খাদ্য পরিবেশনের বর্ণনা]

৫. 'সাচ্চা রূপোর কাজ করা টিশু শাড়ি', 'স্কাই ব্লু রঙের ফ্রেঞ্চ শিফন', 'মেরুণ রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্ক', 'ঢাকাই জামদানি', 'ভিটের শাড়ি', 'জংলি শাড়ি', 'নতুন একরকম ডুরে শাড়ি', 'নিউ মডেল লেডিজ পার্কার', 'নতুন ধরনের ফুলদানি', 'গালার কাজ করা ছোট বাক্স', 'জয়পুরি মিনে করা হাতির দাঁতের সিঁদুর কৌটা', 'গ্রামোফোন' ইত্যাদি।

[আমন্ত্রিতদের উপহার]

৬. 'সাদা সুন্দর মেঝেতে সুন্দর চিকন পাটির উপর।' [স্বাতীর বসার বর্ণনা]

৭. 'সোনালী লাল উজ্জ্বল শাড়ি', 'পদ্ম লাল জামা', 'পান্নার দুল আর পান্না চুরির হার', 'সাদা শাঁখার পাশে ঝকঝকে নতুন চুড়ি আর কঙ্কণ', 'গোলাপী রঙের স্বচ্ছ রেশমী ওড়না', 'সিঁথিতে বাঁধা সোনার মুকুট', 'মস্ত মোটা ধবধবে সাদা সুগন্ধি মালা'...ইত্যাদি।

[কনের সাজে স্বাতীর বর্ণনা]

উল্লিখিত বিবরণ ব্যতীত লৌকিক বিবাহাচার পদ্ধতি, শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের বিবরণও উপন্যাসে অনুপস্থিত নয়।

১. লৌকিক বিবাহচার

(ক) 'লাঠি দিয়ে বরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপা।'

(খ) 'বরকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হলো, একবার মেঝেতে কয়েক পা হাঁটতে হলো, তারপর একজন কেউ কী বিড়বিড় করতে করতে তিনবার টোকা দিলেন।'

(গ) 'কুলোয় জ্বলছে প্রদীপ।'

(ঘ) 'চিত্রবিচিত্র করা কুলো।' ইত্যাদি।

২. শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ

(ক) 'ডান হাতে ত্রিপত্র।'

(খ) 'পুরুত পুঁথি বন্ধ করে দুইহাতের কুশের বাঁধন খুলে...।'

(গ) 'হোমের আগুন।'

(ঘ) 'দুহাত অঞ্জলি করে পাতলো।'

(ঙ) 'একমুঠো করে খই।' ইত্যাদি।

'তিথিডোর' উপন্যাসে কলকাতার স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাপনের পদ্ধতি ঔপন্যাসিক নিজস্ব আবেগে মণ্ডিত করে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু 'তিথিডোর' উপন্যাসটি শুধুই শহর ও শহরতলির স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তবতার উপাস্থাপনাই নয়; উপন্যাসটি একটি পরিবারের দীর্ঘকালের ইতিহাস। আলোচ্য উপন্যাসের আর একটি উদ্দেশ্য হল সত্যেন ও স্বাতীর প্রেম ও তার পরিণতি বিবাহের বর্ণনা। স্বাতীর শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণের বিবরণ, তার প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও এখানে অনুপস্থিত নয়। পাঁচ বোনের মধ্যে স্বাতী ব্যতিক্রমধর্মী পরিচয়ে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে তার দেহগত লাবণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বেরও প্রকাশ ঘটেছে। তারুণ্যের দীপ্তি ও ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সত্যেনকে আকৃষ্ট করেছে স্বাতীর দিকে। ঔপন্যাসিক বেশ সংযত ভঙ্গিতে সত্যেন ও স্বাতীর প্রেমের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মজুমদারের উপস্থিতিতে ত্রিভুজ প্রেমের বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে যুক্ত হলেও স্বাতী সত্যেনের প্রতি ক্রমশ নির্ভরশীল হয়েছে এবং সত্যেনকে আশ্রয় করে বিরোধী পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে। সত্যেনও অবশ্য তা উপলব্ধি করেছে।

"রবীন্দ্রনাথের তিরোধানকে অবলম্বন করে একটি দিনের বিশিষ্ট একটা অংশকে কেন্দ্র করে তাদের পারস্পরিক সান্নিধ্যও যেন তাদের সম্পর্ককে আরও গভীরতা দান করেছে; হৃদয়বেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটির বিশেষ তাৎপর্যও লক্ষণীয়, বিশেষত, সত্যেনের দুঃখের গভীরতা স্বাতীর হৃদয়কেও স্পর্শ করেছে। এমনি করেই তাদের প্রেম বিকশিত হয়ে উঠেছে, এবং তা ক্রমশ প্রকাশও পেয়েছে পরস্পরের কাছে, তেমনি অস্পষ্ট থাকেনি স্বাতীর বোনেদের কাছেও। ফলত, বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে তাদের প্রেমের পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে।" [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস: মুহম্মদ রেজাউল হক]

স্বাতী, সত্যেন ব্যতীত শ্বেতা, মহাশ্বেতা, শাশ্বতী, সরস্বতী, রাজেনবাবু, বিজন, হারীত প্রমুখ সকলেই উপন্যাসে নির্দিষ্ট ভূমিকায় আসীন। স্ত্রী শিশিরকণার অবর্তমানে পিতা ও মাতার ভূমিকা পালন করেছেন রাজেনবাবু। বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভে কৃতী হারীত বামপন্থী রাজনীতির প্রতিভূ; অবশ্য এই উপন্যাসে উক্ত মতবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা বাস্তব সত্যের প্রতি ইঙ্গিত দেয় এবং বুদ্ধদেব বসুর মনোভাবও এ প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়ে যায়। নারী প্রগতির যুগে স্বামী সান্নিধ্যে শাশ্বতীর আড়ষ্টতা হারীতের ভূমিকা সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তোলে। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্বেতার বৈধব্যের সংবাদ ও পিতৃগৃহে তার প্রত্যাবর্তন রাজেনবাবুকে এক করুণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। শাশ্বতীর বিবাহকালীন শ্বেতার ভূমিকা সকলকে মুগ্ধ করে। বৈধব্যদশাতেও তার ভূমিকা একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি। মহাশ্বেতা ও সরস্বতী তাদের সৌন্দর্য ও স্বচ্ছন্দ্যের পরিচয়ে উপন্যাসে সমুদ্ভাসিত। উঠতি পুঁজিপতি প্রবীর মজুমদারের ভূমিকা উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিবর্তনমুখী সমাজমানসের প্রকাশ। সমালোচ্য উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা সত্যেন ও স্বাতী।

কবিতার প্রতি ভালোবাসা, কবিতাপাঠের অনাবিল আনন্দ, পত্রালাপ, রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ইত্যাদি উপন্যাসে এসেছে সত্যেন-স্বাতীর প্রেমকে মাধুর্যমণ্ডিত করার জন্য এবং প্রেমের এক স্নিগ্ধ মধুর রূপপ্রকাশের জন্য। "বুদ্ধদেবের তিথিডোর ছাড়া বিশুদ্ধ প্রেমের আখ্যানও আর নেই।" [বাংলা উপন্যাসের কালান্তরঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়]

প্রকৃতিপ্রেমিক বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট দৃষ্টির আলোকে প্রকৃতিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নবতর তাৎপর্যে স্বাতীর ভাবনায়: "আকাশে নীল মেঘ কালো, ছাই রং ছড়ালো, বৃষ্টি ঝমঝম; আলো কম, আরো, কমে আসে, মরে যায়, আর পড়া যায় না, দেখা যায় না, বই খোলা, বইকোলে, বসে থাকে, ভাবে, আবছা, একলা চুপ"। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর বিপন্ন-বিচূর্ণ সময় দ্বারা প্রভাবিত-আলোড়িত-আক্রান্ত হয়েছে তিথিডোর উপন্যাসের প্রধান সব চরিত্র। স্বৈরবৃত্ত কালের অমোঘ নির্দেশে রাজেনবাবু, বিজন, শাশ্বতী, স্বাতী, হারীত, সত্যেন, প্রবীর মজুমদার—তিথিডোর—এর এই সব মানুষ, কখনো হয়ে উঠেছে একাকিত্বের উপাসক, কখনো নৈঃসঙ্গ্য-পূজারী, কখনো বা তারা হয়েছে নির্বেদ নিরানন্দের আরাধনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে একদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে চোরাকারবারি-কালোবাজারি করে একদল মানুষের দ্রুত ফুলে-ফেঁপে ওঠা—এই যুগলস্রোতে ভেসে গিয়েছিল মানুষের সব প্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞান। তিথিডোরের মানুষদের গায়ে লেগেছে এই নষ্ট সময়ের ছোঁয়া; সময়ের বিনষ্টিতে বিপন্ন হয়েছে তারা। ফলে তাদের মানসলোকে দেখা দিয়েছে নির্বেদ-নৈঃসঙ্গ্যের সংক্রমণ।" [বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ]

আলোচ্য উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতিরও ভূমিকা স্মরণ্য। "উপন্যাসটির উপসংহারে স্রোতোময় চেতনার বাহন হিসাবে যে জয়েসীয় গদ্যরীতির সকল নিরীক্ষা, তা পঞ্চম দশকের বাংলা সাহিত্যের নবীন পরীক্ষাশীলদের কাছে পূর্বসূরী হিসাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে।" [বাংলা উপন্যাসের কালান্তরঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়]। স্বাতীর চিন্তাপ্রবাহ এক বিশিষ্ট গদ্যরীতিতে প্রকাশিত। "তিথিডোর উপন্যসে বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের স্বাক্ষর অঙ্কনে যে প্রয়াসী ছিলেন, তা উপন্যাসের অন্যতম প্রকরণ পরিচর্যা মগ্নচেতনা প্রবাহের বহুল ব্যবহারে সুস্পষ্ট। ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য এবং নৈঃসঙ্গ্যের স্বাক্ষর অঙ্কনে মগ্নচেতনা প্রবাহরীতি ঔপন্যাসিকের কাছে এক অব্যর্থ উপাদন। মগ্নচেতনার আধারে উঠে আসে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার গরল, তার হার্দ্য রক্তপাতের বিষণ্ণ বিবর্ণ ছবি। সময়-উত্তর মানবজীবনের শূন্যতা-একাকিত্ব-নির্বেদ-নৈঃসঙ্গা উপস্থাপনে মগ্নচেতনার যে ব্যাপক ব্যবহার কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করি, তিথিডোর উপন্যাসে তা উপস্থিত"। [বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ] গদ্যরীতি এ উপন্যাসে অভিনবত্বমণ্ডিত। কবি ও গদ্যশিল্পীর যুগলবন্দিতে 'তিথিডোর' এক আকর্ষণীয় ও অভিনব সৃষ্টি।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য

তপস্বী ও তরঙ্গিনী

কাব্যনাট্য বা কাব্যনাটক বলতে সাধারণভাবে কাব্য ও নাটকের মিলনে গড়ে ওঠা এক শ্রেণির নাট্যরচনাকে বোঝায়। কিন্তু এই সাধারণ ব্যাখ্যায় কাব্যনাটকের সম্পূর্ণ স্বরূপ ও শিল্পগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কাব্যনাট্য—নাটক, কাব্য, নাট্যকাব্য এদের সকলের থেকে পৃথক স্বতন্ত্র একটি সাহিত্য শাখা। টি.এস. এলিয়ট এই নাট্যধারাটির সূচনা করেন এবং পরবর্তীকালে লোরকা ইয়েট্স ইত্যাদি অনেকে এর পরিধি ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেন।

এলিয়ট তাঁর 'পোয়েট্রি অন ড্রামা'র 'এ ডায়ালগ অন ড্রামাটিক পোয়েট্রি' প্রবন্ধে কাব্যনাটকে কাব্য নাট্যধর্মের পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করে বলেছেন যে, কাব্যনাটকে কবিতা ও নাটক একই সৃষ্টিশীল কর্মের দুটি ভিন্ন উপাদানমাত্র—এরা পরস্পর সহযোগিতায় একটি সমগ্র শিল্পরূপ কাব্যনাট্যের সৃষ্টি করে। তাই কাব্যনাটক যেমন শুধু কাম্য নয়, তেমনি নাটকের অঙ্গশোভা মাত্রও নয়, বরং নাটকের অন্তঃসার—"...that verse is not merely a farmalisation, or an added decoration but that it intensifies the drama. It should indicate also the importance of the unconcious effect of the verse upon us." এখানে তিনি Verse drama ও Poetic drama-কে একই অর্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনেকে তা সমর্থন করেননি। যেমন—Dene's Donoghue-এর মতে—"Verse drama is a purely technical phrase; it makes no implications whatever as to the quality of the script or of the play as a whole. Unlike 'poetic drama', it is entirely neutral in its application." অর্থাৎ Verse play কাব্যগুণান্বিত নাও হতে পারে। কিন্তু poetic drama গদ্য বা পদ্য যাতেই লেখা হোক, কাব্য গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠাই তার প্রধান প্রয়োজন।

কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য এক জিনিস নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত যে নাট্যধর্মী রচনায় কাব্যগুণের প্রাধান্য থাকে এবং নাট্যরস কাব্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাকে নাট্যকাব্য বা Dramatic Poetry বলা হয়। আর যে রচনায় কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করে এর সমশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং নাট্যরস উৎসারে সাহায্য করে তাকে কাব্যনাট্য বা Poetry Drama বলা হয়। নাট্যকাব্যের শ্রুতিযোগ্যতা থাকলেই চলে কিন্তু কাব্যনাট্যের শ্রব্যতার সঙ্গে অভিনয়যোগ্যতা থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

কাব্যনাটক শুধু কাব্য আর নাটকের যুগল মিলন মাত্র নয়। আমাদের জীবনের মস্ত রূপকে কাব্যনাটক সংহতি ও স্পর্শময় চেতনা দান করে। এলিয়ট আর ইয়েট্সকে অনুসরণ করে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন—"নাট্যকারকে কবিই হতে হবে। কিন্তু তাকে মনে রাখতে হবে এই প্রধান সত্য, যে কাব্যনাট্য কবিতার আর একটা ধরন নয়, কাব্যনাট্য নাটকেরই গরিমাময় প্রকরণ।" কাব্য নাটকে বহির্বাস্তবতার চেয়ে অন্তর্বাস্তবতার বেশি জীবনের কোনো নিগূঢ় অনুভবকে

তরঙ্গিত সংক্ষোভকে কাব্যনাটকের মধ্যে ধরার চেষ্টা করা হয়। এলিয়ট তাই কাব্যনাটকে দেখেছেন 'emotional unity' এবং এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন 'থার্ড ভয়েসে'র কথা যেখানে সাময়িকতা দিয়ে সীমাহীনতাকে ধরার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এখানে কবি নানা চরিত্রের মধ্যে নিজেকে যেমন অনুভব করেন তেমনি এক নৈর্ব্যক্তিক স্বরের মাধ্যমে মানবজীবন ও মনের গভীর উপলব্ধিও প্রকাশ করেন। তাই পদ্য বা গদ্যকে বাহন করা কাব্যনাটকের মূল কথা নয়, মূল কথা হল কাব্যনাটকের ভাষার মধ্যে সেই ব্যঞ্জনা থাকতে হবে, যাতে প্রাত্যহিক ধূলিধূসরতা মুছে গিয়ে প্রত্যক্ষ বাস্তব ধ্যানময়তায় স্বপ্ন রঙিন হয়ে উঠতে পারে।

এ ছাড়াও কাব্যনাটকের আরও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—১. কাব্যনাটক তথাকথিত নাটকের মতো দৃশ্য অঙ্ক সমন্বিতও ভাব ও চরিত্রের অন্তর্গত রূপকে ফোটানোর উপযোগী হয়েও আদ্যন্ত নিটোল হয় না। ২. সমগ্রজীবনের পরিবর্তে জীবনের 'মোমেন্টস মনুমেন্ট' কাব্যনাটকে ফুটে ওঠে। একেই এলিয়ট বলেছেন—"A movement of Intense living". ৩. কাব্যনাটক ছন্দ, অলংকার মর্ত্য অতিমর্ত্য বাস্তব-কল্পনা জীবন শিল্প কবিতা ও নাটকের একাত্মতায় গড়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলায় কাব্যনাটকের বীজ রোপিত। তারপর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কয়েকজন কবির হাতে কাব্যনাটক নতুন মাত্রা পায় এক আধুনিক কাব্যনাট্য আন্দোলনের অন্যতম কাব্যনাট্যকার বুদ্ধদেব বসু। তাঁর কাব্যনাটকে প্রকাশিত হয়েছে 'জীবিতের যন্ত্রণা;' আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা, উপলব্ধির গভীরতা, অস্তিত্ব, জীবনের রহস্য ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যগুলির বিষয়বস্তু সবই পৌরাণিক এবং তার বিশেষ রচনা (পুরাণকে নতুন করে দেখা শুধু নয় পুরাণকে একালের করে তুলেছেন তিনি) যাঁরা অস্তিত্বের সংকটে ও যন্ত্রণায় কাতর অথচ আত্মপ্রকাশের ভাষা অজানা থাকার ফলে (তাঁর নাটকের) পৌরাণিক চরিত্ররা সহজেই সমযুগীয় হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী তরঙ্গিনী' গদ্য ভাষায় রচিত হয়েও কবিত্বমণ্ডিত এবং কাব্যনাটকের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হওয়ায় কাব্যনাটকের শ্রেণিভুক্ত। পুরাণভিত্তিক এই নাটকটির মধ্যে কবি আধুনিক হৃদয়ানুভূতিকে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। ...আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদের সমকালীন।"

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'তপস্বী-তরঙ্গিনী'তে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। এই কবিতা পাঠের স্মৃতির সঙ্গে মহাভারত ও বিশ্বপুরাণের জ্ঞান যুক্ত হয়ে যে শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছিল তাই-ই 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'পতিতা' কবিতার নামহীনা বারাঙ্গনার হৃদয়ে সর্বব্যাপী প্রেমের প্রতিষ্ঠাই প্রতিফলিত হয়েছে তরঙ্গিনীর চরিত্রে। আবার 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কাব্যের নাম কবিতায় তিনি লিখেছেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আত্মকথা। এই কাব্যের ভূমিকাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য নাশের কাহিনি। এই দুই

কবিতার ভাবনার আকর্ষে কাব্যরূপ ও নাট্যরূপের সমীকরণ ঘটেছে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে। এটি নাটকেরই গরিমাময় প্রকরণ। তবে এর চরিত্রগুলিকে তিনি সমকাল থেকে বেছে নেননি, নাট্যঅভিজ্ঞতা থেকেই এর সৃষ্টি, তবে এর শব্দে, ঘটনা সমাবেশে, রূপকল্পে, মুদ্রায় ছড়ানো রয়েছে এর কবিতার ব্যঞ্জনা।

আলোচ্য কাব্যনাটকে বুদ্ধদেব বসু পৌরাণিক কালকে সমকালে রূপান্তরিত করেছেন। বৃষ্টিহীন, বীর্যহীন, বন্ধ্যা লোমপাদরাজ্য যেন আমাদেরই সমকাল পীড়িত সভ্যতার প্রতীক। ঋষ্যশৃঙ্গ আর তরঙ্গিনী পুরাণের কোনো মুনি বা বারাঙ্গনা নন, কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত আধুনিক নরনারী। কিন্তু অনুভবের বা উৎকৃষ্ট কোনো ভাবের ফলে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাটকে পাত্রপাত্রীকে ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক থেকে সরিয়ে এনে ক্ষণিক মুক্তি দিয়েছেন। নাটকের ৪র্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তা সামাজিক ও পারিবারিক ভার না নিয়ে নিজ নিজ সত্তার অভ্যন্তরে মুক্তিলাভ করেছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ: "স্বপ্নে দেখি সেই স্বর্গ, সেই উস্মীলিত মুহূর্ত,
যেখানে ত্রিকাল এক অখণ্ড স্থির বিন্দুর মধ্যে মূর্ত,
স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড, রুদ্ধ সব ইন্দ্রিয়—
সেই ব্রহ্মলোক, আমার ধ্যান মগ্ন তিমির—।"

অথবা, শান্তা: "আসে যায় দিন-রজনী,
আসে জাগরণ, তন্দ্রা
শুধু নেই হৃৎস্পন্দন
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।"

আবার "লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে ক'রে থাকে, তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো"—তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গের এই পরিণাম তাদের সাধারণ জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু কাব্যনাটকে যেহেতু অসাধারণ নারী-পুরুষের সমান্তরালভাবে সাধারণ নারী-পুরুষের জীবনছন্দও নাট্যক্রিয়াধর্মী বাস্তবতার ছন্দোময় রূপ পায় তাই লোলাপাঙ্গী আর চন্দ্রকেতু আশাহত হয়েও রচনা করেছে নতুন সংসার—

লোলাপাঙ্গী: "শূন্যঘর, তরঙ্গিনী নেই। আমরা সমদুঃখী
চলো। আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেবো।
তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেবে।"

—এই ভাব-ভাষা-রূপ এবং রূপকল্পের বিন্যাস একান্তভাবে কাব্যনাটকের।

বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যনাটকের 'রূপকল্প' সৃষ্টিতে টি. এস. এলিয়টের ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—"রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল নাটকটা..." '—তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র সংলাপে এই রূপকল্প দেখা যায়। ক্যান্টারবেরির গ্রামের মেয়েদের কোরাসের সঙ্গে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে প্রথম অঙ্কের শুরুতে গাঁয়ের মেয়েদের সমবেত উক্তি, খেদোক্তি ও বৃষ্টিহীন দেশের বৃষ্টির জন্য হাহাকার ও প্রার্থনা—"হে দেব নরেশ! মহান

সমবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও—বৃষ্টি দাও।" —তে কাব্যভাষা ও কথ্যভাষার যোগে কাব্যনাটকের সফলতা বয়ে এনেছে।

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র ভাষা উপযুক্ত কাব্যনাটকের ভাষা। এখানে প্রত্যহকে ছুঁয়ে অন্তর্গূঢ় আবেগকে ধ্যানকে ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে রূপ দেওয়ার জন্য চিত্র ও সংগীতের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ভাষা নাটকের বহিরঙ্গ অলংকরণ নয়। আন্তর নাট্যগঠন নিয়ন্ত্রণকারী। তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে জীবনের স্বাদ, রং, রূপ বাস্তবতা ও ব্যঞ্জনা, প্রত্যক্ষ আর কবিত্ব মিলেমিশে গেছে—

তরঙ্গিনী: তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

কাম আর প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং তার সমীকরণ ঘটেছে এই কাহিনিতে। একদিকে তপস্বী আর বারাঙ্গনার শরীরে মনে মিলন ঘটে, অন্যদিকে বর্ষণে সিক্ত হয় প্রকৃতি। এখানে কবির ভাষা অনির্বচনীয় কাব্যিক মুহূর্ত রচনা করেছে—"জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো নির্ঝর। ..রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।" আবার তিনি প্রকৃত রোমান্টিকের ভাবনার জোরে কবিতা থেকে দূরেও সরে আসতে পেরেছেন। এই রোমান্টিকতা লক্ষ করা যায় 'ঋষ্যশৃঙ্গের এই সংলাপে—"মাঝে মাঝে আমার অনুভূতি হয়, যেন পশু, পক্ষী, বৃক্ষের সঙ্গে আমি একাত্ম। নিখিলের সঙ্গে একাত্ম।"

দুই

কাব্যনাটকের সংলাপের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে প্রবাহিত দুটি স্তর। একটি দৈনন্দিন কথাবার্তার স্তর, অন্যটি গভীর আবেগময় উচ্চারণের স্তর অর্থাৎ কবিতার স্তর। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র প্রায় প্রতিটি সংলাপেই আছে এই দ্বিস্তরিকতা। 'জল', 'অগ্নি', 'সর্প' ইত্যাদি শব্দগুলির দ্ব্যর্থ অর্থ এখানে গৃহীত। এখানে ব্যবহৃত উপমাগুলি সবই কাব্যিক উপমা। আবার বাক্যের প্রথমে শেষে ক্রিয়াপদ এনে কাব্যিক গতি সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু তবুও 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাট্য হিসাবে যেমন নাট্যগুণান্বিত রচনা হিসাবেও তেমন অসামান্য। সুন্দর, প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচনে কবির ইমেজের পর ইমেজের সজ্জায় এই রচনাটি আমাদের আবিষ্ট করে তোলে। এর দীর্ঘ সংলাপে গদ্য-পদ্যের যে মেলামেশি উপমা, মেধাকরের দ্যুতি-প্রতিটি কথাকে অসামান্য নাট্যগুণ দান করেও প্রতি সংলাপেই প্রাত্যহিকতা থেকে উত্তরণের ঐশ্বর্য, পুরোপুরি কোনো কাহিনি রচনা নয় কেবল তার আভাস দেওয়া—এসমস্তর সমন্বয় প্রমাণ করে এটি কাব্যনাটক হয়েও সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বকীয় মর্যাদায় ভাস্বর একটি শিল্পসৃষ্টি।

কাব্যনাট্য হল কাব্য ও নাটকের মিলনে গড়ে ওঠা এক শ্রেণির নাট্যরচনা, যেখানে কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করে সমশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠে নাট্যরস ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশে সহায়তা করে। কিন্তু এই কাব্যনাটকের অভিপ্রেত ভাষামাধ্যম কী হওয়া উচিত এ নিয়ে আলোচনার আজও নিরসন হয়নি। কাব্যনাটকে যেহেতু তীব্র হৃদয়াবেগ ও উৎকৃষ্ট ভাবনির্যাস প্রকাশিত হয়

তাই এলিয়টের মতে একমাত্র কাব্যভাষাই এর যথাযথ প্রকাশ মাধ্যম হতে পারে। তিনি মনে করেন যে—গদ্যনাটকের তুলনায় কাব্যনাটকই জীবনের অত্যন্ত তীব্র ও উত্তেজক রূপটিকে অনেক বেশি সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারে। এলিয়ট কাব্যনাটকে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণকেও অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র পদ্য সংলাপে রচিত হলেই কোনো নাটক সার্থক কাব্যনাটক হয়ে উঠতে পারে না, সেই পদ্যকে হতে হবে ব্যঞ্জনাগভীর, স্পষ্ট বক্তব্যসূচক এবং তাতে থাকতে হবে 'natural utterance'। আর তখনই মনে হয়, এই একইভাবে গদ্যও তো কাব্যনাটকের বাহন হতে পারে যদি সেখানে—"speech is naturally poetic, both in imagery and rhythm" হয়। পরবর্তীকালে লোরকা এবং অন্যান্যরা কাব্যভাষার বদলে কাব্যিক গদ্যভাষায় নাটক লিখে আধুনিক কাব্যনাটকের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে দেন। তাঁদের মতে কাব্যনাটকের ভাষা হবে—"as fully flavoured as a nut or apple". বা গদ্যে নাটক লেখা বড়ো কথা নয় বড়ো কথা হল কাব্যনাটকের ভাষার বঞ্জনা গভীরতা।

সাধারণ গদ্যনাটক ও কাব্যনাটকের ভাষার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ নাটকের সংলাপে থাকে বিবৃতি ধর্মিতা ও সমতলতা; প্রত্যহের রূঢ়, রুক্ষ, মলিন, দীন জীবনযাপনকে আদ্যন্ত ফুটিয়ে তুলতে চান গদ্য-নাট্যকার। বিপরীতপক্ষে কাব্যনাটকে বিবৃতির বদলে ব্যঞ্জনা সমতলতার জায়গায় বহমানতা আর প্রাত্যহিকতার পরিবর্তে প্রত্যহকে ছুঁয়ে অন্তর্গূঢ় আবেগ ও ধ্যানতন্ময়তাকে রূপ দিতে চান কাব্যনাট্যকার। কাব্যনাটকে নাটক সত্যকে অনাবৃত করে, কবিতা নিয়ে যায় সেই সত্যের গভীরে; নাটক জীবনকে বিশ্লেষণ করে আর কবিতা তা উপলব্ধি করায়। এখানে বাস্তবতার ছলে হৃদয়ের কথা শোনানো হয়। কাব্যনাটকের সংলাপের মধ্যে ভাষাগত চিত্রকল্প এবং পরিস্থিতিকেন্দ্রিক নাটকীয় চিত্রকল্পের দ্বৈত অভিযাতে দর্শকের চেতনায় তার অজ্ঞাতসারেই বাস্তবের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন স্তরের দ্যোতনা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাটকগুলিতে ভাষা নিয়ে রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি কবিতার ভাষাকে ভারমুক্ত অনুপ্রাস অলংকার মুক্ত করে প্রতিদিনের কথোপকথনের কাছাকাছি আনতে চেয়েছেন তেমনি গদ্যকেও মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন আদান-প্রদানের স্তরে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এই গদ্য সাধারণ গদ্যই হবে কিন্তু তা হবে কবিতার আবেশে ছাওয়া। বুদ্ধদেব তাঁর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি গদ্যকে কবিতার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র সুঠাম গদ্যচরণগুলি কবিতায় পরিণত, এখানে আলাদা করে চেনা যায় না কোন্‌টা কবিতা, কোন্‌টা গদ্য। 'তপস্বী তরঙ্গিনী'র ভাষায় যেমন কবিতার ভাবালুতা আছে বৈদেহী উৎপেক্ষা আছে সেই সঙ্গে আছে গদ্যের সুঠামতা ও যুক্তির সংহতি।

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' যদিও কবিতায় লেখা নয় তবু একে কাব্যনাটক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, এই নাটকের ভাষা বানিয়ে তোলা ভাষা। অতিকল্পিত তৎসম শব্দের অঢেল ব্যবহার আর বাক্যগুলির বিন্যাস সব মিলে এখানে এমন এক ভাষা তৈরি হয়েছে যে ভাষায় আমরা কথা বলি না অথচ যা মনের মধ্যে ঝংকার তোলে।

নাটকে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে চিত্ররচনার নিপুণতা লক্ষ করা যায়। উপমাকে তিনি ভাষার

অলংকার মনে করেননি—তা ভাব প্রকাশেরই অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। নাটকের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিমা চলেছে এবং বাড়িয়েছে অর্থ ও ইঙ্গিত। "তপস্বী ও তরঙ্গিনী"র সংলাপে তাঁকে রূপকল্পের প্রেরণা জুগিয়েছিল টি.এস.এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন—"রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল নাটকটা।" নাটক শুরু হয়েছে গ্রামের মেয়েদের কোরাস দিয়ে। রূপকল্পের আটপৌড়ে উপস্থাপনা এখানে চোখে পড়ে। বলা হয়—"বৃষ্টি ও রৌদ্রের সমবায়ে শস্য ফল সঞ্জাত পরিপুষ্ট হয়, আগুন ও জলের সংযোগে আমাদের অন্ন স্বাদু ও সুপাচ্য হয়ে ওঠে।" এই বিশ্বাসে তাদের প্রার্থনা ও হাহাকার—"হে দেব ঐরেশ! মহান! মঘবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও—বৃষ্টি দাও।" প্রচণ্ড খরার দেশে এই প্রার্থনাই গ্রামের মেয়েদের কণ্ঠে কাব্যভাষা ও কথ্যভাষার যোগে প্রাণ পেয়েছে। রৌদ্র ও বৃষ্টির এই রূপকল্পকে আবার তিনি আগুন ও জলে ব্যাপ্ত করে জন্মসূত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন—"নারীর গর্ভে জল, পুরুষের বীর্যে আগুন—এদের সহকর্মিতার ফলে জন্ম নেয় প্রাণীরা, সৃষ্টি ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়।" আবার গাঁয়ের মেয়েদের কোরাসের পর দূতদের আগমনে সংলাপের যে স্তর শুরু হয়েছে তাতে নাট্যকারের স্বাধীনতা—উত্তর অভিজ্ঞতা জড়িয়ে গেছে, এমনকি অন্ধকারও প্রতিভাত হয়েছে দূতদের সংলাপে।

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র সংলাপের যথার্থ বিশ্লেষণ করতে হলে চরিত্রগুলির দিকে তাকাতে হবে। নাটকের চরিত্রগুলি সবাই একই ভাষায় কথা বলেনি। তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সংলাপের ধরন বদলেছে। রাজ্যমন্ত্রী রাজা লোমপাদের প্রতিনিধিস্বরূপ। তাঁর সংলাপে তাই রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা, কাব্যনাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এতে সংলাপের মধ্যে নিরন্তর দুটি স্তর প্রবাহিত থাকে। রাজমন্ত্রীর সংলাপে এই দ্বিপুরিকতা লক্ষ করা যায়। শান্তার মনোবাসনার কথা জেনেও শান্তা ও অংশুমানের মিলন তাঁর কাঙ্ক্ষনীয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি শান্তাকে আশীর্বাদ করেন—"তুমি স্বদেশের কল্যাণদাত্রী হও। তোমার পাতিব্রত্যের ফলাফল হোক অঙ্গরাজ্যের শাপমোচন।" তারপর দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে তিনি স্থির করেন কর্তব্য কর্ম। আগাগোড়া তাঁর সংলাপে রাজ্যের কল্যাণ চিন্তা সক্রিয় থেকেছে।

শান্তা চরিত্রে দু-জাতীয় সংলাপ লক্ষ করা যায়। প্রথম অঙ্কে তার সংলাপে রাজকন্যাসুলভ মর্যাদাবোধ, অহমিকা, তেজস্বীতা ও আভিজাত্য প্রকাশ পেয়েছে। সে নির্দ্বিধায় প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশে মুখর হয়েছে—"অংশুমান ও আমি এক যৌবরাজ্য পেতেছি। আমাদের মন্ত্রী সেখানে হৃদয়, সেনাপতি আমাদের পারস্পরিক প্রীতি...।" কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে এই শান্তার মধ্যেই দেখা গেছে স্বামীকে তুষ্ট রাখার প্রয়াস, কৃত্রিম প্রেমাভিনয় ও অন্তরে রিক্ততার বেদনা।

সুন্দর তুমি, পেটিকা,
অন্তরে নেই রত্ন।

—গানটিতে তার প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবার এই গানটির মাঝে মাঝে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ মিলেমিশে গদ্যপদ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

অংশুমানের সংলাপ প্রধানত একমাত্রিক শান্তার একনিষ্ঠ প্রেমিক সে, তাই শান্তাকে না

পাওয়ার বেদনায় তার সংলাপে ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে। তাই সে তার পরাজয়ের জন্য সরাসরি ঋষ্যশৃঙ্গকে দায়ী করেছে—"আমার ভাগ্যে লোমপাদই তাপহারক। স্বয়ং আমার পিতা তাপহারক। এবং প্রধান তাপহারক আপনি।" তবে নাটকের শেষে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রকৃতস্বরূপ জানতে পেরে ও শান্তাকে ফিরে পেয়ে তার সংলাপে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। অংশুমানের এই সমতল বক্তব্যের পাশে ঋষ্যশৃঙ্গের জটিল ভাবব্যঞ্জক সংলাপ যেমন ঋষ্যশৃঙ্গকে ফুটিয়ে তুলেছে তেমনি নাটককে কাব্যনাটকের মর্যাদা দান করেছে।

বিভাণ্ডক বলশালী তেজস্বী ঋষি। তাঁর সংলাপে তাঁর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা। সাধন নিষ্ঠা, দূরদর্শী তপস্বীর পরিচয় যেমন প্রকাশিত তেমনি পিতৃস্নেহ, পুত্রের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। "আমি তোমার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ দেখেছি। মন্ত্রের উদ্‌গাতা শুধু নয়। মন্ত্রের স্রষ্টা হবে তুমি"—বিভাণ্ডকের এই সংলাপ নাটকীয় তাৎপর্য (Dramatic Irony) তৈরি করেছে। তাঁর কাছে নারী 'উপযোগিতা মাত্র'—"মাতৃত্বের একটি যন্ত্র—সুগঠিত—তারই নামান্তর হলো নারীদেহ।" কিন্তু ৪র্থ অঙ্কের শেষে রাজজামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সংলাপে ফুটে উঠেছে আর্তি, তিনি নিজেকে পুত্রের শিষ্যত্বে সঁপে দিতে চেয়েছেন। অনমনীয় তেজস্বিতায় ও পিতৃহৃদয়ের আর্তিতে মিলেমিশে কোমলে কঠিনে উপযুক্ত কাব্যনাটকের সংলাপ সৃষ্টি করেছে।

লোলাপাঙ্গীর সংলাপে বস্তুময়তার ছাপ, বাস্তবজীবনে অভিজ্ঞ বিগত যৌবনা লোলাপাঙ্গীর প্রতিটি কথায় প্রাত্যহিকতার হিসাবনিকাশ, লাভ লোকসানের ছক। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে তার নিঃস্বার্থ মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। রাজমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে লাভের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, তরঙ্গিনীকে উপযুক্ত চৌষট্টিকলা নিপুণা হাস্যলাস্যময়ী করে তোলার গর্বও তার সংলাপে লক্ষণীয়। কিন্তু প্রেমোত্তীর্ণ তরঙ্গিনীকে আপন ধর্মবৃত্তিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, কন্যার শুভকামনায় চিরন্তন মাতৃহৃদয়েরই প্রকাশ ঘটেছে। "তরু, তুই যা চাস তা-ই হবে। তুই যা বলবি আমি তা-ই করবো। তীর্থে চলে যাবো তোকে নিয়ে। সব ধন দান করে দেবো। তীর্থে-তীর্থে ভিক্ষে করে বেড়াবো তোকে নিয়ে। শুধু তুই আমাকে ছেড়ে যাস না।" লোভী হিসাবী লোলাপাঙ্গীর এই কাকুতি-মিনতি তাকে মাতৃত্বের আসনে আসীন করেছে।

তরঙ্গিনীর স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে তার সংলাপ বদলেছে। প্রথম অঙ্কে তার সংলাপে তার ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়—"আমার ধর্ম বহুর পরিচর্যা।" এখানে তার সংলাপে বারাঙ্গনাসুলভ বাক্‌পটুতা, তীর্যকভঙ্গি রূপগর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশে তার দীর্ঘ একোক্তিতে ঋষ্যশৃঙ্গকে মৃগয়া করার এক আবেগকম্পিত চিত্রকল্প রচিত হয়েছে। নাট্যকার এখানে শব্দ দিয়ে চিত্রকল্প রচনা করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তে তার সংলাপে সংকেত ও ইঙ্গিতবাহী যে চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তা কাব্যনাটকের ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ— "জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর। ...এসো তিমির, এসো তন্দ্রা, এসো দাবানল, এসো ধারাজল...।" কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের স্তুতির সরলতায় বারাঙ্গনা উত্তীর্ণ হয়েছে কাম থেকে প্রেমে নাটকের শেষে তার সংলাপে এই প্রেমময়ী সত্তার প্রকাশ।

সমস্ত চরাচর ও জীবজগতের অনন্ত সৌন্দর্যে নিমগ্ন ঋষ্যশৃঙ্গ নিজেকে ধন্য ও আনন্দিত মনে করেছে তাই বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাঁর কাছে 'দিবালোকের মতো সহজ ও প্রতীয়মান' হয়েছে। এখানে বিশ্বপ্রেমেরই কথা লুকিয়ে রয়েছে—"মাঝে-মাঝে আমার আমার অনুভূতি, যেন পশু, পক্ষী বৃক্ষের সঙ্গে আমি একাত্ম। নিখিলের সঙ্গে একাত্ম।" এই রোম্যান্টিকতা গদ্যসংলাপেও কাব্যের ব্যঞ্জনা এনেছে। তরঙ্গিনীর অতুল সৌন্দর্য বর্ণনায় লক্ষ করা যায় অপাপবিদ্ধ সরলতা—"আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে।" কিন্তু রাজপুরীতে এসে এই ঋষ্যশৃঙ্গের ভাষাতে এসেছে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার পটুতা, তিনি বলেছেন "আমি বিনা বক্তব্যে বয়ন করে যাবো বাক্যজাল।" তিনি সংযত ভাষ্যে ধিক্কার জানিয়েছেন পিতাকে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গে শূন্যতা, কাঙ্ক্ষিতকে অপ্রাপ্তির বেদনাও চাপা থাকেনি, প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সংলাপের মাধ্যমে—"স্বপ্নে দেখি সেই স্বর্গে, সেই উন্মীলিত মুহূর্ত—সেই ব্রহ্মলোক, আমার ধ্যানমগ্ন তিমির।"

গানের মাধ্যমে কাব্যনাটকে এবং জনমানসে কাব্যিক আবেদন সৃষ্টি করা হয়। আলোচ্য নাটকে কোরাস থেকে শুরু করে তরঙ্গিনী, তরঙ্গিনীর সখীদের ও শান্তার গানে এই আবেদন লক্ষণীয়। বিভিন্ন উপমা, চিত্রকল্প ও ইঙ্গিতবাহী সংলাপে বিশেষত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর দেহ মিলনের যে বর্ণনা আছে তা কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়। নারী-পুরুষের সংগমকে এত শিল্পিত ভাষায় রূপ দেওয়ায় নাট্যকারের মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বশেষে এই নাটকে রয়ে গেছে এক অশেষের বেদনা—ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী সম্পর্কে, যা কাব্যনাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে নাটকটিতে প্রতিটি সংলাপেই প্রাত্যহিকতা থেকে উত্তরণের যে ঐশ্বর্য রচিত হয়েছে তা নাটকটিকে একটি সার্থক কাব্যনাটকের মর্যাদা প্রদান করেছে।

৩

অ্যারিস্টটল কথিত নাটকের দুটি উপাদান ছাড়াও আর একটি উপাদানের কথা সর্বজনগ্রাহ্য—সেটি হল নাটকে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা Conflict. 'Conflict is the soul of drama.'—এই মতটি পাশ্চাত্য দর্শনে বহুপ্রচলিত। এই দ্বন্দ্ব বা সংঘাতই নাটককে প্রাণীত করে দুরন্ত গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়।

দ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। কখনও গ্রিক নাটকের মতো দৈবের মানুষের দ্বন্দ্ব, কখনও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দুটি সত্তার দ্বন্দ্ব আবার কখনও বা দুটি ভাবের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই নাটকটিকে চালিত করে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং শেষে কোনো একটি ভাবের বা সত্তার জয় ঘোষিত হয়।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর অন্যতম কাব্যনাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'তে ভাবদ্বন্দ্বের চিত্রাঙ্কন করেছেন। তিনি এর অভিনয় প্রসঙ্গে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন—"লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো—নাটকটির মূল বিষয় হলো এই।"—এই দুজন মানুষ হলেন নাটকের নায়ক তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ এবং নায়িকা বারাঙ্গনা তরঙ্গিনী এঁদের সম্পর্কে আবার তিনি জানিয়েছেন—"আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও

তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন। "আলোচ্য নাটকের কাহিনিতে কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং তার সমীকরণ ঘটেছে এবং তার ফলে পরিবর্তন ঘটেছে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর সাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের।

শুধু জগৎ নয় সমস্ত জীবজগৎও কাম ও প্রেমের দ্বারা আন্দোলিত। সৃষ্টির আদি উৎস হল কাম। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বিস্মরণী' কাব্যের 'পান্থ' কবিতায় লিখেছেন—

"সৃষ্টিমূলে আছে কাম
সেই কাম দুর্জয় দুর্বার।"

কামের মধ্যে আছে সৃজনেচ্ছা। ষড়রিপুর সূচনাই হয় কাম দিয়ে, যা মানবপ্রকৃতির অন্তঃস্তলের আদিমতম প্রবৃত্তি। নয়টি রসের সূচনা হয় শৃঙ্গার রস দিয়ে—এই শৃঙ্গারের অর্থ কাম। এই কাম জীবনচালক বংশগতি সঞ্চারী। তাই সাহিত্যে এই কামের বিভিন্ন প্রকার অভিক্ষেপের প্রতিফলন ঘটেছে।

কবি বুদ্ধদেব বসুর জীবনেও চলেছে এই কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এই দ্বন্দ্বের ছায়া পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। কামের প্রভাবে নিজেকে 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দি বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে কামের গরল মন্থন করে তাকে অমৃতে পরিণত করে প্রেমের সফলতা আনয়নে তিনি সক্ষম হয়েছেন। 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় তাঁকে বলতে শোনা যায়—

"তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি—সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন সুধা মম।"

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাটকে তিনি 'কাম' শব্দটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে প্রাচীন ভারতের ভূমির উর্বরতা সাধন কাহিনির সমসূত্রে মানবজীবনে 'প্রেম ও পুণ্যের' পথে কামের উদ্গতি বা সার্থকতার কথা বলেছেন। তিনি এখানে দেহ এবং দেহজাত কামনাবাসনার স্তর পরম্পরা উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তিধর্মী বা রোম্যান্টিক প্রেমের ধারণা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে তার স্বাধর্ম লক্ষ করা যায়। কামচেতনার বিকাশে প্রেমের নব নব রূপের আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন তিনি। এই জন্যই 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটককে বুদ্ধদেবের রচনার ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। কারণ, এই নাটকের দেহজাত বা কাম সম্ভূত প্রেমের চেতনার মধ্যে তাঁর সমস্ত জীবনের সাহিত্য সাধনার ফলশ্রুতি রয়েছে।

নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়—অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের একমাত্র প্রতিকার ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশ। ঋষ্যশৃঙ্গ বনচারী, সরল ও অনভিজ্ঞ তপস্বী; নারী কী তা তিনি জানেন না। কামনার রজ্জুতে বেঁধে তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসার ভার পড়ল নগরের বারাঙ্গনাদের মধ্যমণি তরঙ্গিনীর ওপর। এই লাস্যময়ী নারী তাঁকে শেখাল কামকলা বিধি, বোঝাল পুরুষের কাম কী এবং কোথায় তার সার্থকতা। আর সেই উপলব্ধিতে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মান্তর ঘটল। তরঙ্গিনীর সঙ্গে কথোপকথনে এই চিত্রের প্রকাশ দেখা যায়—

ঋষ্যশৃঙ্গ: তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী: আমার হৃদয়ে রত্ন;

ঋষ্যশৃঙ্গ: আমার শোণিতে তুমি অগ্নি।

তরঙ্গিনী: আমার সুন্দর তুমি।

* * * * * * * * * *

ঋষ্যশৃঙ্গ: আমি তোমাকে চাই—তুমি আমার প্রয়োজন!

—এই পরস্পর বিরোধী সংলাপে ঋষ্যশৃঙ্গের জ্বালা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যিনি ছিলেন মনে গরল শিশুতুল্য, নিষ্পাপ, আজ তাঁর মনে জেগেছে গড্ডুরের ক্ষুধা ও কৌতূহল। তারপর তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গের দেহ-মিলনের বর্ণনা কবির সংকেতময় শিল্পিত ভাষায় অনন্য সুন্দর হয়ে উঠেছে—

"জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা
জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর।
...সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন।"

—যৌনতা এখানে মিলে যায় প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের সঙ্গে। এখানে আমরা তরঙ্গিনীর বা একজন নারীর তৃষ্ণা বা যোগ্য পুরুষের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ দেহ মিলনের কামনার সঙ্গে সংযুক্তভাবে আদিম মানবসমাজের ভূমির উর্বরতা সাধনের 'রিচ্যুয়াল' বা ক্রিয়াকাণ্ডেরও যেন পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তি হৃদয়ের কামনার তৃষ্ণাকে বুদ্ধদেব এইভাবে প্রকৃতি জগতের সমগ্রতার মধ্যে প্রসারিত করে বিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এরপর পিতা বিভাণ্ডকের কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ জেনেছেন নিজের জন্মরহস্য ও নারী নাম্নী এক বিপরীত লিঙ্গের অস্তিত্ব। ঋষ্যশৃঙ্গ জীবনের এই আশ্চর্য জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একজন পুরুষ হিসাবে অনুভব করেছেন এবং তার ফলে তাঁর মধ্যে জন্মেছে বিরহকাতরতা। এরপরই ঘটেছে তাঁদের দ্বিতীয় মিলন—সজ্ঞানে নারী ও পুরুষ হিসাবে এরপর নাট্যকারের ভাষায়—"একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোম্যান্টিক প্রেম'—যেভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে সেই ভাবেই।"—একজনের সরলতা থেকে কামে। অন্যজনের কাম থেকে প্রেমে এবং এইখান থেকেই নাটকে শুরু হয়ে গেল কাম ও প্রেমের সংঘাত।

তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে ভেদ জ্ঞানহীন কামবোধের জাগরণ ঘটায় তরঙ্গিনীকে তাকে বলতে শোনা যায়—"কোথায় যাই কী এসে যায়? কোথায় থাকি কী এসে যায়? আমি তোমাকে চাই।" এই ভেদজ্ঞান হীনতার ফলেই শান্তার সঙ্গে তার বিবাহ এবং সম্ভোগ সম্ভব হয়েছে। তার অমতে এ বিবাহ ঘটতে পারত না। কিন্তু শান্তার মধ্যে তৃপ্ত হয়নি, তিনি দেখেছেন 'অন্য এক স্বপ্ন'—এই স্বপ্ন তরঙ্গিনীর। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে এই তরঙ্গিনী তাঁর সামনে এলে তিনি আশাহত হন। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন দেহিনীকে, মোহিনীকে। কিন্তু যে এসেছে সে প্রেমিকা ও একচারিণী।

এই নাটকে জন্মান্তর ঘটেছে তরঙ্গিনীরও বারাঙ্গনা থেকে সে রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমিকায়। কাম থেকে প্রেমে যাত্রা করেছে সে, ঋষ্যশৃঙ্গের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ও কামার্ত বাক্যের সামনে দাঁড়িয়েও সে বলেছে—"তুমি আমার ঈশ্বর।" ঋষ্যশৃঙ্গের নিষ্পাপ প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ—

'আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে'

তাকে সরিয়ে এনেছে তার স্বাভাবিক জীবন ও বারাঙ্গনা বৃত্তি থেকে, উন্মত্ত জীবন অর্থ প্রতিপত্তি, নাম-যশ, বহু পুরুষের উত্তপ্ত সান্নিধ্য—এসব কিছুকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে খুঁজে বেরিয়েছে নিজের অন্য এক মুখ যা ঋষ্যশৃঙ্গ তার মধ্যে দেখেছিল। চতুর্থ অঙ্কে তাই ঋষ্যশৃঙ্গের রূপকাতরতাকে ভর্ৎসনা করে সে বলে ওঠে—

"তোমার মনে নেই আমার সেই মুখ, যে মুখ তুমি সেদিন দেখেছিলে" এবং খুঁজেছে ঋষ্যশৃঙ্গের সেই সরল কামহীন।

বস্তুত, ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে কামকাতরতা জাগিয়ে তুলেছিল তরঙ্গিনীই। তাঁকে দিয়েছিল 'আদিম প্রবৃত্তির সন্ধান' অথচ আজ ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে সেই আদিম জন্তুকে জেগে উঠতে দেখে নিজেই ভয় পেয়েছে। বলেছে—"তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছ? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?" পূর্ব স্মৃতির দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে ফেরাতে চেয়েছে। আর তরঙ্গিনীর এই সমস্ত কথা শুনতে শুনতেই ঋষ্যশৃঙ্গের ভাবান্তর হয়, তাঁর মুখে ফুটে ওঠে প্রথমে "সংসার, তারপর বেদনা অবশেষে শান্তি।" তিনি ভাবেন নতুন এক সাধনার কথা—"মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়—আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।" তরঙ্গিনীও বেরিয়ে পরে তার পথের সন্ধানে। আর নাটকের পরিণতিতে শোনা যায়—"কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লো দু-জনে—এক তপস্বী-যুবরাজ, এক বারাঙ্গনা প্রেমিকা।"

জীবনের একটি মৌল এবং উজ্জীবক শক্তিকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দা করা হয়; আর সেইজন্যই মানবজীবনে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব, অসংগতি এবং স্ববিরোধের। কিন্তু কাম যখনই প্রেমে রূপান্তরিত হয় তখনই সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তাই কামনার এই চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কামনাকে করে তুলতে হবে পার্থিব থেকে অপার্থিব বেরিয়ে পড়তে হবে পরম প্রেমের সন্ধানে বন্ধন মুক্ত হয়ে। নাট্যকারের এই বক্তব্য আলোচ্য নাটকে তপস্বী ও তরঙ্গিনীর জীবনালেখ্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কামের প্রভাবে নায়ক-নায়িকার জীবনে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণামে প্রথমে প্রেমে এবং পরে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের যে রূপ তিনি প্রকাশ করেছেন তা অভিনব।

চার

কাব্যনাটকে পূর্ণাঙ্গ কাহিনি যেমন থাকে না। বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-তেও তাই ঘটনা অথবা চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। এখানে চরিত্রের বীজ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ঘটনার অঙ্কুর অথবা ঘটনার গোপন শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চরিত্র তার জটিল ডালপালা মেলে দিয়েছে এবং পরিণতিতে বিকশিত হয়েছে একটি উৎকৃষ্ট ভাবাদর্শ। এই ভাবাদর্শের বিকাশেই নাটক এবং নাট্যকারের সার্থকতা। কিন্তু নাট্যকার চরিত্রের পূর্ণবিকাশের কার্যকারণের ব্যাখ্যা না দিলেও কাহিনির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলি একটি পূর্ণ আবেদন নিয়েই পাঠক মনে হাজির হয়। আলোচ্য নাটকে তরঙ্গিনী চরিত্রটিও এই পূর্ণতার আবেদন এনেছে।

নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়—অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের একমাত্র প্রতিকার

ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশ, সরল, অনভিজ্ঞ, বনচারী, নারীভাব-জ্ঞানহীন তপস্বীকে কামনার রজ্জুতে বেঁধে রাজপুরীতে নিয়ে আসার জন্য ডাক পড়ে দুই বারাঙ্গনার—লোলাপাঙ্গী ও তার কন্যা তরঙ্গিনীর। তরঙ্গিনী বারাঙ্গনাদের মধ্যমণি, পূর্ণ-প্রস্ফুটিত যৌবনা, হাস্য-লাস্যময়ী, নৃত্যগীতে পটিয়সী, কামকলা নিপুণা এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী। সে নিজে তার ধর্মের পরিচয় দিয়েছে—"আমার ধর্ম বহুর পরিচর্যা" সে আরও বলেছে—"...যে আমাকে মূল্য দেয়, তারই জন্য আমি অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি—শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান, কুৎসিত, আমার কাছে সকলেই সমান।" অর্থাৎ যৌবনের জাদু দিয়ে অর্থের বিনিময়ে পুরুষকে মোহিত করাই তার কাজ। বারাঙ্গনার ধর্ম ও বৃত্তি উপযোগী সমস্ত শিক্ষাই সে লোলাপাঙ্গীর কাছ থেকে পেয়েছে। এমনকি অর্থশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, পূজা, ব্রত ইত্যাদিতেও সে উপযুক্ত শিক্ষিত। এই চৌষট্টি কলা নিপুণা তরঙ্গিনীই একমাত্র পারে ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশ করে তাঁকে নগরে আনতে।

মোহিনী, পুরুষ শিকোরে দক্ষ তরঙ্গিনীও প্রথমে ঋষ্যশৃঙ্গের নাম শুনে ভীতি বিহ্বল ও বিস্মিত হয়ে পড়ে। কিন্তু লোলাপাঙ্গীর প্ররোচনায় তার—'মুখ হ'লো উজ্জ্বল, নিঃশ্বাস দ্রুত, দেহে জাগলো চঞ্চলতা, রূপযৌবন-গর্বিনী তরঙ্গিনীর চোখের সামনে ভেসে উঠলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে মৃগয়া করার সেই দৃশ্য—'তাঁর অধর স্ফুরিত, নয়ন কোণ রক্তিম, কণ্ঠমণি স্পন্দমান।' এরপর 'কন্দর্প, অতনু, পঞ্চশর'-কে সহায় করে তরঙ্গিনী তপোবনে যাত্রা করেছে।

নাটকে এই তরঙ্গিনী চরিত্রটি দ্বিমাত্রিক। তার এই দ্বিমাত্রিকতার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অঙ্কে তার পরিকল্পনা মতোই সব ঘটেছে। তার প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের মুগ্ধতা ও প্রশংসাবাক্য বর্ধিত হয়েছে—'সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল ...আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে..." ঋষ্যশৃঙ্গের এই নিষ্পাপ স্তুতিবাক্যই টলিয়ে দিয়েছে বারাঙ্গনার মন, রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র মতো শ্রবণজাত অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু তবু ধর্মকে আশ্রয় করে স্থিতধী থাকতে চেয়েছে সে, অবশেষে ঘটেছে সেই কাঙ্ক্ষিত মিলন তরঙ্গিনীর সংলাপেই এই মিলনের সংকেতময় বিবরণ শোনা যায়—"জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হ'লো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হ'লো মনোরথ, উচ্ছল হ'লো নির্ঝর। ...সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন।"—এখানে তরঙ্গিনীর বা একজন চিরন্তন নারীর তৃষ্ণা বা যোগ্য পুরুষের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ দেহ মিলনের কামনাকেই চরিতার্থ হতে দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজে জানিয়েছেন—"একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হ'লো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোম্যান্টিক প্রেম'—এই রোম্যান্টিক প্রেম বলতে তিনি কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব অবিচল, অবস্থা নির্বিশেষ এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তিকে বুঝিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর নাটকের নায়িকা তরঙ্গিনী রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা', এমনকি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও পাশ্চাত্যের ট্রিটানের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে।

এরপর তৃতীয় অঙ্কে যে তরঙ্গিনীকে দেখা যায় সে এক অন্য নারী। ঋষ্যশৃঙ্গের সান্নিধ্যে নব চেতনায় উদ্দীপিত করেছে তাকে, কাম থেকে প্রেমে যাত্রা করেছে সে। আজ সে বিরহিনী,

সাধিকা, প্রেমিকা, তাই রাজ্য জুড়ে আনন্দ সমাবেশে যোগদান করতে পারে না সে। ঋষ্যশৃঙ্গের সরল দৃষ্টি ও সম্ভাষণ তাকে সরিয়ে এনেছে তার স্বাভাবিক জীবন ও বৃত্তি, ধর্ম থেকে উন্মত্তজীবন, অর্থ, প্রতিপত্তি, নাম-যশ, বহু পুরুষের উত্তপ্ত সান্নিধ্য—এ সব কিছুকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে খুঁজে বেরিয়েছে নিজের অন্য এক মুখ—যা ঋষ্যশৃঙ্গ তার মধ্যে দেখেছিল। চতুর্থ অঙ্কে এই মুখের সন্ধানেই সে এসে দাঁড়িয়েছে যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মুখে। কিন্তু সময় ও প্রেক্ষাপটের বদল হয়েছে। হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গেরও বদল। সরলতা থেকে কামার্ততায় পৌঁছেছেন তিনি। এখানে ঋষ্যশৃঙ্গের রূপকাতরতা ভর্ৎসনা করে উঠেছে সে—"তোমার মনে নেই আমার সেই মুখ? যে মুখ তুমি সেদিন দেখেছিলে?"

অথচ, ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে কামকাতরতা জাগিয়ে তুলেছিল তরঙ্গিনীই। তাঁকে দিয়েছিল আদিম প্রবৃত্তির সন্ধান; অথচ আজ ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে সেই আদিম জন্তুকে জেগে উঠতে দেখে নিজেই সে ভয় পেয়েছে, বলেছে—"তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছ? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?" অবশেষে আবারও সে ঋষ্যশৃঙ্গের ভাবান্তর আনতে সক্ষম হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ যাত্রা করেছে শূন্যতায় ডোবার জন্য, আর বহুজন বল্লভা থেকে একনিষ্ঠ প্রেমের কাঙালিনী হয়ে ওঠা তরঙ্গিনীতে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছে অজানার পথে।

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে তরঙ্গিনীকে আশ্রয় করে, নাট্যকার নিজ ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জীবনে ভোগই নব নয়, ত্যাগেরও বিরাট ভূমিকা আছে। ধ্রুব প্রেমকে আশ্রয় করে কামের জাল ছিন্ন করে ত্যাগের উচ্চসীমায় পৌঁছনো সম্ভব। এই তত্ত্বই তরঙ্গিনী চরিত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। নাট্যকার প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—"আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন তরঙ্গিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই সমকালীন মনস্তত্ত্ব, মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। সামান্য ভোগোন্মত্তা দেহিনী মোহিনী তরঙ্গিনী তার অবিচল প্রেমকে আশ্রয় করে কামের পঙ্কিল আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়েছে প্রেমের তীর্থে, আর এখানেই নাট্যকারের চরম সার্থকতা।"

শান্তা চরিত্রটিকে প্রধান না অপ্রধান চরিত্র বলা হবে এ নিয়ে সংশয় আছে। শান্তা অঙ্গরাজ্য লোমপাদের রাজদুহিতা ও সর্বগুণসম্পন্না। নায়িকা হবার উপযুক্ত বংশমর্যাদাসম্পন্ন সে। অর্থাৎ তার মধ্যে নায়িকা হবার মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু এ নাটক শান্তার কাহিনি নয় বারাঙ্গনা তরঙ্গিনীর কাহিনি। তাই বংশমর্যাদা, গুণসম্পন্না ও নায়ক ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে অপ্রধান চরিত্রই বলতে হবে। নায়িকা বলা যাবে না। তবে অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে তার ভূমিকাই সব থেকে বেশি।

শান্তা তার শরীরে রাজরক্ত বহন করলেও আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-স্বপ্নের দিক থেকে সে অতি সামান্যা এক নারী, সে নিজেই এ বিষয়ে বলেছে—"আমি প্রকৃতি নই, আমি শান্তা—সামান্যা এক যুবতী। দেহ ও অন্তঃকরণে আমার সঙ্গে কৃষক-বধূর পার্থক্য নেই।" সে আর পাঁচটা নারীর মতোই পতি, সন্তান, গৃহ, প্রেম, পরিণতি বন্ধন ইত্যাদি কামনা করেছে। কোনো উচ্চ আদর্শ এই নারীকে তাড়িত করেনি, নিতান্ত মানবীয় কামনা-বাসনাই সে লালন করেছে অন্তরে।

নাটকে শান্তার সবথেকে বড়ো পরিচয় সে প্রেমিকা। রাজমন্ত্রী পুত্র অংশুমানের প্রতি তার আছে একনিষ্ঠ প্রেম। প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশে সে অনর্গল—"অংশুমান ও আমি এক যৌবরাজ্য পেতেছি। আমাদের মন্ত্রী সেখানে হৃদয়, সেনাপতি আমাদের পারস্পরিক প্রীতি...।" প্রেমের এইরূপ দ্বিধাহীন প্রকাশে শান্তা যে-কোনো আধুনিক উপন্যাসের নায়িকার সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে। শুধু প্রেমই নয় এই অংশে তার সংলাপের মধ্যে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের দৃপ্ততা ও মর্যাদা ফুটে ওঠে। রাজমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথনে শ্রদ্ধার অন্তরালে কোথায় যেন নির্দেশের কাঠিন্য ধ্বনিত হয়ে ওঠে। "আমি অংশুমান ভিন্ন অন্য কারো অঙ্কশায়িনী হবো না"—এ যেন তার দৃঢ় অলঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞাবাক্য।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে নারীদের আত্মমর্যাদার অধিকারী করেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যে এই মর্যাদা লঙ্ঘন করতেই সদাব্যস্ত থাকে তাও দেখাতে ভোলেননি। শান্তাকেও তাই অঙ্গরাজ্যকে শস্যশ্যামলা করে তোলার জন্য হতে হয়েছে বলিপ্রদত্ত। তার তিল পরিমাণ ত্যাগকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভুঁড়ি পরিমাণ ত্যাগের দিকে, আর এখানেই শুরু হয়েছে চরিত্রের অন্তঃসংঘাত ও সংকটের। ঋষ্যশৃঙ্গকে তরঙ্গিনী যে রতি রহস্যে দীক্ষিত করেছে তার ফল ভোগ করার জন্য কুমারী শান্তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।

প্রেমিকা হিসাবে শান্তা যেমন একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি পত্নী ধর্ম পালনেও তার সেই একনিষ্ঠা সংলক্ষ। স্বামীর গৌরবে গর্বিত হয়েছে সে; জন্ম দিয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্রকে। তার এই আত্মত্যাগে অঙ্গরাজ্যে এসেছে সুবৎসর, কিন্তু অন্তরে একাকিনী হয়েছে শান্তা। ক্রমশ নিঃসঙ্গতার জীবনে ডুবতে হয়েছে তাকে। বয়ে বেড়াতে হয়েছে প্রেমহীন দাম্পত্যের ভার। তার গানে তার এই রিক্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

"সুন্দর তুমি, পেটিকা,
অন্তরে নেই রত্ন।
* * * *
আসে যায় দিন-রজনী,
আসে জাগরণ, তন্দ্রা
শুধু-নেই হৃৎস্পন্দন,
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।"

শান্তা তার প্রেমের অপ্রাপ্তিতে বা অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষের অঙ্গশায়িনী হয়ে কিন্তু উন্মাদ হয়ে যায়নি বা আত্মহননের পথ বেছে নেয়নি। বরং নিজ বংশ আভিজাত্য বজায় রাখতে নীরবে পালন করে গেছে স্ত্রীধর্ম। কিন্তু নিজে হয়ে পড়েছে নিঃসঙ্গ। অন্তর্মুখী অন্তরচারিণী। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে মনের বিচ্ছিন্নতায় হয়েছে সে নিঃসঙ্গ আর এখানেই শান্তা ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ অঙ্কের শেষে অংশুমানের আগমনে শান্তা চরিত্রের সংকট চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। অংশুমানের প্রেমের অধিকারের দাবি ও পত্নীধর্মের পীড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শান্তা। কিন্তু এই চরম মুহূর্তে কাঙ্ক্ষিতকে সামনে পেয়েও শান্তা স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রয় করেই সংকট থেকে

মুক্ত হতে চেয়েছে। অংশুমানকে বলেছে—“অংশুমান, আমি এখন পরস্ত্রী! আমি পুত্রবতী—মাতা!” এখানেও স্বামী ও পুত্রের পরিচয়ই তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু অকস্মাৎ তার অজ্ঞাতে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে তার জীবনের চরম সত্য—“...আমার জীবন নষ্ট হয়েছে হোক, কিন্তু তুমি যেন শান্তি পাও এখনো আমার দিবানিশি এই প্রার্থনা।” অর্থাৎ তার মনের সিংহাসনে স্বপনে চিন্তনে অংশুমানই অধিষ্ঠিত থেকে গেছে। মনে মনে এখনও সে অংশুমানের প্রতি একাচারিণী। অবশেষে ঋষ্যশৃঙ্গের কথায় সব ছলনা দূর হয়েছে। শান্তা ফিরে পেয়েছে তার কৌমার্য এবং অংশুমানের সঙ্গে তার মিলন সম্পন্ন হয়। নাটকের শেষে শান্তা তার মনের সব দ্বিধা, সংকট ও নিঃসঙ্গতা দূর করে পরিণত হয়েছে পূর্বের আবেগ চঞ্চলা শান্তায়।

কিন্তু নাট্যকার শান্তা চরিত্রে একটি সংশয় রেখে দিয়েছেন। একসময় শান্তা তার নিবিড় দাম্পত্যজীবনে অংশুমানকে ভুলতে পারেনি, ঋষ্যশৃঙ্গের জায়গায় কল্পনা করেছে অংশুমানকে, তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে অংশুমানের সঙ্গে বিবাহিত জীবনে তার ঋষ্যশৃঙ্গকে মনে পড়বে না? এতদিনে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি কি শান্তার কোনো আবেগ জন্মায়নি। যদি জন্মে থাকে তবে তার এই বিবাহেও একটা নিঃসঙ্গতার সুর থেকে যাবে। তাই মনে হয় নাট্যকার শান্তা চরিত্রটিকে আগাগোড়া নিঃসঙ্গ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং তাতে তিনি ব্যাপক সার্থকতা লাভ করেছেন।

কোনো সম্পর্কই নিঃস্বার্থ নয়, প্রতিটি সম্পর্কেই ক্ষমতা ও প্রত্যাশা যুক্ত থাকে। আমাদের পারস্পরিক সামাজিক পারবারিক সম্পর্কগুলিতে যে বিকীর্ণ ক্ষমতা তৈরি হয় সাধারণ-স্বাভাবিক আদান-প্রদানে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, স্নেহ-প্রীতিতে সেই ক্ষমতার সম্পর্ক চলতে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় আধিপত্য কর্তৃত্ব ও অধিকারবোধের মনোভাব আর যেখানে এই অধিকারবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেখানেই সম্পর্কগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকে বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গ এবং লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিনীর সম্পর্কেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়।

‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’র নায়ক ঋষ্যশৃঙ্গ এবং নায়িকা তরঙ্গিনী। একজন তপস্বী অন্যজন বারাঙ্গনা। এদের দুজনেরই পারিবারিক পরিমণ্ডল তথাকথিত নয়, সাধারণ সমাজের বাইরে এদের অবস্থান। কিন্তু এরা কেউই মূল বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, দুজনেরই রয়েছে শিকড়ের টান। তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী উভয়েই বিভিন্ন সময় এই টানকে অস্বীকার করে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে এবং শেষপর্যন্ত তারা এই শিকড়ের বন্ধন ছিঁড়তে সর্মথও হয়েছে, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়েছে বিভাণ্ডক ও লোলাপাঙ্গী। পিতা ও মাতারূপে তাদের বেদনা উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে নাটকে।

ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডক কর্কশ-দর্শন, কঠিন পৌরুষবিশিষ্ট একজন ঋত্বিক। তিনি তাঁর পুত্রকে স্বাভাবিক জগৎ, জীবন, পাপ, কলুষতা থেকে দূরে এক নির্জন তপোবনে ব্রহ্মত্বের সাধনায় নিমগ্ন রেখেছেন। আজন্ম পিতার আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত ঋষ্যশৃঙ্গকে বিভাণ্ডক অপাপচেতন রাখার জন্য নারী-পুরুষের ভেদাভেদের শিক্ষা দেননি। পুত্রকে সিদ্ধ পুরুষে পরিণত

করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে পিতা সম্পর্কে ঋষ্যশৃঙ্গ নিজে যা অভিব্যক্ত করে তাতে তার তপস্যায় পিতার দাপট ও কর্তৃত্ব পরায়ণতা চিহ্নিত হয়েছে। আবার পিতার সঙ্গে তাঁর মনোভাবের সাধারণ পার্থক্যটিও ফুটে উঠেছে—"...তিনি বলেন, ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বজনের অধিগম্য নয়; ...কিন্তু আমি ভাবি এমন কোন প্রাণী আছে, যে আনন্দিত হতে না চায়? আর আনন্দ যার লক্ষ, সে কি ব্রহ্মকেই আকাঙ্ক্ষা করে না?" বিভাণ্ডকের অবর্তমানে ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীর কাছ থেকে প্রথম নারীর আস্বাদ পেলে এবং পিতাকে তা জানালে বিভাণ্ডকের চক্ষু রোষ রক্তিম হয়ে উঠেছে, কেঁপে উঠেছে তাঁর পিতৃত্বের আসন। তিনি বলেছেন—"ব্যর্থ। আমার সব সতর্কতা ব্যর্থ।" ব্রহ্মত্ব ছাড়া অন্য কিছুতে পুত্রের কৌতূহল দেখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বিভাণ্ডকের পিতৃহৃদয়। তিনি নারীকে 'উপযোগিতামাত্র' বলে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন পুত্রের মন। এই সূত্রেই তিনি শুনিয়েছেন ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মরহস্য। তাতে আমরা জানতে পারি যে বিন্ধ্যাচলের সানুদেশে তপস্যার সময় আকাশপথে উর্বশীকে দেখে কিংবা মেস ও রৌদ্রালোকে দৃষ্টিভ্রান্তি অথবা গুপ্ত কামনার ফলে বিভাণ্ডকের চিত্তবিকার দুঃসহ হলে তিনি অরণ্যে এক কিরাত যুবতীকে গ্রহণ করেন। যার ফলস্বরূপ ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। এরপর তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করে স্খলন দোষমুক্ত হন এবং অবিলম্বে স্ত্রী সম্পর্কে আগ্রহ হারান। তিনি পুত্রকে নারীর এই মোহিনী জাল থেকে দূরে রাখার জন্য আরও বলেন—"নারী মাতা, তাই প্রয়োজনীয়; কিন্তু প্রাণীর পক্ষে সর্পাঘাত যেমন, তপস্বীর পক্ষে নারী তেমনি মারাত্মক।" পুত্রকে নিজ স্নেহবৃত্তের মধ্যে আগলে রাখার অক্লান্ত প্রচেষ্টা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, পিতা বিভাণ্ডকের পরিসরকে অতিক্রম করে যায় ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ রাজপ্রাসাদে উপনীত হলে বিভাণ্ডক সেখানে থেকেও তাকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। এখানে পুত্রের ব্রহ্মত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও পিতার অধিকার বোধ—এমনকি অঙ্গরাজ্যের দুর্দশায় দয়া পরবশ হয়ে তিনি একবৎসর কাল পুত্রহীন একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে বৎসরান্তে আবার পুত্রের কাছে পিতৃহৃদয়ের আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছেন ব্যক্ত করেছেন তাঁর দূরদৃষ্টি, স্বপ্ন দেখিয়েছেন মন্ত্রের স্রষ্টা হবার, জানিয়েছেন তাঁর বিরহকাতরতা। পরিবর্তে তিনি পেয়েছেন পুত্রের ভর্ৎসনা। কিন্তু 'পিতৃহৃদয় সহজে হার মানেনি। পুত্রের শেষ সিদ্ধান্তে তৃপ্ত হয়ে পুত্রের অনুগামীও হতে চেয়েছেন তিনি; গ্রহণ করতে চেয়েছেন পুত্রের শিষ্যত্ব, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন আশ্রমে। "আমি তোমারই অনুগামী হতে চাই। আমাকে তোমার শিষ্য করে নাও।"—বিভাণ্ডকের এই উক্তির মধ্যে পিতৃ-হৃদয়ের চিরন্তন হাহাকার ও অধিকার হারানোর বেদনা ফুটে উঠেছে। নাটকের শেষে ঋষ্যশৃঙ্গ রিক্ততা, শূন্যতা ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পুনঃসৃষ্টির দিকে, পরম ঈশ্বরের আলোর দিকে একাকী যাত্রা করেছে। বিভাণ্ডককে একাকী রিক্ত হস্তে আশ্রমে ফিরতে হয়েছে, পরাজয় ঘটেছে তাঁর পিতৃহৃদয়ের।

বিভাণ্ডকের পিতৃত্বের পাশাপাশি লোলাপাঙ্গীর মাতৃত্বের পরিচয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লোলাপাঙ্গী তার একমাত্র কন্যা তরঙ্গিনীকে চৌষট্টি কলা রতিশাস্ত্র, শিল্পকলা, সাজসজ্জা, রূপ, স্বাস্থ্য, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাকে বারাঙ্গনাদের মধ্যমণি করে তুলেছে। বিভাণ্ডকের মতো সেও আপন সন্তানের শিক্ষাগুরুর ভূমিকা পালন

করেছে। রাজমন্ত্রীর কাছে সন্তানের পারঙ্গমতার যে পরিচয় সে তুলে ধরেছে তাতে তাদের বারাঙ্গনা ধর্ম ও দেহ ব্যাবসার বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। অর্থের বিনিময়ে তারা যে-কোনো পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে পারে, কন্যাকেও সে সেই শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের নাম শুনে ভীত হয়েছে তার মাতৃহৃদয়। তরঙ্গিনীর অভিশপ্ত হওয়ার, নিজের আশ্রয়চ্যুত হওয়ার কথা ভেবে আঁতকে উঠেছে সে, অবশেষে তাঁর বাস্তববুদ্ধিতে পারিশ্রমিকের মাত্রা বৃদ্ধি করে তরঙ্গিনীকে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে প্রেরণ করতে রাজি হয়েছে লোলাপাঙ্গী, কন্যার মনে জাগিয়েছে উৎসাহ চোখের মনে রচনা করেছে বিজয়িনী হবার স্বপ্ন—"তুই বিজয়িনী হবি, যশস্বিনী হবি, ইতিহাসে লেখা হবে তোর আখ্যান...।" কিন্তু এই তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে মিলনের পর ভাবান্তরিত হলে, দেহজ প্রেম থেকে দেহান্তরিত প্রেমে তার উত্তোরণ ঘটলে মাতৃহৃদয়ের সঙ্গে তরঙ্গিনীর ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি রোম্যান্টিক প্রেম তরঙ্গিনীকে তার স্বাভাবিক জীবন ও ধর্মচ্যুত করেছে, সরিয়ে এনেছে মাতৃস্নেহের বৃত্ত থেকেও। তরঙ্গিনীকে পাণ্ডুর, মুমূর্ষু, উন্মনা দেখে চিন্তিত হয়েছে লোলাপাঙ্গী, জেগে উঠছে মাতৃব্যাকুলতা। অর্থ, বৈভব, নাম যশের মোহজাল বিস্তার করেছে সে তরঙ্গিনীর সামনে, অন্যান্য বারাঙ্গনাদের কথা বলে তার মনে ঈর্শা জাগিয়ে তুলেছে। সেও বিভাণ্ডকের মতো সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদৃষ্টির কথা জানিয়েছে—"...তুই পারিস জ্যোতির্ময়ী সতী হতে, কিংবা হতে পারিস বারমুখীদের মুকুটমণি।" এবং বলেছে তরঙ্গিনীর পিতার কথা যে, এক ঈর্ষাপরায়ণ, উদার, অকৃতদার পুরুষের ঔরসে তরঙ্গিনীর জন্ম যে তরঙ্গিনীর জন্মের পর বাণিজ্যে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। লোলাপাঙ্গী তরঙ্গিনীকে ধর্মের ভয়, দর্পহারী মধুসূদনের ভয় দেখিয়েছে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে বারাঙ্গনার স্বাভাবিক জীবনে। তাকেও হতে হয়েছে সন্তানের কটুবাক্যের সম্মুখীন। তরঙ্গিনী তার চোখের লোভের উগ্র পলকের কথা বললে লোলাপাঙ্গী বলেছে—"লোভ নয়, যাহা—স্নেহ, মাতৃস্নেহ, তুই আমাকে যা ইচ্ছে হয় বল, কিন্তু আমি তো চাই তোর মঙ্গল হোক।"—লোলাপাঙ্গীর এই সংলাপে চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা ও মঙ্গল ইচ্ছা ফুটে ওঠে।

তরঙ্গিনীর ভাবান্তর তার মনে বিভিন্ন আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রকেতুকে সে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করেছে আবার ছুটে গেছে যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গের কাছেও। যুবরাজের কাছে তুলে ধরেছে কন্যার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা তাঁকে শাসন করতে বলেছে। কিন্তু তারাও সমস্ত চেষ্টা বিফলে গেছে। তরঙ্গিনী বেরিয়ে পড়েছে অজানা অনন্তের পথে। শুধুমাত্র কন্যাকে কাছে পাওয়ার জন্য কন্যার সঙ্গে সব ত্যাগ দিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেও সে রাজি হয়েছে। কিন্তু তার মাতৃহৃদয়কেও শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভবিতব্যের কাছে হার মানতে হয়েছে।

নাটকে পিতা বিভাণ্ডক এবং মাতা লোলাপাঙ্গী উভয়ের মধ্যেই অধিকারবোধের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। উভয়ের স্নেহব্যাকুলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা, ফলে সন্তানেরা এদের কাছে হয়ে উঠেছে প্রতিস্পর্ধী। উভয়েই চেয়েছে স্নেহ দিয়ে শাসন দিয়ে সন্তানকে বেঁধে রাখতে কিন্তু তা না পারায় হাহাকার করে উঠেছে পরাজয়ের বেদনায়। ঋষ্যশৃঙ্গ শূন্যের মধ্যে পূর্ণের সাধনায় ডুব দিয়েছে আর তরঙ্গিনী নিজেকে পূর্ণের যোগ্য করে তুলতে যাত্রা করেছে।

নাটকের শেষে পিতা ও মাতা উভয়েই নিজ ধর্মে ফিরে এসেছে বিভাণ্ডক তাঁর সাধনায় রত হয়েছেন এবং লোলাপাঙ্গী নিজবৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছে। তাই বিপরীত পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডায়মান থেকেও এরা সন্তান বাৎসল্যে সমতুল্য।

পাঁচ

সাহিত্যে বা শিল্পে নামকরণ সংক্ষিপ্ত, সংকেতধর্মী। নামকরণের মধ্য দিয়ে পাঠক সেই মর্মে বা বিষয়ে প্রবেশ করে নাটক বা গল্পের মূল কাহিনি কী? নামকরণ প্রধানত দুইভাবে হয়ে থাকে। প্রথমত কেন্দ্রীয় চরিত্র অবলম্বনে অর্থাৎ যাকে বা যাদেরকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়। আবার কাহিনির ভাবানুসারে নামকরণ হয়ে থাকে, সে নাম নাটক প্রভৃতির মূলভাবকে ব্যঞ্জিত করে। যেটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখি। কাব্যে উপেক্ষিতায় তিনি বলেছেন নামকে যারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাদের দলের নই। অর্থাৎ নামকরণ এমন হওয়া দরকার যার থেকে সৃষ্টি কর্মের চেহারা এক মুহূর্তে পেয়ে যায় রসভোক্তা।

বুদ্ধদেব বসুর **'তপস্বী তরঙ্গিনী'** কাব্যনাট্য নামকরণ দেখে বোঝা যায় এটি চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ। কাব্যনাট্যে কবিতা ও নাটক একই সৃষ্টিশীল কর্মের দুটি ভিন্ন উপাদানমাত্র এরা পরস্পর সহযোগিতায় একটি সমগ্র শিল্পরূপ কাব্যনাট্যের সৃষ্টি করে। তপস্বী ও তরঙ্গিনীকে বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্য না বললেও অনেকেই এটিকে কাব্যনাট্য বলেছেন। এই নাটকে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও বারাঙ্গনা তরঙ্গিনীর জীবনের ঘটনাবর্ত আবর্তিত হয়েছে। এখানে অন্যান্য চরিত্র থাকলেও তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীই প্রধান। এই দুটি চরিত্র পৌরাণিক হলেও নাট্যকারের মতে, 'মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন'।

কাহিনি বিশ্লেষণে আমরা দেখি লোকচক্ষে যা নিন্দনীয় অর্থাৎ যে-কোনো নিন্দনীয়, তার প্রভাবে দুইজন নরনারী পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল। এই নিষ্ক্রান্তির উন্মেষিত চেতনার ফলশ্রুতি, যা প্রকারান্তরে বিষাদমাখা। নাট্যকার এই উদ্বর্তন দেখিয়েছেন। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বিচিত্র নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, শাণিত কাব্যময় ভাষা প্রয়োগে। তাই নাট্যকার যথার্থই বলেছেন তার তপস্বী ও তরঙ্গিনী শিল্পিত। এই নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রী তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী নানাকারণে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব বসু তার নিজস্ব চিন্তায় ও মৌলিক কল্পনায় তাঁর নাটকের কাহিনি বিন্যাস করেছেন যে তাঁর কবিতা ও উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। কাম থেকে পুণ্যের পথে উদ্বর্তন এই নাটকের মূল বিষয়।

তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকে তরঙ্গিনী রাজমন্ত্রীর নির্দেশে নিযুক্ত হয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজপুরীতে আনয়নের জন্য। শুধু তাই নয়? তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন বদ্ধপরিকর ব্রহ্মচারী। তাই তাঁকে কামাতুর অবস্থায় রাজধানী আসতে হয়েছিল। রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হবে। এই পর্যন্ত তরঙ্গিনী পরম আন্তরিকতায় ও নৈপুণ্যে তার কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু তারপরে দেখা গেছে তরঙ্গিনীর ভাবান্তর। লোলাপাঙ্গী অবাক হয় মেয়ের ঔদাসীন্যে, নিঃস্তব্ধতায়। কেন-না বারাঙ্গনাদের অনুরাগ অভিমান ও মনোবেদনা থাকতে নেই। অথচ তরঙ্গিনীর মনেই জেনেছে বেদনা। অহরহ সে দেখতে চায় সেই মুখ, প্রথম দর্শনের শিহরণে

যে মুখ বলেছিল, 'তাপস তুমি কে? কোন স্বর্গের দূত? কোন ছদ্মবেশী দেবতা?' সেই সুখ ঋষ্যশৃঙ্গের। সেই বিস্মিত জিজ্ঞাসার মুহূর্তটিকে তরঙ্গিনী কোনোক্রমে ভুলতে পারে না। সেই মুহূর্তে স্মৃতি তাকে নিরন্তর ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে।

নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শান্তার পূর্ব প্রণয়ী অংশুমান যখন তার মনের বাসনা ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে ব্যক্ত করে তখন এক বিষণ্ণ করুণ মুহূর্তে মঞ্চে ঘটে তরঙ্গিনীর আবির্ভাব এবং সে বলে 'আমার আর সহ্য হলো না। আমি তোমাকে আর একবার দেখতে এলাম। আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?' বিবাহিত ঋষ্যশৃঙ্গ এই অবস্থায় সামাজিকতার খাতিরে যা করণীয়, ঋষ্যশৃঙ্গ তা করলেন না, তিনি বললেন "—আমি সকলের সামনে বলেছি, এই যুবতী আমার ঈপ্সিতা। —আমি জানতাম না কাকে নারী বলে, আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিল।" শান্তাকে পেয়েও তার মনে অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তি নিয়ে মিথ্যা ছলনা তার ভালো লাগে না। কেন-না অন্ধকারে লুপ্ত হয় না স্মৃতি। তাই স্ত্রী-পুত্র, রাজ ঐশ্বর্য দান করে সে বিদায় নেয়। পরিশেষে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী বিপরীত পথে বেরিয়ে পড়লেন, যে পথে কেউ কাউকে দেখবেন না। হয়তো দেখা হবে জন্মজন্মান্তরে। তপস্বী ও তরঙ্গিনী চলে গেছে রিক্ততা শূন্যতার পথে। যদিও নাটক এখানে শেষ হয়নি।

কাহিনি বিশ্লেষণে আমরা দেখি তপস্বী ও তরঙ্গিনীর পরিবর্তনই বা ভাবান্তরই নাটককে গতিদান করেছে। তপস্বী শব্দের অর্থ যিনি তপস্যা করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্যায় নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত করেছিল। ইহলোক সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। তাই তরঙ্গিনীর ছলনা সে বুঝতে পারেনি। আর তরঙ্গিনী শব্দের অর্থ প্রবাহিত স্রোতাস্বিনী। প্রবাহিত জলরাশি যেমন সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গাকে ভানিয়ে নিয়ে যায় জীবনের পথে। সে তপস্বী পিতা বিভাণ্ডকের কাছে তার অজানা জিনিস জানতে চায় যা সে এতদিন জানত না। অর্থাৎ তরঙ্গিনী নতুন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে। নাট্যকাহিনি এই কথাই বলে।

পৌরাণিক চরিত্র হলেও চরিত্র দুটি আধুনিকভাবে সাজিয়েছেন নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু। যেহেতু তিনি একজন প্রথম শ্রেণির আধুনিক কবি। এখানে মূল বা প্রধান চরিত্র দুটি জীবনের উপান্তে এসে কিছুই পায় না, তারা এক শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়। তবে ঋষ্যশৃঙ্গ পার্থিব জগতে প্রবেশ করে পিতা বিভাণ্ডকে যুক্তিতে পরাজিত করে। তাকে পৌরুষমণ্ডিত বলে মনে হয়। দোষে গুণে ভরা এই চরিত্র দোদুল্যমান ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। শান্তা, বিভাণ্ডক, অংশুমান, চঞ্চলাপাঙ্গী প্রভৃতি চরিত্রগুলি মূলত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনীর' দ্বারা ব্যাপকতা পেয়েছে, তাদের কেন্দ্র করেই বারবার এসেছে। অতএব নাটকের নামকরণ-এ এই চরিত্র দুটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ছয়

বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিনী কাব্যনাট্যটি পৌরাণিক চরিত্রকে অবলম্বন করে পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে নির্মিত, কিন্তু আধুনিকতায় পরিপূর্ণ। নাট্যকার ভূমিকা অংশে স্বয়ং বলেছেন— "একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে

সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা।—আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমার সমকালীন।" রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি একসূত্রে গ্রথিত এই নাটকে।

বুদ্ধদেব বসুর পরিচয় একজন আধুনিক কবি হিসাবে। তাঁর শিল্পজীবনের আলেচনায় প্রথমত এই কথা মনে হয় যে, তাঁর মজ্জাগত ঐতিহ্যবোধ, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির অনুশীলন যুক্ত হয়ে তার সাহিত্য সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব এবং পাশ্চাত্য জীবনধর্মের প্রভাব তাঁর শিল্পী চেতনায় শুভঙ্কর হয়েছিল। তিনি তাঁর অর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে তার স্বদেশের ঐতিহ্য প্রসূত সংস্কার মুক্ত জীবনদর্শন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তার রচনায় আধুনিক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি আমরা পাই রামায়ণে, মহাভারতে ও দুটি জাতক গ্রন্থে। যদিও কাহিনিগত পার্থক্য খুবই কম। বিভাণ্ডক মুনি ও শাপগ্রস্তা হরিণীরূপা আদিত্যকন্যা স্বর্ণমুখীর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ যৌবনাবধি পিতা ছাড়া সে কাউকে প্রত্যক্ষ করেনি। তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে দিন কাটিয়েছেন। অন্যদিকে অঙ্গারাজ লোমপাদের আচরণে ব্রাহ্মণরা দেশ ছেড়ে চলে যান এবং তাঁদের নির্বন্ধে ইন্দ্র বৃষ্টি পড়া সেখানে বন্ধ করে দেন। অনুতপ্ত লোমপাদ ব্রাহ্মণদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন তারা বলেন ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য বিসর্জন দেওয়াতে পারলে অঙ্গাদেশ সুজলা সুফলা হবে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ বদ্ধপরিকর ব্রহ্মচারী। তাই রাজা পরমাসুন্দরী বারাঙ্গনাদের প্রেরণ করলেন এবং তাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গাদেশে এলেন ও অঙ্গাদেশ সুজলা-সুফলা হল। তারপর দশরথ কন্যা শান্তাকে বিবাহ করলেন ঋষ্যশৃঙ্গ এবং শান্তা পুত্রবর্তী হলে পিতার নির্দেশে ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমে যান।

এই পৌরাণিক কাহিনিকে বুদ্ধদেব বসু অনাহত রেখে সামান্য অদলবদল করেন। এই কাহিনিতে তাঁর মুখ্য ভাবনাটি ছিল লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভা দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল—নাটকটির মূল বিষয় হল এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকা বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটল; একই মুহূর্তে জেগে উঠল তরঙ্গিনীর হৃদয় ও ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয় লালসা। একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হল পতন আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করল রোম্যান্টিক প্রেম—যেভাবে রবীন্দ্রনাথের পতিতায় বর্ণিত আছে, সেইভাবেই রোম্যান্টিক প্রেম অর্থ হল কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল, অবস্থা নির্বিশেষে এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি যার প্রতীক পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্রিসটান এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা, তরঙ্গিনী সেই আবেশ আর কাটিয়ে উঠতে পারল না, তাই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গাকে দেখে প্রথমে নিরাশ হল সে এবারে যেন দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাটি উলটে গেল—অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গাই তরঙ্গিনীকে ভ্রষ্ট করতে আর তরঙ্গিনী খুঁজল ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে যেই স্বর্গ, যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখে ছিলেন এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ মুহূর্তেই ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা। পৌরাণিক হলেও নাটকের সমস্যা পুরাণ নয়, আধুনিক যন্ত্রণার কথা।

হৃদয়ের মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসা জেগে উঠলে বারাঙ্গনাও সে তার গ্লানিময় জীবনের ঊর্ধ্বে নিজের অন্তরের গভীরে আপন সত্তাকে পবিত্রতার প্রতিমারূপে অনুভব করে, এমন কাহিনির সন্ধান বিশ্বসাহিত্যে প্রাচনীকালেও পেয়েছি। যেমন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী। পৌরাণিক কাহিনি থেকে যেখানেই তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটক সরে গেছে, সেসব ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনিতে তরঙ্গিনীর প্রলোভনে ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য বিসর্জনের ব্যাপারটি সাধারণভাবে উল্লিখিত। প্রসঙ্গত তরঙ্গিনী ও লোলাপাঙ্গীর উল্লেখ পুরাণে নেই। যেমন নেই শান্তার প্রেমিক অংশুমান। প্রকৃতপক্ষে পুরাণের কাহিনি সম্পূর্ণরূপে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মাচারের একটি পরিশীলিত বিবরণ মাত্র। সেই কাহিনিকে বুদ্ধদেব দীর্ঘদিন ধরে নিজের মনের মধ্যে বিকশিত করে তুলেছিলেন। এই নাটকের মাধ্যমে সাজিয়ে গুছিয়ে শিল্পবস্তু করে তুললেন তখন স্বভাবতই তার মধ্যে অনেক সংযোজনের প্রয়োজন দেখা যায়, যার ফলে অংশুমানকে সৃষ্টি করা হল এবং সেই সঙ্গে শান্তা ও অংশুমানের উপকাহিনি গড়ে নাটকের প্লটকে জটিল করা হল এবং ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিনী, শান্তা ও অংশুমানের মানসিক টানাপোড়েন দেখানো হল। এমনকি সন্তানবতী শান্তাকে তার কৌমার্য ফিরানোয় অলৌকিকতার পরিবর্তে এ কালের সামাজিক জীবনচর্চার প্রতিফলনটি যেন বেশি গাঢ় রঙে অঙ্কিত বলে মনে হয়। তরঙ্গিনীকে ধরে না রাখতে পেরে চন্দ্রকেতু এবং লোলাপাঙ্গীর অংশীদায়িত্ব বণ্টন করে নেওয়ার মাধ্যমে দুজনে একত্রে দিন কাটানোর যে প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছে কাহিনির শেষে, সেটিও অত্যন্ত দুঃসাহসিক আধুনিকতা।

বুদ্ধদেবের তপস্বী আধুনিক মানসতায় সমৃদ্ধ। তার কাছে সংস্কার বাঁধন অগ্রাহ্য। তাই বিবাহ নাম শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে খারিজ করে। তবে মনোভাবের দিক থেকে যে স্বাধীন কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নন। তিনি তরঙ্গিনীর কাছে ভোগাকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রস্তাব দেননি। ফিরে যাননি পিতা বিভাণ্ডের কাছে। তিনি যে পথে গেছেন সে পথ রিক্ততা, শূন্যতার, এক নিদারুণ বিষাদ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সেই পথের প্রান্তে পৌঁছনোর জন্যে। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতার পটভূমিতে ঋষ্যশৃঙ্গ এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ। যা বুদ্ধদেবের প্রিয় বিষয়। বুদ্ধদেবের প্রায় নাটকে বিষাদবোধ বর্তমান। বুদ্ধদেবের কাছে আধুনিক কবি বোদলেয়ার, যাঁর কাব্যে তিনি শুনেছিলেন রিক্ততা ও শূন্যতার স্পন্দন যা আধ্যাত্মিকতার চেতনা জাগায়। তপস্বী ও তরঙ্গিনীতে তপস্বী চরিত্রের উদ্‌বর্তনে যে বিষাদবোধ কাজ করেছিল, তাতেও রয়েছে বোদলেয়রীয় আধ্যাত্মিক অন্বেষা।

রবীন্দ্রনাথের পর যথার্থ শিল্পিত নাট্যকার হিসাবে বুদ্ধদেব নরনারীর হৃদয় রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পতিতা কবিতায় সমাপ্তি পতিতার হৃদয় জ্বালাতে আর তপস্বী ও তরঙ্গিনীর পরিণতি আরও অনেক দূর গড়িয়ে গেছে, যেখানে রবীন্দ্র অনুষঙ্গ খুঁজে পাব না। বুদ্ধদেব বসু নিজস্ব চিন্তায় ও মৌলিক কল্পনায় নাট্যকার কাহিনি বিন্যাস করেছেন।

আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব বেদনা এবং বিশেষ করে এ যুগের ব্যক্তি মানুষের জীবনের রোম্যান্টিক আবেগ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। নরনারীর জীবনের রোম্যান্টিক আবেগ—

তারই বিবর্তন এবং উধ্বর্তনের যে কাহিনি—নাটকে তিনি রচনা করেছেন তা বিশেষভাবে আধুনিক যুগের সামগ্রী। তারই পরিবেশন তপস্বী ও তরঙ্গিনী। কামের প্রভাবে নায়ক-নায়িকার জীবনে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণামে প্রথমে প্রেম এবং পরে তাদের পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের যে রূপ তিনি প্রকাশ করেছেন—তা একান্তভাবে স্বয়ং নাট্যকার ভাবিত এবং বিশ শতকীয় ব্যক্তি মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও মুক্তিকামনার স্মারক। সুতরাং পৌরাণিক পটভূমিতে ও রচিত হলেও তপস্বী ও তরঙ্গিনী সম্পূর্ণভাবে আধুনিক নাটক।

সাত

এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেন এই নাটক বিশেষভাবে ভাষা-নির্ভর।

কবিতা হোক বা গল্প বা নাটক যাই হোক সবই ভাষা-নির্ভর। সাহিত্য তখনই সত্য ফলন তা প্রকাশিত। আর সেই প্রকারে জন্য নির্ভর করতে হয় ভাষার উপর। সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের সমন্বয় ঘটে ভাষা থেকে। কাব্যনাট্য আখ্যা দেবার একটা প্রবণতা আছে তা হল সংলাপাত্মক কবিতামাত্রই কাব্যনাট্য। তবে পদ্য সংলাপে রচিত নাটক মাত্রই কাব্যনাটক তা নয়। তবে আধুনিক কাব্যনাটক কাব্য ভাষায় নয়, কাব্যিক গদ্য ভাষায় লেখা। এলিয়টের ধারণা অনুযায়ী কবিতাকে স্বপ্নাহার রেখে তাঁকে নাট্যমঞ্চের উপযোগিতা দান করতে হবে। কাব্যনাটককে বিশ শতকের একদল কবি নাট্যকার বুঝে ছিল নতুন কালের কাব্যনাটককে পুরানো পথ বর্জন করে বিষয়বস্তু, বিন্যাসভঙ্গিতে সর্বোপরি ভাষাপ্রয়োগে আধুনিক কালে কাছে পৌঁছাতে হয়, তাহলে দেখা গেল ভাষাও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে।

বুদ্ধদেব বসু একজন আধুনিক কবি। তিনি তার 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'তে মূলত গদ্য ভাষা ব্যবহারই করেছেন। কিন্তু এই নাটক অনেকটা কবিত্বমণ্ডিত। পুরাণভিত্তিক এই নাটকটির মধ্যে আধুনিক হৃদয়ানুভূতিকে কবি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর যা কিছু সঞ্চয় তা মূলত pose style-এর মতো। তিনি এই নাটকে মূলত বাতাবরণগুলি পৌরাণিকভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের ভাষারীতিও আমরা এখানে দেখি। ধ্রুপদী ভাষা, তৎসম আভিধানিক ভাষা ব্যবহারও ব্যবহার করেছেন তপস্বী ও তরঙ্গিনীতে। আমরা আমাদের জীবনে যে আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করি তা নাট্যকার এখানে পরিহার করেছেন।

নাটকটি পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে গ্রথিত হলেও এর সমস্যাটা সম্পূর্ণ আধুনিক। এখানে আধুনিকতা বলতে নাটকটিকে মনস্তাত্ত্বিকতায় নাট্যকার আধুনিক করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় 'একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমত করে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা সাহিত্য এ ধরনের রচনায় অন্ধভাগে পুরাণের অনুসরণ চলে না। কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদের সমকালীন। এই কাব্যনাটকে তিনি আধুনিক কালের বেদনাকে নতুন ব্যঞ্জনা প্রতীকী তাৎপর্য দান করেছেন, তেমনি আধুনিক মানুষের রিক্ত বিচ্ছিন্ন শূন্য অবস্থানটিকে দ্যোতিত করেছেন। গাঁয়ের মেয়েদের সংগীত এলিয়টের মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল নাটকের কোরাস সংগীতের দ্বারা

যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলেন। কৌশল ও ছলনা প্রয়োগের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কামোদ্রেক করে তার তপস্বী সত্তাকে জয় করলেও স্বধর্মচ্যুত হয়ে সে নিজেও পরাজিত হয়েছে।

তরঙ্গিনীকে প্রথম দেখে ঋষিকুমারের বিস্ময় অসাধারণ কাব্যময় সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। 'সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ, যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহিত গ্রীবাও কটি যেন ঋকছন্দে আন্দোলিত, আনন্দ আপনার নয়নে আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধর বিশ্বকরুণার বিকিরণ।' এই উক্তি তরঙ্গিনীর অন্তসংঘাতকে ঘনীভূত করেছিল। আবার কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এ দুয়ের সমীকরণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ কাহিনিতে অন্তর্ভুক্ত এক তপস্বী ও বারাঙ্গনা জীবনের দেহকামনার উত্তরণ—যেখানে বৃষ্টি নামার পূর্ব মুহূর্তে দেহ মিলনের বর্ণনা প্রতীকী তাৎপর্য এবং কাব্য সৌন্দর্যে এ নাটকে ভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।

নারী ও পুরুষের চিত্তজাগরণের ছবিটি ফুটে উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে।

"নারী, নারী, নারী, নূতন নাম, নূতন রূপ, নূতন ভাষা, নূতন এক জগৎ। মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী, নূতন জপমন্ত্র আমার। আমি অস্নাত থাকবো। তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে। আমি অভুক্ত থাকবে,—আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করব তোমাকে।"

এই অঙ্কের শেষে দেখি নায়ক-নায়িকা উভয়ের পরিবর্তন, উভয়ের মিলনে এই অঙ্কের যবনিকা পতন ঘটেছে, এখানে একই কর্মের দুরকম প্রতিক্রিয়া। পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট দুজনেই কিন্তু মিলনাকাঙ্ক্ষা, হৃদয়াবেগ দুজনের মধ্যে পৃথকভাবে আলোড়িত হয়েও। অনভিজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনে কামনার প্রথম নারী তরঙ্গিনী তায় অভিজ্ঞা তরঙ্গিনীর জীবনে প্রেম স্বপ্নের পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ, মিলনস্থলে দাঁড়িয়েও দুজনে পৃথক। আবেগ ব্যঞ্জনায় বৈপরীত্য উভয়ের সংলাপ নাট্যকার অপূর্ব কাব্যমণ্ডিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী,

তরঙ্গিনী। কুমার আমি তোমার সেবিকা,

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী,

তরঙ্গিনী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী। আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তোমার শোণিতে তুমি অগ্নি।

তরঙ্গিনী। আমার সুন্দর তুমি,

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি

*   *   *   *   *

তরঙ্গিনী। এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।

—এ সংলাপে ঋষ্যশৃঙ্গার জ্বালা যেমন প্রবল তেমনি তরঙ্গিনী প্রেমোপলব্ধিও প্রগাঢ়।

ফলে একই ঘটনায় উভয়ের বিপরীত কথা। একজন সরলতা থেকে কামে উত্তীর্ণ অন্যজন্য কাম থেকে প্রেম।

চতুর্থ অঙ্কে দেখি ঋষ্যশৃঙ্গ ও অংশুমানের সংলাপ

ঋষ্যশৃঙ্গ। এবার আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করুন।

অংশুমান। আমি আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসিনি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। সাধু। আপনি দেখছি অসামান্য পুরুষ।

অংশুমান। আমি সত্যবাদী। আপনাকে একটি মর্মান্তিক কথা বলতে এসেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। মর্মান্তিক তো হলে নির্ভয়ে বলুন। আমি এক বৎসর যাবৎ শুনেছি—শুধু স্তুতি, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন। এই ঘৃতাম্ব ভোজে আমার অগ্নি মুক্তি হয়েছে। আপনি তা প্রশমিত করুন।

অংশুমান। অভিনন্দনে আপনার কোনো অধিকার নেই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার দুর্ভাগ্য—আপনি ছাড়া কেউ তা বোঝে না।

অংশুমান। (তাচ্ছিল্যসুরে) আবার। আপনি ভুল করেছেন, আমি পরাজিত কিন্তু আপনার মতো লোল জিহবা কামার্ত নই। আপনি তপস্বী ছিলেন? নিজেকে আপনার ক্লেদাক্ত মনে হয় না।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনার চোখের ঈর্ষা দেখে মনে হচ্ছে আপনি ওই ক্লেদের অভাবেই কাতর?

এখানে গদ্যধর্মী উক্তি প্রত্যুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের আঘাতে কবিত্বার আভা বিচ্ছুরিত অথচ তা বাস্তব জগৎ থেকে আমাদের স্বপ্নের জগতে সরিয়ে নিয়ে যায় না।

শেলি যেমন প্রমেথিউস-এর মতো বুদ্ধদেব বসুও তেমনি তপস্বীও তরঙ্গিনীর মতো নিজ জীবন অভিজ্ঞতা আর্কিটাইপ খুঁজে পেয়েছেন। পুরাণ ভাবনাকে কাম ও প্রেমের মধ্যে কোথায় কোনো বিরোধ না দেখিয়ে আধুনিক অভিজ্ঞতার আলোক সঞ্চারিত কালে।

১ম দূরের সংলাপে 'আমাদের দিন, রাত্রি, স্বাস্থ্য, জীবন সবই মহারাজের সম্পত্তি। তাঁর আদেশে ইদানীং আমরা বিদ্যুৎগতি অশ্বে ভ্রাম্যমাণ ছিলুম বঙ্গদেশে কামরূপে, কলিঙ্গে, সমুদ্রতীর তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত। দিনমান মার্তণ্ডতাপে দগ্ধ হয়ে রাত্রে মশক বংশকে পুষ্টি দান করেছি। বিশ্রামের সময় পাইনি; অশ্বে যেন কষাঘাত, তেমনি ছিল আমাদের পক্ষে কর্তব্যবোধ।' এই মাত্রিক ভাষাটাও অচেতন অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধদেব। যা এই সংলাপে একটি আদর্শায়িত কাব্যভঙ্গিমার চেহারা। যা সচরাচর দেখা যায় না। যমক উৎপ্রেক্ষার যে ব্যবস্থায় অলংকারধর্মিতা এই নাটকে তা ঐশ্বর্যমণ্ডিত বলে মনে হয়।

এখানে গদ্যের ন্যায়সংগত ধরনকে বজায় রেখেও বুদ্ধদেব গূঢ় উপলব্ধির জগৎকে কবিতার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর করে তুলেছেন। গদ্য ভাষার কবিতার শব্দবন্ধ ও অলংকার সৃজনে পঙ্‌ক্তি বিভাগের পদ্ধতিতে, অত্যুক্তি ও বক্রোক্তির অলংকরণে, তৎসম ও কথা শব্দের স্বচ্ছন্দ মিলনে, শব্দের বিস্ময়কর শৃঙ্খলা ও পারমর্য রক্ষায়, নাটকীয় দ্রুততা আনার জন্যে প্রয়োজন বোধে কথ্য ভাষার ভাণ্ডার থেকে ক্রিয়াপদ ও নানা শব্দ নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এমনই কাব্যবিভা সঞ্চারিত

এই নাটকে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। নাটকে নানা বৃত্তির মানুষ রয়েছে। নাটকের নাম তপস্বী ও তরঙ্গিনী। এরা পেশায় ভিন্ন। তা ছাড়া সামাজিক অংশে বৃত্তির বড়ো। তরঙ্গিনী সমাজে আলাদা, ভাব বৃত্তিও আলাদা তার ভাষাও আলাদা কেন না সে বারাঙ্গনা। আমরা দেখি শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী চর্চার ভাষা যেমন সাজানো-গোছানো হয় তেমনি কায় ক্লেশে দিনযাপন করে যে ব্যক্তি তার ভাষা ততটা সাজানো-গোছানো নয় অর্থাৎ আলাদা। সে রাজা, প্রজা, বারবণিতা সকলের মুখেই নাট্যকার একইরকম classic ভাষা ব্যবহার করেছেন। ফলে কাব্য ভাষা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। লোকধর্ম ও রাজধর্ম যেমন এক নয় তেমনি তাদের ভাষাও এক নয়। এই নাটকে কাব্যের মতো গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ ঘটেছে।

---

১. বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার: বুদ্ধদেব বসুর "তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা"/কমললেশ চট্টোপাধ্যায়
২. বাংলা কাব্যনাট্য/উত্তম দাশ
৩. আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য: উদ্ভব ও বিকাশ/কণিকা সাহা
৪. নাটক কাব্যনাটক নিজস্ব ও বিকাশ/তরুণ মুখোপাধ্যায়
৫. উত্তরাধিকার: বুদ্ধদেব বসুর সংখ্যা
৬. চান্দ্রমাস: ঐ
৭. জলাক: ঐ

কালসন্ধ্যা

বাংলা নাটকে 'কাব্যনাট্য' ও 'নাট্যকাব্য' এই দুটি গুণগত নাট্যপ্রকরণ নিয়ে নানাবিরোধী সমালোচনা হয়েছে। তথাপি নাটকের শিল্পরস বিচারে ও তত্ত্বমুখীন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি অভিধার-ই স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। বুদ্ধদেব বসু রচিত মোট নাটকগুলির মধ্যে ছখানি কাব্যনাট্যের মধ্যে আবার চারখানি সম্পূর্ণভাবে কাব্য ও নাটকের সমন্বিত রূপের মাধ্যমে সম্পূর্ণত কাব্যনাট্যের সিদ্ধি অর্জন করেছে। এই চারটি কাব্যনাট্য হল 'কালসন্ধ্যা' 'অনাম্নী অঙ্গণা', 'প্রথম পার্থ', 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' এবং 'সংক্রান্তি'। এই কাব্যনাট্য গুলির মধ্যে মহাভারতের কাহিনি নাটকীয় স্বতন্ত্র পরিবেশের আধুনিকতায় ও শিল্পরসের নিপুণতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসু এই কাব্য-নাট্যগুলিতে প্রচলিত কাব্য নাট্যের সংজ্ঞানুযায়ী শিল্পরীতির শর্ত মেনে চলেছেন। এই শিল্পরীতির শর্তটি হল কাব্য-নাটক লিখতে গেলে কাব্য ও নাট্যের মধ্যে সংগতি সাধন করা প্রাথমিক কর্তব্য। যে নাটকে সংলাপ ছন্দে গাঁথা হয়েও নাট্যিক রসপরিণতির ইঙ্গিতবাহী—তার মধ্যে দিয়েই কাব্য-নাট্যের প্রকৃত স্বরূপধর্ম সম্পূর্ণ রূপে নির্ধারিত হয় না। কাজেই দেখা গেল কাব্যনাট্য এক দুরূহ নাট্যকর্ম। সেই রচনাই কাব্যনাট্য রূপে চিহ্নিত, যা স্বরূপত নাটকীয়, কিন্তু যার প্রকাশরূপের মধ্যে বিষয়বস্তু, সংলাপ ও নাট্যিক পরিণতির মধ্যে কাব্যময় রসের দিকটি বড়ো হয়ে ওঠে। এই কাব্যময়তার মাধ্যমে সমগ্র জীবনের স্বরূপ মুহূর্ত মধ্যে ব্যাঞ্জিত হয়ে ওঠে।

নাট্য রচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কাব্যনাট্যকে জটিল প্রয়াস রূপে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে কাব্যময়তার মাধ্যমে জীবনের কোণে জটিল অনুভূতি, জীবনতত্ত্ব, বা বিশেষ মুহূর্তের দ্বন্দ্বময় ভাবকে কাব্যনাট্যের মধ্যে বিবৃত করা যায়। কাব্যনাট্য গদ্যছন্দ প্রধান, না কাব্যপ্রধান—এ বিতর্কের সিদ্ধান্তেও একথা উচ্চারিত হতে পারে, গদ্য অনেকসময় 'লিরিক ইন প্রোস্' হয়ে ওঠে এবং তখন গদ্যের মধ্যেও কাব্যিক নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়। তবে একথা সমালোচক মহলে সামগ্রিকভাবেই স্বীকৃত হয়েছে যে, কাব্য নাট্যে জীবনের সামগ্রিক রূপ কাব্যিক আধারে ব্যক্ত হয়ে নাটকীয় দৃশ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত হবে। এই উদ্ঘাটনের পেছনে সংলাপের ভাষা পদ্যছন্দ বা গদ্যছন্দ যেভাবেই গ্রথিত হোক না কেন, উভয়রীতির আশ্রয়ের মধ্যে নাট্যধর্ম অবশ্যই থাকতে হবে।

ইংরেজ কবি ইয়েটস্ তাঁর কাব্যনাট্যে কবিতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই ইয়েটস্-এর কাব্য নাট্যের মূলভাব মাধ্যম হল প্রতীক বিদ্ধ ভাষায় জীবনানুভূতির রহস্যলোকের অনুসন্ধান। বলাবাহুল্য ইয়েট্সীয় সংলাপে কাব্যনাট্যে কাব্যিক স্পর্শ নাটকীয়তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। কাব্যনাট্যে প্রকাশরীতির দিকটিই মুখ্য। চরিত্রাশ্রয়ে প্রকাশরীতির মাধ্যমে দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটানোই বড়ো কথা। এক্ষেত্রে সার্থক হলে কাব্যনাট্যের পরিসরগত দীর্ঘত্ব বা মিতায়তনের প্রশ্নটি অপ্রধান হয়ে পড়ে। ইংরেজি কাব্যনাট্যে ইয়েটস এই রীতির অনুসরণ করে কাব্যনাট্যের

স্বরূপ প্রকৃতির মধ্যে নবতর ভাব এঁকেছেন।

কাব্যনাট্যের আর একটি উদ্দেশ্য হল অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে নাটকের দ্বন্দ্বের রসগত দিকটিকে পৌঁছে দেওয়া। বলাবাহুল্য এই জাতীয় বাহন হিসেবে পদ্যধর্মী গদ্য সংলাপ যেমন প্রযুক্ত হতে পারে, তেমনি আবার কাব্যিক সংলাপের নিরঙ্কুশ প্রয়োগও একমাত্র নিয়ন্ত্রী শক্তি হতে পারে। T. S. Eliot তাঁর কাব্যনাট্যের মাধ্যমে নাট্যশাখায় কাব্যনাট্যের যে স্বতন্ত্রভূমিকা নির্মাণ করেছিলেন—সে ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তিনি কাব্যনাট্যে গদ্যভাষা ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"The Poetic drama in prose more limited by poetic conventions as to what subject matter is poetics than is the poetic drama in verse."

আধুনিক কাব্যনাট্যকারদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে টি. এস. এলিয়টের পন্থানুসরণ করে পাশ্চাত্য বহু নাট্যকার—এমনকি বাঙালি নাট্যকারেরাও অনেকে এই সঙ্গে নাটকের ভাবপ্রকরণে ও রীতিগত আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নবযুগোচিত আধুনিকতা এনেছেন। ইয়েটস্ যেখানে তাঁর কাব্য নাট্যের সত্তাকে প্রকটিত করেছেন, সেখানে এলিয়ট কাব্যনাট্যের আশ্রয়ে তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে সমভাবে নাট্যকার সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি জীবনের বাস্তবরসকে অস্বীকার না করে, কাব্য ও নাট্যিক রসের সম্মিলনে বাস্তব জীবনরসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর সমগ্র কাব্যনাটকগুলিতে বিশেষত তাঁর 'কালসন্ধ্যা' নামক কাব্যনাট্যে ইয়েটস্ ও এলিয়ট উভয়ের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি নিজের কবিস্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে, রসপ্রমাতা সত্তাকে ও জীবনধর্মী কাব্যিক উপলব্ধিকে আবেগাশ্রিত ও মননধর্মী কাব্যিক ও নাট্যিক সংলাপে প্রয়োগ করেছেন।

আলোচ্য 'কালসন্ধ্যা'-য় ব্যক্ত হয়েছে সেই চরম সত্য, যা জীবনের পরিণতির কথা নিখুঁতভাবে জানিয়ে দেয়। বৃত্তাকারে জীবনের যে পরিবর্তন তা এত সত্য যে তার জন্য শোক ও অভিমান প্রকাশ মিথ্যা। ব্যাসদেবের মুখে উল্লিখিত হয়েছে এই সত্য, যা আদি বীজ। স্বয়ং কৃষ্ণ যিনি স্বয়ং এই সত্যের স্বরূপ, তিনি এক ব্যাধের বাণে নিহত হয়ে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন, এই সত্যই ঘটায় কালসন্ধ্যা। চারিদিকে যখন জাগে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ব্যভিচার তখন শৃঙ্খলাহীনতা মানুষের মনে জাগায় সন্দেহ, সংশয়, ক্রোধ, আর্ত, ক্লান্ত, অভিমানী নারী-পুরুষ পায় এই অপশাসন থেকে মুক্তি, অনিয়মের অবসান। কিন্তু 'কালসন্ধ্যা' জীবনের বৃত্ত পালটে দিচ্ছে, এই বোধ যতক্ষণ না তীব্র হচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে ততক্ষণ স্বাভাবিক সুশৃঙ্খল নরনারী শুধুই প্রতিকারের দাবি উচ্চারণ করে। কিন্তু যখনই বোঝে এসবই কালসন্ধ্যার আভাস, তখন নির্লিপ্তভাবে মেনে নেয়, নিতে বাধ্য হয় মহাপ্রস্থান। ব্যাসদেব তাই অর্জুনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন,—

> "এই সব কুশীলব—ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
> একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।"

কালসন্ধ্যার এই কাব্যময় বিষয়, বস্তুকে নাট্যকার অপূর্ব নাটকীয়তায় প্রকাশ করেছেন।

আলোচ্য কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের ভাব-ভাবনা, মানসিক অনুভূত সত্যের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, যা কাব্যনাট্যের আশ্রয়ে গাঢ়তর রস সৃষ্টি করেছে। বলাবাহুল্য এজন্য 'কালসন্ধ্যা' নাটকের সংলাপগুলির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবকে নমনীয়, স্থিতিস্থাপকতা গুণ যেমন সংলাপে প্রয়োগ করতে হয়েছে, তেমনি আবার বিপরীত নৈরাশ্যকর পরিবেশের মধ্যে ঐতিহ্যপন্থী জীবনচিন্তার প্রতিষ্ঠার কারণে ছন্দোচিন্তার মধ্যেও নানাজাতীয় বৈচিত্র্য আনতে হয়েছে। কাব্যনাটকে নিছক ব্যক্তিগত আবেগ থেকে কবিতাকে মুক্ত করে এনে তাকে বস্তুগত নাটকীয় পরিবেশের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে স্থাপন করা উচিত। 'কালসন্ধ্যা' নাটকে বুদ্ধদেব বসু এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটাননি। আধুনিক কাব্যচিন্তার একটি সক্ষম প্রকাশ হিসেবে কালসন্ধ্যা কাব্যনাট্যের মধ্যে সংশয়হীনভাবে চিরকালীন সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। আলোচ্য নাটক যদিও মহাভারতের এক বিশেষ সময় ও পর্বকে অবলম্বন করে রচিত, তথাপি মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেও বুদ্ধদেব এই কাব্যনাট্যে তাঁর কবি মনোজীবনের মহাকাব্যিক বিশালতা এনেছেন। নাটকীয়তারও কাব্যিক রসে নাটকখানির মানব-মানবী অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পরিণামে বিবর্তিত হয়ে কাব্যিক জীবনদর্শনকে নাট্যিক করে তুলেছে।

এ ছাড়াও কালসন্ধ্যা নাটকের আলম্বন বিভাব ও স্থায়ী রসের পরিণতি সন্ধান করলে লক্ষ করা যাবে, এখানে স্থায়ী ভাব হল 'নির্বেদ' এবং প্রায় ক্ষেত্রেই নাটকীয় রস হল করুণরস। তথাপি কবির প্রাজ্ঞ জীবন নিষ্ঠা এবং বস্তুধর্মী দৃষ্টিকোণ বিষাদ অতিক্রম করে চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষ নাটকীয় তাৎপর্যেও পৌঁছেছে। তাই কাব্যনাট্যখানির মধ্যে একই সঙ্গে কাব্যত্বের প্রাধান্যের মধ্যে দিয়ে আধুনিক দৃষ্টিকোণে নাট্যকার ভাবীকালের সত্য চেতনার উৎসকে উন্মোচিত করেছেন চরম নাট্যিক সম্ভাবনায়।

সংলাপ ব্যবহারের যথার্থতায় ও ছন্দ প্রয়োগের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আলোচ্য কাব্যনাট্যটি বুদ্ধদেবের যথার্থ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। 'কালসন্ধ্যায়' যে গদ্য ছন্দের সংলাপ ব্যবহার করেছেন তাতে যুগপৎলক্ষিত হবে চরিত্রগুলির গুরু ও লঘু উভয় মনোভাব। আবেগ, উৎকণ্ঠা ও বিস্ময় প্রকাশের সময় এই গদ্যছন্দ সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব সুরের স্পন্দন। নেপথ্যে সুরবিহ্বল কণ্ঠে সুরতাল ভ্রষ্ট গানের শব্দে ভীত চকিত সত্যভামা সুভদ্রাকে ডেকে বলেছিলেন—

> "শুনেছো? ...গান শুনেছো?
> নেই তাল, নেই মান, মদিরায় উদ্দাম
> পুরুষের, রমণীর কণ্ঠ! ...আবরণে নেই কৌলীন্য"

সত্যভামার এই উক্তি গ্রথিত হয়েছে এমন এক গদ্য ছন্দে, যা এক অখণ্ড প্রবহমানতায় ভরা।

নাটকে গদ্য ছন্দের সংলাপ প্রয়োগের প্রয়াস বাংলা নাট্যসাহিত্যে বহুদিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু এই প্রয়াসের তুঙ্গস্পর্শী সার্থকতা বুদ্ধদেবের পূর্বে কোনো নাট্যকার দেখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। অর্জুন যখন ব্যাসদেবকে সুগভীর নিশ্বাস পতনের সঙ্গে বলেন,—

'ভাষা নেই, পিতামহ, কণ্ঠ নেই করি উচ্চারণ!
আমি আজ ঈর্ষা করি কর্ণ, দুর্যোধনে
মৃত্তিকায় বুক চেপে যাঁরা
নিঃসৃত রক্তের বেগে পুণ্যধামে চলে গিয়েছেন

—তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, বিরাট যুদ্ধ জয়ের আনন্দ বুকে নিয়েও তিনি কী ভীষণভাবে পরাজিত! তার নিশ্বাস পতনের সঙ্গে যে ভাষা বেরিয়ে এসেছে তাঁর মুখ দিয়ে, তাতে মিশে আছে ক্ষোভ, হতাশা ও বেদনা। নিতান্ত গদ্য প্রয়োগ 'চলে গিয়েছেন' ও অর্জুনের নিশ্বাস পতনের মতো ভারী. বিষাদমাখা কবিতার এক পঙ্‌ক্তির মতো উজ্জ্বল। অর্জুন যথার্থই 'জীবন্মৃত'।

মদমত্ত পুরুষ ও রমণীদের সংলাপে একটি শব্দের বা ক্রিয়ারূপের পুনরাবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছন্দের কুশলতা যেমন বজায় রাখা হয়েছে তেমনি আধুনিক ছন্দোরীতির বিন্যাসের মাধ্যমে, স্বল্পায়তন কথা প্রয়োগের মাধ্যমে এই কাব্যনাটিকাটিকে সংলাপ ও ছন্দ উভয় দিক দিয়েও তীক্ষ্ণতা দান কবা হয়েছে, সুরা বিহ্বল পুরুষ কণ্ঠে উচ্চারিত—"লুপ্ত / ভেদ-বুদ্ধি। / এসে যায় না, / তুই কন্যা / নাকি ভার্যা / এসে যায় না— / হোক যুবতী / হোক বৃদ্ধা / এই তো ব্রহ্মবিদ্যা!"—এই উক্তির মধ্যে দিয়ে মানসিক ভ্রষ্টতার পরিচয়কে বিশেষ ধরনের ছন্দ-প্রকরণের মাধ্যমে ধরা হয়েছে।

সমগ্র নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রকাশধর্মিতার বিচারে, ছন্দের নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, চরিত্রের আভ্যন্তর স্বরূপের সঙ্গে ছন্দোরীতির বাস্তব সমন্বয় সাধনে, শব্দ চয়নের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিকোণের সঞ্চারে, স্বল্পকথনের মাধ্যমে কাব্যিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে নাট্যিক রসমাধুর্যের সম্মিলন ঘটানোয়, পরিবেশ সম্মত বাক্-প্রতিমা বা চিত্রকল্প প্রয়োগের ফলে নাট্যিক কাহিনি গ্রন্থনার মধ্যে কাব্যিক রসের দিকটি অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে। একজাতীয় সংশয়োত্তীর্ণ মানসিক জিজ্ঞাসার দার্শনিক চেতনা আলোচ্য নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যরস সৃষ্টির যেমন সহায়ক, তেমনি কাব্যরসের মাধ্যমে আগত তীক্ষ্ণ দার্শনিক জীবন জিজ্ঞাসা বা সত্যসমীক্ষা নাটকের শেষতম পরিণতিতে নাট্যিক রস মাধ্যমে পূর্ণতার পথগামী হয়েছে। এখানেই কাব্য নাট্য হিসেবে যেমন 'কালসন্ধ্যা' নাটকের গঠনকুশলতার সার্থকতার প্রশ্ন নিহিত, তেমনি ভূমিকাংশে বিবৃত গান্ধারীর অভিশাপের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক সত্য তাৎপর্যকে কবি নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন, তাও সার্থকতা লাভ করেছে। কৃষ্ণ চরিত্রের শেষাংশে আধুনিক মনস্তত্ত্বের মনোবিকলন রীতিকে কাব্যিক আধুনিক পন্থায়, নাট্যিক প্রকরণে সমন্বিত করেন নাট্যকার চরিত্রের অন্তর্জীবনের চিত্রণে নাটকীয় মনস্তত্ত্বও এনেছেন। তাই সমস্ত দিকের বিচারেই 'কালসন্ধ্যা'-কে বুদ্ধদেবের পরিণততম কাব্যনাট্যের অঙ্গীভূত করা যায়।

দুই

সংলাপ নাটকের প্রাণ। নাট্যবৃত্তকে গতিশীল রাখার জন্য নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক উক্তিই হল নাট্যসংলাপ। সংলাপের মাধ্যমেই নাটকের কাহিনি এগিয়ে চলে। নাট্যসংলাপকে

নাটকের প্রাণ স্বরূপ বলা যায়। নাট্যবৃত্তের ক্রিয়ার অগ্রগতি ও চরিত্রগুলির ভাষ্যরূপেই সংলাপ নাটকে দেখা যায়। মহাভারতের 'মৌষল' পর্ব অবলম্বনে রচিত সমালোচ্য 'কালসন্ধ্যা' নাটকটির সংলাপ রচনায় বুদ্ধদেব বসু যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর সংলাপ প্রয়োগের গুণেই আলোচ্য কাব্যনাট্যটি আধুনিকোত্তম কাব্যনাট্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

'কালসন্ধ্যা' আদ্যন্ত ঘটনাবহুল, নাট্যকার আশ্চর্য কৌশলে ঘটনা সন্নিবেশের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তীব্রগতি সম্পন্ন নাটকীয়তা যা কাব্যনাট্যটিতে এনেছে সাহিত্যের পরিপূর্ণ আস্বাদ। 'কালসন্ধ্যা' শুরু হয়েছে দ্বারকায় আসন্ন দুর্লক্ষণের আভাস দিয়ে। দুই বৃদ্ধ তাঁদের কথপোকথনের মাধ্যমে করেছেন সেই আভাসের নান্দীপাঠ। কালসন্ধ্যা সেই উল্লিখিত দুর্লক্ষণের নাট্যরূপ।

বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম কাব্যনাট্য 'কালসন্ধ্যায়' যে গদ্যছন্দের সংলাপ ব্যবহার করেছেন, তাতে যুগপৎ লক্ষিত হবে চরিত্রগুলির গুরু ও লঘু উভয় মনোভাব আবেগ, উৎকণ্ঠা ও বিস্ময় প্রকাশের সময় এই গদ্যছন্দ সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব সুরের স্পন্দন নেপথ্যে সুরাবিহ্বল কণ্ঠে সুরতাল ভ্রষ্ট গানের শব্দে ভীতচকিত সত্যভামা সুভদ্রাকে ডেকে বলেছিলেন—

> "শুনেছো? ...গান শুনেছো?
> নেই তাল, নেই মান, মদিরায় উদ্দাম
> পুরুষের, রমণীর কণ্ঠ। ...আবরণে নেস কৌলীন্য।"

সত্যভামার এই সংলাপ গ্রথিত হয়েছে এমন এক গদ্যছন্দে, যা এক অখণ্ড প্রবহমানতায় ভরা। সত্যভামার এই উক্তির সময় কাব্যনাট্যটির চরম পরিণতির জন্য সুভদ্রার মতো আমরাও সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। নাট্য কৌতুহল সৃষ্টির এ এক অদ্ভূত কৌশল। সত্যভামার এই সংলাপে যে প্রবহমানতা ধরা পড়েছে, এই প্রবহমানতা কিন্তু ধরা পড়ে না সুভদ্রার এক সংলাপে—

> "সত্যভামা, ভেবে দ্যাখো
> পিতৃগণ অগ্রগামী জন্মে ও মরণে,
> তাদের অপসারণ কষ্টকর, তবু স্বাভাবিক...জীবন-নিষ্ঠুর"।

আবেগ অভিজ্ঞতা মেশানো এই গদ্যছন্দ অতিসহজেই কেমন সুভদ্রার চরিত্রটিকে বিশ্লেষণের পথ দেখিয়ে দিল। আর সেই সঙ্গে আসে গদ্যের স্বাধীনতার মধ্যে কাব্যের সুষমা।

সত্যভামা ও সুভদ্রা চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে নাট্যকার পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার বিবর্তন অর্থাৎ জীবনের আনন্দ ও অশ্রুর সহাবস্থান চিত্রিত করেছেন। এক্ষেত্রে দুঃখের ঘনায়মান মেঘের ম্লানিমা ঘটনার গতিকে মাঝে মাঝে এক ঘেয়ে সংলাপাত্মক বিবৃতিতে কিছুটা স্থাণু করে তুললেও শেষাবধি সত্যভামার কণ্ঠে কবি-নাট্যকার আকণ্ঠ আলোকিত রৌদ্রের পিপাসা বজায় রেখেছেন। এ জাতীয় একটি সংলাপ স্মরণযোগ—

> "সুভদ্রা আকাশে রৌদ্র! মেঘে দ্যাখো অমল আশ্বাস লিখে
> সূর্যোদয়ে এইমাত্র আবির্ভূত! শান্ত হও।"

অর্জুনের সংলাপের মধ্যে উপমা চয়নে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে তাঁর অন্তর্নিহিত মানসিকতায়

বীর্যহীনতা, তেজোদৃপ্ত মানসিকতার অভাব এবং অসহায় ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ নাট্যকার এনেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে অর্জুনও কৃষ্ণের পারস্পরিক সংলাপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে বার্ধক্যের বহিরঙ্গ লক্ষণ দেখা গেলেও অন্তরঙ্গে বীর্য বলিষ্ঠ যৌবনোদ্ধত ভাব মুহূর্তের মধ্যেই জেগে ওঠে। সমগ্র কৃষ্ণ চরিত্রটি এখানে আগাগোড়া এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ মানসিকতার মধ্যে দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণচরিত্রকে কেন্দ্র করে অর্জুনের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে চরিত্রটির নাটকীয় রসদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়েছে।

এখানে কৃষ্ণের একটি সংলাপ উদ্ধৃতিযোগ্য—

"ইদানীং সব বলে মৃদু হচ্ছে, সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে যায়
নিশ্চিন্তে কৃষক করে কৃষিকর্ম', বেদমন্ত্র জপেন মুনিরা,
অর্থাৎ দিন ও রাত্রি নিতান্তই অভ্যস্ত, দৈনিক
অবিরাম, নিরাপত্তা ও বিশ্রামে আমি
কিঞ্চিৎ হয়েছি ক্লান্ত।"

ভাষার প্রকাশভঙ্গির আধুনিক রূপরীতির মাধ্যমেই এইভাবেই বুদ্ধদেবের সংলাপ পৌরাণিক কৃষ্ণচরিত্রকেও চিন্তাক্লিষ্ট, একান্ত আধুনিক যুগোচিত পরিণতি দান করেছে।

নাটকের পরবর্তী অংশে কৃষ্ণ অর্জুনের সংলাপ কিছুটা দীর্ঘতর, হতোদ্যম অর্জুনের প্রশ্নের সামনে কৃষ্ণ নীরব থেকে নাটকীয় ঘটনার পারিপার্শ্বিকতাকে যেন আরও মুখর করে তুলেছেন। কাব্যিক সংলাপের ক্ষেত্রে এখানে বুদ্ধদেব নাটকীয়তাকে পরিহার করেননি, এখানে সংলাপের মধ্যে শব্দ ও উপমায় অনুভূতিগম্যতা তো আছেই চরিত্রগুলির অর্ন্তদ্বন্দ্বের বাতাবরণকে বহির্মুখী করে আরও আস্বাদনযোগ্য করে তোলা কিংবা চরিত্রগুলির মানসিক সুকুমার ভাববৃত্তিকে মানবিক কল্যাণেচ্ছাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার জন্যই এক্ষেত্রে কাব্যিক সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্যিক রসের সঙ্গে পরিস্থিতি-নির্ভর এবং চরিত্রগুলির পরস্পর সাপেক্ষ নাটকীয় দ্বন্দ্বের দিকটিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্জুন ও কৃষ্ণের সংলাপের মধ্যে এই পর্বে 'কালসন্ধ্যা' নাটকে চরিত্রের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও চলৎশক্তি এসেছে। সংলাপের মধ্যেও নতুন প্রাণশক্তি জাগ্রত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে অর্জুনের সঙ্গে কথোপকথন কালে কৃষ্ণ এক স্থানে বলেছেন—

"পরস্পর উন্মাদ হননে / যদুবংশ লুপ্ত আর বসুদেব শোকে /
যোগাসনে প্রাণত্যাগ করেছেন / অভ্রান্ত গান্ধারী /"

কৃষ্ণের উল্লিখিত সংলাপে এই নাটকের মুখপাতে উল্লিখিত গান্ধারীর অভিশাপ কৃষ্ণ কর্তৃক স্পষ্টতই উচ্চারিত হয়েছে। ফলে নাটকীয় কাহিনি এখানে পূর্বের নাট্যদ্বন্দ্বের উল্লেখের মাধ্যমে পুনর্বিবেচিত ও পুনর্বিশ্লেষিত হয়েছে।

'কালসন্ধ্যা' নাটকের শেষাংশে কৃষ্ণচরিত্রের মুখে কোনো এক স্থলে 'গান্ধারীর অভিশাপের' কথা উল্লেখ করা যায়। নাটকখানিতে বুদ্ধদেব বসু কৃষ্ণ চরিত্রাঙ্কনে শেষার্ধে খুবই মনস্তত্ত্ব সম্মত পথে অগ্রসর হয়েছেন। বাইরে কৃষ্ণের মুখের প্রসন্নতা বা মানসিক বীর্য বলিষ্ঠতার ভাব বজায় রাখলেও অন্তরে চরিত্রটিকে কিছুটা ক্লান্ত, হতাশ্বাস ও ট্র্যাজিক কারুণ্যে বিষাদাচ্ছন্ন করে

তুলেছে। এই সময়কার কৃষ্ণচরিত্রের সংলাপ রচনায় নাট্যকার আরও তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ব জটিল আকর্ষণীয়তা এনেছেন এবং আধুনিক কাব্যরসের পরিপ্রেক্ষিতে সংলাপগুলির বাক্‌রীতিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। নাটকখানির সমাপ্তিতে কৃষ্ণ-অর্জুনের পারস্পরিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে উভয়ের চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ চতুষ্পার্শ্বের মৃত জীবন প্রত্যয় লক্ষ করে অন্তরের ট্র্যাজিক বেদনা অনুভব করেছেন। সেখানে নেতিবাদী জীবন তত্ত্বের ভূমিকা সক্রিয়। কিন্তু অর্জুনের সামনে অন্তর্দ্বন্দ্বের এই পরিচয় গোপন করে নতুন জীবনদার্শনিকতা কিংবা সত্যবোধের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এরই মধ্য দিয়ে নাটকখানির মধ্যে আপাত নেতিবাদী বা ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সত্ত্বেও গঠনমুখী পুনর্বাসনের প্রয়াসও এখানে লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণের দ্বন্দ্বমথিত এই জাতীয় একটি সংলাপ (অর্জুনের প্রতি)—

কৃষ্ণ।। শোক অবলার বৃত্তি। আর তুমি, / অর্জুন তুমি তো বীর। ধৈর্য ধরো।

তাছাড়া, কেনবা শোক? কার জন্যে? / কে কাকে সংহার করে?

জন্ম থেকে সকলেই মৃত, চিরকাল সকলেই মৃত, / জীবিত ও মৃতে কোন ভেদ নেই'।

আলোচ্য সংলাপে কৃষ্ণের বিশেষ জীবনদর্শনের বিরোধাভাস অর্জুনকে স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত করেছে। নাট্যকারও সেই অপার বিস্ময়বোধকে অর্জুনের দ্বিধাযুক্ত বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন। অর্জুনের জিজ্ঞাসু মানসিকতায় বুদ্ধদেব বসু কবির মতই শব্দচেতনার স্পর্শসংযোগ ঘটিয়ে এই কাব্য নাটকটিকে আঙ্গিকরীতির উপরেও আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত করে তুলেছেন।

আর তুমি আমি / দৃশ্য-শ্রাব্য স্পর্শনীয়, এই মুহূর্তে এই দ্বারকায়—

এখানে অর্জুন ও কৃষ্ণ চরিত্র কীভাবে দৃশ্য শ্রাব্য ও স্পর্শনীয়, সেই বিশেষ শব্দযোজনার মাধ্যমেও এখানে আধুনিকতার ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ব্যাসদেবের সঙ্গে অর্জুনের কথপোকথন কালে ব্যাসদেবের মুখে অর্জুনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা, কিংবা তার সক্রিয় কর্মাদর্শের কথা, তার ব্যর্থতা সব কিছুই সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমাপ্তিতে পঞ্চভ্রাতাসহ পাঞ্চালীকে নিয়ে পুনরায় হস্তিনায় গমনের জন্য ব্যাসদেব জানিয়েছেন। এই বিদায় মুহূর্তে ব্যাসদেবের সংলাপটি উল্লেখযোগ্য—

"প্রস্থান সুন্দর হোক তোমাদের, / জেনো, আজ এক বৃত পূর্ণ হলো, অন্য এক বৃত্ত অপরে হয়তো বা আরব্ধ এখনই। / যাত্রা করো, বিদায়।"

আলোচ্য সংলাপের মধ্যেও পরিবেশ অনুযায়ী এবং মানসিকভাবের বিশেষ পরিমণ্ডল অনুসারে বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। বুদ্ধদেবের কাব্যিক রসের স্বতঃস্ফূর্ততা সংলাপের এই অংশে আস্বাদ্য—'প্রস্থান সুন্দর হোক তোমাদের'।

একেবারে সমাপ্তির সংলাপে ব্যাসদেবের উক্তির মধ্যে এবং নাট্যকারের নাট্য নির্দেশনায় (অর্জুনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে) নিজের সৃষ্টিক্ষম মনোজীবনের মধ্য দিয়েই চিত্রিত চরিত্রের মধ্যে যে উত্থান-পতন ঘটাতে পারেন, এবং চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বও যে নিয়তি নির্ধারিত এবং ক্ষণজীবী, এ ইঙ্গিতও

এইসব কুশীলব, ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার
একমাত্র অক্ষরেই নির্দ্ধারিত এদের উদ্ধার।

আলোচ্য সংলাপেও শব্দচয়নের তীক্ষ্ণতা এবং উপমা নির্মিতির অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়।

'কালসন্ধ্যা'য় আর একধরনের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে বলা যায় সাংগীতিক। এই সংলাপ মুখ্যত ব্যবহৃত হয়েছে সুরাবিহবল অভিজাত নরনারীদের মুখে, জনতার উগ্রকণ্ঠে, দস্যুদলের আস্ফালন প্রকাশের মুহূর্তে। 'কালসন্ধ্যা'র উল্লিখিত গীতিনাট্য ধরনের সংলাপে হাস্যরস ছাড়াও রয়েছে গভীর জীবন রসের দ্যোতনা।

অর্জুন যখন দস্যুদলের স্পর্ধায়, অতিষ্ঠ হয়ে বলে ছিলেন,

'জানিস আমি কে? / আমি পার্থ, সব্যসাচী, অজেয় অর্জুন।

তখন দস্যু দলপতি বলেছে—

'হাঃ হাঃ হাঃ / ইনি কী বলছেন, শোন'।

অর্জুনের আস্ফালন যে মিথ্যা এবং অর্থহীন তা জানতে পারা যায় দস্যু দলপতির এই গানটিতে—

ভয় নেই ভাই সব, ভয় নেই! / চেয়ে দ্যাখ অফুরান কাঞ্চন /
কত রাতরঙ্গিণী কামিনী — / সব হবে আমাদের, আমাদের।

মিল না থাকলেও গানটিতে আছে পদ্যের বোল, সুরের স্মৃতি। এই গান রচনায় বুদ্ধদেব মৌলিক না হলেও, প্রয়োগ দক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে দেখিয়েছেন। 'কালসন্ধ্যা' নামে 'কাব্যনাট্য' হলেও বুদ্ধদেব তাঁর আলোচ্য নাটকের প্রকৃতিতে 'গীতিনাট্যের' বৈশিষ্ট্যও বজায় রেখেছেন, এমনকি গান বলে যাকে চেনা যায়, তা গীতিনাট্যের গীতি সংলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সমগ্র 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাট্যটির সংলাপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই কথাই বলা যায়—এখানে বুদ্ধদেব সংলাপ রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের সীমাস্বর্গে উন্নীত। সমস্ত চরিত্রের মুখে সংলাপ ব্যবহারে তিনি যথাযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যনাট্যে একদিকে গদ্য ছন্দের সংলাপ যেমন বুদ্ধদেবকে সর্বপ্রথম তুঙ্গাস্পর্শী সার্থকতা এনে দিয়েছিলো, আবার কাব্যিক সংলাপে উপমা ও অলংকারের যথাযোগ্য ব্যবহার চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বকে আস্বাদন করতেও সহায়তা করেছিল। এই দুই ছন্দের পাশাপাশি বুদ্ধদেব আলোচ্য কাব্যনাট্যে সাংগীতিক সংলাপও ব্যবহার করেন। যথার্থ ছন্দপ্রয়োগের ফলেও আলোচ্য কাব্যনাট্যের সংলাপ নবতর সৌন্দর্য লাভ করেছে। তাই কাব্যনাটকের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেব যে যথার্থই ছন্দ-রচনাবিদ একথা 'কালসন্ধ্যা' নাটকের সংলাপ বিচারের পর বলা যেতে পারে।

তিন

কবি নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাট্যটি মহাভারতের মৌষল পর্ব অবলম্বনে রচিত। আধুনিক কবি হিসেবে তিনি মহাভারতের এই বিশেষ পর্ব অবলম্বনে এক দেশ কালাতীত সত্যের ইতিহাসকে বিবৃত করতে চেয়েছেন তাঁর আলোচ্য কাব্যনাট্যের মাধ্যমে। পৌরাণিক

নাটকের ক্ষেত্রে এই জাতীয় নবভাষ্য রচনার রীতি নতুন কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে পৌরাণিক নাটকের ঘটনা আশ্রয়ে নাট্যিক আবেদনের মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধ, মনস্তত্ত্বচেতনা ও চলমান মানব সভ্যতার অনাগত ভাবী সম্ভাবনাকে কোনো চিরন্তন সত্যে বিধৃত করে দেবার জন্য পৌরাণিক নাট্যকারেরা সচেতন থাকেন, সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিশেষ জীবন রসকেও পুরাণের বস্তু অংশ ভেদ করে চিরন্তন মর্মরসের প্রতিষ্ঠা ঘটান। 'কালসন্ধ্যা' কাব্যনাটকের ক্ষেত্রেও কবি বুদ্ধদেবের এই জাতীয় সচেতন কোনো উপস্থাপ্য তত্ত্ব সক্রিয় এবং এই উদ্দেশ্যই তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে। তাই নাটকখানির মুখপাতে বুদ্ধদেব এই প্রসঙ্গে বলেছেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন, "তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে। আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি"। কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেবি আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই—ই উক্ত হল"।

কীভাবে এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়, মহাভারতের মৌষল পর্বে তা বর্ণিত আছে। 'কালসন্ধ্যা'-তে কাহিনির অংশ সেখানে থেকে আহৃত। তাই নাট্যকার কালসন্ধ্যার ভূমিকায় একথাও লিখেছেন—"বলাবাহুল্য, দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আর বহুদূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদিসত্য বিরাজমান।"

—অর্থাৎ 'কালসন্ধ্যা'র বিষয়বস্তু মহাভারতের হলেও এর আবেদন চিরকালীন মানব-ইতিহাসের। উত্থান ও পতন নিয়ে মানবেতিহাসের চলমানতা। উত্থানের মুহূর্তের ন্যায় পতন মুহূর্তও কেউ বুঝতে পারে না। পতন মুহূর্তেই ঘনিয়ে তোলে 'কালসন্ধ্যা'। নাট্যকার যথার্থই বলেছেন কালসন্ধ্যা 'মানব ইতিহাসের একটি আদিসত্য। এই সত্য অস্বীকারের কোনো উপায় নেই'। 'কালসন্ধ্যা'য় উল্লিখিত দ্বারকাপুরী ও যদুবংশ—দুটি রাজ্যের পরিপূর্ণ ধ্বংসের পটভূমিতেই নাটকের সমাপ্তি ঘটেনি, নাটকীয় দ্বন্দ্বের মতো এই দুই রাজ্যের ধ্বংস পরিণাম নাটকখানির গ্রন্থিত আখ্যানের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। সেখানে বিপরীত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অনুকূল প্রকৃতির সামঞ্জস্য যেমন আছে, তেমনি আবার রক্তাক্ত সংঘর্ষময় আধুনিক দৃষ্টিকোণের বিচার বোধও রয়েছে। কারণ নাট্যকার স্পষ্টতই বলেছেন যে এর মর্মে মানব ইতিহাসের আদি সত্য বিরাজমান আছে। 'কালসন্ধ্যা' নাটকখানির পৌরাণিক বহিরাবরণ ভেদ করলে মানব ইতিহাসের সত্য স্বরূপের এই বহমানতার অক্ষয় সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

'কালসন্ধ্যা' দুই অঙ্কের কাব্যনাট্য হলেও প্রথম অঙ্কের পূর্বে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের পরে আছে যথাক্রমে 'পূর্বরঙ্গ' ও 'উত্তর কথন'। 'পূর্বরঙ্গে' আছে ঘনায়মান দুর্লক্ষণের আতঙ্ক। সেই আতঙ্কের কথা দুই বৃদ্ধের উক্তি—প্রত্যুক্তিতে ধরা পড়েছে; সবাইয়ের ধারণা ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভারতবর্ষব্যাপী অশান্তির অবসানে শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু যুদ্ধশেষ হলেও শান্তির ইঙ্গিত নেই। প্রথম বৃদ্ধের মুখে শোনা যায় সেই অশুভবার্তা—"কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?" পূর্বরঙ্গে যে দুর্লক্ষণের ইঙ্গিত ছিল, প্রথম অঙ্কে সেই

দুর্লক্ষণ স্পষ্ট হল। সমগ্র দ্বারকায় অনাচার, ব্যাভিচার, বিশৃঙ্খলা, নারী ও পুরুষের আব্রুহীন বেলেল্লাপনা। রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত, সর্বত্র দুর্বৃত্তের বল্গাহীন দৌরাত্ম্য। স্বয়ং কৃষ্ণ এর কোনো মীমাংসা করতে ব্যর্থ। কেন-না তিনি জানেন, এ সবই অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেছেন—

"এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোষ্ট্রাহত জলের কম্পন শুধু।"

কৃষ্ণের এই উক্তির মাধ্যমে গান্ধারীর অভিশাপ সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনিই তাঁর জ্ঞাতি ধ্বংসের কারণ হলেন। এমনকি, যে গাণ্ডীব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে এনে দিয়েছিল সুগভীর সাফল্য, সেই গাণ্ডীবেও রইল না কোনো শক্তি ও প্রতিরোধের ক্ষমতা। দ্বিতীয় অঙ্কে দস্যুদলের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ অর্জুন সরোষে যখন বলেছেন,

"জানিস আমি কে? / আমি পার্থ সব্যসাচী, অজেয় অর্জুন।"

—তখন দস্যুদল অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল। আর অর্জুন ব্যর্থ, পরাজিত। মর্মপীড়িত অর্জুন আত্মধিক্কারে বিদীর্ণ। এখন তাঁর আস্ফালন অর্থহীন, হাস্য উদ্রেককারী। উত্তর কখন দৃশ্যে দেখা যায়, অর্জুন ও ব্যাসদেব কথপোকথনে রত। অর্জুন ব্যাসদেবের কাছে নিবেদন করলেন তাঁর অক্ষমতার কথা। যে অর্জুন ছিলেন চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী রণজয়ী, তিনি কিনা আজ জীবন্মৃত? অর্জুনের এই করুণ জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাসদেব বলেছেন—

"সব দেবতার দান তুমি পেয়েছিলে / প্রচুর, অপরিমাণ, মানবের প্রাপ্যের অধিক', তার মূল্য দিতে হবে।"

যথার্থই অর্জুন অপর্যাপ্ত পেয়েছিলেন দেবতার দান। অগ্নি ও অর্ণব তাঁকে দেন গাণ্ডীব, দিব্যাস্ত্র দিয়েছিলেন পশুপতি। তিনি যম, ইন্দ্র ও বরুণের স্নেহ চিহ্ন লাভ করেন। সেই দেবতাই কৃষ্ণের প্রচ্ছদে ছিলেন অর্জুনের সঙ্গী, সহকর্মী ও নির্দেশক। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টি সীমায় আবদ্ধ, সেই হেতু অপ্রয়োজনীয় দানেরও নেই কোনো সার্থকতা। তাই প্রয়োজন নেই দেখে দ্বারকায় প্রাণ দিলেন কৃষ্ণ। সেইজন্যই ব্যাসদেব অর্জুনকে বিক্ষোভ দূর করার উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"অতএব," অর্জুন, তুমিও আজ সমাপ্ত, নিঃশেষ—
যদি কোনো সমাপ্তি কোথাও থাকে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন অর্জুনকে শিখতে হবে বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ। কেন না বিশ্বনিখিল বৃত্তচক্রে নিরন্তর ঘুরছে। পঞ্চপাণ্ডবের জীবন বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে। অতএব প্রস্থানই এখন বড়ো কথা। পঞ্চভ্রাতা পাঞ্চালীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক মহাপ্রস্থানের পথে। এই পৃথিবী যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চ, প্রতিটি নরনারী যেন কুশীলব। অর্জুনও সেই কুশীলবের একজন। বিদায়ী অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ব্যাসদেবের মুখে চরম সত্যের নিষ্ঠুর উচ্চারণ শোনা যায়—

"এই সব কুশীলব, — ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।"

ব্যাসদেবের এই উচ্চারণের মাধ্যমেই ধ্বনিত হয়েছে কালসন্ধ্যার স্বরূপ। কালসন্ধ্যা মানুষকে নিয়ে যায় জানা থেকে অজানায়। জানা জগৎ ছেড়ে চলে যেতে জাগে ব্যথা ও বিষাদ। কিন্তু যা চরম সত্য ও অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য অনুশোচনার কোনো অর্থ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে তৈরি হয় মহাকাল। মুহূর্ত পরবর্তী মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে মহাকালের চক্রকে স্বাভাবিক করে রাখে। মহাকালের এই স্বাভাবিক চক্রবৎ পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে অমোঘ পরিণতির অপেক্ষার মাধ্যমে আধুনিক মানুষ স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ সেই আধুনিক মানুষ, যিনি স্বনির্মিত দ্বিতীয় পৃথিবীর স্থির অধিবাসী এবং পুরোমাত্রায় নিষ্কাম, তিনি অর্জুনকে বলেছেন—

> "যেন এক সত্তা আছে, / অন্য কিছু নেই, আছে একমাত্র সেইসত্তা /
> পায় না বৃদ্ধি বা ক্ষয়; জন্মে না মরে না; / একবার অস্তিত্ব সম্ভব হলে কোন কালে
> ঘটে না বিনয়; /যার মুখ গহ্বরে অনন্তকাল ধরে / যুগপৎ উপস্থিতি বর্তমান, অতীত
> ও ভাবীকাল, / জড়প্রাণ, জীবিত, মৃতেরা।"

কৃষ্ণের এই উক্তি অশেষ আবহমান অস্তিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে যেন। এই কৃষ্ণ মহাভারতের কাল এড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছেন। তেমনি অর্জুনের উক্তিতেও ধরা পড়ে বিচ্ছিন্নতা বোধ ও বিষাদমগ্ন নিঃসঙ্গতা। অর্জুন বলেছেন—

> "একী! / আমি একা—কৃষ্ণ নেই! / অর্থহীন মহাশূন্যে /
> আমি যেন মজ্জমান — শরীর সর্বস্বজড়।"

অর্জুন এই একাকিত্বের মধ্যে দিয়ে জানতে পেরেছেন কৃষ্ণের অস্তিবাদী চৈতন্যের স্বরূপ। অবশ্য তাঁর এই জানাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছেন ব্যাসদেব। যা স্বাভাবিক, এবং যা ঘটবে, তার জন্য অনুশোচনার কোনো অর্থ নেই। কেন না 'জীবতে ও মৃতে কোনো ভেদ নেই'। কেবলমাত্র সত্তায় ধ্রুব সত্য। এই সত্তার ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই, জন্ম ও মৃত্যু নেই। সত্তার এই বোধ ব্যাখ্যার অতীত বলেই রহস্যময়। নিয়তই এই বিশ্বনিখিলে—কালসন্ধ্যা চলছে।

"এ মুহূর্ত এইমাত্র / অন্য এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো / অন্য এক মুহূর্তে আবার।"

এই হল বুদ্ধদেব বসুর অস্তিত্ববাদী অভিজ্ঞানতত্ত্ব। তিনি এই তত্ত্বকে নাট্যে রূপায়িত করতে এক অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করেছেন। নাটকের ভূমিকায় গান্ধারীর কৃষ্ণকে দেওয়া অভিশাপ কৃষ্ণ নতমস্তকে মেনে নিয়েছেন। কৃষ্ণ যে কালচক্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সচেতন, তাই নাটকে ঘটনা সংস্থাপনের দ্বারা নাট্যকার দেখিয়েছেন; 'কালসন্ধ্যা'র বিষাদ পরিণত হয়েছে নির্বেদে। এই বিষাদ অতিক্রমী নির্বেদের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যনাট্যে এনেছেন নানা বিপরীত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। কামোন্মত্ত নারী, পুরুষ, সত্যভামা, সুভদ্রা, অর্জুন, দস্যুদল কারওর বোঝার অবকাশ নেই, সবাই এক সুনির্দিষ্ট পরিণতির শিকার। এমনকি স্বয়ং কৃষ্ণ যিনি এই সত্যেরই স্বরূপ, তিনিও এক ব্যাধের বাণে নিহত হয়ে আন্তরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ব্যাসদেবের প্রাজ্ঞ উক্তির নিহিতার্থ সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন।

কালসন্ধ্যার এই কাব্যময় বিষয়বস্তুকে নাট্যকার অপূর্ব নাটকীয় ভাবে তুলে ধরেছেন। পূর্বরঙ্গে দুই বৃদ্ধের কথোপকথনের মধ্যে গান্ধারী নির্দিষ্ট দ্বারকার দুর্লক্ষণ উচ্চারিত হয়েছে, এবং এই দুর্লক্ষণের ঘনীভূত রূপের পরিচয়েই প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি। দ্বিতীয় অঙ্কে এসে নাট্যকার নানা বিপরীত নাট্য ঘটনা ও নাট্যিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এই মূল দ্বন্দ্বের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। নাটকের উত্তর কথন অংশে অভিমানাহত অর্জুনের উপলব্ধির মধ্যে কালসন্ধ্যার সমাগত বেদনা তাঁকে কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছে এবং অর্জুন স্বয়ং বলেছেন 'আমি স্বনামের অযোগ্য'। 'কালসন্ধ্যা'র মতো 'অনাম্নী অঙ্গনা' নাটকেও নাট্যকার বুদ্ধদেব বিদুরের জন্ম বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে মহাবিধ্বংসী আসন্ন যুদ্ধের কথা জানিয়েছেন। উভয় নাটকেই চিরন্তনী কল্যাণধর্মের প্রতিষ্ঠা ও পুনর্বাসনের জন্য সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েও স্থিতধী চৈতন্যের সামগ্রিক সত্যকেই উদ্ভাসিত করেছেন প্রাজ্ঞ ব্যাসদেব। তাঁর উক্তির মধ্যেই পুরাতনী ভাবজীবনের ক্ষেত্রে নবজীবনের নতুন যুক্তি-বাহিত এবং উপমাশ্রিত বক্তব্য নাটকখানির জীবনতত্ত্বের নবভাষ্যরচনায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। অর্থাৎ ব্যাসদেবের আড়ালে বুদ্ধদেব স্বয়ংই এখানে পুরাণের অনুসন্ধান করতে গিয়েও, কালচেতনার মধ্যে চিরন্তন সত্যসন্ধানী হয়ে উঠেছেন। পুরাণ অবলম্বী নাটকে আদি যুগ নবতমযুগ এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই। কিছু ভিন্নতা অবশ্যই আছে। বুদ্ধদেবও নবতমের মধ্যে পুরাতনের শিল্পসিদ্ধি ঘটিয়ে চিরন্তনেরই পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পী সবসময়েই 'নতুন করে পাব বলে' এই প্রত্যাশার জন্যই ব্যাকুলিত থাকেন। আলোচ্য নাটিকাটিতেও পুরাতনের রূপের সঙ্গে একটি অখণ্ড আত্মীয়তার সুর বাঁধা পড়েছে এবং বুদ্ধদেবের আলোচ্য কাব্যনাটিকা 'কালসন্ধ্যা' যথার্থই পুরাণের বাতাবরণে নবতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

প্রথম পার্থ

[বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম কাব্যনাট্য 'প্রথম পার্থ' প্রথমে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক স্বয়ং জানিয়েছেন, পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে কাব্যনাট্যটি পরিবর্তিত হয়েছে। আলোচ্য কাব্যনাট্যটির প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে; নভেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে।]

'প্রথম পার্থ' কাব্যনাট্যটির উপাখ্যানও বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কয়েকটি নাটকের ন্যায় মহাভারত থেকে গৃহীত। কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ১৪২-১৪৪ অধ্যায়ে আলোচ্য উপাখ্যানের প্রথমাংশ বর্ণিত হয়েছে।

'উদ্যোগ পর্বে'র আখ্যায়িকাভাগ হল কৌরব ও পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব। কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রায় সকলেই ওয়াকিবহাল। সূর্যদেবের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভের কর্ণের জন্ম। মহর্ষি দুর্বাসার বরে কুন্তী মন্ত্রপ্রয়োগে যে-কোনো দেবতাকে আহ্বান করে পুত্রবতী হতে পারতেন। পরীক্ষামূলকভাবে ওই মন্ত্রে সূর্যদেবকে আহ্বান করে কুমারী থাকাকালীন কুন্তী কর্ণের মাতা হন। কুন্তীর বিবাহ হয় পাণ্ডুরাজের সঙ্গে; কিন্তু পাণ্ডু কোনো অভিশাপে পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ ছিলেন বলে রাজা পাণ্ডুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে পূববর্তী পদ্ধতি অনুসারে কুন্তী ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জন্ম প্রদান করেন। অনুরূপে রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার যুগলের দ্বারা নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। এইভাবে রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজপুত্রের জন্ম হয়। এই বৃত্তান্ত মহাভারতের আদিপর্বের ১০৪-১০৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত কুন্তী রাজা পাণ্ডুর নিকট গোপন করেছিলেন। মহাভারতের সমাজব্যবস্থায় কন্যাকাবস্থার কামীনপুত্র বিবাহের পরে পতির গোত্রই লাভ করত। সেই সূত্রে কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠাগ্রজ। বুদ্ধদেব বসু সেই অর্থেই কর্ণকে 'প্রথম পার্থ' বলেছেন।

সমাসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নিবারণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ কৌরব সভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গমন করলে তা ব্যর্থ হয়। সন্ধি প্রস্তাবে ব্যর্থ কৃষ্ণ কর্ণকে স্বীয় রথে তুলে নিয়ে উপপ্লব্য নগরে যাবার পথে যে কথোপকথন করেন তারই উপর ভিত্তি করে আলোচ্য 'প্রথম পার্থ' নাটকের কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ রচিত। সমালোচ্য কাব্যনাট্যে এই শেষ দৃশ্য হলেও মহাভারতে আলোচ্য ঘটনাটি কিন্তু কর্ণ-কুন্তী সংবাদের পূর্ববর্তী ঘটনা। 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাট্যে দ্রৌপদী-কর্ণ সংবাদ থাকলেও কালীপ্রসন্ন অনূদিত মহাভারতে কিন্তু দ্রৌপদী-কর্ণ সংবাদ ও উভয়ের কথোপকথনের বিবরণ অনুপস্থিত।

কৌবব ও পাণ্ডবদের ভয়াবহ ভ্রাতৃযুদ্ধ থেকে নিরসনের জন্য, তাদের উভয়কে যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য বিদুর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে কুন্তী ভাগীরথী তীরে অবস্থানরত কর্ণের নিকট গমন করেন। কর্ণ কুন্তীর প্রথম সন্তান। কুন্তীর উদ্দেশ্য ছিল কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে কুন্তীর মাতৃত্ব দাবি করে এবং সেই দাবির সূত্রে কর্ণকে ভ্রাতৃযুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা। বুদ্ধদেব মহাভারতে বর্ণিত এই ঘটনাকে অনুসরণ করেছেন। ভগবান ভাস্করও গগন থেকে

কর্ণকে মাতার অনুরোধ অনুসরণের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। সূর্যদেবের উক্ত উপদেশের কিয়দংশ নাটকের দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক কর্ণকে উপদেশ প্রদানে বর্ণিত হয়েছে।

'প্রথম পার্থ' নাটকের সূচনা হয়েছে দুই বৃদ্ধের বচনে। তাঁরা কিন্তু সংলাপ উচ্চারণ করে চলে যাননি, শেষ পর্যন্ত থেকেছেন; শুধু অন্যদের সংলাপ উচ্চারণ কালে তাঁরা প্রচ্ছন্ন থেকেছেন। কাব্যনাট্যের শুরু প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে এবং সমাপ্তি দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে। হস্তিনাপুরের এই দুই ব্রাহ্মণ কিন্তু যুদ্ধ চান না; তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। তাঁরা জানেন না যুদ্ধ হবে কিনা? তাঁরা জানেন, সূর্যাস্তের আগে নেতারা সিদ্ধান্ত নেবেন। কি সেই সিদ্ধান্ত:

> কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে,
> নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা,
> মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল-কুকুর হস্তিনাপুরে—
> সেই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ রাজত্বের অবক্ষয়ের কথা উচ্চারণ করে জানিয়ে দেন জতুগৃহ, দ্যুতক্রীড়া, পাণ্ডবের বনবাস, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদির ফলে ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডবের মধ্যে বিরোধে কুরুবংশীয়দের রাজত্বে এক ঘনায়মান অন্ধকার। যুদ্ধের কারণ নির্ণয়ে দ্বিতীয় বৃদ্ধ অক্ষম:

> কেউ বলে দর্পিত দুর্যোধন দায়ী,
> কেউ দোষ দেয় দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরকে,
> কেউ বলে কৃষ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন;—
> আমরা কিছুই জানি না। শুধু ভাবি:
> যে দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু,
> আর গান্ধারীর মতো সত্যদর্শিনী, সেখানেও কেন যুদ্ধ?

প্রথম বৃদ্ধের বচনে আমরা প্রথম সমালোচ্য কাব্যনাট্যে কর্ণের নামোচ্চারণ শুনি। প্রথম বৃদ্ধ কর্ণের পরিচয়ে জানান:

> আমাদের কাহিনীর তিনি অন্যতম নায়ক—
> পাণ্ডব নন, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ।
> সারথি অধিরথের পুত্র। আশ্চর্য, ঐ বিরাট পুরুষ,
> দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু,
> রূপে, গুণে, আচরণে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ; তিনি সূতপুত্র?

অর্থাৎ কর্ণের জন্ম সম্পর্কে তাঁরা সংশয়ান্বিত। তারা লোকসাধারণের ভাবনায় ভাবিত হয়ে বলেন:

> তিনি নাকি পালিত পুত্র অধিরথের, তাঁর প্রকৃত পিতা এক রাজরাজেশ্বর।

অর্থাৎ কর্ণ যে অধিরথসূত পুত্র এ তথ্য কারোর কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় বৃদ্ধ কর্ণের বীর্যবত্তার প্রশংসা করেন। প্রথম বৃদ্ধ কর্ণের স্বভাবের প্রশংসা করে তাঁকে উগ্রস্বভাববিহীন, নম্র, উদাসীন, মহাপ্রাণ, অস্ত্রবীর, সত্যনিষ্ঠ রূপে অভিহিত করে বলেন: 'দানে তিনি সূর্যের মতো উদার, ত্যাগে তিনি মহিমান্বিত। এবং তারা জানেন যে, কুরুকুলের ধ্বংস হওয়া অথবা বিনাশের

হাত থেকে রক্ষা পাওয়া নির্ভর করছে কর্ণের উপর। কর্ণ কুরুপক্ষের অনাত্মীয় হলেও স্তম্ভ স্বরূপ; তিনি ধর্মত যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন এবং এ বিষয়ে জনপদবাণীদের প্রতিনিধি বৃদ্ধ জানেন যে, 'তিনি সরে দাঁড়ালে দুর্যোধনেরও রণস্পৃহা নিস্তেজ হবে।' আমরা তাঁর সংলাপ শেষ হলে দ্বিতীয় বৃদ্ধের কথায় জানতে পারি যে 'যশস্বিনী স্পৃহা' কুন্তীর আগমন ঘটছে। কুন্তীর পরিচয়ে বৃদ্ধ জানান, বিখ্যাত যদুবংশে তাঁর জন্ম; তিনি বন্দনীয় পাণ্ডুকে পেয়েছিলেন স্বামীরূপে এবং দেবতার বরে তাঁর দেবতার ন্যায় পঞ্চপুত্র।

কুন্তী বৃদ্ধদের জানান তিনি এক সুকঠিন অথচ অসম্পন্ন কর্তব্য পালনের জন্য কর্ণের নিকট আগমন করেছেন। যদিও কুন্তীর সঙ্গে কর্ণের কথোপকথনের পটভূমিকা ও সূচনা প্রায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদের' ন্যায়; তবুও পার্থক্য এই যে, গঙ্গার তীরে বনভূমির দিকে পিছন ফিরে কর্ণ দাঁড়িয়ে; কুন্তী প্রবেশ করলেন তাঁকে কিছু জানাবার জন্য। কর্ণকে কোনো নিগূঢ় বার্তা জ্ঞান করবেন মনে করে তারা চলে যেতে অথবা সরে দাঁড়াতে চাইলে কুন্তী তাঁদের জানান: 'অদূরে থাকবেন। শ্রবণের বাইরে যাবেন না'। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ কিন্তু কোনো বৃদ্ধের উপস্থিতি নেই; সেখানে কুন্তী একাই পুণ্যজাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা বন্দনায় রত কর্ণের কাছে সমুপস্থিত। কুন্তী আলোচ্য 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাট্যে বৃদ্ধদের 'হস্তিনাপুরের নাগরিক, কুরুবংশের হিতৈষী, শুদ্ধাচারী বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ' রূপে অভিহিত করে তাঁদের জানালেন যে কৃষ্ণ ব্যতীত' তাঁর কথা কেউ এখনো জানে না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদ্বয় বিশ্বস্ততা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে কুন্তী তাঁদের উপস্থিতি কেন কাম্য তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ জানালেন:

> আমি এসেছি কর্ণের কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে—
> শুভ প্রস্তাব, কর্ণের পক্ষে সৌভাগ্যময়,
> কুরুকুলের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলজনক,
> আর ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষেও আনন্দের।

কুন্তী সম্ভবত কর্ণের স্বভাববৈশিষ্ট্য জানতেন। না হলে বলতেন না, কর্ণের আত্মশ্লাঘা কুন্তীর অভীষ্টসিদ্ধির পথে অর্থাৎ মঙ্গলসাধনের পথে অন্তরায় হবে। তিনি সেই বাধা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদ্বয়ের অনুরোধ করলেন, মুক্ত কণ্ঠে তাঁর প্রস্তাব সমর্থনের জন্য। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদ্বয় প্রতিশ্রুতি দিলেন ন্যায়সঙ্গত হলে, ধর্মসঙ্গত হল তাঁরা কুন্তীর প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

কুন্তী কর্ণের পিছনে দণ্ডায়মান হলে কর্ণ তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করে তাঁকে প্রণাম জানালেন। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি কুন্তী অর্জুনজননী!' আর বুদ্ধদেবের, কর্ণও সবিস্ময়ে বললেন, 'কুন্তী! অর্জুনের মাতা!' কুন্তী যখন জানালেন তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের মতো আর একজনেরও জননী তখন কর্ণ ভাবতে শুরু করলেন এবং অর্জুন সহ আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর অর্থাৎ দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা তাঁর স্মরণে উদিত হলো। কুন্তী কর্ণকে প্রথম পার্থ রূপে অভিহিত করে কর্ণকে আলিঙ্গান করতে উদ্যত হলে কর্ণ তা গ্রহণ না করে পশ্চাদ্‌বর্তী হলেন। স্বীয় পরিচয় দানে বললেন, 'আমি, অধিরথপুত্র বৈকর্তন, রাধার সন্তান'। কুন্তী কোমল স্বরে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করলে কর্ণ উন্মুখর হলেন জিজ্ঞাসায়—

> রাজকন্যা কুন্তী আমার জন্মদাত্রী,

আমার পিতা সূর্যদেব।

—কিন্তু একি সত্য হতে পারে?

কুন্তী কর্ণকে বলেছিলেন, 'তুমি কুন্তীপুত্র, তুমি সূর্যের সন্তান'। তিনি সূর্যের সন্তান সেকথা শুনে বললেন:

কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা কিছু আছে সপ্রাণ
তৃণ, বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ—যারা পরস্পরকে আহার করে
বংশ পরস্পর বেঁচে থাকে, জন্মজন্মান্তরে ঘূর্ণিত হয়—
সূর্য তাদের সকলেরই পিতা, সকলেরই প্রতিপালক।
পশুর সংজ্ঞা যে কীট সেও তো সূর্যের সন্তান।

সূর্যের তেজঃপুঞ্জকে কোনো মানবীর, এমনকি দীপ্তিময়ী কুন্তীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে কর্ণ প্রশ্নমুখর হলে কুন্তী তাকে সবিস্তারে কর্ণেব জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। কর্ণ আবেগের সঙ্গো কুন্তীকে 'মা! আমার মা'! বলে সম্বোধন করে অত্যন্ত আবিষ্ট হলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি কুন্তীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন:

কিন্তু তারপর? আমার জন্মের পর?
কোথায় তুমি ছিলে তখন—আর কোথায় আমি?

কর্ণ যে চরিত্ররূপে মহান তার প্রমাণ পাওয়া যায় কর্ণ যখন তাঁর দুর্বাক্যের জন্য কুন্তীর কাছে মার্জনা প্রার্থনা করেন। কুন্তী তাঁর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উচ্চারণ করেন। কুন্তী কর্ণকে তাঁর উত্তরাধিকার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে কর্ণ তীব্র শ্লেষে তাঁকে বিদ্ধ করে প্রশ্ন করলেন তাঁর অভীষ্ট তাহলে পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি আর অর্জুনের আয়ু।

কুন্তী কোনো কিছু গোপন না করে সাধু, উৎপীড়িত পাণ্ডবদের হিতের জন্য যে এনেছেন তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিয়ে জানালেন যে তিনি কোনো কর্তব্যবোধে কর্ণের কাছে আসেননি; তাঁর আগমনের কারণ হলো রক্তের টান আর হৃদয়ের আদেশ। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এর মতো বুদ্ধদেবও অস্ত্র পরীক্ষার প্রসঙ্গ আনয়ন করেছেন তাঁর কাব্যনাট্য 'প্রথম পার্থে'। কুন্তী কর্ণের অপমানে আর্ত ব্যথিত হলেও সেই সভায় প্রতিবাদমুখর হতে পারেননি। কুন্তীর সমস্ত বক্তব্য, যুক্তি-তর্কের, আবেগের উত্তরে কর্ণ জানিয়েছেন:

আমি কারোরই নই। কাউকে আমি আমার বলে ভাবি না।
আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথম বৃদ্ধ অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে কুন্তীর বক্তব্য সমর্থন জানিয়েছেন যে, এই জন্মকথা কর্ণের মত মহাবলের পক্ষে যোগ্য, ধর্মত পাণ্ডু তাঁর পিতা এবং কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের পরমাত্মীয়। তবুও কর্ণ জানিয়েছেন যে তাঁর ধর্মের ক্রম মনুষ্যত্ব। কুন্তী কর্ণের মুনয্যত্ববোধের প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে 'ধর্ম অথবা অধর্ম, সত্য অথবা ব্যভিচার'-এর পথ বেছে নিতে বললেন। কর্ণ মনুষ্যত্বের বাণী উচ্চারণ করে জানালেন যে উপকারীর উপকার অস্বীকার করা কৃতঘ্নতার নামান্তর। রাধা তাঁর মাতা, অধিরথ তাঁর পিতা এবং দুর্যোধন কর্ণের হীনজন্ম সত্ত্বেও তাঁকে দিয়েছেন আতিথ্য।

সুতরাং সমাসন্ন দুর্যোগে তাঁদের পরিত্যাগ করা মনুষ্যত্বহীনতার নামান্তর মাত্র। সুতরাং তিনি কুন্তীকে প্রত্যাগমনের অনুরোধ জানালেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ কর্ণের 'দাতা কর্ণ' অভিধার প্রসঙ্গ তুলে কুন্তীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য আহ্বান জানালেও কর্ণ তাতে সম্মত হলেন না। কুন্তী শেষ বারের জন্য বঞ্চিত কর্ণকে মাতৃহৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার আকুল আবেদন জানালেন:

কর্ণ ফিরে এসো। এসো তোমার মাতৃহৃদয়ের স্বরাজ্যে
এসো তোমার স্বাভাবিক সাম্রাজ্যে, সিংহাসনে:
যেখানে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন যুধিষ্ঠির,
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধারণ করবেন,
নিত্য তোমার অনুগামী হবেন অর্জুন,
আর ষষ্ঠ কালে, আমার অনুমতি নিয়ে, রত্নে মাল্যে
ভূষিত হয়ে
তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন দ্রৌপদী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ কর্ণকে দ্রৌপদীর লোভ দেখাননি; বুদ্ধদেব বসু কিন্তু কুন্তীর সংলাপে কর্ণকে দ্রৌপদীকে পাওয়ার লোভ দেখালেন। মনে হয়, কুন্তী এখানে তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য চ্যুত হয়েছেন। কর্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় প্রত্যাখ্যানের অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেননি দীর্ঘকাল। সুতরাং তিনি কুন্তীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দ্রৌপদীর নাম তাঁর পক্ষে যন্ত্রণা। তবুও, কুন্তী পুনর্বার পুত্ররূপে তাঁকে সম্বোধন করে 'কাঙ্ক্ষিতা নারী' দ্রৌপদীকে গ্রহণের জন্য আবেদন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন—'পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী পাঞ্চালী—ধর্মত তোমারও ভার্যা'। কুন্তীর অনুরোধের পর কর্ণের অভ্যন্তর থেকে আবির্ভূত হল এক আত্মমর্যাদাবান মানুষ এবং সে মানুষ আধুনিকও বটে। কর্ণ যদিও অভিজাত বংশপরিচয়হীন তবুও আত্মমর্যাদায় যে দীপ্ত দীপ্র যুক্তিবাদী বীর, শুধু রণক্ষেত্রে নয়—তাঁর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রেও। কর্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত হল ব্যক্তিগত কর্ণের নয়; সমগ্র নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের বেদনাময় অথচ পৌরুষমণ্ডিত গভীর জীবনদর্শনমণ্ডিত মন্দ্রিত সংলাপ:

'ধর্মত'! 'ধর্মত'! আর শুনতে চাই না 'ধর্মত'।
আমি চেয়েছিলাম জয় করতে দ্রৌপদীকে—নিজের জন্য—একান্তভাবে—
কিন্তু পারিনি—আমার শক্তির অভাবে না, আপনার ধর্ম সুপ্ত ছিলো বলে।
আর আজ আমাকে ষষ্ঠাংশে তার পতি হতে বলছেন?
—না!
আমার কাম্য নয় কোনো নারী—কোনো রাজত্ব—
যা বিনা চেষ্টায় জন্মসূত্রে প্রাপনীয়,
আমার গ্রাহ্য নয় অনর্জিত কোনো উত্তরাধিকার।

কুন্তীর একমাত্র ভয় হল ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার যুদ্ধ, দুই সহোদর, দুই পুত্র মুখোমুখি সংগ্রামে, অস্ত্র হাতে নিয়ে দুরন্ত সংগ্রাম আর বীভৎস হত্যা, যা কুন্তীর পক্ষে ভীষণ—

আর্তিময়—মর্মান্তিক। শুধু কুন্তীর পক্ষে নয়, কর্ণের পক্ষেও তা মর্মান্তিক। কুন্তীর অনুরোধ উপেক্ষা করলেও কর্ণ তাঁকে স্নেহসিক্ত জন্মদাত্রী, রাজ্ঞী, নেত্রী ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে প্রত্যাগমন করতে বললে কুন্তী নিজেকে 'অনুতপ্তা মাতা' রূপে অভিহিত করে বিদায় নিলেন। অবশ্য তিনি উভয়ের ভবিতব্য সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়ে প্রস্থান করলেন।

হতোদ্যম, ব্যর্থকাম, ভবিতব্য সম্পর্কে সংশয়ান্বিত কুন্তীর প্রস্থানের পর দ্রৌপদীর প্রবেশ। দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে দ্রৌপদীর প্রবেশ সম্পর্কে পাঠক/দর্শক জানতে পারেন। বুদ্ধদেব বসু দ্রৌপদী সম্পর্কে কতকগুলি যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা তাঁর রূপ ও স্বভাববৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের অবগত করালেন। দ্রৌপদী সতর্ক, নীলবসনা, শ্যামাঙ্গী, কান্তিময়ী, পদ্মগন্ধা; তিনি চিত্তহারিণী। প্রথম বৃদ্ধের দৃষ্টিতে আলোকলক্ষণা, কৃশা বা স্থূলাঙ্গী নন, অতিকৃষ্ণা বা রক্তবর্ণা নন, তেজস্বিনী এবং সুভাষিণী। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় বুদ্ধদেবের সেই স্মরণীয় কবিতাটি 'রোদনরূপসী'—যেখানে দ্রৌপদীর বর্ণনা 'প্রথম পার্থ'-র দ্রৌপদীর বর্ণনার প্রায় অনুরূপ। পাঞ্চালী যেমন 'মনস্বিনী' বৃদ্ধদের কাছে, তেমনি কর্ণও তাঁদের কাছে 'আর্তের তিনি বন্ধু'। দ্রৌপদী যখন তাঁদের সভায় কর্ণ কর্তৃক তাঁর অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে একজন 'স্বয়ংবর সভায় কর্ণের প্রত্যাখ্যান' ও 'যজ্ঞভূমি থেকে কুক্কুরের মতো প্রত্যাখ্যানে'র কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বিস্মৃত হলেন না। কর্ণের নানা দোষের প্রতি ইঙ্গিত করলে বৃদ্ধরা রামচন্দ্র, ইন্দ্র প্রমুখের অপরাধ ও দোষের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বিরত হননি। দ্রৌপদী যখন প্রশ্ন করেন দুর্যোধনের মিত্র কি সজ্জন হতে পারেন তখন বিভীষণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ তুললেন দ্বিতীয় বৃদ্ধ।

এরপর বৃদ্ধদের অনুমতি নিয়ে দ্রৌপদী কর্ণের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে কোমলস্বরে কর্ণ সম্বোধনে আহ্বান করলে কর্ণ বিমূঢ়ভাবে তাঁর দিকে তাকালেন—'তুমি...পাঞ্চালী?' কর্ণ দ্রৌপদীকে নিয়ে পূর্বতন স্মৃতিচারণায় প্রবৃত্ত হলেন। দ্রৌপদী প্রকৃতির এক রোমান্টিক নির্জনতায় যখন কর্ণের সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের কথা বললেন তখন কর্ণ তাঁকে বাস্তব জগতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাজধানী, প্রাসাদ, রাজন্য, চক্রান্ত, সংঘর্ষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। এখানে কর্ণের বাস্তবোচিত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর মনে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সংশয়—যদিও কৃষ্ণের বক্তব্যে বিশ্বাসী যাজ্ঞসেনী মনে করেন পাণ্ডবের জয় নিশ্চিত। সমাসন্ন যুদ্ধের লোকক্ষয়, বিপদ সম্পর্কে কর্ণকে ওয়াকিবহাল করিয়ে প্রশ্ন করলেন অন্তরঙ্গ সুরে:

> তুমি কুরু বংশের কেউ নও, কোনো রাজবংশের কেউ নও,
> এই যুদ্ধে তোমার স্থান কোথায়?

কর্ণ বেদনামলিন হাসির সঙ্গে তাঁকে জানালেন:

> আমার মর্মকথা তুমি প্রকাশ করলে, পাঞ্চালী।
> আমিও তাই ভাবি মনে-মনে: আমি কে?
> পাণ্ডব নই, কৌরব নই—
> অনাত্মীয় এক আগন্তুক, কালস্রোতে ভাসমান এক পাত্র,
> নির্বন্ধে ভরা, নিরুদ্দেশ, জল আর বাতাসের বেগে চালিত।

এক অনাহুত অতিথি আমি হস্তিনাপুরে,
কুলগোত্রহীন, নিষ্প্রয়োজন,
দৈবক্রমে কুরুবংশের কাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট—
যা আমার ভুলে, যেহেতু
আমিও নিয়েছিলাম যোদ্ধার বৃত্তি—সূতপুত্র হয়েও।
চেয়েছিলাম
অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে
কোনো-একদিন, কোনো-এক স্বয়ংবর সভায়।

দ্রৌপদী স্মিতহাস্যে জানালেন তাঁকে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হলেও তাঁর সঙ্গে অর্জুনের সাদৃশ্য লক্ষ করে বললেন: 'তোমাকে অর্জুনেরই আত্মীয় বলে মনে হয়।' দ্রৌপদী এবার উচ্চারণ করলেন সেই সংলাপ যেখানে অর্জুন ও কর্ণের সাদৃশ্য সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী:

একথা কেউ আগে তোমাকে বলেনি?
তোমার হাসিতে, হাতের ভঙ্গিতে,
কখনো তোমার কণ্ঠস্বরে, ওষ্ঠরেখায়—
স্পষ্ট নয়, কিন্তু আচম্বিতে ধরা পড়ে সাদৃশ্য,
যেন দুই ভাই তুমি আর অর্জুন।

দ্রৌপদী তাঁকে স্বয়ংবর সভার কথা, কর্ণ যখন দ্বারপথে স্বয়ংবর সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন তখন দ্রৌপদীর দৃষ্টি ইত্যাদি স্মরণ করালে কর্ণ পাঞ্চালীকে জানালেন, 'ভালো নয় নতুন করে বেদনা জাগানো।' যাজ্ঞসেনী কুরুসভায় তাঁর লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কর্ণ প্রত্যুত্তরে যথাযথ ঘটনা বিবৃত করেন। অনেক যুক্তিজাল বিছিয়ে দিলেও কর্ণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হলো না। কর্ণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পূর্বের মত দ্রৌপদীকে জানালেন যে, তাঁর কেউ মিত্র নেই, তাঁর কোনো শত্রু নেই। তিনি স্বাধীন, তিনি নিঃসঙ্গ। তিনি, 'শুধু অপেক্ষামান সেই মহান, নিষ্করুণ পরীক্ষার জন্য।'—যার মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মপরিচয় প্রকাশিত ও প্রমাণিত হবে।

যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর নিষ্ক্রমণ ঘটলে এবার মঞ্চে প্রবেশ করলেন স্বয়ং কৃষ্ণ—যিনি অর্জুনের সখা, কিন্তু দুর্যোধনের সহায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃদ্ধ এখানে যেন অনেকখানি নিয়তিতত্ত্বে বিশ্বাসী; তাঁদের উক্তিতে তা প্রমাণিত—

প্রথম বৃদ্ধ: হয়তো সবই স্থির হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ: হয়তো যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে।

কৃষ্ণ তাঁকে বুদ্ধিমান বলেছেন। কৃষ্ণ কর্ণের কাছে কয়েক মুহূর্ত সময় চাইলে কর্ণ কৃষ্ণকে জানালেন—'তোমার যে কোনো বাক্য শুনতে আমি উৎসুক।' কৃষ্ণ যদিও জানেন যে কর্ণকে কেউ সংকল্প থেকে টলাতে পারবেন না তবুও তিনি তাঁকে যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনকালে কর্ণ যেন নবযুবক, মাতৃস্নেহলিপ্সু এবং নারীর

সঙ্গকামনায় চঞ্চল। বীর কর্ণ, দাতা কর্ণ, অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর কর্ণ যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন এবং ভেবেছেন—তাহলে তিনি বোধহয় সুখী হতেন। কৃষ্ণের যুক্তি জালে অতৃপ্ত কর্ণ এই যুদ্ধকে মহাকালের প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত বলে জানালেন। কর্ণ কৃষ্ণের বক্তব্যে চমকে উঠে তীব্র স্বরে কৃষ্ণকে কুটিল, কপট, চতুর রূপে অভিহিত করে প্রশ্ন করলেন—'আমাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে হবে?' কৃষ্ণ তাকে জানালেন মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর এই প্রার্থনা এবং কর্ণ তাঁর ভূমিকা পরিবর্তন করলে মানবসভ্যতার মুক্তি ঘটবে অকল্যাণের রাহুগ্রাস থেকে। কর্ণ ধ্বংসের দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। কৃষ্ণকে তিনি জানালেন তাঁর একমাত্র লক্ষ অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কৃষ্ণ তাঁকে স্মরণ করিয়েদিলেন, 'হত ও হন্তা একই গর্ভের সন্তান।' কৃষ্ণ তাঁকে দ্বিখণ্ডিত হৃদয় বলে এক অংশে ভালোবাসার, অন্য অংশে শত্রুতার কথা বললে কর্ণ জানালেন—

শত্রুতা? কে বলে শত্রুতা?
প্রেম, কৃষ্ণ, তীব্রতম প্রেম!
ঘনিষ্ঠতম ভ্রাতৃত্ব, নিবিড়তম মিলন।

তিনি অবিচলিত প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন:

সমাপ্তি — শান্তি — নির্বাপন
হয় অর্জুনের, নয় কর্ণের।

কৃষ্ণ তাঁকে ভয়ংকর যুদ্ধের মহাপরিণামী ফল, অমোঘ অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে বললেন যে, মায়াবলে 'তাঁর রথচক্র মেদিনীগ্রস্ত হবে, পরশুরাম প্রদত্ত দিব্যাস্ত্রের নাম সে বিস্মৃত হবে, বজ্রতুল্য অঞ্জলিক বাণের আঘাতে তার ছিন্ন শির মিলিয়ে যাবে ঊর্ধ্বাকাশে।' কৃষ্ণ কর্ণকে পথ বেছে নিতে বললেন—একদিকে আছে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের পথ; আর একদিকে অমরত্বের পথ:

অর্জুন আমার আশ্রিত হতে পারেন, কিন্তু তুমি আজ নির্বাচিত।
আমি রচনা করেছি তোমার জন্য এক উপহার—
তোমারই মতো বীরের যা যোগ্য,
আর যার যোগ্য তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই—
শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সর্বশেষ সাফল্য,
এক অন্তিম ও অন্তহীন অভিনন্দন,
এক মৃত্যু, যাতে আহত হবে সর্বযুগ,
এক অমরতা, দিনে দিনে উজ্জ্বলতর।
কিন্তু তুমি যদি গ্রহণ করতে না চাও, তবে বলো।

কর্ণ কৃষ্ণের এমন অভাবনীয় অচিন্তনীয় প্রস্তাবে সম্মত হলেন। যদিও তিনি তখনও উন্মন:

এক আশাতীত সম্মান দিলে আমাকে
আমার জন্য তুমিও হবে কুচক্রী,

নেপথ্য ছেড়ে নেমে আসবে মঞ্চে,
হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—তুমি! অর্জুনের প্রচ্ছদে।
আমার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্ত,
আমার সব বাসনার তৃপ্তি,
আসার সব স্বপ্নের সফলতা—
তা আমাকে উপহার দেবে—অর্জুন নয়—তুমি—
তুমি কৃষ্ণ, যাকে কেউ কেউ বলে নরশ্রেষ্ঠ—বিশ্বম্ভর!
আমি সম্মত, আমি আনন্দিত, আমার
পরাজয়ে আমি ধন্য।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সকলেই পরাজিত হবে—'জয়ী বিজিত, হত, উদ্বৃত্ত সকলেই'। কিন্তু একমাত্র কর্ণ—তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে—চিরকাল
এক ভাস্বর, মহান, পরাজিত বীর।

কর্ণ মৃত্যুর মূল্যে বেছে নিলেন মহত্ত্ব। আর এইখানেই কর্ণ স্বপ্রভ, উজ্জ্বল, মহনীয়। কালের যাত্রায় ব্যথিত, কালস্রোতে ভাসমান মহান বীর চরিত্র মানুষের হৃদয়সিংহাসনে চিরকালের জন্য সমাসীন হলেন। কৌরবরা পরাজিত, কৌরব পক্ষ হতোদ্যম, কিন্তু পাণ্ডবরা বেদনার্ত, বিচলিত; কুন্তী সন্তান হারানোর বেদনায় আর্ত, কাতরা, দীর্ণা। দ্রৌপদীও ক্ষণেক নয়নাশ্রুতে তর্পণ করলেন কর্ণের জন্য। মহাভারতের মহান ট্র্যাজেডির বীর নায়ক কর্ণ মানুষের অশ্রুতে হাহাকারে অর্কপ্রভ দীপ্তিতে বিরাজিত রইলেন মহান কালস্রোতে, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দীর্ণ জীবনসংগ্রামে, বেদনার অনতিক্রম্য সোপানে: "মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের ওপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—এক হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র, অসহায় বিপন্ন, কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন! ...সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা রোদ মাখানো গাছটির দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যে ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে টানিয়া তুলিতেছে ...রোজই তোলে — রোজই তোলে — মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ। ...বিজয়ী বীর অর্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের ওপর হইতে বাণ ছুড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ—যে মানুষেব চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।"

(পথের পাঁচালী: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: অন্তরঙ্গ পাঠের আলোকে

শেষের রাত্রি

বুদ্ধদেব বসুর 'শেষের রাত্রি' কবিতাটি 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটির সমাপ্তিতে লেখা আছে ১৯৩১-৩৭। 'কঙ্কাবতী' প্রথম প্রকাশিত হয় জুলাই, '৩৭-এ। তখন কবিতার সংখ্যা ছিল পঁচিশ। ১৯৪৩-এ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন কবিতার সংখ্যা ছিল আটত্রিশ। তৃতীয় এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-তে। কবিতার সংখ্যা তেতাল্লিশ। ১৯৩৭-এ 'কঙ্কাবতী' প্রথম প্রকাশিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থের রচনারম্ভ ১৯২৯-এ। 'শেষের রাত্রি' কবিতাটি 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও এর সৃষ্টির পটভূমিকা একটু ভিন্নতর। এবং কেন এই কবিতাটির শেষে ১৯৩১-৩৭ লেখা আছে তার কারণও বোঝা যাবে যদি আমরা 'কবিতা ও আমার জীবন: আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ' লক্ষ করি। বুদ্ধদেব বসু এই অংশে আমাদের জানাচ্ছেন—"বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী', 'নতুন পাতা'র কবিতাগুলো আমার সতেরো থেকে পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। ...'কঙ্কাবতী'র 'শেষের রাত্রি' কবিতাটা প্রথম স্তবকের পর অনেকদিন এগোয়নি। সেটি লিখেছিলাম আমার ঢাকার জীবনের শেষ দফায়—তারপর কলকাতায় এসে বাসা বাঁধলাম, বিয়ে করলাম, আমার প্রথম সন্তান ও 'কবিতা' পত্রিকা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হল। ততদিনে সেই প'ড়ে-থাকা স্তবকটিকে হয়তো ভুলেও গিয়েছিলাম, অন্তত পুরোনো খাতার পাতা ওলটাতে আর লুব্ধ হইনি—মনে প'ড়ে গেলো যখন 'কঙ্কাবতী' বই ছাপবার তোড়জোড় চলছে। বইয়ের শেষ কবিতা হিসেবে এটা নেহাৎ মন্দ হবে না মনে হলো—তারই তাগিদে আরো কয়েকটা স্তবক তৈরি করে কবিতাটাতে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম"।[১]

'তৈরি ক'রে' কথাটি বুদ্ধদেব যথার্থ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কেন-না কবি তখন আর পুরানা পল্টনের আবহাওয়ায়, 'কঙ্কাবতী'র আবহাওয়ায় বাস করছেন না। কবি পুরানা পল্টনের প্রান্তর, বাতাস, চন্দ্রোদয় আর তারার আলো থেকে ভৌগোলিকভাবে যে দূরে চ'লে এসেছেন তাই নয়, মনের দিক থেকেও তিনি ভিন্ন পথের যাত্রী। তবু পাঁচবছর আগেকার সুরে সুর মেলাতে কবির অসুবিধা হলো না, এবং এ অভিজ্ঞতাটি বুদ্ধদেবের পক্ষে নতুন।—"এতদিন আমার কবিতা ছিলো চলতি মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে-আসা—আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন যা গ্রহণ করছি, অথবা যে সব আবেগ আমাকে নাড়া দিচ্ছে, আমি সেগুলোকেই আমার উপাদান ব'লে জেনেছিলাম, কিন্তু 'শেষের রাত্রি' শেষ করতে গিয়ে মনে হ'লো আমাদের কল্পনা অনেক বেশি স্বাধীন।"[২] 'কঙ্কাবতী' মূলত প্রেমের কাব্য এবং 'শেষের রাত্রি' কবিতাতে সেই প্রেমভাবনার সুর আদ্যন্ত ধ্বনিত। 'কঙ্কাবতী' প্রথম সংস্করণের আলোচনাকালে জীবনানন্দ লিখেছিলেন—"বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' প্রেমের কাব্য।...এই কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন।...আমাদের মুখ্যতম কবিদের সঙ্গে বুদ্ধদেব সেই কবি যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন,

—সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে 'কঙ্কাবতী'; মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য।"[৩] 'শেষের রাত্রি' কবিতার নায়িকা কঙ্কা—কঙ্কাবতী; এই নামটিতে রয়েছে রূপকথার স্পর্শ এবং এই কবিতায় দেশজ লোকসাহিত্যের সঙ্গে কবির যোগ হয়েছে নিবিড়। শুধু দেশজ লোকসাহিত্য নয়, "'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে বুদ্ধদেব দেশজ-চলিত-কথ্য ভাষার প্রয়োগ শুরু করলেন, এবং কথ্য ভাষার মধ্য থেকে নিষ্কাশন করে আনলেন সুন্দরতা। এই প্রথম তাঁর আঙ্গিকচেতনার আধুনিকতা শুরু হ'লো। ...বুদ্ধদেবের রোমান্টিকতা এখানে উত্থিত হল গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য থেকেই।"[৪] বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতা সম্পর্কে উল্লিখিত সূত্র দুটি যথার্থ হলেও উক্ত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'শেষের রাত্রি' কবিতা সম্পর্কে এর যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। যদিও 'কঙ্কাবতী'র অন্যান্য কবিতায় দেশজ-চলিত-কথ্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন, তবুও 'শেষের রাত্রি' কবিতায় শব্দগত প্রয়োগ মূলত তৎসম। কবিতাটিতে মোট সাতটি স্তবক আছে। সাতটি স্তবকের প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করলে আমরা সেখানে তৎসম ও দেশজ শব্দের যে তালিকা খুঁজে পাই, তাতে তৎসম শব্দের দিকেই পাল্লা ভারী।

প্রথম স্তবক—যেইখানে, খালি, মুখে, ঘুরে ঘুরে, যায়, পরে, ঢাকা, মতো, তবু, চলে, এসো, কোরো না ইত্যাদি ব্যতীত বাকি সমস্তই তৎসম; কয়েকটি মাত্র তদ্ভব শব্দ আছে।

দ্বিতীয় স্তবক—মতো, নেমে, মুখে, এসেছে, মতন, ঘুমায়, থেমে, থেকে, খাঁ খাঁ, তবু, চলে এসো, কোরো না ইত্যাদি ব্যতীত সমস্তই তৎসম শব্দ।

তৃতীয় স্তবক—নেমেছে, হাজার, ভেঙে ভেঙে, চলো, আড়াল, বাঁকা, যেথা, মতো, চোখ, তবু, চলে এসো, ইত্যাদি দেশজ লোক-প্রচলিত শব্দ।

বাকি স্তবকগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, 'শেষের রাত্রি' মূলত তৎসম শব্দপ্রধান কবিতা। এই কবিতায় কবি এলোমেলো, হলদে, মাড়ায়ে, আঁকাবাকা প্রভৃতি শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করলেও কবির প্রবণতা রয়েছে তৎসম শব্দের প্রতি। 'শেষের রাত্রি' কবিতাটিতে তৎসম শব্দের এমন ব্যাপক ও বহুল ব্যবহারের কারণ মনে হয় কবিতাটি রচনার ব্যাপারে দীর্ঘ সময়ক্ষেপ। অন্যান্য কবিতায় কবি যখন 'লালপেড়ে শাড়ি' (সুখান্বেষী) / 'মাছের মতন ফেরা' (মধ্যবর্তী) / 'ছোটো টুলে বসে থাকো' (কোনো মেয়ের প্রতি) / 'তোমার শাড়ির রং', 'আঁচল আঁটার ঢং' 'ঠোঁট দুটি গোল করে তুলে' (অন্য কোনো মেয়ের প্রতি) / 'খসখসে চুলগুলি' (চুল)। 'পাদুখানি ফেটে গেছে তার', 'পাদুখানি লাল তার লাল আলতায়' (রূপকথা) 'ফুরফুরে ঠোঁট', 'ঠোকরাই পাখির মতো' (গান) / 'ঠোঁটে-ঠোঁটে ঠুকঠুক মিঠে পাখিপনা' (কিছুই প্রেমের মত নয়)—প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন ও দেশজ লৌকিক শব্দের সৌন্দর্য অন্বেষণে সচেষ্ট হন, তখন 'শেষের রাত্রি' কবিতায় তৎসম শব্দের বাহুল্য পাঠককে বিস্মিত করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে—আরশি, সেরিনাড, কঙ্কাবতী, কবিতা, প্রেমিকের প্রার্থনা, শেষের রাত্রি প্রায় এক প্যাটার্নের কবিতা। মনে হয় এ জাতীয় কবিতার দেহগঠন দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যয়গত পরিকাঠামোর উপর। 'শেষের রাত্রি' কবিতার শেষের দিকে বুদ্ধদেব যতই অগ্রসর হয়েছেন, ততই লৌকিক শব্দের ব্যবহার কমতে আরম্ভ করেছে। কবি ক্রমশ 'পরিক্রমণ', 'দিগন্ত',

'উন্মাদনা', 'জ্যোতি', 'মরণপুঞ্জ', 'বিদ্যুৎময় দীপ্ত', ছিন্ন, বিরহ প্রভৃতি শব্দের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

'শেষের রাত্রি' কবিতায় 'মতো' উপমাবাচক শব্দটি ১১ বার এবং 'মতন' উপমাবাচক শব্দটি ৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'মতন' শব্দটি কিন্তু কোনো বারেই 'মতো' শব্দের ন্যায় অন্ত্যমিলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; 'মতো' শব্দটি চতুর্থ স্তবকে ১ম ও ২য় পঙ্ক্তিতে অন্ত্যমিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। 'তবু' অব্যয়বাচক শব্দটি তিনবার সাপেক্ষতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য কবিতার ধ্রুবপদ সম্ভবত 'কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না'। এই ছত্রটি বারবার কবিতায় আবৃত্ত হয়ে প্রেমিকাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছে। কবি এখানে প্রেমিকাকে হাতে হাত দেওয়ার জন্য যে অনুরোধ করেছেন তাতে নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে যৌনচেতনাকেও যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষণ ব্যবহারে বুদ্ধদেব এখানে কোনো উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিশেষণের তালিকা প্রমাণ করে যে, বুদ্ধদেব বিশেষণ ব্যবহারের প্রচলিত গণ্ডি উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

'শেষের রাত্রি' কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষণ তালিকা—**ঘনকালো** অন্ধকার / **বিশাল** আঁধার / **বিশাল** আকাশ / **ক্লান্ত** শিশু / **ক্লান্ত** সময় / **দূর** দিগন্তে / **ধূসর** পৃথিবী / **অসীম** বাসনা / **হলদে** পাতা / **পীত** স্মৃতি / **এলোমেলো** প্রেত / **কুটিল** শাখা / **ধূসর** স্মরণ / **উজ্জ্বলবিশাল** বন্যা / **মনোহীন** তমো / **আদিম রাতের**।—'পীত স্মৃতি' এবং 'এলোমেলো প্রেত' ব্যতীত বিশেষণ ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধদেব প্রথাবদ্ধতায় আবদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে, 'শেষের রাত্রি' কবিতায় বুদ্ধদেব দেশজ লৌকিক ও কথ্যভাষার প্রয়োগ করেননি। তাঁর উপায়ও ছিল না। কেন-না গার্হস্থ্য জীবনের মধ্য থেকে এখানে রোম্যান্টিকতা উত্থিত হয়নি। 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর এখানে প্রকাশিত। এ কবিতায় 'ম্লান মানুষের বেদনার কথা নেই'-এ কবিতা কোনো বিদ্রোহের কবিতাও নয়। 'শেষের রাত্রি' 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের প্রাসঙ্গিক কবিতা—কেন-না এ কবিতার আধুনিকতা হল চিরন্তনের আধুনিকতা, কোনো কৃত্রিমতার আধুনিকতা নয়। 'কঙ্কাবতী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের বক্তব্যকে যদি 'শেষের রাত্রি' কবিতা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়, তাহলে বোধহয় ভুল হয় না— "যাঁরা সময় ও সৃষ্টিকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তবুও আরো ভগ্নাংশে পরিণত করতে চান, সময় ও সৃজনের মুখের রূপ তা না হ'লে দেখতে পারবেন না ব'লে, তাঁদের প্রীতির জন্য সৃষ্টি ও সময় নিজেদের ব্যবহার ভুলে যায় না—মানুষের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছতম শতাব্দীর কোনো একটা তুচ্ছতম দিনকে তুচ্ছতম শতাব্দীর তুচ্ছতম দিন ব'লেই মনে করে শুধু সেই সব দারুণ মাস্তুলের কর্ণধারগণ;—যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো কোনো মানুষের মন এককণা বালির ভেতর সমস্ত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে, স্বর্গ খুঁজে পায় একটি ঘাসফুলের ভেতর, হাতের তেলোর ভেতরই যেন পায় সীমাহীনতাকে এবং অনুপলের ভেতরেই সময়হীনের আস্বাদ পায়।"[৫] 'শেষের রাত্রি' হল হাতের তেলোয় সীমাহীনতাকে আর অনুপলের ভিতরে সময়হীনতার আস্বাদ পাওয়ার কবিতা।

চিল্কায় সকাল

কবিতা হতে পারে অনন্ত মুহূর্তের এবং চলতি মুহূর্তের। 'চিল্কায় সকাল' হল চলতি মুহূর্তের কবিতা। বুদ্ধদেব বসু এ কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন—"চলতি মুহূর্তের কবিতা বলে কি বুঝি তার একটা উদাহরণ দিই। চিল্কায় সকাল কবিতাটি সত্যই চিল্কায় ধারে ব'সেই লিখেছিলাম, সত্যি এক সকালবেলায়—আমার জীবনের নিবিড় এক আনন্দের মুহূর্তে। যেন মুহূর্তটিকে হাতে হাতে গ্রেপ্তার করে ফেলেছিলাম, তার সব সবুজ গন্ধ আর সজলতা সুদ্ধু—তাকে শুকিয়ে যাবার সময় না দিয়ে, নিজেকে অন্য কোন দিকে ফিরে তাকাবার সময় না দিয়ে। *** 'চিল্কায় সকাল' যা-কিছু আছে সবই সেই মুহূর্তে দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েছিলা। 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি 'নতুন পাতা' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই ১৯৩৩-৩৯ এর মধ্যে লেখা; বেশিরভাগই লেখা হয়েছিল ১৯৩৩-৩৪-এ। 'চিল্কায় সকাল' 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং কবিতাটি গদ্যে লেখা। কবিতাটি রচনার শেষে স্থান ও কালের উল্লেখ করা হয়েছে ১১ নভেম্বর ১৯৩৪, চিল্কা। কবিতাটি সাতটি স্তবকে সমাপ্ত; প্রথম স্তবকটিতে মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তি—কবিতার ভূমিকারূপে ব্যবহৃত। ২৯ পঙ্‌ক্তির কবিতাটিতে ধ্রুবপদ হল—'কেমন ক'রে বলি'।

'নতুন পাতা' পূর্ববর্তী হল নবযৌবনের আরক্ত সংরাগ চঞ্চল প্রেমোন্মাদনার কাব্য 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭)। 'নতুন পাতা' বুদ্ধদেবের রোম্যান্টিক মনের কামনাঘন প্রেমানুভূতির বেদনামাধুরীর কাব্য। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি কবির মনোবিকাশের স্তর পরম্পরার এক সংগতিমধুর পরিণাম। কবি জীবনের প্রেমাবেগের পথে জন্ম-মৃত্যুর আশ্চর্য রহস্যের সম্মুখীন হয়েছেন। এবং রক্তমাংসের শরীরকেন্দ্রিক প্রেমমাধুর্যের উন্মোচিত নানা স্তর কবিকে নানা পর্যায়ের সম্মুখীন করিয়েছে—এই পর্যায় কখনও ব্যাকুল, কখনও অভিমানী আবার কোনো বা পুলকশিহরিত আনন্দঘন, কখনও বা স্বচ্ছন্দ প্রসন্নতার উজ্জ্বলতায় দীপ্ত।

'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি একই সঙ্গে সৌন্দর্য ও প্রেমের কবিতা—অবশ্য দুটিই অবিচ্ছেদ্য। কবির কাছে চিল্কায় সকাল অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত যেন এক শিল্পিত সৌন্দর্যের বিকাশ। এবং এই সৌন্দর্যের শিল্পী হল কবিপ্রিয়ার প্রতি কবির অপরিম্লান অমেয় ভালোবাসা। কবি এখানে প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারি। নিসর্গের এক আশ্চর্য মায়াময় পরিবেশে প্রেমিকার ঘন সান্নিধ্যে কবি প্রেমের পরিপূর্ণতার আনন্দানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কবিতাটিতে কবির আবেগ, উত্তাপ, চেতনা রোমাঞ্চ শিহরণে আবেগস্পন্দিত ভাষায় আবেশবিহ্বল কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। কবিতাটির সুর অলংকারহীনতায়, প্রকাশের দিক অত্যন্ত ঋজু এবং কবি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত বিহ্বলতার বর্ণনা প্রদান করেছেন। কবিতাটির মূল বক্তব্য—'কেমন করে বলি।' এযেন ভালোবাসার কানায় কানায় ভরে ওঠা কবিমনের নিরলংকার অথচ ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্যবাহী সহজানন্দের অনির্বচনীয় মন্ত্রোচ্চারণ; সহজতার আনন্দকে পরম মমতায় উচ্চারণ করা। সংহত অথচ আবেগপ্রবণ এই বাক্যাংশটি একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে। কবির কাছে নিঃসীম, নির্মল নীলকাশের সৌন্দর্য অসহ্য সুন্দর—আর এই বিশেষণ ব্যবহারে সৌন্দর্যানুভূতির উপর যেন একপ্রকারের তীব্রতার প্রকাশ ঘটে। আবার সঙ্গে সঙ্গে কবি আকাশজুড়ে দেখতে

পান এক পরম স্তব্ধতা—যে স্তব্ধ আকাশ গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তানের মতো। কবিতার এই অংশে আকাশের প্রশান্তির অনুভূতি এবং অসীমতার ব্যাপ্তি যেন কবিচিত্তে নিঃসৃত হয়। ভালোলাগার অনুভূতি কবিকে বিহ্বল করে তোলে। নিসর্গ পরিমণ্ডল কবির দৃষ্টি ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দান করে। কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা সবুজ পাহাড়, আর তার মধ্যে ঝলকিত চিল্কার আলোছায়া এক মায়াময় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এমনি এক নিসর্গ পরিমণ্ডল পটভূমিকায় কবির প্রেমিকা এসে কাছে বসেন। কবির দৃষ্টি নিসর্গ পরিমণ্ডল থেকে নিবদ্ধ হয়ে প্রেমিকার প্রতি—এখানে কবি তাঁর প্রেমিকার গতিবিধির টুকরো টুকরো বিবরণ প্রদান করেন। আবার এক গভীর ভালোবাসার আবেগে উচ্চারণ করেন "কী ভালো তোমাকে বাসি, কেমন করে বলি", ছত্রটিতে কবির প্রেমানুভূতির অনির্বচনীয়তা, গাঢ়তা এবং তীব্রতা নির্দেশিত হয়।

কবি আবার নিসর্গ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সেই প্রকৃতিতে তখন সূর্যের বন্যা—বিশাল পৃথিবীর বুকে সূর্যের প্রচণ্ড কিরণ তার অপার্থিব দ্যুতির উদ্দাম প্রবাহ নিয়ে যেন ভেসে আসছে। আবার তার বিপরীত চিত্র—একপাল গোরু একমনে শান্তশিষ্টভাবে ঘাস ছিঁড়ছে। কবি কখনও ভাবতে পারেননি যে এই হ্রদের ধারে বসে তাঁরা এতদিন যা পাননি, তারই প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর হবেন। আলোচ্য স্তবকটিতে সীমা এবং অসীমের চিত্র যেন এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত। বিশালতা-ক্ষুদ্রতা, সীমা-অসীম, চপলতা-অচপলতা, তীব্রতা-শান্তি সমস্তই যেন একাধারে বিধৃত। কবির এই সীমা-অসীমের ব্যঞ্জনবোধের সঙ্গে আছে প্রেমিকা সম্পর্কিত অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির বিস্ময়াবিষ্ট সুখানুভূতি। আর এই বিস্ময়াবিষ্ট সুখানুভূতিতে নিহিত থাকে রোম্যান্টিক কবিমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তী স্তবকে কবি আকাশ এবং হ্রদের জলের অপরূপ মিলন লক্ষ করেছেন। কবির চোখে ধরা পড়েছে রূপোলি জলের শুয়ে শুয়ে স্বপ্নদেখা আর তার বুকের উপর সূর্যের চুম্বনে সমস্ত আকাশ নীলের স্রোত ঝরে পড়ছে। এই স্তবকটিতে যেমন তীব্র ইন্দ্রিয়বাসনার সংরাগ আছে তেমনি আর এক বিস্ময়বিহ্বল জিজ্ঞাসাও আছে।—"এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু / তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে / কখনো কি ভেবেছিলে?" কবি আর তাঁর প্রেমিকার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে এখানে প্রকৃতির চিত্রকল্প যেন ধীরে ধীরে মানবীয় চিত্রকল্প এবং সুখানুভূতিতে রূপায়িত হচ্ছে। কবি এরপর স্মৃতিচারণায় রত। চিল্কায় নৌকা করে যেতে যেতে কবি দেখেছিলেন দুটি প্রজাপতির উড়ে আসা—কবি আর প্রেমিকা সবিস্ময়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিলেন। তাদের সেই দুরন্ত দুঃসাহস কবি-প্রিয়াকে হাস্যোদ্বেল করেছিল। তাঁর উদ্‌বেলিত হাস্যরাশিতে আর একটি সৌন্দর্যের জগৎ প্রতিভাত হয়েছিল। দুটি প্রজাপতিকে উড়ে আসতে দেখার অপরূপ উপভোগ্যতায় সুখ সঞ্চারিত হয়েছিল প্রেমিকার দেহ-মনে-নয়নে। কবি সেই অপরূপ সুখাবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তাঁর প্রেমিকার নয়নে—যেখানে মানবসংসারের জন্মমৃত্যুর কত না রহস্য লুক্কায়িত। কবি তার প্রেমিকার চোখে অনন্ত আকাশকে কম্পিত হতে দেখেন আর জীবনের অসীম রহস্য কবিদৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। প্রেমের এই সীমাহীন সৌন্দর্য, অতলান্ত, রহস্য, সুদূরের বিস্ময়, ব্যাকুলতার বেদনা, তৃপ্তিহীন

স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের সহজতা, অন্তর্বর্তী গ্লানিহীন শান্ত সুখের অনুভব ইত্যাদি রোম্যান্টিকতার বিশিষ্টতায় কবিতাটি দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

'চিল্কায় সকাল' প্রকৃতপক্ষে একটি নিসর্গ-বিষয়ক কবিতা। কেন-না চিল্কাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি কবির দৃষ্টিতে যে রূপে প্রতিভাত তারই এক নিপুণ বর্ণনা আলোচ্য কবিতার দেহে পরিব্যাপ্ত। কবিতাটির স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য অলংকারহীনতা—প্রত্যক্ষত কবি অলংকারশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেননি; একটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ব্যতীত ['যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান'] কিন্তু সমস্ত অলংকারের বেড়া ভেঙে কবিতাটি আশ্চর্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়। নিসর্গচিত্রের পটভূমিকায় একটি উজ্জ্বল সুখাবিষ্ট মানবী-মূর্তি শেষ পর্যন্ত কবিতার আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত প্রকৃতির পটভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। প্রকৃতির সুখতন্ময়তা নারীর মানসিক অনুভূতিতে অবয়ব গ্রহণ করে—একটি সান্ধ্য রোম্যান্টিকতার বর্ণিল অনুভূতি পাঠকের গোচরে আসে, কবিতাটি প্রেমের কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। নারী ও প্রকৃতি একাকার হয়। কবিতাটি বক্তব্যগত অর্থ পরিহার করে ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। কবি তাঁর প্রেমিকার নয়নে জন্মমৃত্যুর চকিত দ্যুতি প্রত্যক্ষ করে শারীর শিহরণের অনিঃশেষতায় বিস্ময়বিমুগ্ধ হন। কবিতাটি প্রেমের রসোত্তীর্ণতায় সার্থকতামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

সাতটি স্তবকে গঠিত 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা। কবিতাটির ধ্রুবপদ হল 'কেমন করে বলি' এবং এই বক্তব্যটি সমগ্র কবিতাটিতে তিনবার ব্যবহৃত—প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম স্তবকে। কবিতাটির শুরু ভালো লাগার অনির্বচনীয়তায়। সময়ের দিক থেকে কবিতাটির আবহমণ্ডল প্রভাত। প্রেমিকার সান্নিধ্যে একটি অপরূপ প্রেমজ অনুভূতির আশ্চর্য প্রকাশ—কিন্তু তার বাঙ্ময় রূপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব কবির পক্ষে—তাই কবিকে উচ্চারণ করতে হয়—'কেমন করে বলি।' পরিবেশটি অত্যন্ত ঘরোয়া—'কি ভালো আমার লাগলো'—এই যে ও-কারের দোলন-লাগা স্বাপ্নিকতা তা যেন এক অপরূপতার পরিমণ্ডল রচনা করে। প্রথম ছত্রটি আলংকারবিহীন একটি সাধারণ বক্তব্য মাত্র—অথচ আশ্চর্য মন্ময়তায় উদ্ভাসিত একটি প্রেমজ অনুভূতির অনির্বাচ্য রূপায়ণ। এর পরেই কবির দৃষ্টি প্রকৃতির দিকে—এখানে আকাশের আগে নির্মল নীল দুটি বিশেষণ বা একটি বিশেষণের বিশেষণ (নির্মল) ও অন্যটি বিশেষণ (নীল) ব্যবহার করেন। অর্থাৎ আকাশের অনপনেয় স্বচ্ছতার দুরন্ত ব্যক্তিত্ব এই শব্দদুটির মাধ্যমে রূপায়িত হয়। 'অসহ্য সুন্দর' পদটি প্রকাশের অনির্বচনীয়তায় এতই স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন যে পরিবেশ যেন পাঠককে আনন্দলীন অমোঘতার পাদপীঠে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়—যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। তারপর দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত গুণীর কণ্ঠের অব্যক্ত উন্মুক্ত তান। যেন, ওই উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দে সমস্ত উৎকণ্ঠার পরিসমাপ্তি তো হয়ই না—আরও পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। একে এক অর্থ বাক্‌প্রতিমার ধ্বনিরূপ বলা যেতে পারে। আকাশের অসীম অনন্ত বিস্তার ও অমেয় পবিত্রতা সাংগীতিক বিশুদ্ধতা ও স্পন্দনের সঙ্গে তুলিত হয়; ফলে দৃষ্টিগ্রাহ্য, দৃষ্টিনন্দন বিষয় শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে রম্যতা সৃষ্টি করে তার জন্য এই চিত্রকল্পটি যেন বাক্‌প্রতিমার ধ্বনিরূপ হয়ে ওঠে। এ যেন কবির এক বিশুদ্ধ নান্দনিক উপলব্ধি। এখানেই কিন্তু কবিতার প্রথম স্তবকের ভাবগত সমাপ্তি হয় না; যদিও গঠনগত বক্তব্য প্রায় সমাপ্তির পথে।

ফলে কবিকে পূর্ণচ্ছেদ দিতে হয় দ্বিতীয় স্তবকের পর। দ্বিতীয় স্তবকে কবির দৃষ্টি আকাশের দিকে—ভালোলাগার অপরূপ মহিমায় আবেগোদ্‌বেল কবি। প্রকৃতির চিত্রপট কয়েকটি রেখাঙ্কনে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—'চারিদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে।' এখানে পাহাড় সবুজ—শ্যামলিমায় পূর্ণ—সবুজ এখানে যৌবনের প্রাণের প্রদীপ্ততায় উচ্চকিত। কুয়াশায় সে পাহাড় ধোঁয়াটেও বটে। [ধোঁয়ার ভাব আছে এই অর্থে ধোঁয়াটে প্রত্যয়]। মাঝখানে চিল্কা ঝলমল করে ওঠে। এইখানে কবিপ্রতিভার বিচিত্র বর্ণবিচ্ছুরণ ঘটে, সবুজ পাহাড় আর কুয়াশার ধোঁয়াটে ভাবকে অতিক্রম করে চিল্কার অনির্বাচ্য কিরণ সম্পাত ঘটে যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে প্রকৃতির ও পরিবেশের ভালোবাসার নিপুণ তথ্যধর্মী বর্ণনার পর কবি এবার তৃতীয় স্তবকে প্রেমিকার দিকে পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাইলেন। অত্যন্ত ঘরোয়া টুকরো কথায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তিনটি বাক্যবিন্যাসে মধ্যম পুরুষে বললেন—'তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে।' কাছে এসে বলার মধ্যে ইন্দ্রিয় সংরাগের বিদেহী প্রকাশ ঘটে। আসার এবং বসার মধ্যে শারীরিকতা এবং কামনাই প্রকাশিত। প্রেমিকা ওদিকে গেল ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়ানো দেখতে—অর্থাৎ প্রেমিকার ঈষৎ চাঞ্চল্য তার তারুণ্যের স্বভাবকে প্রকাশ করতে চায়। অতঃপর গাড়ি চলে যায়—স্বাভাবিকভাবে শূন্যতার সৃষ্টি হয়; কিন্তু এ শূন্যতা ভরে যায় প্রেমিকার সান্নিধ্যে। প্রেমিকার কাছে আসা—বসা এই শারীর ঘন বাক্য বন্ধ আবার ওদিকে যাওয়া—এই বিচ্ছেদাত্মক ক্রিয়া সমস্তই কবির কাছে প্রেমের মায়াময়তার, স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করে। এরপর কবি উচ্চারণ করেন 'কী ভালো তোমাকে বাসি,/কেমন করে বলি।' এই অপ্রকাশেয় ব্যঞ্জনায় কবিচিত্ত উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে। ভালোবাসার উচ্চারণ এখানে অন্তহীন—ভাষার অতীত তীরে—এ যেন একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ায় সাতটি অমরাবতীর ভর করা—কাঙাল নয়নে রূপৈশ্বর্যের ক্ষণিক দীপ্ত মাধুরী; না বলা বাণীতে প্রেমের অমর ঐশ্বর্যের অবাঙ্‌ আলিম্পন।

চতুর্থ স্তবকে আবার প্রকৃতি তবে এখানে প্রকৃতির দুটি রূপ। একটিতে সূর্যের বন্যা সূর্যের কনক কিরণমালার দূর বিস্তারী সীমাহীন সৌন্দর্যতন্ময়তা। আর একদিকে গোরুগুলোর ঘাস ছিঁড়ে খাওয়া—শান্তি রসাস্পদ সীমিত জীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র। সীমা ও অসীমের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই রূপচ্ছবিকে জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা অথবা দুটি পরস্পরবিরোধী জীবনদর্শনকে উপভোগের অভীপ্সা। বৈপরীত্যের সমাবেশে এখানে এমন এক বিশ্বাসযোগ্য বৈচিত্র্য এসেছে যা সত্যই উপভোগ্য। 'আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না/গোরুগলি একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্তি'। স্বভাবোক্তি অলংকারের একটি সার্থক নিদর্শন। কবি যখন 'গোরুগুলো'র উদ্দেশ্যে 'কী শান্তি' বাক্যাংশটি প্রয়োগ করেন তখন মনে হয় এই অবোধ প্রাণীটি নিসর্গের প্রোজ্জ্বল মহিমায় উদ্দীপ্ত হতে পারছে না বলে কবি তাদের প্রতি অনুকম্পা পোষণ করছেন। পঞ্চম স্তবকে অলস মন্থর জীবনস্রোত—রূপোলি জলের শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখা—এখানে এবং পরবর্তী ছত্রে ঘটে যায় সেই নরত্বারোপ—'রূপোলি জলে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ / নীলের স্রোত ঝরে পড়ছে তার বুকের উপর / সূর্যের চুম্বনে।' স্বপ্ন দেখার অলস মন্থরতা, বুক, চুম্বন প্রভৃতি শব্দে ইন্দ্রিয়ঘনত্বের শরীরী পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর সেখানে

কবির সঙ্গে কবি-ঈপ্সিতা নারীর মিলনে উভয়ের রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে জ্বলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রিয়ধনু। এর পূর্ববর্তী স্তবকে কবি প্রেমিকাকে প্রশ্ন করেছেন 'তুমি আমি'র পরিবেশে—'তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের, ধারে এসে আমরা পাবো/যা এতদিন পাইনি।' অর্থাৎ অচরিতার্থতার চরিতার্থতা ঘটবে—এমন পরিবেশ প্রেমিক-প্রেমিকার কল্পনায় পর্যন্ত আসেনি। যা অধরা, অপাওয়া ছিল তা আজ কবির ও তার প্রেমিকার হস্তামলক হয়েছে। আর পরের স্তবকে অর্থাৎ—ষষ্ঠ স্তবকে বললেন—'এখানে জ্বলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু/তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে/কখনো কি ভেবেছিলে?' অর্থাৎ ঈপ্সিত প্রতিবেশ পাওয়ার পর ঈপ্সিত মিলনাকাঙ্ক্ষা—পূর্বরাগ, অভিসারের পর এ যেন সমৃদ্ধিপান সম্ভোগজনিত মিলন। এ যেন বুদ্ধদেবীয় প্রেমচিন্তার অনন্য ফসল—প্রেমের চিরন্তন আবেগকে বর্তমান দেশকালের আধারে রূপ প্রদান। এ প্রেম দেহজ হলেও দেহসর্বস্ব নয়। এ যেন আত্মার উত্তাপে প্রস্ফুটিত শতদলবাসিনী প্রেম। এর পর কবি দুটি প্রজাপতির চিত্রকল্প আনেন। দুটি প্রজাপতি যেন কবি ও কবিপ্রিয়ার প্রতীক—দুজনের উপর দিয়ে দূর থেকে উড়ে আসার দুঃসাহস। কবি ঘনিষ্ঠ প্রেমের উত্তাপে দ্রবিত হন—প্রেমিকার হাসিতে যেন নবজীবনের সান্দ্র তন্ময়তা। সপ্তম স্তবকে কবিতার অন্তিম পরিণাম—প্রেমিকার উজ্জ্বল অপরূপ সুখে কবির অপরূপ মগ্নতা—অসীম অন্ত বিস্তারী নীলিমা—আর প্রেমিকার নয়নে কত আকাশের কম্পিত বিথার, অগণন মৃত্যুর সমাবেশ, সীমাহীন জন্মের দীপ্ত প্রতিজ্ঞা—এ অনির্বচনীয়; কবির পক্ষে এ অনুভূতি প্রকাশ অসম্ভব। বুদ্ধদেবের কাছে নারী এ প্রকৃতি যেন সমার্থক হয়ে ওঠে! সীমাহীন আকাশ, শ্যামলিম পৃথিবী আর অপরূপ নারী, চিল্কার মোহময় স্বপ্নালু অগাধ, অবাধ জলরাশি, জোয়ারে ভাসমান নৌকা, উড্ডীন প্রজাপতির পাখার বিচিত্র বর্ণালিম্পন সমস্ত মিলিয়ে রোমান্টিক অনুভূতির বিচিত্র বর্ণসম্পাতে চিরচেনা জগৎ হয়ে যায় অজানার বলয়িত পরিধি। প্রেমিকার চোখের তারায় কম্পমান নভোবিস্তারী ছায়ায় জন্ম-মৃত্যুর বিস্ময়কর মহিমা। এ যেন রোমান্টিসিজমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিস্ময়ের জাগরণ !

> 'দ্যাখো, দ্যাখো/কেমন নীল এই আকাশ।—
> আর তোমার চোখে/কাঁপছে কত আকাশ,
> কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম—/কেমন করে বলি।'

নায়ক কবি নায়িকার সত্তার সীমাহীনতায় বিমুগ্ধ হন। নায়িকার উজ্জ্বল অপরূপতায় ভরা নয়নে অন্তহীন জন্মমৃত্যুর লীলার উদ্ভাসন প্রত্যক্ষ করেন। যুগ্মসত্তার এই উপলব্ধি এতই গভীর ও সীমাহীন যে কবিকে অতৃপ্তির ভাষাতে পরম তৃপ্তিকে ব্যক্ত করতে হয়—'কেমন ক'রে বলি' অপূর্ব ও অপরূপময়তার ব্যঞ্জনায় রোম্যান্টিকতার যে আবহমণ্ডল তা 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটিতে ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হয়।

সমস্ত কবিতাটির পটভূমিকায় বিরাজিত থাকে চিল্কার সকাল; ফলে চিল্কা হ্রদটি যেন প্রসারিত জীবনের জীবনস্রোতে প্রেমের দয়িত-দয়িতার প্রতিমানরূপে দেখা দেয় দুটি দুঃসাহসী অথচ জীবনপ্রেমিকা প্রজাপতি। সমস্ত পরিমণ্ডলটি হয়ে ওঠে যেন 'এপিফ্যানিক ইমেজ' বা 'স্বপ্নভঙ্গ'। নিছক সত্তাগত স্থূল আবরণ কবির চোখের সামনে থেকে বিদূরিত হয়; অন্তঃশায়িতা

সত্তার অপার্থিব আলোকে কবির চোখে সমুদ্ভাসিত হয় তার 'পরমা'র উজ্জ্বল অপরূপ সুখ'। সত্তার গহন গভীরে জ্বলে ওঠে গভীরতম প্রান্তে গদ্যছন্দের স্বর বিন্যাসে স্তোত্রের স্বর প্রক্ষেপ ধ্বনিত হতে থাকে। কবির আশ্চর্যমধুর রমণীয়, উজ্জ্বল প্রেমের গহনগোপন অথচ স্বতপ্রকাশিত বর্ণাঢ্য অনুভূতির ইন্দ্রধনুবর্ণে কবিতাটি সমকালীনতার বলয়িত পরিধিতে শাশ্বত প্রেমের কবিতায় উত্তীর্ণ হয়।

দময়ন্তী

'দময়ন্তী' বুদ্ধদেব বসুর একটি কৃশকায় কাব্যগ্রন্থ, যার প্রকাশ ১৯৪৩-এ; কিন্তু কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৫-৪২/১৯৩৫-৪২ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নানাকারণে অত্যন্ত স্মরণীয় হলেও বুদ্ধদেবের কাব্যে কালের ছায়াপাত আদৌ ঘটেনি। তিনি প্রেমের চিন্তায় মগ্ন থেকে আমাদের আর একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কাব্য উপহার দিলেন। সেইটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কেন-না তিনি প্রেমের কবি। 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দময়ন্তী'; নল-দময়ন্তীর পুরাণ-কাহিনিকে কবি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তবে বুদ্ধদেব বসুর প্রেম সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটলো আলোচ্য কাব্যটিতে। "বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কাব্যের ঋতুবদল হ'ল 'দময়ন্তী'-তে (১৯৪৩)। যৌবনপ্রান্তে পৌঁছে সহজ উপভোগের পথ পরিত্যাগ করে প্রেমের দর্শন রচনায় মন দিলেন তিনি। মন্ময় আবেগের উদ্দাম উল্লাসের স্থলে দেখা দিল তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রেমের রহস্য অনুসন্ধানের প্রয়াস। কবি প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর নিজের জীবনে যে যৌবন অতীত, সে যৌবন আবার ফিরে আসছে তাঁর কন্যার জীবনে। এইভাবে উত্তরাধিকার পরম্পরায়, অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে মহাকালের পথ বেয়ে যৌবনের দৃপ্ত রথ চলেছে।"[৭] যৌবন সকলেই কাম্য—স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ, অগ্নি এবং কালান্তক যম দময়ন্তীর যৌবন প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু দময়ন্তী স্বর্গের দেবতাদের অপেক্ষা মর্ত্যের নলকে বরণীয় বলে মনে করেছিলেন। কবি মনে করেন তাঁর কন্যাও মর্ত্যের দাবি পরিপূর্ণ করবে। কন্যার মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করলেন চিরন্তন দময়ন্তীকে। কবিতার এই ভাবসত্যকে কবি দুটি রসের মাধ্যমে রূপায়িত করতে চাইলেন; আর এ রসদুটি হল বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রস। বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের মিলনে কবিতাটি আশ্চর্য রূপাবয়ব লাভ করেছে! বাৎসল্য রস—'ওরে দেববিজয়িনী/যৌবন গর্বিণী কন্যা/রে, কন্যা আমার,/সেদিন মুখশ্রী তোর পূর্ণিমার মতো...।' শৃঙ্গার রস—১. 'সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন/সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথ বনে।' ২. 'যে মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবি/খ'সে পড়ে।' ৩. 'স্বতঃশ্লথ নীবিবন্ধে আনন্দের ঢেউ তুলে।' প্রৌঢ় বয়সে বাসনার শেষ নেই, অথচ ইন্দ্রিয়দুর্বলতা বাসনা পরিতৃপ্ত হতে দেয় না, তখন কবি স্বীয় কন্যার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন অবসিত যৌবনের পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ যৌবনের জন্য কবির হাহাকার নেই, কন্যার দেহে নবযৌবনের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে কবির দেহজ বাসনাময় প্রেমের মুক্তি ঘটে, কবি প্রেমের দর্শন রচনায় মনোনিবেশ করেন—১. "লক্ষ রাত্রি, লক্ষ দিন/কেটে যায়—নাকি আসে ফিরে ফিরে/মৃত্তিকার মূর্তি দিতে চিরন্তনী দময়ন্তীরে?" ২. "আমাদের প্রেমেরে/প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে।"

'দময়ন্তী' পুরাণাশ্রিত কবিতা; পুরাণকাহিনিকে অবলম্বন করে কবি নর-নারীর জৈব প্রেমের অনিবার্য কঙ্কালময় পরিণতি দেখে শুধুই বেদনার্ত হননি। পুরাণাশ্রিত আলোচ্য কবিতাটিতে কবি নরনারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের অনিবার্য ক্ষয় ও দেহের মৃত্যুর কথা ভেবে একদিকে যেমন পীড়িত হয়েছেন, তেমনি আবার প্রেমের শাশ্বত রূপ আবিষ্কারে সচেষ্টও হয়েছেন। বুদ্ধদেব তাঁর স্বকালের পটভূমিকায় মহাভারতীয় কাহিনির কোনো রূপান্তর ঘটাননি; বিবাহঘটনার সাংকেতিকতা তিনি যথার্থ অর্থে গ্রহণ করেছেন। নল-দময়ন্তীর বিবাহিত জীবনের বিপর্যয় ও পুনর্মিলন-এর সাংকেতিকতা সম্ভবত নরনারীর নশ্বর জীবনধারার আবহমানতা সন্ধান করা; এই আবহমানতায় এই সত্যই পরিস্ফুট যে, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু অতিক্রমকারী মানব-মানবীর প্রেম চিরজয়ী। বুদ্ধদেব কবিতায় " 'যজ্ঞ' ও 'যজ্ঞবেদী'র উল্লেখ করেছেন। এই শব্দ দুটি কবিতার সামগ্রিক ব্যঞ্জনায় অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। 'যজ্ঞ' ও 'যজ্ঞবেদী'র উল্লেখে যেমন বুদ্ধদেবের অভিলষিত, মানবজীবনের অনাদিকালের যৌনপ্রেমের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে—তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বা অবচেতনার অভিঘাতের সমান্তরালভাবে এই কবিতায় লিখিত পুরাকাহিনির-স্তর অতিক্রান্ত আদিকালের মানুষের মনোভূমিতে রচিত নশ্বর মানুষের স্বর্গজয়ী প্রেমকাহিনির প্রকাশও ঘটেছে।"[৮]

প্রেমদর্শনের এই তাত্ত্বিকতা ব্যতীত 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের মূল্য অন্যত্র নিহিত—১. এখানে কবি কাব্যের আবেগসঞ্চারী স্বভাবের সঙ্গে গদ্যের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। ২. সাধু ক্রিয়াপদ বর্জন করতে চাইলেও তা এসে গেছে। ৩. বাক্‌ভঙ্গি ও রচনাভঙ্গিতে আধুনিকতা আনয়ন।

উদাহরণ—১। ১. 'একদিন হংসদূত এসে।' ২. 'শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।' ৩. 'এ কথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না।'

উদাহরণ—২। কাটায়েছি / আসিবে / শুনায়েছে / আকর্ষিবে/

উদাহরণ—৩। ১. 'যে ত্রিবলি/তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরী প্রতিম/আজও তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।'

২. 'সংকীর্ণ কঙ্কালে করেছে সকাম।'

৩. 'বিনষ্ট সংকল্প পূর্ণ, সার্থক ধিকৃত অনটন/স্বার্থ কেন্দ্রচ্যুত বিশ্ব ফিরেছে আদিম মহিমায়।'

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচক যা জানিয়েছেন তাকে 'দময়ন্তী' কবিতারও বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে—" 'দময়ন্তীতে' বুদ্ধদেব প্রথম সচেতনভাবে কাব্যিক শব্দ, সাধু ক্রিয়াপদ ইত্যাদি বর্জন করলেন; সচেতনভাবে গ্রহণ করলেন আধুনিকতা—বাক্‌ভঙ্গি, রচনাভঙ্গি ইত্যাদিতে। এই কাব্যে যেমন কবি যৌবনের দুকূল-ভাসানো আবেগোচ্ছ্বাসকে সংদমন করেছেন, তেমনি বাক্যবিন্যাসের মধ্যেও শমিত করেছেন আবেগস্রোত—যেন পাড় বেঁধে দিয়েছেন কঠিনে।"[৯]

ব্যাং

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-'৭৪) ইলিশ, ব্যাং, কুকুর, জোনাকি বিষয়কেন্দ্রিক

কবিতা লিখলেন। এর আগে বা পরে এই সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিতা লেখার প্রবণতা অনুপস্থিত। কবি কেন এদের মধ্যে সৌন্দর্য অনুসন্ধানে তৎপর হলেন তা অনুসন্ধানের বিষয়। যে বুদ্ধদেবের কবিতার আদি জন্ম উৎস হল প্রেম-কাম-যৌবন-নারী সেই বুদ্ধদেব কি তাহলে শালিক-কাক-দাঁড়কাক-বিড়াল-চড়ুই প্রভৃতিকে কবিতার জাতে তুলে নেওয়ার জীবনানন্দীয় প্রবণতার দ্বারা আচ্ছন্ন হলেন! 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেবীয় মানসপ্রবণতার ত্রিধারা প্রবাহিত—প্রথম ধারায় প্রেম; দ্বিতীয় ধারায় আধুনিক জীবনের অস্তিত্বগত জটিলতা; আর তৃতীয় ধারায় অপাংক্তেয় বিষয়ে সৌন্দর্য-তাৎপর্য সন্ধানের প্রবণতা। প্রথম ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা হল 'দময়ন্তী', দ্বিতীয় ধারার কবিতাগুলি 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' 'কোনো কবি বন্ধুর প্রতি'; আর তৃতীয় ধারার কবিতা হল 'ইলিশ', 'ব্যাং' ইত্যাদি। অবশ্য তৃতীয় ধারার কবিতার ইলিশ, ব্যাং, জোনাকি, কুকুরের মধ্যে তিনি 'ইলিশ' কবিতাটিকে প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করেছিলেন, শান্তনু দাস ও বুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' কবিতা সংকলনে কবির 'ইলিশ' কবিতাটি কবিকৃর্তক প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হয়েছিল। 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবির পরিবর্তন যে আসন্ন এমনতর ইঙ্গিত এই কবিতাগুলি বহন করছে। " 'দময়ন্তীতে' বুদ্ধদেবর পরিবর্তন পরিণামী হয়ে উঠতে চাইলেন। ''দময়ন্তীতে' বড়ো কবিতার পাশাপাশি আশ্চর্য সব ছোটো কবিতা আছে। বড়ো কবিতার প্রতি তাঁর বরাবরের পক্ষপাত 'দময়ন্তীতে' যেন খণ্ডিত। 'ইলিশ', 'কুকুর', 'ব্যাং' 'দুপুরবেলা বিদায়' ইত্যাদি কবিতায় বুদ্ধদেব উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন সহসা সংযত করলেন। সাবলীলতাকে বর্জন করলেন না, সচেতনতাকে এবং নৈর্ব্যক্তিকতাকে অগ্রাধিকার দিলেন।"[১০]

অবশ্য একথ্য স্বীকার করা দরকার যে, এই জাতীয় কবিতাগুলি কিন্তু বুদ্ধদেবীয় মানসিকতার স্বাক্ষর বহন করে না। মনে হয়, বুদ্ধদেব এই জাতীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে কিছুটা মানসিক আলোড়ন থেকে সরে আসতে চাইছিলেন। এ যেন 'বিশ্বারণ্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিজ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন।' 'ইলিশ', 'ব্যাং' 'কুকুর' ও 'জোনাকি' জাতীয় কবিতাগুলি কবিতা হিসেবে ভালো বা শ্রুতিসুখকর হলেও মহৎ কবিতার স্তরে এগুলি সমুন্নীত হতে পারে না।—"তিনি প্রখর আত্মসচেতনতার বশেই কিছু পরে বুঝেছিলেন এগুলি তাঁর হাতের কবিতা, ভালো কবিতাও বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ভালো। তিনি যে আকাঙ্ক্ষায় জ্বলছেন, বহন করছেন, যে বিদ্যুতের চাপ, এখানে উল্লেখিত কবিতাগুলি তার কেউ নয়।"[১১]

'ব্যাং' অষ্টাদশপদী কবিতা ; অষ্টাদশ মাত্রায় ও অষ্টাদশ পঙ্ক্তিতে রচিত।

বর্ষায় ব্যাঙের স্ফূর্তি/বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক।। ৮+১০

উচ্চকিত ঐকতানে / শোনা গেল ব্যাঙেদের ডাক।। ৮+১০

আদিম উল্লাস বাজে/উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চ সুর।। ৮+১০

আজ কোনো ভয় নেই/বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।। ৮+১০

বর্ষাকালীন পটভূমিকায় কবিতার রাজ্যে প্রায় অন্ত্যজ ব্যাং-কে কবিতার বিষয়বস্তু করে বুদ্ধদেব কবিতার রাজ্যে অভিনবত্ব আনয়নে প্রয়াসী। প্রাক্-বুদ্ধদেব বাংলা কবিতায় অধিকাংশ

ক্ষেত্রে ব্যাং শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। বিদ্যাপতির কবিতায় 'মত্তদাদুরী ডাকে ডাহুকী' ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জতিমিরে' ইত্যাদি স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'ছেলেটা' ব্যতীত সম্ভবত ব্যাং-এর প্রয়োগ অন্যত্র দুর্লক্ষ্য। ['কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে'...]। বুদ্ধদেবের 'ব্যাং' কবিতাটি একটি গাঢ় সুন্দর সংহত কবিতা। এ কবিতার সরলতাই এর ভূষণ। বর্ষাকালেই ব্যাঙের স্ফূর্তি, বৃষ্টির সমাপ্তিতে আকাশ নির্বাক, সমগ্র স্থলভূমি, জলাভূমি জলে পরিপূর্ণ। এমন সময় উচ্চকিত সম্মিলিত ঐকতানে ব্যাঙেদের ডাক ধ্বনিত হয়। আদিম উল্লাসে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চস্বর বেজে ওঠে—সেখানে বিরহ বিচ্ছেদ, ক্ষুধা বা মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। ব্যাঙের ডাক বুদ্ধদেব বসুর কাছে একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ারূপে আবির্ভূত। ব্যাঙের ডাক—শুধুই কোনো একটি জীবের ডাক নয়; এ যেন সমস্ত জড় জগৎ জুড়ে যে বিরহ, বিচ্ছিন্নতা আছে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হবার ডাক। মহাসাগরে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মানুষের এই যে নিত্য বিরহবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, একাকিত্ববোধের ট্র্যাজেডি তা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। বর্ষণক্ষান্ত পৃথিবীতে ব্যাঙের ডাক সেই মাদকতা সঞ্চার করে যে মাদকতায় বিরহবিচ্ছিন্ন মানুষের মনে হয় পৃথিবীতে বিচ্ছেদ, ক্ষুধা বা মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। কবি এই যে 'বিচ্ছেদ', 'ক্ষুধা' ও 'মৃত্যু' শব্দ তিনটি ব্যবহার করেন তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংগতবোধ, যৌনতার ধারণা এবং আত্মিক অপসরণতার অনুষঙ্গবাচকতা সৃষ্টি করে। ব্যাং সুতরাং প্রতীকী অর্থে যৌনতার বোধ সঞ্চারিত করে। কবি যখন বলেন—'ঘাস হ'লো ঘনমেঘ; স্বচ্ছ জল জমে আছে মাঠে'—তখন যে শ্যামলমেঘের প্রতিবিম্ব সমাকুল প্রাকৃতিক চিত্রই অঙ্কিত হয়, তা নয়; বাদল পরিবেশ ও যৌনপরিবেশ একত্রিত হয়ে জীবনের সৃষ্টির উল্লাসকে ব্যক্ত করে। উদ্ধত আনন্দ গানে উৎসবের দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হয় এবং এই অতিবাহিত হওয়ার পটভূমিকায় থাকে সংগমের আনন্দ, মিলনের আনন্দ। কবিতাটির চতুর্থাংশে কবি বর্ষার আগে 'স্পর্শময়' শব্দ ব্যবহারের দ্বারা একটি ইন্দ্রিয়মগ্নতার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। বর্ষার জলে গলিত কর্দম কবির কাছে মনে হয় 'মসৃণ' এবং 'তরুণ'। আর সেখানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় স্কন্ধহীন জীবের কবিনিঃসৃত ধ্বনি যা মনে হয়েছে সপ্তমের অর্থাৎ 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'-এর শরীরী প্রকাশ। এখানে একটি চাক্ষুষ ও শ্রুতিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের মিলন ঘটে। কর্দমের সঙ্গে সপ্তমের মিল আছে; কিন্তু এই মিলটাই বড়ো কথা নয়। এখানে 'মসৃণ তরুণ কর্দম' চিত্রকল্পের ভাবানুষঙ্গে কবি ফ্রয়েডীয় বোধে নরনারীর জৈবিক মিলনের প্রতিও বোধ হয় ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। তবে 'সংগীতের শরীরী সপ্তম' চিত্রকল্পটি অনেক অভিনব; কেন-না এর আগে পর্যন্ত ক্ষান্ত বর্ষণদিনে ব্যাঙের ডাকে 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'-এর শরীরী প্রকাশরূপে কল্পনা করা হয়নি। ভেকের সংগীতের এমন শ্রবণসুভগ ইঙ্গিত বুদ্ধদেবীয় প্রাক্ বাংলাকাব্যে অনুপস্থিত। বুদ্ধদেব যে কী নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী তার পরিচয় পাওয়া যায়—'আহা কী চিক্কনকান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে সবুজে!'—এই পর্যন্ত বর্ষা প্রকৃতির পটভূমিকায় স্থাপিত ব্যাঙের চিত্রটি নয়নবিমোহন। কিন্তু এর পরে কবি যখন লেখেন 'কাচ-স্বচ্ছ উর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরের খোঁজে / ধ্যান মগ্ন ঋষি সম' তখন কবিতাটির এই অংশে ঈষৎ হাস্য ও ব্যঙ্গরস সঞ্চারিত হয়। ব্যাঙের অবয়ব ও চক্ষু বর্ণনা বুদ্ধদেবের নিপুণ পর্যবেক্ষণ

শক্তির পরিচয় দিলেও কবিতাটি এই অংশ থেকে যেন ক্রমশ তার প্রথমাংশের কাব্যিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। মিলনের আকাঙ্ক্ষিত উল্লাস যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। সমাপ্ত বৃষ্টিরলগ্নে, বেলা পড়ে আসার মুহূর্তে স্তম্ভিত আকাশে বাজে গভীর বন্দনাগান 'বৃষ্টি শেষ, বেলা পড়ে আসে / গম্ভীর বন্দনাগান বেড়ে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।' দলবদ্ধ ব্যাঙের সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনিকে কবি প্রথমে বললেন 'ঐকতান', আর কবিতার প্রায় শেষাংশে এসে বললেন—'গম্ভীর বন্দনাগান'। 'গম্ভীর' বিশেষণটি 'বন্দনাগানকে' তাৎপর্যবাহী করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এ বন্দনা কীসের বন্দনা? মনে হয় কবি ব্যাঙেদের বন্দনা গানকে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুভূতিলব্ধ 'বন্দীর বন্দনা' রূপে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এ যেন বুদ্ধদেবীয় যৌবনোচিত প্রেমের আকাঙ্ক্ষার গান, প্রবৃত্তির কারাগার থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়। রক্তের মধ্যে জৈব প্রবৃত্তির স্রোত প্রবাহিত হলেও, শিরায় শিরায় কামনার সর্পিল শিহরণ অনুভূত হলেও অমৃতের অন্বেষণেই কবির চির আত্মপরিক্রমা—

—'বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদেমরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দমবেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্তলাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণীরমণ রণে পরাজয় ভিক্ষামাগে নিতি।

বিধাতা জানো না তুমি। কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।

* * * *

মোর এই নব সৃষ্টি—এ যেমূর্ত বন্দনা তোমার
অনাদির মিলিত সংগীত।'

অবশেষে ভেকের উচ্চস্বরনিনাদী কণ্ঠস্বর, কণ্ঠের উচ্চগ্রামী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, দিন আগতপ্রায়। শেষ পর্যন্ত 'অন্ধকার শতচ্ছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা আনা ডাকে'। মধ্যরাত্রে মানুষ রুদ্ধদ্বার গৃহে একাকী আরামে শয্যাশায়ী; স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু ডাকের সম্মিলিত ঐকতান-তখন তা উচ্চকিত নয়। এ যেন সেই অক্লান্ত সুর বা তুলনীয় হত 'নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোকের সঙ্গো। সঙ্গীবিহীন ব্যাঙের কণ্ঠধ্বনি উৎসারিত হয়—'ক্রোক্, ক্রোক্, ক্রোক্'।

[ইংরেজিতে ব্যাঙের ডাককে Croak বলে। কবি এখানে ইংরেজি শব্দের ধ্বনি অনুকৃতি বাংলায় স্বচ্ছন্দভাবে প্রয়োগ করে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।]

পৃথিবী যখন নিঃশেষে নিদ্রার অঙ্কে নিজেকে সমর্পণ করেছে তখনও উৎসাহী, অক্লান্ত অথচ নিঃসঙ্গ ব্যাং তার কণ্ঠোৎসারিত ধ্বনিকে যেন শ্লোকের মতো [যা জাত শোক থেকে 'শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যতা।'] অস্তিত্বের সামগ্রিকতায় সঞ্চারিত করে দেয়।

কবিতার সবচেয়ে বড়ো উপকরণ যে শব্দ, সেই শব্দই এখানে নানাভাবে নিজেকে উদ্দীপিত করেছে। অত্যন্ত আপাততুচ্ছ বিষয় শব্দের মহিমায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে কবিতার এক নতুন জগৎ

সৃষ্টি করেছে। বৃষ্টিশেষের নির্বাক আকাশে ব্যাং-এর ডাক কবিকে জগতের আদিমতার প্রথম উল্লাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এ কবিতায় বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব হল সুনির্দিষ্ট বিষেশণ ব্যবহারে। প্রতিটি বিষেশণ ব্যবহারে কবি এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যা পাঠকের কাছে ব্যাং ও বর্ষার অনুষঙ্গে আত্যন্তিকভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কবি প্রথাসিদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করেননি, বিপরীতপক্ষে ব্যাং-এর উচ্চারিত ক্রোক্ ধ্বনির মাধ্যমে মিলনপিয়াসীর প্রত্যাশা মন্দ্রিত করেছেন। 'বিচ্ছেদের', 'ক্ষুধার' এবং 'মৃত্যুর' এই তিনটি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা জীবনের একটি আবর্তিত ভঙ্গিমার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'নরত্বারোপ' '[পার্সোনিফিকেশন্-কে বাংলায় 'নরত্বারোপ' বলা যেতে পারে সমাসোক্তির পরিবর্তে] । নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা রোম্যান্টিক চিত্তবৃত্তির অন্যতম লক্ষণ। এই মুগ্ধতা নিসর্গের এক একটি অংশকে প্রাণবান ও জীবন্ত করে তোলে। রোম্যান্টিক কবিতায় ওই প্রাণবপনের ফসল ফলে ওঠে। 'ব্যাং' কবিতাটিতেও এর প্রমাণ সংলক্ষ্য! কবিতাটি মূলত তৎসম শব্দনির্ভর। পরপর সজ্জিত শব্দের অন্তহীন ধ্বনিতরঙ্গে বৃষ্টিশেষের নির্মেঘ নির্বাক আকাশের রূপচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাং-এর কণ্ঠস্বর যেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের স্পন্দন বয়ে আনে। কবিতাটি বিশেষণনির্ভর। যদি একটি বিশেষণও এখান থেকে স্খলিত বা নির্বাসিত করা হয় তবে কবিতাটির অঙ্গদ্যুতি এবং ধ্বনির স্পন্দিত তরঙ্গোদ্‌বেলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিশেষণের তালিকা এ বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়—

উচ্চকিত ঐকতান / **আদিম** উল্লাস / **উন্মুক্ত** কণ্ঠ / **ঘন** মেঘ / **স্বচ্ছ** জল / **উদ্ধত** আনন্দগান / **স্পর্শময়** বর্ষা / **মসৃণ তরুণ** কর্দম / **চিক্কণ** কান্তি / **কাচ স্বচ্ছ** ঊর্ধ্ব দৃষ্টি / **ধ্যানমগ্ন** ঋষি / **গম্ভীর** বন্দনা গান / **স্তম্ভিত** আকাশ / **উচ্চকিত** উচ্চসুর / **মধ্য** রাত্র / **রুদ্ধ** দ্বার / **স্তব্ধ** পৃথিবী / **অক্লান্ত** সুর / **নিগূঢ়** মন্ত্র, / **নিঃসঙ্গ** ব্যাং। 'অন্ধকার শতচ্ছিদ্র' অংশটি বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ববর্তী। আধুনিক বাগ্‌বিন্যাসের বাস্তবতা, বাক্যবিন্যাসের আবেগদমনের প্রবণতা, গদ্যের পরিচ্ছন্নতা, সংহত বাক্যপ্রয়োগ প্রভৃতি আধুনিকতাকে কবি এ কবিতায় প্রয়োগে তৎপর—বর্ষায় ব্যাঙের স্ফূর্তি / ঘাস হ'লো ঘন মেঘ / স্পর্শময় বর্ষা এলো / বেলা পড়ে আসে / একটি অক্লান্ত সুর'—প্রভৃতি বাক্যবিন্যাস বুদ্ধদেবীয় দীর্ঘতায় যেন অনেকখানি ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। তবুও বাংলা কবিতার রাজ্যে ব্যাং বক্তব্যে, শব্দচিত্রে, ভাব-গম্ভীর একটি অনন্যসাধারণ কবিতা।

"আধুনিক বাংলা কবিতায় শুদ্ধীকৃত শোণিত ও উজ্জীবিত প্রাণময়তা সঞ্চারে তরুণ কবিদের প্রথাবিবাদী শব্দানুসন্ধান বরাবরই যে একটা চমকপ্রদ ভূমিকা নিয়েছে তার নিদর্শন বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও আছে। তাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এই কারণে যে, তাঁর সম্পর্কে নিত্যনতুন শব্দসন্ধানী কবির গৌরবাত্মক প্রচারণা তেমন শোনা যায়নি। কিন্তু তাঁর কিছু কিছু অভ্রান্ত শব্দ সত্যিই কবিকে দিয়েছে মৌলিক কণ্ঠ, কবিতার শরীরে বাজিয়েছে নতুন ঘণ্টাধ্বনি। বুদ্ধদেবের 'ব্যাং' নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির দাদুরির উত্তরসূরি—কিন্তু প্রাণের গাঢ় পিপাসায় কতই না তারা পৃথক ও ভিন্নকণ্ঠী। বিদ্যাপতি দাদুরির কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে কৌশলে মিলিয়েছেন বর্ষার বৃষ্টির গান। কিন্তু এহো বাহ্য। আসল কথা হচ্ছে, কোন্ কোন্ শব্দ দিয়ে একালের কবি বর্ষাকে

অন্যরকম করে ধরতে চাইলেন? অবাক হয়ে আমরা লক্ষ করি একটা আশ্চর্য শব্দ—'স্পর্শময়' ('স্পর্শময় বর্ষা এলো') শব্দটি আমাদের চোখের কাছে থেকেও মনের কাছে ছিল না। অথচ এমন একটা তরতাজা লক্ষ্যভেদী শব্দ কী সহজেই না বুদ্ধদেব বসু খুঁজে পেলেন ও অবলীলায় ব্যবহার করলেন ! বর্ষা সম্বন্ধে স্পর্শেন্দ্রিয়ের এই অভাবিত প্রয়োগ আশানুরূপ অনিবার্যতায় আমন্ত্রণ করে এনেছে আরও কয়েকটি স্পর্শাতুর শব্দ—'মসৃণ কর্দম', 'স্ফীতকণ্ঠ', 'বীতস্কন্ধ', 'শরীরী সপ্তম'। এই প্রত্যেকটি শব্দই এখানে স্পর্শন্দ্রিয়ের উষ্ণতা ছাড়িয়েছে। ব্যাং-এর মধ্যে বর্ষার আনন্দধ্বনির শরীরী সঞ্চার ঘটিয়ে কবি অভ্রান্ত নৈপুণ্যে সেই ধ্বনিকে নিস্তব্ধ রজনির গভীরে মন্ত্রের মতো ছেড়ে দিয়েছেন। এইভাবেই কয়েকটি নতুন শব্দের জৌলুসে গভীর ভাবতত্ত্ববর্জিত একটা সাধারণাখ্য কবিতা একটা সূর্যকরোজ্জ্বল অসাধারণ কবিতা হয়ে উঠেছে।"[১২]

মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে

'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে'। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫; কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪০-৪৫। কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৫৬ ও ১৯৬০। ফলে '৪৫ পরবর্তীকালে রচিত অনেকগুলি কবিতাও এখানে গ্রন্থিত হয়েছে। 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৪৭। কবিতাটি দীর্ঘ কবিতা, গদ্যছন্দে লেখা, দীর্ঘতম পঙ্‌ক্তি ও ক্ষুদ্রতম পঙ্‌ক্তির একত্র সহাবস্থান লক্ষণীয়। একটি শব্দে একটি ছত্র যেমন আছে তেমনি এগারোটি শব্দে রচিত দীর্ঘতম ছত্রও অনুপস্থিত নয়। জীবনদর্শন প্রকাশের দিক থেকে ও গঠনরীতির দিক থেকে কবিতাটি অভিনব। গঠনরীতির দিক থেকে কবিতাটির আলোচনা জীবন-দর্শনের গভীরতম স্তরে প্রবেশে আমাদের সহায়তা করে।

গঠনরীতি

(১) কবিতাটির পঙ্‌ক্তিসংখ্যা: ৩৪৪।

(ক) হ্রস্বতম পঙ্‌ক্তি; 'আরো'।

(খ) দীর্ঘতম পঙ্‌ক্তি: 'ফুটিয়েছি মনে-মনে নারীকে মৃণাল ক'রে: মনে হয়, নারীরে বেসেছি ভালো' (১১)।

(২) জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য: ১৩।

(৩) ভূগোলবাচক শব্দ ব্যবহার: ৪ [বাংলা, কলকাতা, দিল্লি, শান্তিনিকেতন]।

(৪) খ্রিস্টীয় ধর্মোৎসব: ১ [ক্রিসমাস]।

(৫) পাখিবাচক শব্দ: কাক—৫/শালিক—৫/চড়ুই—৩।

(৬) সংখ্যাবাচক শব্দ: বারো ১/দ্বিতীয়—২ পঁচিশ—১।

(৭) রংবাচক শব্দ: নীল—১ ['আকাশ নরম নীল']

সবুজ—১ ['সবুজ বিনুনি']

(৮) পশুবাচক শব্দ: কুকুর—১ ['কুকুরের মতো কুঁকড়ে লুকোই']

(৯) জন্মসম্পর্কবাচক শব্দ: পিতা/মাতা/মাতামহী/নাতনি।

(১০) মাসবাচক শব্দ: বৈশাখ।

(১১) ঋতুবাচক শব্দ: শীত।

(১২) ভোগবাচক শব্দ: লেপ, বিছানা, টেবিল, চেয়ার।

(১৩) যৌনানুষঙ্গবাচক শব্দ: যৌবন, জনন, নারী, শাড়ি, শরীর, গর্ভ, ওষ্ঠ, যোনি, আঙুল।

(১৪) -তম যুক্ত বিশেষণ: স্বল্পতম, ন্যূনতম, হ্রস্বতম।

(১৫) চলিত শব্দ: হল্লা, হুল্লোড়, অব্দি, পচা, বুড়ো, কড়া, খাড়া, চড়া, তিতো, হাৎড়ায়, কাৎরায়।

কবিতাটির মূল প্রশ্ন—'এই শীতে গান?' এই প্রশ্নের সমাধান হয়েছে কবিতার শেষতম ছত্রে সিদ্ধান্তবাচক বাক্যে—'তাই গান, তাই আজও গান।' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কবি নানা চিত্রকল্প ও ভাবানুষঙ্গের আবহমণ্ডল রচনা করেছেন। মূলত চিত্রকল্প ও ভাবানুষঙ্গ এসেছে যৌবন ও মৃত্যুর শীতলতাকে কেন্দ্র করে; আবার মৃত্যুর শীতলতা এসেছে শীতকালকে আশ্রয় করে। কবিতার অন্তিম পরিণতি পাঠককে যেখানে দাঁড় করায় সেখানে সৃষ্টির দুর্মর ইচ্ছা জাগ্রত। শীত ও জরা কবির কাছে সমপর্যায়ী বলে শীতের মতো জরা সংগীতবিহীন ঋতু। কবি স্মৃতিমন্থনে জরার ভাব লাঘব করতে চান না। আকাশে-বাতাসে গান না থাকলেও কবি স্বয়ং তা রচনা করতে চান। কিন্তু কবির সমস্যা হল গানের বিষয়। অপগত যৌবনে তো আর যৌবনকে নিয়ে কবিতা রচনা করা চলে না। কিন্তু যৌবন তো শুধু জননশক্তির পূজা নয়—যৌবন হল প্রেম, ভালোবাসা, আর এই ভালোবাসার অবলম্বন হল নারী ও কবিতার সম্মিলিত মূর্তি। নারীকে তিনি ভালোবেসেছেন, যেহেতু নারী তাঁর নয়নে কবিতারূপে দীপ্যমান; তাকে ভালোবেসে তিনি ভালোবেসেছেন শব্দের সম্মোহনে স্পন্দিত ছন্দের ইন্দ্রজালকে—"মনে হয়, নারীরে বেসেছি ভালো / যেহেতু কবিতা / জেগেছে, জ্বলেছে তার চোখ থেকে—সে নিজে বোঝেনি/সে নিজে বোঝেনি, আমি তারে ভালোবেসে/আরো ভালোবেসেছি আমার ছন্দের ইন্দ্রজালে, শব্দের সম্মোহনে, আর/কবিতারে আরো বেশি ভালোবেসে আরো ভালোবেসেছি নারীরে/যতক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রেম/কবিতা না হয়েছে, আবার/কবিতাই প্রেম।"

বুদ্ধদেবের কাব্যজীবনের দর্শন হল দেহভোগবাদ ও ইন্দ্রিয়বাদ। এবং এ দর্শন পরিবর্তিত তো হয়ইনি; উপরন্তু ক্রমশ এ দর্শন স্থিরবদ্ধ হয়েছে। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'শীতের প্রার্থনা': বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত এই জীবনদর্শনের স্রোত নির্বাধ, অব্যাহত। "কবি 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতায় 'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে' তাঁর জীবনদর্শনের দলিলটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কবিতায় তিনি বলেছেন, তাঁর যখন যৌবন ছিল তখন তিনি যৌবনের বন্দনা করেছেন, যৌবনঅন্তে তিনি আবার যৌবনের জয়গান গাইছেন, 'কেননা জীবন/যৌবনেরে ভালবাসে—প্রকৃতির রীতি এই।' ফ্রয়েডীর তত্ত্বেও এই কথা, মানুষ তার সারাজীবন ধরে যৌবনের কামনাকে ভোগ করতে চায়। বার্ধক্যেও তার ব্যতিক্রম নেই; বুদ্ধদেব বসু শুধু বলেননি শিশুরাও

অল্প আবেগে বাসনার তৃপ্তি খোঁজে, যা ফ্রয়েড বলেছেন। আর যখন যৌবনভোগে মানুষ অসমর্থ, তখনই সে একা। *** কিন্তু কবির বক্তব্য, দেহ প্রেমেই তাঁর কাব্য সীমাবদ্ধ থাকেনি, তিনি ভালোবাসাকে অমর করে তুলতে চেয়েছেন, এবং ভালোবাসার স্তবগানেই কখন তাঁর কাছে নারী ও কবিতা একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এখানেই দেখা যায়, এ ভালোবাসা একেবারে আত্মহারা ভালোবাসা, যার রূপ সর্বগ্রাসী, ফ্রয়েডীয় মতবাদেও ভালোবাসা বলতে এমনই স্বার্থপর ভোগের কথা বলা হয়েছে. যেখানে ভালোবাসার সঙ্গে অন্য কোনো প্রবৃত্তি যুক্ত নেই, যা মানুষকে স্বার্থশূন্য কোনো আনন্দময় জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে।"[১৫] ফ্রয়েডীর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য কবির ন্যায় বুদ্ধদেব বসুও মৃত্যু সম্পর্কে এমন এক তত্ত্বের উপস্থাপনা করলেন যা নির্মোহ; আর এই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিবশত তিনি মৃত্যু থেকে পরিত্রাণলাভের উদ্দেশ্যে ঘুমের উষ্ম আরাম বা তামসী মাতার নির্বাণ করুণ যোনির চিত্রকল্প কবিতায় এনেছেন। আলোচ্য কবিতায় বুদ্ধদেবের কাছে মৃত্যু অন্ধকারপ্রতিম এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা—"ফিরে যেতে চাহি যেন তামসী মাতার গর্ভে, তারপর অজাত আত্মার/নিশ্চিত নির্বাণে।" বার্ধক্যের নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য কবি ঘুমের উষ্ম আরামে ডুব দিতে চাইলেন। ঘুম আর মৃত্যুর রূপকল্প কবিতাতে একইভাবে উপস্থাপিত—"মনে হয় ঘুম যেন জীর্ণ কোনো/জন্তুর গোপন গুহা, ছোটো তার অন্ধকার রেখেছে ঠেকিয়ে/আরো বড়ো অন্ধকারে এখনো এখনো/আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় ঘুম যেন মাতার মমতা/তামসী মাতার নির্জন করুণ যোনি/পরিমিত অন্ধকারে, মমতার নরম উষ্মতা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে/অন্তহীন অন্ধকারে, কঠিন ঠাণ্ডারে—/ আরো একদিন—আরো একদিন।" এই কবিতায় বুদ্ধদেব তাঁর যৌবনকামনা ও মৃত্যু সম্পর্কিত জীবনতত্ত্বের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে যৌবনকামনার পঙ্ক্তিগুলি আবেগে দীপ্যমান বলে তাদের দীর্ঘতা কম; আর মৃত্যুর শীতলতাবাচক পঙ্ক্তিগুলি শীতরাত্রির মতো দীর্ঘতায় যেন কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

১. **যৌবনবাচক**—(ক) 'যৌবন যখন ছিলো, যৌবনের/করেছি বন্দনা; যৌবন যখন যায়, যায়-যায়, তখনও আবার/যৌবনের করেছি বন্দনা; কেননা জীবন/যৌবনের ভালোবাসে—প্রকৃতির রীতি এই।' (খ) 'যৌবনের বন্দনা আবার/সে কি শুধু জননশক্তির পূজা?'

২. **মৃত্যুর শীতলতাবাচক**—(ক) 'স্বল্পতম সূর্যালোক, নূন্যতম তাপ আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আভার চাঁদ।' (খ) 'দিগন্তের জন্ম-যন্ত্রণারে কণ্ঠ দেয় শালিক, চড়ুই, কাক, ওঠে ডাক/তীক্ষ্ণ ডাক, শঙ্খ ডাকে অন্ধকারে—আরো দিন। আরো একদিন/মুখ-ঢাকা বুক-চাপা অন্ধকারে, লেপের গোপন, গরম গুহায়/রাত্রি কাৎরায়, আর রাত্রিরে জুড়ায়ে ঘুম হাৎড়ায় স্বপ্নের শেষ।" নারীর চিত্রকল্পেও মৃত্যুর শীতলতা এসেছে—

(ক) 'নারীর শরীরে আর নেশা নেই, শাড়ির তরঙ্গে আর গান নেই/চোখে চোখে কথা নেই, হাতে হাতে চকিত পরশে নেই কবিতার তাপ।'

(খ) 'নারীর শরীরে আর কল্পনার শিরা নেই, শিরার বন্যায় আর/কবিতার সুরা নেই।'

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও কবিতাটি যে ফ্রয়েডীর তত্ত্বের কাব্যরূপায়ণ মাত্র, এরকম মনে করা ঠিক নয়। "কবিতাটিতে যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ ফ্রয়েডীর তত্ত্বে স্বপ্ন ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যকে

খুঁজে বার করে, সে রকম বিশেষ কিছু নেই, কারণ এই কবিতায় একটি বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে। বরং বলা যায়, এ কবিতা চেতনার উপর স্তরের বিশ্বাস নিয়ে লিখিত, এবং অবচেতনের গভীরে তাকে নামতে হয়নি, যা হলে, হয়তো কবিতাটিতে আর একটি বিস্ময়কর মাত্রা যোগ হতে পারত।"[১৪]

'মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে'—র মতো দীর্ঘল কবিতায় কবি শেষবারের মতো যেন উদ্দীপিত হলেন। চিত্রকল্পের অনন্যপূর্ব কুশলতায়, মুক্তক অক্ষরবৃত্তের মধ্যমিলে, শব্দ ও বাক্যবন্ধের পুনরাবৃত্তিতে, অনুপ্রাসের ব্যবহারে কবি যেন ঝলসিত হয়ে উঠলেন।

১. **চিত্রকল্প**—(ক) 'মাংসহীন শীতের শরীর'/(খ) 'আয়ুর সিঁড়িতে বসে শুনি পিছে স্মৃতির প্রপাত।' (গ) 'সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা।' (ঘ) 'তরুণী নাতনীর তাপে মাতামহী হাত সেঁকে নেন।' (ঙ) 'আয়ুর শীতের সিঁড়িতে।' (চ) 'তামসী মাতার নির্জন করুণ যোনি।'

২. **মুক্তক অক্ষরবৃত্তের মধ্যমিল**—

(ক) 'মুমূর্ষু, মৃত, নামমাত্র দিনের **খবরে**,
বৎসরের হ্রস্বতম দিনের **কবরে** জন্মে।

(খ) 'শেষ রাতে আকাশ যখন রাতের **লাঙুল** আর টানে,
দিগন্তের তল থেকে দিনের **আঙুল** আর অন্ধকার।

(গ) 'কলকাতায় ক্রিসমাস, দিল্লীতে উল্লাস, আর শান্তিনিকেতনে
মেলা, খেলা সারাবেলা—বেলা যায়, যায়!

(ঘ) 'কথা আনি, কথা বুনি, শব্দ ছানি; কেননা তাতেই আজও সবচেয়ে ভালোবাসি।'

৩. **শব্দ ও বাক্যবন্ধের পুনরাবৃত্তি**—

(ক) 'দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন, সবচেয়ে ছোটো দিন আনে, তারপর দিনে-দিনে আরো দিন, আরো বড়ো, আরো আলো, আরো তাপ। আরো!'

(খ) 'বেলা তো গেছেই, আমার তো বেলা গেছে। বুড়ো হয়ে উড়ো উড়ো মন মানায় না আর, মানায় না ইচ্ছার হাওয়ার তাড়া:'

(গ) 'শুধু শুনে যেতে হয়, শুধু মেনে নিতে হয়, তাই আমি মেনেই নিয়েছি এ উত্তরের ঠাণ্ডা ঘর।'

(ঘ) 'হাতে ঠেকে টেবিলের ঠাণ্ডা কাঠ, পায়ে ঠেকে ঠাণ্ডা মেঝে, পিঠে বেঁধে ঠাণ্ডা হাওয়া; ঠাণ্ডা অন্ধকার',

(ঙ) 'দিন নেই, আলো নেই, মন নেই, কিছুরই সময় নেই, যদি না ঘুমের',

(চ) 'এই শীতে গান?
এই শীতে গান! এই শীতে গান নেই, যদি না বানাই আমি।'

(ছ) 'আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, ডাকি—বাড়ো, বাড়ো গান! এখনো হয়নি শেষ, আছে আরো, আরো গান! আরো দিন!'

(জ) 'দিনে-দিনে ছোটো হয়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন এনে দিনে দিনে বড়ো হয়';

(ঝ) 'যৌবন যখন ছিলো, যৌবনেরে করেছি বন্দনা; যৌবন যখন যায়, যায়-যায়, তখনও আবার যৌবনের করেছি বন্দনা, কেননা জীবন যৌবনেরে ভালোবাসে—'

(ঞ) 'বাড়ো বীজ, বাড়ো! বাড়ো জীব, বাড়ো! আরো, আরো, আরো!'

৪. **অনুপ্রাসের ব্যবহার:**

(ক) 'দুরাশারে পশায় কফিনে, আশারে মিশায় হতাশায়।'

(খ) 'আবার প্রখর পথ, খাড়া সিঁড়ি, ঝিরি ঝিরি ফাল্গুনের পরে বৈশাখের সুখের শিখর;'

(গ` ়ড়া, খাড়া, চড়া, রেখা, যত চড়া তত বাঁকা, তত একা;'

(ঘ) 'চিরন্তনী-রঙ্গিনী নারীর মুখশ্রীর অসীম অমিয়, অনির্বচনীয়, অবিস্মরণীয়;'

(ঙ) 'যে ভালোবাসার বাসা নতুন ননীর মতো নারীর শরীরে নয়।'

(চ) 'অন্তহীন ওষ্ঠহীন অন্ধকারে,
অন্তহীন কঠিন ঠাণ্ডায়।'

(ছ) অন্তহীন অন্ধকারে, কঠিন ঠাণ্ডারে—।'

অসম্ভবের গান

'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থের মূল সুরকে কবি 'অসম্ভবের গান' (১৯৫০) কবিতায় অন্য এক মাধ্যমকে অবলম্বন করে প্রকাশ করতে চাইলেন। এ কবিতাতে কবির বিষণ্ণতার অবসান হয়নি। এখানে পৌরাণিক চরিত্র অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদাকে অবলম্বন করে কবি অবসিত যৌবনের আর্তিকে প্রকাশে তৎপর। নানা কারণে এই দশকটি বিচলিত, বুদ্ধদেবের পক্ষেও এক ক্রান্তিকাল সমাসন্ন—অবশ্য এ কালান্তর আত্মিক কালান্তর। কবি স্বীয় হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এখন কবির কাছে যৌবন অতিক্রান্ত জীবন যেন অন্ধকার ও অনিশ্চয়। কবি-হৃদয়ের বিষাদ আর গ্লানি ফুটে ওঠে 'ক্লান্ত', 'অন্ধকার', 'অনিশ্চয়তা', 'অসম্ভব' প্রভৃতি শব্দে। 'এক বসন্তেই শূন্য তূণ' বাক্যাংশে যেন যৌবন হারানোর হাহাকার ফুটে ওঠে। তবে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কবিকে মাঝে মাঝে প্রাণিত করে, আর যখন তাঁর মনে হয় যে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পেরেছেন তখনই অবচেতনার গভীর থেকে উঠে আসে কামনার বন্যার প্রদীপ্ত প্রোজ্জ্বল কবিতার অংশ—'জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা/হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।' যৌবন অবসিত হওয়াতে কবির শান্তি নেই। কবির মনে হয়—কবি এতদিন অকারণে মনকে অস্থিরতা থামাতে অনুরোধ করেছিলেন। অকস্মাৎ যৌবনের আকাঙ্ক্ষায় কম্পিত হওয়া অপেক্ষা পাশা খেলাতেই বোধহয় কবি নিশ্চয়তা খুঁজে পেতে চান—'উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো।' তবে চিত্রাঙ্গদার আশা না করাই ভালো। কবি যৌবন হারানোর বেদনায় মদিরার বুকে আশ্রয় গ্রহণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করেন। চিত্রাঙ্গদা এখানে কামনার অনিবার্যতায় উপস্থিত হয়, চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে কোনো অসম্ভব মায়াবিনী আমন্ত্রণ; ব্রহ্মচারী অর্জুন তাতে বিচলিত, বিভ্রান্ত ব্রহ্মচারী অর্জুনও ব্রহ্মচর্য বিসর্জন দিয়ে চিত্রাঙ্গদার বিলোল যৌবনের কাছে আত্মসমর্পণের আশায় উন্মুখ। সব্যসাচী অর্জুনের ব্রহ্মচর্য বিসর্জন

দেওয়াতে যৌবনের জয় ঘোষিত হয়। কবি তৃষ্ণার আদিমতম উৎস অনুসন্ধানে তৎপর হন, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া তো অসম্ভব। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের দ্বন্দ্বে কবি যেন যৌবনের মাধুরিমাতেই লগ্ন হতে চাইছেন, এক বসন্তেই তূণ শূন্য হওয়াতে কবির নিঃসীম বেদনা। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের দ্বন্দ্বে প্রৌঢ়ত্বের জয়লাভ অসম্ভব—তাই এ কবিতা হয়ে ওঠে 'অসম্ভবের গান'।

'এক বসন্তেই শূন্য তূণ' বাক্যাংশটি কবিতায় দুবার ঘুরে ফিরে আসে; আর একবার ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে আসে—'শূন্য তূণ এক বসন্তেই।' শূন্যতার বেদনা, নিঃসঙ্গতা কবিকে যেন অতলান্ত বেদনার গহ্বরে নিক্ষেপ করে, আর তাই কবিকে ঘুরে ফিরে শূন্যতায়, পথহীনতায় আশ্রয় নিতে হয়। কবি 'অর্জুন', 'যুধিষ্ঠির 'পাঞ্চালী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কৃষ্ণ', 'সব্যসাচী' প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র ব্যবহারের দ্বারা এক পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনা করতে চান—যদিও কবিতাটি পরিণতিতে পুরাণাশ্রয়ী কবিতার নবভাষ্য হয়ে ওঠে না। 'পাঞ্চালী' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নারীর মাধুর্য ও কমনীয়তা নিয়ে কবির কাছে অনিঃশেষ সৌন্দর্যের প্রতিমা হয়ে ওঠেন। যৌবনে দীপ্র কামনার বন্যায় জীবনকে ভাসিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা কবিহৃদয়ে সংগুপ্ত; অথচ প্রৌঢ়ত্ব তাঁকে সেই পথে নিয়ে যেতে অক্ষম—এমনই সীমাহীন বেদনার অতলান্ত ট্র্যাজেডির গান এখানে ধ্বনিত, এ যেন পরাভূত যৌবন সৌন্দর্যের শেষ মুহূর্তে জ্বলে ওঠা, যা অসম্ভব তার জন্য আর একবার পুরাণপ্রতিমার আশ্রয় গ্রহণ।

শীতরাত্রির প্রার্থনা

'শীতরাত্রির প্রার্থনা' (১৯৫৩) বুদ্ধদেবের দীর্ঘ কবিতার অন্যতম। সাধারণভাবে আত্মজ্ঞানমূলক এই কবিতাটিতে ২০টি স্তবকে মোট ১২৪টি পঙ্‌ক্তি আছে। পঙ্‌ক্তিগুলি সংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। আপাতদৃষ্টিতে তৎসম শব্দ ব্যবহারের জন্য কবিতাটির গঠন সংহত মনে হলেও আসলে কবিতাটি শিথিলবদ্ধ এবং কবি অনেকক্ষেত্রে অতিকথনের আশ্রয় নিয়েছেন; ফলে কবিতাটি তরল গীতিধর্মিতায় পর্যবসিত হয়েছে। 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থের প্রায় শেষ কবিতা এটি। শীতরাত্রির প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আগামী নবজন্মের উজ্জ্বল দ্যোতনা ঘোষিত হয়েছে। শীতের প্রচণ্ডতা, ভয়াবহতা, শাদা স্তব্ধতা, নিঃসীম অন্ধকার প্রভৃতি যে শেষ পর্যন্ত 'বসন্তের প্রথম চুম্বনে' জাগ্রত হওয়ার আর্তিমাত্র কবি সে কথাই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন এবং আত্মদর্শনের গহন গভীরতায় নিমজ্জিত হয়ে জীবনের দর্শন প্রকাশ করেন—যা শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির দর্শন হয়ে দেখা দেয়।

'প্রথম স্তবকে কবি জীবনের সমস্ত ভাবনা বিস্মৃত হয়ে হিম নিঃসঙ্গতা' আর 'অন্ধকার নিস্তাপ রাত্রি'র জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। দ্বিতীয় স্তবকে কবি শীতার্ত জগতের মৃত্যুর করাল চিত্র প্রত্যক্ষ করেন 'ডাইনি হাওয়ার কনকনে চাবুকে' আর 'হিংসুক হাতে' ছড়িয়ে দেওয়া হিমে। তৃতীয় স্তবকে চিরকালের জন্য ফুলে ভরা, পাখি ডাকা পৃথিবী হারিয়ে যায় উত্তরের শীতে, অন্ধকারে আর মেরু হাওয়ার ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে। তৃতীয় স্তবকের শেষে ধ্বনিত সংহত হওয়ার প্রবণতা চতুর্থ স্তবকে বিতানিত হয় এবং অপেক্ষিত অতীত কবির কাছে ভবিষ্যৎ

অভিধায় অভিহিত হয়। পঞ্চম স্তবকে পুরাতনকে উপলব্ধি করার জন্য রিক্ত হওয়ার কথা উচ্চারিত। ষষ্ঠ স্তবকে অতীত আর ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির ভাবনা।

সপ্তম স্তবকে আবার পৃথিবীর মৃত্যুর পুনরাবৃত্তির দৃশ্য—'সব সবুজ নিবে গেছে, চারিদিকে শুধু কঠিন শাদা স্তব্ধতার চিহ্ন।' এই মৃত্যুর অন্ধকারে মানুষকেও ডুবতে হবে। তা নাহলে জন্মের আলোয় প্রত্যাবর্তন করা যায় না। যদি সত্য করে কেউ বাঁচতে চায় তবে তাকে জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দুলতেই হবে—অষ্টম স্তবকে এই তত্ত্ব অভিব্যক্ত। নবম স্তবকে শীতের মূর্তি মৃত্যুর প্রতিরূপ রূপে উপস্থিত হয়। অন্ধকারই মৃত্যুর অন্য নাম কবির বিশ্বাসে সত্য হয়ে ওঠে। দশম স্তবকে কবির উপলব্ধি সত্য—মানুষের জীবনেও রঙিন সাজ ছিঁড়ে গিয়ে শীতপ্রতিম জরা নেমে আসে। একাদশ স্তবকে প্রাণের, নতুন জন্মের দ্যোতনা আভাসিত—'প্রচ্ছন্ন প্রাণ অবিচল ধৈর্যে জেগে আছে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্রি।' ফলে শীতের বরফের কাছে ঋণের অন্ত নেই। দ্বাদশ স্তবকে গোপনে গোপনে প্রাণের অনন্ত ধারাবাহিকতা, 'বসন্তের প্রথম চুম্বনে' প্রাণের জেগে ওঠার চিত্র। ত্রয়োদশ স্তবকে আবার দর্শনতত্ত্ব—সন্দেহ-অবিশ্বাসের চোরাবালি পেরিয়ে উৎসর্জন আর সমর্পণের দ্বারা নিজেকে যোগ্য করে তোলার নির্দেশবাক্য উচ্চারণ। চতুর্দশ স্তবকে 'নেকড়ের মতো অন্ধকারে', 'আততায়ীর ছুরির মতো শীতে' প্রাণের উৎসর্গীকৃত যজ্ঞে আত্মার প্রদীপ্ত শিখা প্রজ্জ্বলিত হবে। তার জন্যে পবিত্র প্রতীক্ষার প্রয়োজন। পঞ্চদশ স্তবকে, কবির শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধ্বনিত হয় জিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে গির্জার অনাদ্যন্ত অনাহত ঘণ্টাধ্বনি, অন্য এক আশ্বাসের উচ্চারণে ইতিহাসের আকাশ ধ্বনিত হয়। ষোড়শ স্তবকে কবি উপনিষদের সত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে অমৃতের পুত্র, কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'অসতো মাং সদ্‌গময়, তমসো মাং জ্যোর্তির্গময়।' তিনি প্রত্যয়ী হন যে, মানুষের জীবন শুধু দেহের গণ্ডিতে বাঁধা নয়।

সপ্তদশ স্তবকে জন্ম-মৃত্যুর নানা আবর্তিত বিরহমাল্যে প্রাণের জয় ঘোষণা। অষ্টাদশ স্তবকে তৃপ্তিহীন জ্বালার অন্তহীন বিরহ উত্তীর্ণ হয়ে মানবাত্মার অন্তহীন অভিসারের বাক্যবন্ধ উচ্চারণ। ঊনবিংশ স্তবকে কবি পুনরায় কবিতার প্রথম দিকের সেই ভয়ংকর শীতার্ত প্রেতার্ত অন্ধকারের কথা উচ্চারণ করে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষার কথা বলেন। বিংশ স্তবকে মৃত্যু উত্তীর্ণ ফসলের আশ্চর্য সফলতা, সবুজের উল্লাস, বসন্তের অমর ক্ষমতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত। একবিংশ স্তবকে—মৃত্যুর অপর নাম অন্ধকার—একথা কবি প্রজ্ঞাপ্রত্যয় কণ্ঠে জানিয়ে দিয়ে মাতৃগর্ভের অন্ধকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং 'শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে' নবজন্মের জন্য প্রস্তুতির বাক্য উচ্চারণ করেন। কবিতাটি প্রতীক্ষা আর প্রস্তুতির আশ্বাস-বাক্যে সমাপ্ত হয়।

কবিতাটির গড়ন আবর্তধর্মী। এ কাব্যে এক আবেগকে অন্য আবেগে নিয়ে যাওয়ার মতো সরলরেখাধর্মী গতি নেই। অবিরাম পাক খেতে খেতে এ কবিতার গতির প্রবাহ—ফলে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ একাধিকবার আবর্তিত হয়। জীবনের করুণ অপচয়, অগাধ শূন্যতা আর নিঃসীম বিচ্ছিন্নতার জ্বালা প্রকাশের জন্য তিনি এমন কতকগুলি চিত্রকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করেন যা পাঠকের অস্তিত্বের গভীরে নাড়া দেয়। যেমন 'হিমনিঃসঙ্গতা'/'অন্ধকার নিস্তাপ রাত্রি'/'ডাইনি হাওয়ার কনকনে চাবুক'/'শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ'/'পৃথিবী মরে গেলো আজ'/'শুধু কঠিন

শাদা স্তব্ধতায় চিহ্ন'/'অনাকার অন্ধকার'/'প্রেতের চীৎকারের মতো হাওয়া'/'ঝাপসা পথ চাওয়া'। এই কবিতার কয়েকটি বাক্য/বাক্যাংশ যেন প্রবাদ-প্রতিম গাম্ভীর্যের স্বাক্ষর বহন করে—(১) 'যে অতীত অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য, তারই না.. ভবিষ্যৎ।' (২) 'হারাতে হবে যা কিছু তোমার চেনা'/ (৩) দুলতে হয় মৃত্যু আর নবজন্মের বিরামহীন দোলায়'/(৪) 'অন্ধকারকেই মৃত্যু নাম দিয়েছি আমরা'/(৫) 'বার বার মরতে হয় মানুষকে, নতুন করে' জন্ম নেবার জন্য'/ (৩) 'মৃত্যুর নাম অন্ধকার'।

বুদ্ধদেবের কবিতায় গঠনশিল্পের মূল্যবান দিক হল পুরাতন কাব্যিক ছাঁদের ক্রিয়াপদ বর্জন করে চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ আনয়ন। যেমন—মুছে গেছে/ভাঙলো/ছিড়ে নেয়/ছিটিয়ে দেয়/উপড়ে আনে/ছড়িয়ে দেয়/এঁকে যায়/ফুরিয়ে যায়নি/বেঁধে রাখতে/লুকিয়ে রাখতে/ফেলে দিতে হবে/হারাতে হবে/ভরে তুলবে/ভুলে যাও/মরে গেলো/ডুবতে হবে/মরতে হয়/হারিয়ে যায়/ঢিলে ছিলো/মুছে গেল ইত্যাদি। কবি যখন শীতের ভয়াবহতাকে পর্যুদস্ত করে প্রাণের জয়বার্তার কথা ঘোষণা করেন তখন দীর্ঘ বিতানিত গদ্যবাক্যের আশ্রয় গ্রহণে তাঁর সেই ভাবনা মঞ্জরিত হয়। যেমন—(১) 'প্রচ্ছন্ন প্রাণ অবিচল ধৈর্যে জেগে আছে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্রি।' (২) 'রাশি রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়।' (৩) 'জ্ব'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়।'

বুদ্ধদেব বসু রাত্রির কবি—'শীতরাত্রির প্রার্থনা' পড়ে অন্তত এ ধারণা করা যায়। তবে এ রাত্রি তাঁর 'মায়াবী টেবিল'-এর 'প্রেয়সী রাত্রি' নয়; এ রাত্রি 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের 'স্পন্দনময় তনু'-স্পর্শের রাত্রি নয়, এ রাত্রি হল 'বয়সের রাত্রি'। 'ডাইনি-হাওয়ার কনকনে' চাবুকে 'গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুক্‌রো ক'রে ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপড়ে আনে আকাশ, হিংসুক হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।'

'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় কবি মহাকালের অকল্পনীয় সৃষ্টিধর্মের মহারহস্যকে অনুভব ও প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। রাত্রি, পৃথিবী, শীত, বসন্ত প্রভৃতিকে অবলম্বন করে কবি এই ভাবনা প্রকাশে প্রয়াসী। নিসর্গের বস্তুকে অবলম্বন করে বুদ্ধদেব আত্মসংলাপী ভাষায় তীব্র আবেগকে কাব্যরূপ দান করতে চেয়েছেন। যৌবন ও যৌন অনুষঙ্গতাবাচক শব্দে বুদ্ধদেবের এই প্রতীতি ব্যক্ত। "নীহারিকা রহস্যে ঢাকা মহাবিশ্বের অনাকার আদিম অন্ধকারের ভিতর থেকে বিপুল এক প্রাণীর শক্তির বেগে বিশ্ব ও বিশ্বজৈবের জন্ম, জলে তাপে বায়ুতে ভূমিতে তা সৃষ্টির আকার আর্তি যৌনতা জীবন, রাত্রির গহন মগ্নতা স্পর্শ করে কবির চৈতন্য সেই নিত্য হয়ে-ওঠার সাড়া পায়। সৃষ্টিরহস্যের আদি পরিচয় সম্পর্কে কবির এ অকল্পনীয় অনুভব আমাদের পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মতো অস্মিতাহীন বিবৃতি নয়, কবির স্বতন্ত্র যৌন-চৈতন্যে স্পন্দিত।"[১৫] চৈতন্যশাসিত অন্তদর্শনকে তিনি সময়শাসিত শব্দ-অভিজ্ঞানে প্রকাশ করে কবিতার কাঠামোয় গদ্য কবিতার নিরলংকৃত ভাব বজায় রাখতে চেয়েছেন। 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' কবিতায় গদ্য কবিতার অন্ত্যমিল লক্ষ করা যায় প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে, পঞ্চম পঙ্‌ক্তিটি একক, বিনির্মুক্ত। বাক্য-অর্থ-দর্শনের অতলান্ত চৈতন্যশাসিত 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' বুদ্ধদেবীয়

মানসিকতার অনন্য প্রত্যভিজ্ঞান; বাংলা কবিতার এক মনীষাসমৃদ্ধ অস্থির, বিচ্ছুরিত আবেগের উদ্বেলতা, উত্তালতা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি *২২ শ্রাবণ* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। *২২ শ্রাবণ এক পয়সায়* একটি কবিতা গ্রন্থমালার পঞ্চম সংখ্যা; রচনাকাল ১৩৪৮-১৩৪৯। কবিতাটি কবির কবিতা সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতার* অন্তর্ভুক্ত হলেও, ভারবি প্রকাশিত *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*-র (১৯৫৩) অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৭) সম্পাদনা করেছেন নরেশ গুহ। তিনি 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি কেন এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হল তার কৈফিয়ত দান প্রসঙ্গে বলেছেন—" 'যামিনী রায়কে' এবং 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা দুটি একটু আলাদা জাতের রচনা। ***এদের মধ্যে সমাজ চেতনার মতো এক ধরনের সাময়িক প্রবণতার ছাপ আছে যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসুকেও ক্ষণিকের জন্য নাড়া দিয়েছিল। সেই পর্যায়ের একটি দুটি নমুনা রাখা উচিত মনে হলো।" 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি ব্যতীত বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে পরিশিষ্ট অংশে বর্জিত কবিতাবলী অধ্যায়ে "২২ শ্রাবণ' থেকে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' (১. প্রাণে মোর আনো তব বাণী। ২. একে একে খসে পড়ে। ৩. যায় না এমনদিন যেদিন তোমারে) কবিতা আছে। *যে আঁধার আলোর অধিক* (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থেও 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি কবিতা আছে। তবে *যে আঁধার আলোর অধিক* কাব্যগ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' (রচনা ২১ এপ্রিল ১৯৫৫) কবিতার ভাবনার সঙ্গে *২২ শ্রাবণ* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির দুস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রায় ওই একই সময়ে রচিত ২২ শ্রাবণ থেকে বর্জিত কবিতাবলি অংশে স্থান পাওয়া 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা তিনটির আশ্চর্য, ভাবগত সাদৃশ্য সংলক্ষ।

২২ *শ্রাবণ* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির রচনাকাল ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯। ২২ *শ্রাবণ* কাব্যগ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা সংগ্রহ*-এর সম্পাদক নরেশ গুহ ভূমিকায় জানিয়েছেন—

> "আধুনিক বাংলা কবিতার ক্রমে পরিস্ফীত ধারাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যপর্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সেদিক থেকে বর্তমান পুস্তিকাটি বিশেষ কৌতূহলজনক। সৎ কবির কাজ কী, তিনি সামাজিক ইতিহাসে ক্রীড়নক কিনা, সমাজবিপ্লব ঘটানোর জরুরি কাজে ব্যাপৃত না হ'য়ে তাঁর পক্ষে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা আদৌ সম্ভবপর কিনা, অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের চেতনা তার রচনাকর্মে ক্রিয়াশীল না হ'লে তার কী পরিণাম হ'তে পারে—এইসব গুরুতর বিষয় নিয়ে লেখক-পাঠক-বিদ্বজ্জন সমাজে তখন তুমুল আলোড়ন চলছিলো। মৃত্যুশয্যা থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, ২৪ মে ১৯৪১ সালে উদয়ন থেকে বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন:
>
> "আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত একথা বারবার শুনেছি এবং বারবার ভিতরে

ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নই—কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ˘ ˋ ঘাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়। ...আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা কোনও ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টি উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা ওর সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায় কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। ... সেটুকুই বড়ো করে দেখো যে-ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে যে-মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। তোমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।"

ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের প্রভাবে জীবনে এই একবারই মাত্র এমনকি বুদ্ধদেব বসুও শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন। এবং পূর্বোদ্ধৃত চিঠি থেকে অনুমান হয় যে এই মনোভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সর্বশেষ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল যার আংশিক বিবরণ আছে *'সব পেয়েছির দেশে'* নামক গ্রন্থে। স্বল্পস্থায়ী এই সমাজচেতন মনোভাবেরই কৌতূহলজনক ছাপ দেখা যাবে ২২ *শ্রাবণ* পুস্তিকার কবিতাগুলিতে। ১৯৪২-এ লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি বুদ্ধদেব পরবর্তীকালে কেন শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহে বর্জন করলেন, এ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ১৯৪২-এ লিখিত আলোচ্য কবিতাটিতে এমন কিছু ভাবনা-চিন্তা বা মনোভাবের প্রকাশ ছিল যা পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু মানতে পারেননি। মনে রাখতে হবে, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি লেখার মাত্র এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ঘটেছে। চারিদিক মহাযুদ্ধের ভয়ংকর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, পরাধীন ভারতবর্ষের লেখকদের উপর সেই ভয়ংকর মহাযুদ্ধ প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব না ফেললেও, তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো যোগ না থাকলেও একথা সত্য যে, ইউরোপে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকাও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে এগিয়ে এসেছিল। *'তরী হতে তীর'* গ্রন্থের লেখক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—"চিন, অ্যাবিসীনিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশকে নিয়ে ফ্যাসিজমের কদর্য-কুকীর্তি আর তার পেছনে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ সমর্থন তখন আমাদের দেশের সর্বস্তরে এক নতুন চেতনা উদ্রিক্ত করেছিল, 'অভিজাত' পত্রিকা বলে বর্ণিত 'পরিচয়' ফ্যাশিস্তবিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকায় নেমেছিল।—জগৎ জুড়ে ফ্যাশিজমকে রোধ করার লড়াইয়ে ভারতবর্ষকে তাই অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়তে হল, আর ঐতিহাসিক এই বির্বতনের ছায়া পড়ল আমাদের রাজনীতিতে, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের জীবনে।" এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বুদ্ধদেব বসু সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। ১৯৩৮-এ কলকাতার আশুতোষ হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলীতে মুলকরাজ আনন্দ, পণ্ডিত সুদর্শন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু ছিলেন। ১৯৪২-এর ৮ মার্চ ঢাকার তরুণ গল্পকার ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কর্মী সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্তপন্থী ও কমিউনিস্ট বিরোধীদের হাতে নিহত হলে, ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট লাইব্রেরি হলে

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখকদের যে সম্মেলন হয় সেখানে বুদ্ধদেব বসু সভাস্থলে কালোপযোগী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর তরফে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর লিখিত 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম্' নামক গ্রন্থও ছিল। সুস্নাত দাশের *ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা* গ্রন্থ থেকে জানা যায়—"ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার-পুস্তিকার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা হলো—বুদ্ধদেব বসু রচিত 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম'। এটিরও অন্য এক তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, রাজনীতির শতযোজন দূরে যাঁর অবস্থান, বিশুদ্ধ সাহিত্যের যিনি উপাসক, সেই উন্নাসিক ও অভিজাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু কিভাবে নিঃসঙ্গতার গজদন্তমিনার থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও নেমে এসে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ঐতিহাসিক এক আন্দোলনে সফল হয়েছিলেন এই রচনাটি তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।"

বুদ্ধদেব বসু তাঁর *সভ্যতা ও ফ্যাসিজম* গ্রন্থে লিখেছিলেন:

> "রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিল না। বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা কিছু ভালো যা-কিছু খাঁটি তা রচনাচর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি। এ-ব্যাপারে যেমন প্রবল আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করেছি এবং আজ পর্যন্ত করি, তেমন আর কিছুতেই করি না। এ-কথা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। ভালো লিখবো, আরো ভালো লিখবো—আমার সমস্ত জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি এই ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। ***একদিকে জর্মানি, ইটালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ; অন্যদিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সাধনা। এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়োরকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিলো। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমব্লি হলে বক্তৃতা নয়, মাছ ও পাউরুটির বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবনযাপন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং সেই জন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে-অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হয়ে জ্বলে ওঠে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে। ***লোভ জিনিসটা অতি কুৎসিত এবং কবি কুৎসিতকে সইতে পারেন না। তাই আজ পৃথিবী ভ'রে লোভ যখন তার বীভৎসতম মূর্তিতে প্রকট তখন আমরা কবিরা, শিল্পীরা স্বভাবতই, নিজের প্রকৃতির অদম্য টানেই, ওই বীভৎসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো—এর মধ্যে রাজনীতির কোনো গূঢ়তত্ত্ব নেই, আমাদের মনুষ্যত্বের কবিচরিত্রের এটা ন্যূনতম দাবি। বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। জর্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে একে বিতাড়িত হতে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ষণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত হতে লাগলো, তখন ঘৃণায় শিহরিত হ'য়ে এ-কথাই ভাবলুম যে দু'দিন পরে এইরকম কোনো পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তাহলে আমরা যারা কবি শিল্পী বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো, এই দুর্গত

পরাধীন দেশেও চিন্তার ও আত্মপ্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটুকুও আর থাকবে না, শুধু যে আমাদের জীবিকা কিংবা জীবন যাবে তা নয়, যা কিছু আমাদের কাছে মূল্যবান, যে-সব জিনিস আছে ব'লে আমরা বাঁচতে চাই এবং যা না থাকলে আমাদের জীবনের কোনো মানে থাকে না সব একেবারে ছারখার হ'য়ে যাবে। স্প্যানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা। তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধলো। বর্বরতার শেষ সূক্ষ্ম মুখোশ খ'সে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইল না। জলে স্থলে আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধৃহত্যা নয়, নারীহত্যা শিশুহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌঁচেছে। আজ এ-কথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। ***এরই নাম ফ্যাশিজম্। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাশিজম্-এর ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। ***ফ্যাশিজম্ শুধু একা রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়, ফ্যাশিজম্ একটা মনোভাব। ***আমি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সাধনার মহিমায় আমি মুগ্ধ; তাই আমি শান্তি চাই, প্রীতি চাই, মুক্তি চাই, যাতে এই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি অর্জন করতে পারে। যা চাচ্ছি তা শিগগির হয়তো হবে না, সহজেও হবে না, কিন্তু সেইজন্যই তো আরো নিষ্ঠা আরো সাহস দরকার, আগে থেকেই হার মানলে চলবে না, ভীরু হলে চলবে না। নৈরাশ্যের আবছায়ায় নিজের কাপুরুষতা লুকিয়ে রাখলে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি আমার নিজেরই এ-কথা আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করি।" [পরিচয়/ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংখ্যা (১৯৭৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত]

সোমেন চন্দকে নিবেদিত ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রথম কাব্যসংকলন 'প্রাচীর'-এ বুদ্ধদেব বসু কবিতা লিখেছিলেন। *প্রাচীর* কাব্যসংকলন প্রকাশিত হলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩৪৯) সম্পাদকীয়তে লেখেন—"...সম্প্রতি ছাত্র সমাজ একই সঙ্গে নিহতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও হত্যাকারীর প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'প্রাচীর' নামক কবিতার সংগ্রহটি সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে। এ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অত্যন্ত শোভন হয়েছে, কারণ 'প্রাচীর' বইটিতে বাংলার অনেক কবি তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যে মনোভাব সংস্কৃতি ও প্রগতির শত্রু।"

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির আলোচনার প্রাক্-ভূমিকারূপে উল্লিখিত তথ্যগুলি আমাদের জানতে হয়; কেন-না কবিতাটি ওই পর্বের বুদ্ধদেবীয় মানসিকতার ফসল। প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে জড়িত হওয়ার ফলে সমকালীন যে পরিমণ্ডল তাঁকে বিচলিত করেছিল, তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি এ কবিতাতে অত্যন্ত স্পষ্ট অলংকৃত ভাষায় প্রকাশিত। শব্দচয়নে হয়তো রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত নন, কিন্তু ভাবনাচিন্তার দিক থেকে প্রগতিশীল। সামগ্রিক মানবসভ্যতার পটভূমিতে অগ্রজ কবিকে মননে অনুভব করার মানসিকতাই সমালোচ্য কবিতাটির রচনার উৎস।

মানবসভ্যতার দারুণ দুর্দিনে অনুজ কবি বুদ্ধদেব অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন। মানবসভ্যতার নিদারুণ অবক্ষয়ের দিনে, মহাযুদ্ধের ভয়ংকর বিধ্বংসী দিনগুলিতে, ফ্যাসিবাদের নির্মম অত্যাচারে, মানবাত্মার আর্ত লাঞ্ছিত পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই কবির মনে উদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিঃসীম সাহসী ভূমিকা। তাই তাঁর কাছে তিনি বন্ধু ও প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান শয্যায় মানুষের মর্মে ও মজ্জায় যখন মহামারি সংক্রমিত, প্রাণলক্ষ্মী যখন নির্বাসিতা—তখন ইতিহাসের শ্বাসরোধকারী ধূম্রসমাচ্ছন্ন অধ্যায়ে মানবতার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রোচারণকারী রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়াই তো স্বাভাবিক। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে সুন্দর আজ বিদ্ধ, মৃত্যুবহনকারী আকাশযানে অধিষ্ঠিত মর্মন্তুদ অত্যাচারের প্রতীক রাক্ষস নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে; নির্মল, নীলাকাশে আকাশযান থেকে বর্ষিত বোমায় সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্বরতাই শ্রেষ্ঠত্বের নামান্তর। দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত, কম্পিত। প্রাণের প্রকাশ সর্বত্র অনুপস্থিত—প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তির লোভের লালসা ক্রমপ্রকাশমান। জীবনের এই বিনষ্টি, মানবসভ্যতার এই ভয়াবহ অবক্ষয়, পররাজ্য আগ্রাসী মনোভাব ইত্যাদির ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে যে নারকীয় অবস্থা, পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা বোধ হয় সহ্য করা কবির পক্ষে সম্ভব হত না, যদি না তিনি রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রে দীক্ষিত হতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা কবির চিত্তদেশে আমূলভাবে প্রোথিত বলে, রবীন্দ্রনাথের উজ্জীবনী গায়ত্রীমন্ত্রে চিরবিশ্বাসী, চির দীক্ষিত বলে বুদ্ধদেবের পক্ষে নারকীয় পরিবেশে বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়েছে। নবজীবনের আশ্বাসে উদয়শিখরে যে মাভৈঃ বাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আজীবন উচ্চারিত বুদ্ধদেবীয় মানসিকতা তার অমৃতনিস্যন্দী বাণীতে চির অভিস্নাত বলে বুদ্ধদেব দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাসের মন্ত্রে প্রাণিত হয়ে উচ্চারণ করলেন—

অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাইতো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

'বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথ' ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক আন্তর্জাতিকতার পুরোহিত, শান্তির দূত, দুর্বলের বন্ধু, শোষকের শত্রু মানবপ্রেমিক, ঈশ্বরপ্রেমিক, পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমন্ত্রের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথের কাছেই যে বিশ্বযুদ্ধের সীমাহীন অত্যাচারে ফ্যাসিবাদী দানবের মর্মন্তুদ ভয়াবহতার পীড়িত কবিমানস মুক্তি চাইবে এতে কোনো আশ্চর্যময়তা নেই। আছে ইতিহাসের অনিবার্য অমোঘ ফলশ্রুতি।

সমালোচ্য 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি যেন বুদ্ধদেবীয় কবিমানসিকতা বিচ্যুত কবিতা। কেন-না, বুদ্ধদেব তো মূলত রোম্যান্টিক কবি। তাঁর কবিতার বিষয়—প্রকৃতি, প্রেম আর নারী। কিন্তু তবুও তাঁকে মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতে হয় সচেতন সমাজ পরিমণ্ডলে—যেখানে তাঁর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবি, শিল্পী, ধ্যানী, মরমি সত্তাপেক্ষা দেশপ্রেমিক, সমাজসচেতন, মানবতাবাদী সত্তা অনেক বড়ো। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর কাছে জগতের কবিরূপে তাঁর আশ্রয় খুঁজে নিতে চান। আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বিশাল নন, সারা জীবনব্যাপী আশ্রয়—'আমার প্রথম প্রেম, সর্বশেষ প্রেম তাও তুমি।' 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় উচ্চারিত বুদ্ধদেবের যে

রবীন্দ্র দীক্ষামন্ত্র, যা তাঁকে প্রাণের মহিমায় পূর্ণ করেছে তা কিন্তু শুধু সমকালীনতার ফসল নয়; কেন-না *বন্দীর বন্দনা* রচনার যুগে রবীন্দ্র বিরোধিতার কালেও বুদ্ধদেব লিখেছিলেন— "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু আজি হতে শতবর্ষ পর / কবিবৃেে. রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক/প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন ঋতু/সকল শোকের শান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।" *বন্দীর বন্দনা* কাব্যগ্রন্থে 'কোনো বন্ধুর প্রতি' কবিতায় ১৯২৯-এ যার সূচনা, ১৯৪২-এ তারই পরিণতি দেখি 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায়। আসলে আলোচ্য কবিতার সমাজচেতনার মতো এক ধরনের সাময়িক প্রবণতার ছাপ আছে যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসুকেও ক্ষণিকের জন্য নাড়া দিয়েছিল। বুদ্ধদেব সম-সাময়িক চিত্তবৃত্তির অস্থিরতাকে যে অস্বীকার করতে পারেননি তার প্রকাশ সমালোচ্য কবিতায় সংলক্ষ্য এবং যে-কোনো কবির পক্ষে সমকালকে অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত ছিলেন, অন্তত প্রথমদিকে এটা শুধু সামাজিকতা কিংবা বন্ধুত্বের খাতিরে বলে মনে হয় না; তখনকার রচিত কবিতাবলিতেও এই তৎকালীন মানসিক পরিমণ্ডলের অনিবার্য ছাপ পড়েছিল। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটিই ধরা যাক। শব্দচয়নে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি খুব অস্পষ্ট নয়, কিন্তু ভাবনাচিন্তার দিক থেকে বেশ প্রগতিশীল, যদিও মূল চিত্রকল্পটি এসেছে, ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে, রামায়ণ, হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ থেকে। জীবনের সোনার হরিণ উন্মত্ত জন্তুর মুখে, দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে থরোথরো কাঁপছে, লুব্ধতার লালা ঝরছে এমনকি ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে। উন্মত্ত জন্তুটি অবশ্যই ফ্যাসিজম। চতুর্দিকে এত দুঃখ, এত দুঃসহ ঘৃণা, এত নরক—কবি এখন সহ্য করতে পারছেন তা কবিতাটি থেকে জানতে পারি। শুধু রবীন্দ্রনাথের অক্ষয়মন্ত্র তাঁর রক্তে লিপ্ত হয়েছে বলে, গূঢ় মর্মমূলে বিদ্ধ হয়েছে বলে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এত কবিতার তাই অন্তিম ঘোষণা:

অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাইতো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

এই উচ্চারণ সম্পূর্ণতই প্রগতিবাদী ব্যাকরণসম্মত। কবিকে সরাসরি জীবনের জয় হবে বলে স্বাস্থ্যকর ঘোষণা করতে হবে এই ছিল তখনকার আধুনিক নান্দনিক মনোভাব। কবির কাজ হল মানবজীবন এবং মানবসমাজের প্রগতিতে ঘোরতর আস্থার বাণী ঘন বন অন্যদের মনে করিয়ে দেওয়া, যাতে তারা হতাশায় ভেঙে না পড়েন অথবা, উদাসীন হয়ে কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন না করেন। রূপদক্ষ কারিগরদের প্রশংসাযোগ্য একমাত্র করণীয় হল উদার স্বাধীন নিঃশঙ্ক ভাবী সমাজ গড়ার কাজে আশা-ভরসা জুগিয়ে যাওয়া।" 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, এই কবিতাটির পিছনেও এই একই মনোভাব মোটামুটি কাজ করছে। প্রগতিশীলতার এটা একটা চমৎকার রোমাণ্টিক প্রকরণ।" [ছিলে না বনের মৃগ/নরেশ গুহ। *বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ/*সম্পদনায়—আনন্দ রায়]

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়লে দেখা যাবে যে, তিনি সমাজ ও মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীর রূপ অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজ, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। মনুষ্যত্ববোধের মহান প্রেরণা থেকেই

তাঁর একালের কবিতা রসসঞ্চয় করেছে। 'সভ্যতার সংকটে' কোনো মানবতাবাদী কবিই যে নিরাসক্ত ও উদাসীন থাকতে পারেন না, আলোচ্য কবিতাটি তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। আসলে 'প্রত্যেকটি যুগ, তার কবি বা কবিসমূহের মধ্যে স্বর খুঁজে পায়।' *সভ্যতা ও ফ্যাসিজম পুস্তিকায়* এমন প্রত্যয়ের ঘোষণাও আছে, যাতে বুদ্ধদেব বসুকে 'সমাজতান্ত্রিক প্রগতিবাদী' আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর এ-সময়ের প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনা অন্যান্য কবিতাতেও লক্ষ করা যায়। ঢাকায় সোমেন চন্দর হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—ফ্যাসিবাদের ব্রত হচ্ছে সভ্যতার ধ্বংসসাধন। কবি ফ্যাসিবাদী পশুবৃত্তির প্রতিবাদে নিজের কবিতার, উদ্দীপন কামনা করেছেন—'কবি যাঁরা শিল্পী যাঁরা। জ্ঞানী যাঁরা/অরাজক অন্ধকারে একমাত্র/আলোর ইশারা/অত্যাচারে অপমানে নির্বাসনে/রক্তচক্ষু শাসনেত্রাশনে। তাদের বিনাশ এর পৈশাচিক ব্রত/ ** পশুত্বের প্রতিবাদে, নিখাদে, রেখাবে/আজ হোক উদ্দীপিত/আমার কবিতা।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় ও ফ্যাসিবাদের উত্থানে যখন সমগ্র ইউরোপ মুহ্যমান, বুদ্ধদেব বসু তখন 'ফ্যাসিবাদী বিরোধী' সংগ্রামে যোগ দিয়ে কবিতায় আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। এই পর্বের কবিতায় কবির সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তাধারণার অভিপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। মহাযুদ্ধের অভিঘাতে বিশ্বমানবতার অপমান, বিশ্বব্যাপী পাপাচার ও হিংসার উত্থান যে একদিন ধ্বংস হবে—এমন প্রবল আশাবাদও প্রকাশিত হয়েছে সমকালে রচিত 'যামিনী রায়কে' কবিতায়। ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনার প্রকাশই 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় অলংকৃত, বক্তব্যধর্মী চিত্রকল্পে প্রকাশিত। জন্তুর নামান্তর ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী মনোবৃত্তিতে বিচলিত কবি মানবিকতা ও মানবিক সংকটে পতিত মানবসভ্যতার মুক্তির সম্ভাবনা দেখলেন রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে। এ মুক্তি শুধু ব্যক্তি আমির মুক্তি নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার মুক্তি যে রবীন্দ্রদর্শনে নিহিত—তাও পরোক্ষ প্রকাশিত। শেষ দুই পঙ্ক্তিতে ব্যক্ত আশাবাদ ও জীবনের জয় ঘোষণা প্রগতিবাদী সম্মত মনোভাব—

অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাইতো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।

প্রিয় সুন্দর পরিচিত পৃথিবীর মানবসভ্যতার সামগ্রিক অবক্ষয়ের পটভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায়। ফ্যাসিবাদের নির্লজ্জ আক্রমণে সভ্যতার শ্মশান শয্যা যখন রচিত হয়েছে এবং রক্তপিপাসু উদ্ধত সঙিনে সুন্দর যখন আবিশ্বে বিদ্ধ, যখন বর্বরতা তার ভয়াল নখদন্ত বিস্তার করে তার অহংকার স্পর্ধার কথা বিশ্বভুবনে ঘোষণা করে তখন রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বেশি করে মনে পড়ে। কবির নিজের দেশে বিশ্বজোড়া মারণযজ্ঞের ত্রস্ত উন্মাদনায় একালের কবির মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এদেশে আবির্ভূত না হলে এবং তাঁর অমোঘ মন্ত্রের জীবনদায়ী শক্তি আমাদের রক্তে ধমনিতে তার আবেগময় স্রোত প্রবাহিত না করলে এই দুঃসহ নরকে জীবন হত ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র। কবি বুদ্ধদেব অকম্পিত প্রত্যয়ে স্থির কিন্তু যে শেষ মহৎ মানবতার, জীবনের জয় ঘোষিত হবে মরণের ভয়াল দংস্ট্রাকে পর্যুদস্ত পরাভূত করে।

আলোচ্য কবিতায় ভাবসম্পদের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে শব্দসম্পদের যে আয়োজন করা হয়

তা মূলত তৎসম। যদিও তিনি ভেবেছিলেন যে, কবিতার ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি আনতে হবে তবুও এ-কবিতায় তা সম্ভবপর হল না কবিতার গাঢ় সংহত ভাবনার রূপায়ণের জন্য। তৎসম শব্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য কবিতার অঙ্গে অঙ্গে যেন কল্লোলের তাৎপর্যময়তা এনেছে। এজরা পাউন্ড তাঁর 'ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে বলেছিলেন, রচনার পরিবেশনে নিরঙ্কুশভাবে অনিবার্য নয়, এমন শব্দ বর্জন করতে হবে। বুদ্ধদেব বসু এই সূত্র মেনে সমালোচ্য কবিতায় অনিবার্য শব্দসমূহই ব্যবহার করেছেন। সভ্যতার নিদারুণ অবক্ষয়, মৃতপ্রায়তা বোঝাবার জন্য 'শ্মশান শয্যা' শব্দবন্ধ যেমন ব্যবহার করেন 'সঙিন'-এর আগে 'রক্তপায়ী উদ্ধত' তার অনতিক্রম্য শক্তির দুর্নিবার লালসার প্রতি ইঙ্গিত করে। 'লুব্ধতার লালা ঝরে' শব্দবন্ধে লোভ-লালসার উদগ্রতা অভিব্যক্ত হয়।

দারুণ, রক্তপায়ী, উদ্ধত, মৃত্যুবহ বর্বর, উন্মত্ত, স্নিগ্ধ, গূঢ়, অক্ষয় ইত্যাদি তৎসম বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে শব্দগত ভয়াবহতা, সৌন্দর্যের, চিরন্তনত্বের বোধকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেয়। প্রায় সর্বত্র বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে বসলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণ বিশেষ্যের বা সর্বনামের পরে বসেছে। যেমন: আমি শ্রেষ্ঠ [সর্বনামের পর বিশেষণের প্রয়োগ] প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ [বিশেষ্যের পর বিশেষণের প্রয়োগ।] এর কবিতা-ভাবনার দৃঢ়সংবদ্ধ, স্পষ্ট, অবধারিত রূপ প্রকাশিত হয়। কবিতাটির ক্রিয়াপদ দুটি ব্যতীত [সহিতে, পারিতাম] সমস্তই চলিত ক্রিয়াপদ। যেমন: করি, করে হাঁকে, ঝরে, হ'তো, লভেছি ইত্যাদি। এর মধ্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদে কবির ভাবনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত; আর অসমাপিকা ক্রিয়ার মাধ্যমে কবি পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হবার মানসিক প্রস্তুতি অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখানে এজরা পাউন্ডের 'ইমেজিস্ট ম্যানিফেস্টো'র শর্ত লক্ষণীয়, যেখানে তিনি বলেছেন, বাক্য বিন্যাসের মৌখিক রীতি থেকে চ্যুত হওয়া যাবে না; এবং সাধুক্রিয়াপদের ব্যবহার করা যাবে না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *দময়ন্তী*-র কবিতাসমূহে আধুনিক যুগে কবিতা লেখার যে ঘোষণাপত্র জুড়ে দিয়েছিলেন, সেখানেও এ সমস্ত বক্তব্য আছে। কাব্যিক শব্দ, ক্রিয়া ইত্যাদি বর্জন করলেও বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ বেশি করে নিলে কবিতায় যদি সংহতি আসে তবে তা বর্জনীয় নয়। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে কবিতার শৈলীতে তিনি তৎসম শব্দরীতির প্রয়োগ করেছেন; আমার ক্রিয়াপদে মিশ্র (সাধু ও চলিত) রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য বুদ্ধদেব বসু একথাও বলেছেন যে, কবি আদর্শের জন্য মনুষ্যজীবন ও চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং জীবনের সত্যিকার রূপের ব্যঞ্জনা প্রদানের জন্য সমর্থ ভাষারীতি প্রয়োগ করবেন। আলোচ্য কবিতায় তৎসম শব্দের সুপ্রচুর ব্যবহার থাকলেও তা দুর্বোধ্যতার প্রশ্রয় দেয়নি এবং শব্দ-সংক্রান্ত কোনো কৃত্রিমতার ধারণাও গড়ে উঠতে দেয় না।

বোদলেয়ার কবিতায় অলংকার ব্যবহার সম্পর্কে নিরাসক্ত হলেও এবং বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারীয় ধারণার অনুসারী হলেও তাঁর কবিতায় অলংকারের ব্যবহার আছে এবং তিনি অলংকারকে কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেছেন। 'অলংকারই কাব্য মাধুর্যের জনক' সংস্কৃত আলংকারিকদের-এ-তত্ত্ব তিনি মেনে নিয়েছেন তাঁর অনেক কবিতায়। আলোচ্য কবিতায় ধ্বন্যুক্তি (থরোথরো) ও রূপক অলংকারের সার্থক প্রয়োগ আছে। বুদ্ধদেব যেন চেস্টারটনের

সেই বক্তব্যে বিশ্বাসী, যেখানে চেস্টারটন বলেছেন, 'রূপকই কবিতা'। এ কবিতাতেও আছে বুদ্ধদেবীয় রূপকের চয়নিকা। যেমন: শ্মশান-শয্যা, প্রাণলক্ষ্মী ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসু চিত্রকল্প নির্মাণে কাব্যিক কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর কবিতায় নানাজাতীয় চিত্রকল্প দেখা যায়। সাধারণ চিত্রকল্প নির্মাণে বুদ্ধদেব কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দ্রিয়জ ও পরাবাস্তব চিত্রকল্পে। আলোচ্য কবিতায় তিনি সাধারণ ও মানসিক, সময়সম্পৃক্ত ও মৃত্যুচিত্রকল্পের আয়োজনেই ব্যস্ত। যেমন: সভ্যতার শ্মশান শয্যা (সাধারণ চিত্রকল্প), প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা (মানবিক চিত্রকল্প); রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিন (সময় সম্পৃক্ত চিত্রকল্প) লুব্ধতার লালা ঝরে (সময় সম্পৃক্ত চিত্রকল্প), জীবনের সোনার হরিণ (মানবিক ও পরাবাস্তব চিত্রকল্প)। আলোচ্য কবিতায় বৈচিত্র্যময় চিত্রকল্পের স্বাদ অভিব্যক্ত।

বুদ্ধদেব বসু নানা ছন্দে কবিতা লিখলেও তিনি পয়ারকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে: 'বাক্যরীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে, পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন।' আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি অষ্টাদশপদী সনেটের অব্যর্থ উদাহরণ।

> তোমাকে স্মরণ করি/আজ এই দারুণ দুর্দিনে ৮ + ১০
> হে বন্ধু হে প্রিয়তম/সভ্যতার শ্মশান শয্যায়
> সংক্রমিত মহামারী/মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
> প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা/রক্তপায় উদ্ধত সঙিনে
> সুন্দরের বিদ্ধ করে/মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
> বর্বর বাকস হাঁটে/'আমি শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বড়ো'
> দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থরো থরো
> উন্মত্ত মৃত্যুর মুখে/জীবনের সোনার হরিণ

এর রীতি মিশ্রবৃত্ত; প্রবহবান সমিল মহপয়ার (৮ + ১০) পর্যায়ক্রমিক মিলবিন্যাস যথাক্রমে ১/৪, ২/৩, ৫/৮, ৬/৭ ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব ছন্দসচেতন কবি বলে তাঁর ছন্দের প্রয়োগকুশলতা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর ছন্দ কবিতার ভাষাকে এখানে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং তিনি নিয়মিত যতিস্থাপনে পদ্যভাষার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এ-কবিতায়। কবিতা রচনার সময় বাক্য বিন্যাসের মৌলিক রীতি থেকেও তিনি বিচ্যুত হননি। বাক্যরীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলনের ছন্দকেই তিনি পয়ার বলেছেন। কবিতায় তিনি মিলকে পরিহার করতে চাইছেন না। আলোচ্য কবিতার কাব্যশৈলী বিচারে দেখা যায়, তিনি ধ্বনি, শব্দ/পদ, বাক্যখণ্ড, বাক্যগঠনের কৌশলে কবিতাটির ভাগকে ক্রমারোহণের দিকে নিয়ে গেছেন। শ্রুতিসুখকর ধ্বনির বিন্যাস বা শ্রবণরঞ্জন ধ্বনির বিন্যাসকে কবিতার ভাষার অন্যতম শর্ত বলে মনে না করলেও তিনি ধ্বনির সংগতিময় বিন্যাসকে কবিতায় প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় কখনোই সম্পূর্ণত তৎসম, বা কখনোই সম্পূর্ণত কথ্যরীতি অনুসৃত হয়নি; তাঁর কবিতা মিশ্ররীতির উদাহরণ। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা আসলে এক পৃথক রীতির উদাহরণ। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা আসলে এক পৃথক অস্তিত্বময় কাব্যভাষা যেখানে

কবির মননশীলতার অভিব্যক্তি ঘটে সভ্যতার ভয়ংকরত্ব বর্ণনায় আবার শাশ্বত জীবনদর্শনের বাণীতে উদ্‌বোধিত হওয়ার মন্ত্রোচ্চারণে।

১। কবিতার শত্রু ও মিত্র: বুদ্ধদেব বসু। আগস্ট ১৯৭৪
২। পূর্বোক্ত: বুদ্ধদেব বসু
৩। বুদ্ধদেব বসু কবিতা সংগ্রহ (১ম খণ্ড), সম্পাদক নরেশ গুহ। (গ্রন্থ পরিচয়) ১৯৮০
৪। দশদিগন্তের স্রষ্টা: আবদুল মান্নান সৈয়দ। ঢাকা ১৯৮০
৫। কবিতা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) বুদ্ধদেব বসু (গ্রন্থ পরিচয় অংশ) ১৯৮০। সম্পাদক: নরেশ গুহ
৬। কবিতার শত্রু ও মিত্র: বুদ্ধদেব বসু। আগস্ট ১৯৭৪
৭। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়: দীপ্তি ত্রিপাঠী নভেম্বর ১৯৭৭
৮। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ভাবলোক: কমলেশ চট্টোপাধ্যায় [আধুনিক বাংলা কবিতার বিচার ও বিশ্লেষণ / জীবেন্দ্র সিংহ রায় সম্পাদিত / জুলাই ১৯৮০]
৯। বুদ্ধদেব বসু—প্রকৃতি ও সংস্কৃতি / দশদিগন্তের স্রষ্টা: আবদুল মান্নান সৈয়দ। ঢাকা ১৯৮০
১০। কবিতার কালান্তর: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ১৯৭৬
১১। কবিতার কালান্তর: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ১৯৭৬
১২। আধুনিক কবিতার মানচিত্র: জীবেন্দ্র সিংহ রায়। এপ্রিল ১৯৮৬
১৩। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও বাংলা কবিতা. মৃণালকান্তি ভদ্র। [আধুনিক বাংলা কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ / জীবেন্দ্র সিংহ রায় সম্পাদিত / জুলাই ১৯৮১]
১৪। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও বাংলা কবিতা: মৃণালকান্তি ভদ্র। [পূর্বোক্ত]
১৫। জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা: শিবচন্দ্র লাহিড়ী
[আধুনিক বাংলা কবিতা: বিচার ও বিশ্লেষণ / জীবেন্দ্র সিংহ রায় সম্পাদিত / জুলাই ১৯৮১]